চড়াই উতরাই

ISBN 81-237-3735-1

প্রথম প্রকাশ 2002 (*শক* 1923)

Original English title : Fall of A Sparrow
Bangla Translation : Charhai Utrai

মূল্য : 70.00 টাকা

নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ–5 গ্রীন পার্ক
নয়াদিল্লি 110 016 কর্তৃক প্রকাশিত

জাতীয় জীবনী গ্রন্থমালা

চড়াই উতরাই

সেলিম আলি

অনুবাদ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

সূচি

চড়াই উতরাই

তিন কাল গিয়ে এককালে এসে ঠেকেছে। স্মৃতিকথা লেখার কথা মনে কখনও উদ্রেক হয়নি। তারপর দুম ক'রে একদিন ঠিক করে বসলাম লিখব। কাঁচা কাজ হয়েছিল এখন বুঝছি। এসব কাজে নথিপত্র লাগে। জমানো চিঠি, ডায়রি-টায়রি। এইসব। আমার প্রায় কিছুই ছিল না। একমাত্র অবলম্বন নড়বড়ে স্মৃতি। আমার পছন্দ হচ্ছিল না। এই অবস্থায় নাছোড়বান্দা বন্ধুবান্ধব আর 'ভক্তবৃন্দে'র উপরোধে বুকে বল পেয়ে শেষ পর্যন্ত আত্মজীবনী লেখায় আমি হাত দিলাম। যে সময়ে ভারতবাসীদের মধ্যে পক্ষিতত্ত্বচর্চার বাতিক ছিল না বললেই হয়, সেই কোথা থেকে কীভাবে আমার মধ্যে এর সংক্রমণ ঘটল, যাঁরা জানতে চান তাদের জানানো আর সেইসঙ্গে, পাখিসংক্রান্ত আমার বৈজ্ঞানিক ঝোঁক কীভাবে ধাপে ধাপে এগিয়েছে, সেটা তুলে ধরা—এই দু-কাজ একসঙ্গে সারার এটা একটা ভালো উপায়। আট বছর আগে নিতান্ত ঠেলায় প'ড়ে, আগে থেকে অতশত কিছু না ভেবেচিন্তেই এবং কালানুক্রমের ধারাবাহিকতা না মেনে, এই বৃত্তান্ত লিখে গিয়েছি। আমার মধ্যে ছিল একটা গেঁতো ভাব। পুরনো কথা, পুরনো স্মৃতি আলটপকা যখনই মনে পড়েছে, খাতায় টুক-টাক লিখে রেখেছি। আমার শুভার্থী বন্ধুবর্গ আর প্রিয়জনেরা যদি ছিনেজোঁক হয়ে লেগে না থাকতেন, তাহলে দীর্ঘসূত্রতার কবলে পড়ে আমার সব চেষ্টা মাঠে মারা যেত।

কবেকার সব ভুলে যাওয়া কথা যাঁরা মনে করিয়ে দিয়েছেন এবং আরও নানাভাবে আমাকে যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাদের সংখ্যা এত বেশি যে, আলাদা আলাদাভাবে তাঁদের নাম করছি না। তাঁদের সবার কাছেই আমি অতিশয় ঋণী। যাঁর কাছে আমি সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ, তিনি হলেন আর. ঈ. হকিন্স (হক)। আমার এলোমেলো লেখা সাজিয়ে গুছিয়ে দেওয়া এবং খাপছাড়া ভাব কমিয়ে তাতে কতকটা ছিরিছাদ আনা—তিনি সানন্দে সে কাজের ভার গ্রহণ করেছিলেন। অন্যান্য যাঁদের কাছে সবিশেষ অনুগৃহীত, তাঁদের একজন হলেন জে. এস. সেররাও, ঈর্ষণীয় তাঁর স্মৃতিশক্তি—তিন দশকেরও ওপর তিনি ছিলেন আমার অপরিহার্য সহায়ক আর মহাফেজ। অন্যজন হলেন অর্চনা মেহরোত্র অক্লান্ত উৎসাহে পাণ্ডুলিপি সমানে টাইপ রি-টাইপ করে গিয়েছেন। লেখা যখন কিছুতেই আর শেষ হতে চায় না, অর্চনা ক্রমাগত চাগিয়েছেন এবং নিজের মতামত দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। প্রধানত সেই কারণেই আমি একাজ হাসিল

করতে পেরেছি। আমি জানি, আমার অনবধানবশত, এ কাহিনীতে স্থান পাওয়ার যোগ্য অনেক ঘটনা আর ব্যক্তির কথা হয়ত অনুল্লিখিত থেকে গেছে। কিন্তু মাত্র এই ক'টি ছাপানো পৃষ্ঠায় আঁটানোর পক্ষে ঘটনাবহুল আশি বছর বড়ো বেশি দীর্ঘ সময়। এই অবস্থাগতিকে আমি শুধু পারি বাদ পড়ার জন্যে আফশোষ করতে।

সেলিম আলি

১

জোর বরাত

হঠাৎ কেন পাখির জাত আমাকে পেয়ে বসল, ক'বছর আগেও, তা নিয়ে কখনই মাথা ঘামানোর গরজ হয়নি। না আমার, না আর কারো। ঐ টানটা নিয়েই আমি বেড়ে উঠেছি। চোখে ঠেকলেও কেউ আর তা নিয়ে আপত্তি করেনি—ব্যস, আর কী চাই! এর অনেক কাল পরে যখন এক কৌতূহলী প্রেস রিপোর্টারের জেরার মুখে পড়ি, একমাত্র তখনই বিষয়টা আমার মাথায় ঢুকতে শুরু করে। তখন আমি বুঝতে পারি যে, তার প্রশ্ন গোড়ায় যতটা মনে হয়েছিল, আসলে ততটা অবান্তর নয়। সাতাশি বছর এমনই একটা লম্বা সময় যে, তখন আর ঐ বয়সে খুঁটিয়ে সব কিছু মনে পড়ার কথা নয়। বোম্বাইয়ের এখন যেখানে পিরগাঁও আর চার্নি রোডের মাঝের এলাকায় লোকের ভিড়ে পা পাতা যায় না, খেতওয়াড়ির সেই অঞ্চলটাতে এককালে ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাস। আমি কিন্তু সেখানকার ছড়ানো-ছিটানো পারিবারিক বসতবাড়িটা চোখ বুঁজলে আজও স্পষ্ট দেখতে পাই। বাপ মা-মরা পাঁচ ভাই আর চার বোনকে নিয়ে ঐ বাড়িতে আমি থেকেছি। ভাইবোনদের মধ্যে আমি ছিলাম সবার ছোট। আমার তিন বছর বয়সে আমার আম্মা জীনৎ উন্-নীসা মারা যান। তার দু বছর আগেই আব্বা মঈজুদ্দিন চোখ বোঁজেন। আমার এক মাতুল ছিলেন আমিরউদিন তৈয়ব্জী। আর তাঁর সন্তানহীনা স্ত্রী হামিদা বেগম। এই দুজনের কাছে থেকে তাঁদের স্নেহে-যত্নে আমরা মানুষ হই। আমাদের জন্যে ওঁরা যা করেছেন, তা যেকোনো বাবা মা-র চেয়েও বেশি। এছাড়া ছিল তাঁদের ঘাড়ে ফেলে-যাওয়া আত্মীয়বন্ধুদের নানা বয়সের আরও অনাথআতুর আর এণ্ডাগণ্ডার। স্বভাবে তাদের কোনো মতিস্থিরতা ছিল না এবং মাঝে মাঝে তাদের যেন কেমন-কেমন মনে হত। এই গোটা গুষ্টির অভিভাবক হওয়ার ভার নিতে হয়েছিল আমার মামু-মামীকে। যত দূর মনে আছে, পাঁচমিশেলি সেই সংসারে এমন কেউই ছিল না যার পাখপাখালির ওপর আদৌ টান ছিল। যেটুকু ছিল, তাও বোধহয় মাঝে মধ্যে উৎসবে-পরবে পোলাও রাঁধার উপকরণ হিসেবে।

'প্রকৃতির সংরক্ষণ'—কথাটা সে সময় বড় একটা শোনা যেত না। বাজারে তখন অবাধে তিতির বটের ঢেলে বিক্রি হত। একঘেয়ে মুর্গি খেয়ে খেয়ে যখন অরুচি

ধরত, তখন পালাপার্বণে ছুটির দিনে সহজেই লোকে মুখ বদলাতে পারত। কেননা এক টাকায় তিতির মিলত ছ'টা আটটা আর বটের ষোলটা কুড়িটা। প্রায় জলের দরে। মুর্গির দাম ছিল সম্ভবত ছ'আনা-আটআনা (৩৫ থেকে ৫০ পয়সা)। খেতওয়াড়ির বাড়িতে গোল চ্যাপ্টা আকারের বাঁশের ঝাঁকায় ঠেসে গাদাবন্দী করা জ্যান্ত পাখি আসত। ঝাঁকার ওপর থাকত একটা চটের ঢাকা। শাস্ত্রমতে তাদের নলি কেটে হালাল করা হত। আমার বেশ মনে আছে, আমি তখন বছর দশেকের আর আমার চেয়ে দু-বছরের ছোট ভাগ্নে সুলেমান এইসব উনপাঁজুরে পাখির গাদা থেকে কয়েকটাকে চুপচাপ সরিয়ে ফেলতাম। খোলা জায়গায় তারের জাল আর পুরনো প্যাকিং বাক্স জুড়েতুড়ে বাসা বানিয়ে সেই উদ্ধার করা পাখিগুলো পুষতাম। পাখির ঘর বানানোয় আমাদের হাতে হাতে মিলিয়েছিল নান্নু। পুরনো বিশ্বস্ত রান্নার লোক শুধু নয়। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ বাড়ির সব কাজেই সে ছিল দুরস্ত। ছোটদের সে সবসময়ের বন্ধু। আমাদের দস্যিপনার সহযোগী আর শরিক। বাড়িতে কাজের লোকের সমস্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। যখন এসব দেখি আমরা সবাই ভেবে অবাক হই—'বাঁধা কাজের বাইরে' এসব বাড়তি ক্রিয়াকর্মে কী করে নান্নু স্বেচ্ছায় ভিড়ে পড়ত—তাও আবার সোৎসাহে আর হাসিমুখে। নান্নু এত কিছু করার সময়ইবা কোথা থেকে পেত? একা হাতে তাকে হেঁসেল সামলাতে হত। রোজ দুবেলার পুরো খানা পাকানো। খাওয়ার লোক কখনই প্রায় জনাদশেকের কম নয়। বেশির ভাগই ছেলেছোকরা আর নওজোয়ান। চনমনে তাদের ক্ষিদে। সেইসঙ্গে আছে থালাবাসন ধোয়ামাজা (কেননা রসুইঘরে লোক সে একা), আছে আটা মাখা আর দিস্তে দিস্তে রুটি সেঁকা। কখনও কখনও কাঠের জালের ধোঁয়ায় মেঝেয় ব'সে খেলাচ্ছলে আমাদের চ্যালেঞ্জ ক'রে বলত—তোমরা একটা ক'রে খাও আর আমি একটা ক'রে বানাই, দেখি কে কাকে টেক্কা দিতে পারে। 'পক্ষিশালা'টি আমি আর সুলেমান, দুই ভাগীদারে মিলে চালাতাম। বেড়ার ধারে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা মশগুল হয়ে ব'সে পাখিদের হাবভাব আর ক্রিয়াকাণ্ড দেখতাম। নিজেদের পছন্দের পাখিদের আমরা একটা ক'রে নামও দিয়েছিলাম। ইস্কুলের ছুটির দিনে কে আর হোমওয়ার্ক করে। তার চেয়ে এইভাবেই অনেক বেশি আনন্দের সঙ্গে সময়টা আমরা কাটিয়ে দিতাম।

হাতখরচের জন্যে আমাদের মাসিক বরাদ্দ ছিল ২ টাকা। তা দিয়ে যত ঘন ঘন সম্ভব আমরা চলে যেতাম ক্রফোর্ড মার্কেটের পাখির বাজারে। ঘুরে ঘুরে দেখতাম নতুন কী পাখি এল। যাতে আমাদের সঞ্চয় বাড়ে। গোড়ার দিকে আমাদের প্রধান নজর থাকত শিকারযোগ্য পাখির দিকে। আমাদের সংগ্রহে ছিল খয়োই বাহারে তিতির এবং বড়ো বটের, চীনা বটের আর ছোট বটের। ক্বচিৎ কখনও জন্মদিনটিন এলে, যখন সবিশেষ শাঁসালো বোধ করতাম, তখন একজোড়া দু-জোড়া বনমোরগ অথবা ছোট জংলি মুরগি কিনে আনতাম। না-আগে না-পরে আমি কিন্তু খাঁচায় কোনো

পশুপাখি বা পোষা জন্তুকে কখনই বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারিনি। বারংবার ব্যর্থ হয়ে আর না পেরে, শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। অবশ্য পরবর্তী সময়ে পাখি রেখে নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা করেছি, কিন্তু সবসময় কাজ হয়ে গেলেই, ছেড়ে দিয়েছি।

যে আব্বামামুর কাছে আমরা থাকতাম তিনি দুর্ধর্ষ শিকারী ছিলেন ব'লে আমরা ছেলের দল মনে মনে তাঁকে পূজো করতাম। এই সময় নাগাদ আমার ন'দশ বছর বয়সে, আব্বামামু আমাকে একটা এয়ারগান উপহার দেন। নিকেলের কলাই করা ৫০০ শট রিপিটার 'ডেইজি'। সে সময়ে খুব চলত। যত না বন্দুক, তার চেয়ে বেশি খেলনা। সেই এয়ারগানের কথা আজও আমার মনে আছে। সামনের অংশের পেছন দিকে বন্দুকের নলটাকে বেড় দিয়ে একটা ফাঁকা সিলিণ্ডার। তাতে ভরতে হত .১৮ মাপের ৫০০ রাউণ্ড সিসের ছর্‌রা। একবার ছোঁড়বার পর হ্যাণ্ডলিভার টেনে দিলে স্প্রিংএ চাপ পড়বে আর সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকে ধাঁ ক'রে পরের গুলিটা তৈরি হয়ে বন্দুকের মুখে এসে যাবে। অবশ্য অস্ত্র হিসেবে এয়ারগান খুব একটা কিছু নয়। যতই তাক করা হোক, ঠিক জায়গায় লাগবে না। চলবে নিজের মর্জিতে। ৩০ ফুট দুরের লক্ষ্য ভেদ করতে হলে অনেক কেরামতি করতে হবে আর বাদসাদ দিতে হবে। যত যাই হোক, রিপিটার এয়ারগান ছিল তখন বেজায় হালফ্যাশানের একেলে ব্যাপার। আমার পুঁচকে খেলার সাথীরা আমাকে হিংসে করত। তাদের কারো কারো ছিল সমগোত্রের নির্দোষ এক-গুলিঅলা তবক। এমন এক 'ঘোরালো প্যাচালো' অস্ত্রের টুকরো হাতে পেয়ে আমার বেজায় গুমর বেড়ে গিয়েছিল এবং তা নিয়ে বারফাট্টাই করতেও ভালো লাগত। আমাদের বাড়ির আড়গড়ায় মৌরুসি পাট্টা গেড়ে বসেছিল একপাল চড়াই। ঘোড়ার গলায় ঝোলানো দানার থলি থেকে বেশ খানিকটা আস্তাবলের মেঝেয় ছড়িয়ে পড়ত। ঘরের ভেতরের দিকের ছাদে আর দেয়ালে ছিল বিস্তর ফাঁকফোকর। সুতরাং তারা সেসব জায়গায় বাসা করে এলাহি খেয়েদেয়ে তোফা থাকতে পারতো। এয়ারগানটার ছিল শতেক দোষ। এ সত্ত্বেও নানা কলাকৌশলের জোরে কিছুদিনের মধ্যেই হাত পাকিয়ে নিয়ে এবার সেটাকে চড়াই নিধনের কাজে লাগালাম। ধর্মভীরু মুসলমান ঘরের সন্তান হিসেবে আচারবিচারের মধ্যে মানুষ হওয়ায় আমরা ছেলের দল এটা জানতাম যে, চড়াইয়ের মাংস অবশ্যই অনুমোদিত খাদ্যের মধ্যে পড়ে। তবে যথাবিহিতভাবে হালাল করলে তবেই তা খাওয়া যেতে পারে। গুরুজনেরা যথাকালে পরকালের ভয় দেখিয়ে রাখায় আমরা সচরাচর ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগুলো অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতাম। কিন্তু কখনও কখনও লোভ সামলাতে না পেরে নরকবাসের ঝুঁকি মাথায় নিয়েও আমরা তার অন্যথা করেছি। পাখিগুলো মরে ভূত হওয়ার ঢের পরেও আমাদের তাড়নায় নান্নু তাদের গলার নলি কাটতে বাধ্য হয়েছে। নান্নুই আমাদের শিখিয়েছিল যথাযথভাবে সৎকারের পর

চড়াইগুলোর কীভাবে সদ্‌গতি করতে হয়। একটু মশলা, একফোঁটা ঘি আর একটা ফ্রাইং-প্যান—এই দিয়ে জিভে জল আনার মতো একটা ব্যাপার ঘটিয়ে তুলতে আমাদের বালখিল্য দলের কেউ কেউ সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছিল।

পাখি সংক্রান্ত একেবারে প্রথম যে নোট আমি লিখেছিলাম, সেটা এই আমলে। তখন আমার ন-দশ বছর বয়স। খেতওয়াড়ির আস্তাবল থেকে চড়াই-নিধন পর্বের একটি ঘটনা নিয়ে সেটা লেখা হয়েছিল। ঘোড়ার সাজ টাঙিয়ে রাখার জন্যে দেয়ালে বসানো কাঠের গোঁজগুলো খসে যাওয়ার ফলে যে সব গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল সেই খোঁদলগুলো হয়ে পড়েছিল চড়াইদের ভারি পছন্দসই পাখির বাসা। সেই গর্তে আস্তানা পেড়েছিল এক স্ত্রী-চড়াই। তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে আমার সেই নোটটা লেখা। প্রায় ষাট বছর পরে ফের নতুন ক'রে যখন সেটা চোখে পড়ে, লেখাটা কাঁচা আর আধাখেঁচড়া ব'লে মনে হয়েছিল। তবে তার একটা সংক্ষিপ্তসার যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক বিবেচনা ক'রে 'নিউজলেটার ফর বার্ডওয়াচার্স' পত্রিকায় ছাপা হয়। মবলগে মূল লেখাটি ছিল এই :

> ১৯০৬/০৭। বাইরে পুরুষ-চড়াইটি কাঠের গোঁজে বসে আছে। গর্তের প্রবেশ পথের প্রায় মুখে। ভেতরে স্ত্রী-চড়াই ডিমে তা দিতে বসেছে। আস্তাবলে রাখা একটা ঘোড়ার গাড়ির পেছনে নিজেকে আড়াল ক'রে অতর্কিতে আমি তাদের ওপর আক্রমণ করলাম। পুরুষ চড়াইটা গুলি খেয়ে মরল। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই দেখি মেয়েটি এক ফাঁকে আরেকটি পুরুষ-চড়াই জুটিয়ে এনেছে। সেও বাইরের গোঁজটাতে ভর দিয়ে 'পাহারা'য় বসে গেছে। এই মরদটিকেও আমি ঘায়েল করলাম। চোখের পলকে দেখি মেয়েটি আবার এক মরদ এনে হুজুরে হাজির করেছে। পরের সাত দিনে ঐ একই দাঁড়ে-বসা গুটি আষ্টেক পুরুষ চড়াইকে আমি সাবাড় করি। মেয়েটিকে দেখে মনে হয়েছিল, তার মৃত পতির শূন্য স্থান চকিতে পূর্ণ করার জন্যে পুরুষ চড়াইরা পরের পর যেন কাতার দিয়ে অপেক্ষা করে ছিল।

তখন এটা লিখে রেখেছিলাম ব'লে আমার এখন বেশ গর্বই হয়। লিপিবদ্ধ করার ছিল একটাই কারণ শিকারি হিসেবে আমি কতটা ক্ষমতা ধরি, সেটা দেখানো। এর যে ধারাবাহিক কোনো সম্ভাব্য যোগসূত্র থাকতে পারে, অতশত তখন মাথায়ই আসেনি। আজকের দিনে জীবজন্তুর আচরণ নিয়ে যেরকম অনুশীলন চলেছে সেটা খেয়ালে রাখলে এর যে কী তাৎপর্য তা ধরা পড়ে।

ইস্কুলে আমাদের গরমের ছুটি শুরু হলেই খেতওয়াড়ির বাড়ি ছেড়ে আমাদের গোটা গুষ্টি গিয়ে উঠত চেম্বুরে। ওটা তখনও বোম্বাই মহানগরীর এমন একটা মেছোহাটা হয়ে যায়নি। বাইরে দিয়ে গেছে পশ্চিমঘাটের ছোট ছোট পাহাড়। তারই মধ্যে বসিয়ে দেওয়া পাতাঝরা বৃষ্টিভেজা ছুটকোছাটকা জঙ্গল। চারদিকে চোখজুড়ানো রমণীয় সবুজ। সেকালের সেই নিরিবিলি চেম্বুরে গিয়ে আমরা যেন হাঁপ ছেড়ে

বাঁচতাম। সবচেয়ে উঁচু পাহাড় বলতে ট্রম্বে হিল্। তার উচ্চতা ৩০০ মিটারের সামান্য কিছু বেশি। সেটা ছিল আমাদের পর্বতারোহণের অভিযানের জায়গা। এখন তা ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের সম্পত্তি। এর কতকাংশ ছিল ঘনজঙ্গলে ঢাকা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে এ জায়গা ঘিরে জনতা কলোনির পত্তন হয়। কলোনির লোকেরা নিরন্তর জ্বালানির ধান্ধায় এসে এসে সমানে সব গাছ মুড়িয়ে কেটে নিয়ে যেত। ফলে, সেখানে এখন ধূ ধূ করছে শুধু ডাঙা। এখন প্রকৃতপক্ষেই হয়েছে তার রক্-অব-জিব্রল্টারের দশা। শহরের এত কাছে হয়েও সেকালের চেম্বুর আজও স্মরণীয় হয়ে আছে তার জঙ্গলের নিরুদ্বেগ স্বাদগন্ধ আর প্রভূত বন্যপ্রাণিসম্পদের জন্যে। তিন মাইল পথ পায়ে হেঁটে কিংবা গরুর গাড়িতে গেলে সবচেয়ে কাছের ইস্টিশন কুরলায় পৌঁছে যাওয়া যেত। কলকারখানা দোকানহাট ইস্কুল পাঠশালা বা সামাজিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য—এসবের ছিটেফোঁটাও ধারে কাছে ছিল না। না মোটরগাড়ি, না বাস দুইয়ের কোনোটাই কখনও চোখে পড়ত না। বলতে গেলে কোনো নিত্যযাত্রীই সপ্তাহান্তে খামারবাড়ি কিংবা আমবাগানে শখ ক'রে বেড়াতে আসা দেশান্তরী জমিদারকুল—শহরবাসী এই বিরল প্রজাতির মানুষগুলোর সঙ্গেই ক্বচিৎ কদাচিৎ এখানে দেখা হত। আলফান্‌সো আর গাইরি—এই দু-জাতের উৎকৃষ্ট আমের জন্যে যথাযোগ্য ভাবেই চেম্বুর এলাকার ছিল দীর্ঘদিনের সুনাম। দুঃখের বিষয়, ঘরবাড়ি আর কলকারখানার বাড়বৃদ্ধি সত্ত্বেও সেসব বাগানের যাওবা দু একটা টিঁকে ছিল, তাও আজ সব সাফ হয়ে যাচ্ছে। শহরের শ্রীবৃদ্ধি আর সম্প্রসারণের দরুন জমির দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে যতই আকাশছোঁয়া হচ্ছে, ততই পটাপট গাছ হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। যে আমগাছ ছিল লোকের চোখের মণি, আজ হয় তা নেই, নয় জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়ে আছে তাদের দেখবার কেউ নেই। তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে 'বান্ধা' (লোরান্সাস) পরগাছা। কবে লুটেরাদের কুড়ুলের কোপ পড়বে, তারা আছে তার অপেক্ষায়। পশুপাখির যেসব ডাক স্কুলছুটির দিনগুলোর কথা আমাদের মনে পড়িয়ে দেয়, 'সভ্যতা'র নিষ্ঠুর রাহুগ্রাসে প'ড়ে তার অধিকাংশই আজ একের পর এক স্তব্ধ হয়ে গেছে। সন্ধেবেলায় শুরু হয়ে রাতভর শোনা যেত যে শেয়ালের ডাক, যা আমার চেম্বুরের স্মৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে, সেই বহুপরিচিত ডাক বহু বছর আগেই লোপ পেয়ে গেছে। অদৃশ্য হয়ে গেছে সেই হায়েনারা, সেকালেও যাদের দেখা পাওয়া যেত কালেভদ্রে। আজ আর তাদের চিহ্নমাত্র নেই। ভোরবেলায় আধো ঘুমে আধো জাগরণে নরম বিছানায় যখন আমরা আড়ামোড়া ভাঙতাম, তখন কানে মধু ঢেলে দিত দোয়েলের উদাত্ত কণ্ঠস্বর। এটা আমার পক্ষিবিদ্যার ভাঁড়ারে সর্বপ্রথম আর সর্বোত্তম স্মৃতির একটি। যখন যেখানে থাকি, দোয়েলের গান শুনলেই অমনি আমার চেম্বুরের সেই নিরুদ্বেগ স্কুলছুটির দিনগুলো মনে পড়ে যায়।

সব জায়গায় যেমন হয়, তেমনি আমরা ছিলাম গা-ছাড়া, বেআক্কেলে ইস্কুলের

ছেলে। শিকারের ক্ষেত্রে (তা সে যে হাতিঘোড়াই হোক না কেন।) ন্যায়-অন্যায় বোধ বা সংরক্ষণ চেতনা—এর কোনোটাই আমাদের কেউ হাতে করে ধরিয়ে দেয়নি। না বাড়িতে, না ইস্কুলে। বরং শিকার আর বন্দুক ছোঁড়ার ব্যাপারটাকে তারা কতকটা ভিক্টোরীয় মায়াকাজল পরা দৃষ্টিতে দেখত। ভাবত এসব খুব পৌরুষের কাজ। এয়ারগান নিয়ে আমরা সব গাঁয়ের দিকে মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়াতাম। ছোট ছোট পাখি সরল বিশ্বাসে আমাদের কাছে ঘেঁষতে চাইত। তাদের প্রত্যেকেই হত আমাদের চাঁদমারির নিশানা। এই বর্বরোচিত শিকারযজ্ঞে গিয়ে মধুলতা কিংবা ঐ ধরনের ছোট পাখিকে ধরাশায়ী করতে পারলে, মনে আছে, আমার সে কী ছেলেমানুষি আনন্দ। সুখের কথা, তেমন সুযোগ কম এসেছে। আমাদের সেই দুর্ব্বৃত্তদলের নিয়মিত কর্মসূচির অঙ্গ ছিল সূর্যাস্তের কাছাকাছি সময়ে দেওনার নামের একটি প্রতিবেশী ছোট্ট গাঁয়ে হানা দেওয়া। ক্ষুধার্ত গরুছাগলে যাতে নাগাল না পায়, তার জন্যে সেখানে গাছের ওপর খড় গাদা করে রাখা হত। সূর্য ডোবার মুখে ঝাঁকে ঝাঁকে চড়াইপাখি এসে সেই খড়ের গাদায় আশ্রয় নিত। একটু ঘোর ঘোর হয়ে এলে চটপট এসে তারা খড়ের ভেতর টুক টুক ক'রে সেঁধিয়ে যেত। আমরাও তৈরি থাকতাম যাতে তারা গা ঢাকা দেবার আগেই, ওরা আসামাত্র পুরুষগুলোকে বেছে বেছে আমরা গুলি করে নামাতাম। দেওনারে হানা দেওয়ার মধ্যে ছিল আমাদের এক ঢিলে দু পাখি মারার একটা ব্যাপার। আমাদের পরিবারের ডিম, সবজি আর দুধের যোগান আসত এই গ্রামটি থেকে। নিজেদের 'শিকার' আনার থলি হাতে নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে গ্রাম থেকে সেইসঙ্গে ডিম সংগ্রহ করারও ভার থাকত আমাদের ওপর। (তখন ডিমের দাম ছিল এক 'ফাড়িয়া' বা ৪ পাই বা পুরনো টাকার ১/৪৮ ভাগ।) যতদূর মনে পড়ে, এই সময়টাতেই এবং চড়াই মারার এইসব ফলপরিণাম থেকেই পাখির বিষয়ে আমার মধ্যে প্রথম 'বৈজ্ঞানিক' আগ্রহের উন্মেষ হয়।

একদিন আমার শিকার করা একটা পাখিকে হালাল করতে যাওয়ার মুখে আমার যেন কেমন মনে হয়েছিল, পাখিটার কোথাও কিছু একটা গণ্ডগোল আছে। মাঝে সাঝে আমার মারা মামুলি স্ত্রী-চড়াইয়ের মতো পাখিটাকে দেখতে। শুধু তার গলায় ঝোল-পড়ার দাগের মতো একটা হল্‌দে ছোপ। এই চড়াইটার মাংস একজন ধর্মভীরু ক্ষুদে মুসলমানের পক্ষে বিহিত কিনা, এটাই ছিল আমার আদত চিন্তা। অনুচিত কিছু ক'রে ফেলে পরকাল নষ্ট করতে আমি চাইনি। সে জায়গায় হালাল করার ব্যাপারটা ঠেকিয়ে দিয়ে মরা পাখিটাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে পরিবারের শিকারী আমিরুদ্দিন মামুকে দেখিয়ে এ বিষয়ে ফতোয়া দিতে বললাম। খুঁটিয়ে পরীক্ষা ক'রে তিনি সায় দিয়ে বললেন—সত্যিই, পাখিটার জাত আলাদা। দেখেই বোঝা গেল, এরকমটা এর আগে কখনও তাঁর চোখে পড়েনি। বোম্বাইয়ের ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটির (বিএন্‌এইচএস্‌) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৩-তে। পত্তনকালের পরে পরেই মামু তার প্রথম

ভারতীয় সদস্যদের একজন হন। আমিরুদ্দিন মামু এই সোসাইটির কাজের একজন সক্রিয় অংশীদার। আমাকে তিনি সোসাইটির তৎকালীন অবৈতনিক সেক্রেটারি মি: ডব্লু. এস্. মিলার্ডের কাছে একটি পরিচয়পত্র হাতে দিয়ে পাঠালেন। চিঠিতে ওটা কী পাখি, সেটা নির্ধারণ করতে ওঁর সাহায্য চাওয়া হয়েছিল। কর্মক্ষেত্রে মিলার্ড ছিলেন ওয়াইন মার্চেণ্ট ফিপসন অ্যাণ্ড কোং-এর ওপরওয়ালা। এইভাবেই সোসাইটির সঙ্গে আমার প্রথম যোগাযোগ ঘটে। যে বাড়িতে ছিল ফিপসনের আপিস, সোসাইটির অবস্থানও তখন সেখানেই ছিল। সেই যাওয়াটা ছিল আমার পক্ষে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। আমার স্মৃতিতে এখনও তা অম্লান হয়ে আছে।

ভালো কথা, ফোর্বস্ স্ট্রীট আর অ্যাপোলো স্ট্রীটের এই বাড়িটাতে আগে থাকতেন বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। তখনকার দিনে ইংরেজদের সঙ্গে ভারতীয়দের সামাজিকভাবে মেলামেশা করার বস্তুত কোনো সুযোগই ছিল না। আমার বয়সী ছেলেদের পক্ষে তার সুযোগ ছিল আরও কম। সাহেবরা ছোট ছোট ইংল্যাণ্ড বানিয়ে নিয়ে তার ঘেরাটোপের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ হয়ে থাকত। তাদের ছিল নিজেদের আলাদা ক্লাব, যেখানে ছোটা-পেগ বড়া-পেগ ঢালার বয়-বেয়ারা ছাড়া সাহেবরা আর কোনো অশুচি কালো-চামড়ার ছায়াও মাড়াত না। একটা ধোঁকার টাটি সৃষ্টি করেছিল এই ব'লে যে, তারা হল রাজার জাত, বড়ো মাপের আর উঁচুদরের মানুষ। ওদের ঘাড়ে এসে পড়েছে কালা আদমিদের ভার। এইসব হেন তেন। এই মিথ্যেটাকে মনের মধ্যে এমন গম্ভীরভাবে তারা চারিয়ে দিয়েছিল যে, আজ স্বাধীনতার চল্লিশ বছর হয়ে গেলেও তা টিঁকে আছে। মধ্যবিত্ত ঘরের কোনো ভারতীয় নিছক কর্মসূত্রে ছাড়া সরকারি বা বেসরকারি কোনো ইংরেজের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে কথা বলেছে, এমন ঘটনা ছিল বিরল। শিক্ষাবিভাগীয় পরিদর্শকেরা তখন সবাই ছিলেন সাহেব। বছরে একবার ক'রে তাঁরা যখন স্কুলপরিদর্শনে আসতেন, ইস্কুলের ছেলেরা একমাত্র তখনই যা ইংরেজ দেখতে পেত।

আমার মনে আছে, নিরেট সেগুনকাঠের জমকালো ফটক পেরিয়ে যখন আমি সেই পুরনো একতলা বিচিত্র বাড়িটাতে ঢুকছি, ভয়ে আমার প্রায় নাড়ি ছাড়ার অবস্থা। এখনি সাজোয়ান এক সাহেবের সামনা সামনি হতে হবে ভেবে ভেতরে ভেতরে ঘামছি। আমার সদঅভিপ্রায় যথাবিহিতভাবে জানার পর একজন খাঁকি উর্দিপরা সেপাই গটমট গটমট করতে করতে নারকোল-ছোবড়ার একহারা গালচেমোড়া সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে নিয়ে গেল। যেতে যেতে দুপাশের দেয়াল জুড়ে দেখলাম মাউণ্ট করা রয়েছে যতসব শিকার করা জন্তু-জানোয়ারের পিলে চমকানো কাটামুণ্ডু। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরের কাঠের মেঝের এককোণে ডাঁই হয়ে আছে ডেস্কে শো-কেসে সাজানো সাগরমুক্তি, প্রজাপতি, পাখির ডিম আর প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত বিষয়ের বহুবিধ ফট্‌কি-নাটকি জিনিস। দেয়ালে টাঙানো বস্তুরই ভিড় বেশি। মাথার খুলি আর তার পাশে

বাঁধিয়ে-রাখা বাঘ-চিতাবাঘের কাটামুণ্ডু। ভাবলেশহীন চোখে অনধিকারপ্রবেশকারীদের তারা যেন স্থিরদৃষ্টিতে দেখছে। জ্যান্ত থাকতে যা করেনি, মরে গিয়ে তারা যেন আরো বেশি ভয়ঙ্করভাবে দাঁত খিঁচিয়ে গরর্ গরর্ করছে। জীবজন্তুর বিক্ষিপ্ত দেহাবশিষ্টের ভেতর দিয়ে, কখনও সংরক্ষিত মরা কুমিরের গায়ে, কখনও মেঝেয়-পাতা শম্বরের চামড়ার খুরে গা লেগে হোঁচট খেতে খেতে অবশেষে সাহেবের খাসকামরায় পৌঁছুনো গেল। ঠাসাঠাসি ক'রে রাখা গাদাগুচ্ছের হাবিজাবি জিনিস। সেটাই ছিল তখন সোসাইটির জাদুঘর। তারই এককোণে সুইং-ডোর দিয়ে পার্টিশান করা জায়গায় ডেস্কের ওপর ঝুঁকে টাক মাথায় যে দিলখোলা মানুষটি বসেছিলেন, জানতে পারলাম তিনিই হলেন সোসাইটির অবৈতনিক সেক্রেটারি। ওয়াল্টার স্যামুয়েল মিলার্ড।

এটা নিশ্চয় ১৯০৮ সালের কোনো একটা সময়ে ঘটে থাকবে। বি এন্ এইচ্ এস্-এর সঙ্গে সেই আমার প্রথম যোগাযোগ। পরে আমার জীবন গড়ে তুলতে এবং বিশেষ একটি খাতে বইয়ে দিতে এই যোগাযোগ বড়োরকমের সহায় হয়েছিল। মিলার্ডে আমার সব ভয়ভাবনা নিমেষে ঘুচিয়ে দিয়ে এত অন্তরঙ্গ হয়ে মন দিয়ে আমার সঙ্গে কথা বললেন যে আমি মোহিত হয়ে গেলাম। চা-বাগানের নানা ঘটনা শুনে আর রেলকামরায় শত্রুভাবে শ্বেতাঙ্গদের দেখে, ছেলেবেলায় ওদের বিলকুল কাঁচাখেকো রাক্ষস হিসেবেই কল্পনায় স্থান দিয়েছিলাম। পড়ার চশমার ফাঁক দিয়ে চোখ তুলে মি: মিলার্ড যেই না আমার দিকে তাকিয়েছেন, ঢোঁক গিলে অমনি আমি হাতড়ে হাতড়ে অভিজ্ঞানপত্র আর সেইসঙ্গে আজব-পাখি-মোড়া কাগজের ছোট প্যাকেটটা বার করে দিয়েছি। এক ঝলক দেখেই তিনি ওটাকে জংলি চড়াই ব'লে চিনতে পারলেন। তথ্যপঞ্জি রাখার জায়গায় সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। ঠিক বলেছেন কিনা যাচাই করতে একটি ক্যাবিনেট থেকে সংরক্ষিত বেশ কয়েকটি নমুনা সামনে রাখলেন। সংগ্রহের মধ্যে ছিল আরও সব নানান জাতের চড়াই। তিনি তা অনেক কষ্ট ক'রে ধরে ধরে দেখালেন। তাদের একটার সঙ্গে আরেকটার কোথায় অমিল আর তাদের কী কী লক্ষণ দেখে চিনে নিতে হয়, তা বাতলে দিলেন। ধৈর্য ধ'রে একের পর এক দেরাজ টেনে টেনে ভারত সাম্রাজ্যে প্রাপ্ত শত শত রকমের ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির পাখি চোখের সামনে তুলে ধরলেন। আমার বিশ্বাস, এইভাবে দেখায় মুহূর্তটাতেই প্রকৃতভাবে পাখির নেশাটা হঠাৎ আমার ঘাড়ে চেপে বসল। ছোটগোছের লাইব্রেরিটা থেকে মি: মিলার্ড পাখি সংক্রান্ত গোটা কয়েক বই আমাকে পড়তে দিলেন। এইভাবেই এডওয়ার্ড হ্যামিল্টন আইটকেন (ঈ. এইচ্. এ.)-র অদ্বিতীয় ক্লাসিক 'কমন বার্ড্‌স্ অব বম্বে' আর 'এ ন্যাচারালিস্ট অন দি প্রাউল' বই দুটির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তাঁর লেখা আমার সুপ্ত আগ্রহকে খুঁচিয়ে তোলে। গত ষাট বছরেরও বেশি সময় জুড়ে এতবার আমি পড়েছি তবু বইদুটি পড়বার মজায় আর অনুরাগে কিছুমাত্র ভাঁটা পড়েনি। ১৯৪৬ সালে প্রথমোক্ত বইটির নতুন সংস্করণে নাম বদ্‌লে করা হয় 'কমন

বার্ড্স্ অব ইণ্ডিয়া'। প্রকাশক আমাকে দিয়ে বইটির টিকাভাষ্য লিখিয়ে নেন। এটা আমার কাছে ছিল পরম ভাগ্য। নতুন সংস্করণে প্রশ্নকর্তার সংক্ষিপ্ত একটি জীবনী লিখে দেন আমার বন্ধু লোক্ ওয়ান থো।

মি: মিলার্ড আমাকে পাখিসংগ্রহের উৎসাহ দিলেন। বললেন, পাখি সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের এটাই সবচেয়ে ভালো উপায়। চামড়া খুলে নিয়ে কিভাবে নমুনা সংরক্ষণ করতে হয়, আমি চাইলে সোসাইটি সে বিষয়ে আমাকে তালিম দেবে। এই ব'লে তিনি আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে এক তরুণ ইংরেজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সোসাইটি কিছুদিন আগে এই প্রথম মাইনে দিয়ে কিউরেটরের পদে বহাল করেছে। এঁর নাম নর্মান বয়েড কিনেয়ার। পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মিটে গেলে তিনি ব্রিটিশ মিউজিয়াম (প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত)-এর বার্ড রুম বিভাগে যোগ দেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০—এই পর্বে তিনি ছিলেন মিউজিয়ামের ডিরেক্টর। সার নর্মান কিনেয়ার হিসেবে তিনি তাঁর কর্মজীবন শেষ করেন। তাঁকে দেখে প্রথমটা মনে হয়েছিল তাঁর মধ্যে রয়েছে কেমন একটা এড়িয়ে-যাওয়া মুখগোমড়া ভাব। কাঁচা বয়সে পাকা সাহেব বলতে আমাদের যে ধারণাটা ছিল, ঠিক সেইরকম। ওপরসা যাকে অলগা-আলগা ভাব ব'লে মনে হত, তার মূলে ছিল ওঁর লাজুক স্বভাব। আসলে ছিলেন নরম মনের মানুষ। ওঁর সাহায্যের হাত সব সময় বাড়ানো থাকত। আমাকে তিনি সমানে প্রেরণা দিয়ে গেছেন আর আমার আনকোরা উৎসাহে পুষ্টি যুগিয়েছেন। সোসাইটির কিউরেটার থাকার সময় যেমন, তেমনি ব্রিটিশ মিউজিয়মে-র বার্ডরুমে যোগ দেওয়ার পরেও। আমাকে তালিম দেওয়ার জন্যে তিনি দুই ছোকরা সহকারীর হাতে তুলে দেন। তাঁদের একজন এস্. এইচ্. প্রেটার, অন্যজন পি. এফ্. গোমেজ। তাঁরা পাখির পুরো সংগ্রহটা দেখান। সেইসঙ্গে হাতে ধ'রে শেখান শিক্ষাপোযোগী সংগ্রহ গড়ে তোলার জন্যে কিভাবে চামড়া ছাড়িয়ে, ফাঁকা খোল ভর্তি ক'রে পাখি আর স্তন্যপায়ী জীবদের নমুনা সংরক্ষণের ব্যবস্থা ক'রে লেবেল লাগাতে হয়। এঁরা দুজনেই কর্মজীবনের শেষদিন পর্যন্ত সোসাইটির চাকরিতে বহাল থেকেছেন। প্রেটারের বিষয়ে পরে আরও কিছু বলতে হবে। প্রেটার আরও নানা ক্ষেত্রে নাম করেছিলেন। সোসাইটি যখন সবচেয়ে বেশি জমজমাট হচ্ছে প্রেটার তখন কিউরেটর। গোটা পশ্চিম ভারতে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজের তিনি ছিলেন নেতা। সেই সমাজের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে তিনি গণ-পরিষদ আর বোম্বাই বিধান পরিষদের সদস্য হন। অবসর নেওয়ার পর ১৯৪৮ সালে দেশ ছেড়ে ইংলণ্ডে চলে যান। পি. এফ. গোমেজ শেষদিকে হয়েছিলেন সোসাইটির কীটপতঙ্গ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত। কতকটা নিরেট ধরনের মোটা চামড়ার গোয়ার মানুষ। কুশলতার সঙ্গে নির্বিকারে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁকে আমার প্রধানত মনে পড়ে পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরের জন্যে। সোসাইটির দফাওয়ারি অন্তর্ভুক্তির পুরনো নথি ঘাঁটলে আজও তা চোখে পড়বে। চোখে পড়বে তথ্যসূত্র

সংগ্রহের বহুবিধ লেবেলে। মনে আছে, (চর্ম-সংরক্ষণের প্রক্রিয়া শেখাবার সময়) গোমেজ সব সময় কণ্ডর বা স্নায়ুরজ্জুকে বলতেন 'নাসারন্ধ্র'। 'টেন্ডন'-এর 'ট'-কে পর্তুগিজ ঢঙে কোমল ক'রে 'ত' বলতেন। গোড়ার দিকে ধাঁধায় পড়ে যেতাম। শেষে কেবলি মজা লাগত।

জংলি চড়াইয়ের কাকতলীয় ঘটনাটি আচম্বিতে আমার দেখার চোখ খুলে দিয়েছিল। এমনটা হবে স্বপ্নেও ভাবিনি। সেই থেকে ক্রমেই বেশি বেশি ক'রে নির্বিশেষে প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত সংক্রান্ত বই পড়ার দিকে ঝোঁক গেল। বিশেষ ক'রে পাখিদের নিয়ে লেখা বই। তখনকার দিনে ভারতের পাখপাখালির বিষয়ে সচিত্র বই-কেতাব ছিল না বললেই হয়। এর পরেও বহুদিন ধরে ছিল একই হাল। চারপাশের পাখপাখালি জানতে চিনতে ইচ্ছুক কোনো শিক্ষানবিশ এ বিষয়ে তেমন কোনো বইপত্র জোটাতে পারত না। আমার মতে, ভারতবাসীদের মধ্যে ঘরের বাইরে গিয়ে পাখি দেখে বেড়ানোর শখ যে ছড়িয়ে পড়েনি, তার কারণ—সে পথে বড় রকমের কাঁটা হয়ে ছিল বই না থাকাটা। ফলে, গোড়াকার বছরগুলোতে যাঁরা ভারতে পাখি-সংক্রান্ত জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁরা প্রায় সকলেই বিদেশি। বেশির ভাগই ইংরেজ। স্বদেশে তাঁরা ব্রিটিশ প্রাকৃতিক ইতিবৃত্তের গতানুগতিক ধারায় মানুষ হয়েছেন। ঘর ছেড়ে ভারতে পা দেবার আগেই, পাখির ডিম কুড়িয়ে বেড়ানো ইস্কুলের ছেলে হিসেবেই হোক বা যে ভাবেই হোক—পাখির বিষয়ে তাঁরা ওয়াকিবহাল। এদেশে এসে তারা দেখেছেন পাখির ছড়াছড়ি। দেখে ছাইচাপা আগুন নতুন ইন্ধন পেয়েছে। সুখসুবিধে পেলেও, তাদের থাকতে হয়েছে ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে। সেখানে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা। তাদের বরণ করতে হয়েছে জেলা অফিসারের নিঃসঙ্গ জীবন। এই অবস্থায় পড়ে তাদের কেউ কেউ সেই সময় শিকারে মন দিয়েছেন আর প্রাকৃতিক ইতিবৃত্তকে সময় কাটাবার গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসেবে নিয়েছেন। কালক্রমে প্রকৃতি-বিজ্ঞানে এঁরা অনেকে পণ্ডিত ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন। কেউবা পক্ষিবিদ্যায় উঁচুদরের পারদর্শিতা অর্জন ক'রে ভারতে বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিচর্চার ভিত গড়ার কাজে সহায়ক হয়েছেন। পাখিদের শনাক্ত করার কাজে যথেষ্ট সহায়ক বই হল জের্ডন-এর 'বার্ড্স্ অব ইণ্ডিয়া' (১৮৬৪) এবং পরে ওট্স্ ব্ল্যানফোর্ড-এর (১৮৯৮) চার খণ্ডে প্রকাশিত দেশকালবদ্ধ ভারতীয় পাখির বৃত্তান্ত। আগে থেকে পক্ষিকুল সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক জ্ঞান, প্রবল অনুসন্ধিৎসা আর হাতে যদি থাকে একটি নমুনা, তবেই এসব বই পড়ে ফল মিলবে। সেকালে পাখি দেখে বেড়ানোর ব্যাপারটা হালআমলের মতন ছিল না। সচিত্র নির্দেশগুচ্ছ আর দূরবিনের অভাবে সব কাজ আটকে যেত। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, রহস্যময় সেই জংলি চড়াইটাকে সেদিন ভাগ্যিস পেয়েছিলাম। সেই সুবাদেই তো পাখিতে আমায় পেয়ে বসে। পরে তারই খেই ধ'রে একের পর এক ঘটনা ঘটে গেছে।

□

২

তখন ইস্কুলে পড়ি

পিরগাঁওতে মেয়েদের একটা মিশন স্কুল ছিল। খুব গালভরা তার নাম। জেনানা বাইবেল মেডিকাল মিশন গার্লস্ হাই স্কুল (সংক্ষেপে, জেড. বি. এম. এম)। আমার দুই বোন (আখতার আর কামু) সেখানে পড়ত। আট-ন' বছর বয়স পর্যন্ত আমিও তাদের সঙ্গে যেতাম। উত্তরকালে ইস্কুলটির নাম বদ্‌লে হয় 'কুইন মেরিজ হাই স্কুল ফর গার্লস্, ঐ ইস্কুলে ছোট ছোট ছেলেদেরও ভর্তি করা হত। কিন্তু বালকত্ব ঘুচে গেলেই ইস্কুল ছাড়তে হত। যেমন হয়েছিল আমার ক্ষেত্রে। আমি আহ্লাদে আটখানা হই যখন আমাকে পরে সেন্ট জেভিয়ার্সে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। কেননা এবার থেকে তাহলে আমি ইস্কুলে যেতে আর আসতে পারব ঘোড়ায়-টানা ট্রামে। (ইস্কুলটা ছিল ধোবি-তালাওতে; তখন ওটাকে বলা হত মানি স্কুলপল্লী) আমার দাদারাও সব ছেলেবেলায় ঐ একই ইস্কুলে পড়েছে। ছোটদের কাছে ঘোড়ায়-টানা ট্রাম ছিল কল্পলোকের ব্যাপার। একেবারে সামনের সিট্‌টা দখল ক'রে ড্রাইভারের ঠিক পেছনে কে বসবে, এই নিয়ে ইস্কুলের ছেলেদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। ওখানে বসলে গাড়ি চালানোর মনোমুগ্ধকর কারিকুরিগুলো দেখা যেত। ড্রাইভারের কী মজা! এই ভেবে তাকে দেখে আমাদের কী হিংসেই না হত। ঘোড়ায়-টানা ট্রাম ছিল দুরকম মাপের। এক-ঘোড়ার ট্রাম টেনে নিয়ে যেত অস্ট্রেলিয়া থেকে আমদানি করা প্রকাণ্ডকায় ওয়েলার। আর অন্যটা টানত আরবের একজোড়া টগবগে টাট্টু। বেশির ভাগই আসত ইরাক থেকে। ঘোড়াদের খুব তুতুপুতু ক'রে ভালো অবস্থায় রাখা হত। গরমের দেশে যাতে মাথায় রোদ লেগে না যায়, তার জন্যে সাহেবসুবোদের মতো ওয়েলারের মাথায় পেল্লায় এক শোলার টুপি পরিয়ে দেওয়া হত। দুটো ফুটোর ভেতর থেকে তাদের দুটো কান বেরিয়ে থাকত। ট্রামে সামনের দিকে মুখ ক'রে পাঁচ-ছ'জন বসতে পারে, সেইমতো পরের পর সার বেঁধে লম্বা লম্বা বেঞ্চি পাতা থাকত। পাশ দিয়ে ঢুকে বেঞ্চিতে গিয়ে বসতে হত। প্রথম বেঞ্চির সামনে ছিল ড্রাইভারের দাঁড়াবার জায়গা। কাঠের মেঝে একটা ব্র্যাকেটে খাড়া ক'রে রাখা হত চাবুক। চাবুকের আগায় পরানো থাকত একটা ধাতব আংটা। সেটা দিয়ে ঘোড়াকে

গোঁতানো হত। রাশ টেনে ট্রাম দাঁড় করাবার জন্যে ড্রাইভারের থাকত নিয়ন্ত্রণযোগ্য দণ্ডযুক্ত একটা ব্রেক কষার ঘুরন্ত হাতল। যতদূর মনে পড়ে, ট্রামের কোনো নির্দিষ্ট স্টপ ছিল না। কিন্তু যখনই কোনো যাত্রী উঠতে বা নামতে চাইত, ট্রামের গতি কমানো কিংবা ট্রাম থামানো হত। লাইনের ওপর কোনো যানবাহন বা মানুষ থাকলে ড্রাইভার পায়ের তলায় ঘণ্টা টিপে ঢং ঢং শব্দ ক'রে সেসব হটিয়ে দিত। চড়া রাস্তায়, যেমন ব্রিজ পেরোবার সময়, অতিরিক্ত অশ্বশক্তির দরকার হত। ব্রিজের মুখে একজন লোক তৈরি থাকত। চলন্ত ট্রামের সঙ্গে সে কিস্তির একটা বাড়তি ঘোড়া সুকৌশলে জুতে দিত। তারপর সে লাফ দিয়ে ড্রাইভারের পাশে উঠে পড়ত। খাড়াইয়ের মাথায় পৌঁছে চলন্ত ট্রাম থেকে টক্ ক'রে লাফিয়ে নেমে বাড়তি ঘোড়াটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে ফের চলে যেত আগের জায়গায়। তারপর আবার সেই ব্রিজের মুখে গিয়ে ঘোড়া নিয়ে ঝট ক'রে খাড়া হয়ে যেত পরের ট্রামের অপেক্ষায়। এইভাবেই চলত।

ইস্কুলে যাওয়া (মানিস্কুল টার্মিনাস) আর ফিরে আসা গ্র্যাণ্ট রোডের মোড়ে (গ্রে হাউস, স্থানীয় লোকে বলত 'পিলা হাউস')—যেটা ছিল আমাদের খেতওয়াড়ি এলাকার ট্রামগুমটি। যাতায়াতি ট্রামভাড়া বাবদ বরাদ্দ ছিল ২ আনা (প্রায় ১২ পয়সা)। সেণ্ট জেভিয়ার্স হাই স্কুল পেরিয়ে মানিস্কুল টার্মিনাস আর ক্রফোর্ড মার্কেটের মধ্যে মিনিট পনেরো অন্তর একটা শাট্‌ল্ সার্ভিস মিলত। সেখান থেকে মেন্ লাইন দিয়ে পায়ধুনি হয়ে গ্র্যাণ্ট রোডে গিয়ে দু-ঘোড়ার ট্রাম ধরতে হত। পায়ধুনিতে সচরাচর বদ্‌লি ঘোড়া পাওয়া যেত। সেখানে টাটকা টাটকা জিন চড়িয়ে ঘোড়ার-ডাক তৈরিই থাকত। হলে হবে কী, আমি এদিকে ট্রামভাড়া ভেঙে টিফিনের ছুটিতে ভেল্‌পুরি খেয়ে সব পয়সা খরচ ক'রে বসেছি। প্রায়ই আমি এই অপকর্ম করে ফেলতাম। তখন স্কুলছুটির পর মুখ বেজার ক'রে, অলিগলি দিয়ে, খিড়কি পেরিয়ে রাস্তা সংক্ষেপ ক'রেও, মাইল দুয়েক পথ ঠেঙিয়ে আমাকে বাড়ি ফিরতে হয়েছে। ঐরকম একটা দিনে মানিস্কুল টার্মিনাসে ট্রাম আসতেই বেখেয়ালে আমি উঠে পড়েছি। টিকিটের পয়সা বার করতে গিয়ে পকেটে হাত দিয়ে দেখি একদম খালি। কণ্ডাক্টর ছিলেন ইউ-পির এক দাড়িওয়ালা শরিফ আদমি। তাঁর মতন তাঁর দেশোয়ালি অনেক লোকই তখন বোম্বাইয়ের ট্রাম কোম্পানিতে কাজ করতেন। আমি যে টিকিট-কাটা নিত্য যাত্রী—তিনি জানতেন। ভুল করে ফেলে আমি যে লজ্জায় পড়ে গিয়েছি, সেটা ওঁর নজরে পড়েছিল। আমি যখন এই ভেবে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে আছি যে, ট্রাম থেকে পত্রপাঠ আমাকে নেমে যেতে বলা হবে—তার বদলে হঠাৎ দেখি, কণ্ডাক্টর একটা টিকিট কেটে নিঃশব্দে আমার হাতে তুলে দিচ্ছেন। তারপর বাবা যেমন সন্তানকে বলে, সেইভাবে বললেন আমি যেন এই নিয়ে ভেবে মন খারাপ না করি। টিকিটের পয়সাটা কাল দিলেই চলবে। এক আনা পয়সা ফিরে না পেলে উনি কিছু মারা যেতেন না, তা ঠিক। কিন্তু হন্যে হয়ে ছোটা আর হাড়ে-বাসা-বাঁধা বেআদবির অর্থপিশাচ এই

জমানায় এমন আর কোন্ ট্রামের কণ্ডাক্টর মিলবে, যিনি পয়সা-না-থাকা এক ছোট্ট ভয়তরাসে স্কুলবালককে এমন ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবেন? সেদিনের সেই অনুগ্রহের কথা আমি জীবনে ভুলব না। এ থেকে ক্রমশ আমাদের দুজনের মধ্যে একটা পিতাপুত্রের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এরপর দ্বিপ্রাহরিক ভেলপুরির লোভ সামলাতে না পেরে আমিও অচিরে আরও ঘন ঘন তাঁর ভালোমানুষির সুযোগ নিয়েছি।

ইস্কুলে আমি এমন কিছু ভালো ছাত্র ছিলাম না যে, তা নিয়ে বড়াই করতে পারি। বেশির ভাগ বিষয়েই আমি ছিলাম গড়পড়তার দলে। ভূগোলে আর খেলাধুলোয় খানিকটা ওপরদিকে। গণিতে বেজায় তলার দিকে। বলা হত, আমার ইংরিজি সরেস। আমার খুশির কারণ ঘটত, যখন মাঝেসাঝে আমার লেখা রচনা মাষ্টারমশাই ক্লাসের সবাইকে উঁচুগলায় পড়ে শোনাতেন। আমার বড় হওয়ার অনেক পরের কথা। ১৯৩৪ সালে হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরিজির সিনিয়র প্রোফেসর ঈ. ঈ. স্প্রেইট-এর সম্পাদনায় ভারতীয় লেখকদের লেখা ইংরিজি পদ্যের একটি সঙ্কলন বেরোয়। অবাক হয়ে দেখি তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে আমার লেখা। নিজের চোখে দেখেও ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। কলেজছাত্রদের অনুপূরক পাঠ্য হিসেবে সঙ্কলিত বইটির ঘটা ক'রে নাম দেওয়া হয় 'ইণ্ডিয়ান মাষ্টার্স অব ইংলিশ'। আমার 'সহযাত্রী ওস্তাদ' কারা? না, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর সরোজিনী নাইডুর মতন স্বনামধন্যেরা। ভাবা যায় না। স্কুল পরীক্ষার সব গাঁটই যথাক্রমে পেরিয়েছি বটে, স্কুলপ্রাইজে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে একমাত্র 'ভালো আচরণে'র জন্যে। তখন ফোর্থ-ক্লাসে পড়ি। পেয়েওছিলাম যেন আমার ভবিষ্যৎদ্রষ্টা একটি বই, যার নাম 'আওয়ার অ্যানিম্যাল ফ্রেণ্ড্স্'। হকি, টেনিস আর ব্যাডমিণ্টন—খোলা জায়গার এসব খেলাই ছিল আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দের। গড়পড়তাদের চেয়ে কিঞ্চিৎ ভালোই খেলতাম। ফুটবলও আমাকে টানত। আর ক্রিকেট যে একেবারে খেলিনি তা নয়। কিন্তু ও খেলার রস বরাবর আমার অধুরা থেকে গেছে। অবশ্য যদি তেমন ভালো, মারকাটারি ক্রিকেট হলে, পরিমিত মাত্রায় হলে দেখে মজা পেতাম। তাই ব'লে পুরো পাঁচদিনের টেস্ট। কখনই নয়। ঘোড়ায় চড়তে আমি ভালবাসি। কিন্তু সাধ মিটিয়ে ঘোড়ায় চড়ার তেমন সুযোগ হয়নি। হয়েছিল একবারই অল্পসময়ের জন্যে দেরাদুনে। বন্দুক নিয়ে বনেজঙ্গলে ঘুরে পাখি শিকার আর বাঘা বাঘা জন্তু মেরে কোনো কিছুটা সে সুযোগ পেলে আমি আর কিছুই চাই না। এ দুটো কাজেই যে গড়পড়তাদের চেয়ে আমি কিছুটা দড়, সেটা ভাবতে আমার ভালো লাগে। মারলাম কি মরলাম না, কতটা পরিমাপে বয়ে আনতে পারলাম, সেটা তুচ্ছ। কিন্তু ঘরের বাইরেক া আর অরণ্যের হাতছানি আর থেকে থেকে জলে বাতাসে বিপদের গন্ধছড়ানো গা ছম ছম করা থমথমে ভাব—সব নিয়ে থুয়ে এই অভিজ্ঞতা বড়ো উপভোগ্য হয়ে ওঠে। এখন থাক এসব। আবার সেই ইস্কুলের কথায় আসি।

যখন আমার তেরো চোদ্দ বছর বয়স, সেই সময় নাগাদ জটিল মাথা ধরার অসুখে আমি কাবু হয়ে পড়ি। মাথাধরার কারণ কখনও কেউ ধরতে পারেনি। তবু ডাক্তারবদ্যিরা মনে করলেন যে, হাওয়া বদল করলে হয়তো উপকার হবে। তাতে ইস্কুলে আমার অর্ধবর্ষের মেয়াদ বরবাদ হবে। এই মর্মে ডাক্তারদের ব্যবস্থাপত্র। হাতে পেয়ে আমার আহ্লাদে আটখানা ভাব আমি মোটেই গোপন করিনি। আমার দাদা হামিদভাই আর তার স্ত্রী শরিফা সানন্দে জানিয়ে দিল ওরাই আমার ভার নেবে। কেননা সিন্ধু প্রদেশের শুকনো জলহাওয়ায় ওরা আমাকে নিয়ে গিয়ে রাখলে, ভাবা হল, তাতে আমার ভালো হবে। হামিদভাই তখন সিন্ধু প্রদেশের ভূমি লেখ্য বিভাগের অধীক্ষক এবং হায়দ্রাবাদে তপেদারদের (আমিন) ইস্কুলের প্রধান। শীতের সময় এই কাজে প্রদেশময় তাকে ট্যুর করে বেড়াতে হত। সিন্ধুরাজ্য দখলের পর অল্পদিনের মধ্যেই ১৮৪০ সালে বা তার কাছাকাছি সময়ে জেনারেল জেকব শহরপ্রান্তে একটি দুর্গের মতো দেখতে বেলে পাথর দিয়ে বাড়ি বানিয়েছিলেন। লোকে তাকে বলত জেকবের কাসেল বা কেল্লা। ছবির মতো সেই বাড়িটাতে হামিদভাইরা থাকত। বাড়িটার মূল প্রবেশপথের দুধারে ছিল দুটো গোলাকার টাওয়ার বা গম্বুজ সামনেই একটা খোলা চাতাল। আমার দহলিজটা ছিল দোতলায়। সমান জায়গায় হেঁটে টাওয়ারের বাথরুমে যাওয়া যেত। টিলা নয়, একটা ঢিবিমতো উঁচু জায়গায় তোলা হয়েছিল এই দুর্গপ্রাসাদ। চবুতরার চতুষ্পার্শ্বে মাটির দেয়াল। সরু একফালি উঠোনে ছিল কাঁটাঝোপ আর বাবলা গাছের হিজিবিজি জঙ্গল। সেটা ছিল টুনটুনির মতন ছোট পাখিদের এক আদর্শ আস্তানা। বাবুইপাখির বাসা ঢের আগেই আমার দেখা ছিল। যখন চেম্বুরে ছুটি কাটাতে গিয়েছি। কিন্তু সেসব বাসা তো সচরাচর থাকত ঢ্যাঙা খেজুর গাছের মটকায়। মন ছোঁক ছোঁক করলেও হাতে পেতাম না। সে সময় আমি পেলেই পাখির ডিম চুরি ক'রে জমাই। আমার মনে আছে, সেইসব বাসা ছিল সামনের উঠোনে নিচু নিচু বাবলার ঝোপে। হাত বাড়িয়ে পেড়ে নিলেই হল। দেখে আমার কী আনন্দ হল বলার নয়। হামিদভাইয়ের এক চাপরাসি ছিল হাবশি। তার নাম উর্স্। দৈত্যের মতো চেহারা। শিকারি মোতাবেক চাকরি। তার ওপর ছিল যাবতীয় বন্দুক আর শিকারের সাজসরঞ্জাম তদারকের ভার। সেইসঙ্গে আরেকটি কাজে সে নিজেই নিজেকে নিযুক্ত করেছিল। মনিব ট্যুরে বেরোলে শিকারে কোথায় কী পাওয়া যায়—বিশেষ করে তিতির, বটের, পাতিহাস আর কাদাখোঁচা—সরেজমিনে তার খোঁজখবর নেওয়া, জঙ্গলখেদার লোক যোগাড়, আগাগোড়া সব বন্দোবস্তই সে করত। এই উর্স্ ছিল সেই সময় আমার নিত্য সহচর। আমার শিকারের ব্যাপারে সে ইন্ধন যোগাত। আর পাখির বাসা খোঁজা এবং পাখির ডিম চুরি করার কাজে সে ছিল আমার দক্ষিণ হস্ত।

এই আমলের একটা স্মৃতি আজও আমার মনে জ্বলজ্বল করে। একদিন কাকভোরে

হামিদভাইয়ের টাঙায় চড়ে হায়দ্রাবাদের মাইলকয়েক দূরে তান্দো হায়দারে যাচ্ছিলাম তিতির শিকার করতে। তারাভরা আকাশে তখনও রাতশেষের অন্ধকার। শিয়রে ঝকমক করছে হ্যালির ধূমকেতু। যেতে যেতে ভাবছি, ১৯৮৬ তে এই ধূমকেতু হিসেবমতো আবার যখন ফিরে দেখা দেবে, আমরা কেউই কি বেঁচে থাকব? উননব্বইতে প'ড়ে মনে হয়েছিল ১৯৮৬ তখনও দূর অস্ত। কিন্তু সেইসঙ্গে চিন্তা করে দেখলাম আবদুলআলির (দাদা ১১৪, চাচা ১০০, এক ফুফা ১০০, এক আপা ৯৭) এক ঝাড়ের বাঁশ। যেমনি শক্তপোক্ত, তেমনি টেঁকসই। তখন আমার খটকা লাগল। কী জানি, পরিণামে হয়তো সেটাই সম্ভব হবে, আগে যেটা অসম্ভব ঠেকেছিল।

ঘুষঘুষে মাথাধরার কারণে একটা বছর জলে গেলেও ১৯১৩ সালে কোনোরকমে ঘেঁষটাতে ঘেঁষটাতে আমি বেড়া টপকেছিলাম। সে বছরে ৩০০০ পরীক্ষার্থীর তালিকায় আমার স্থান হয়েছিল পড়ি-মরি ক'রে একেবারে প্রায় তলার দিকে। ছেলের বাহাদুরি আছে বলতে হবে।

এর একটু আগের কথা বলে নিই। ১৯০৮-এর কাছাকাছি সময়টাতে বাঘ-মারা বড় শিকারি হব, এটাই ছিল আমার উচ্চাভিলাষ। চেষ্টা করব নাম করা একজন শিকারি হতে। আমি যে খুব একটা বইয়ের পোকা ছিলাম বা আমার খুব পুঁথিপড়া বিদ্যে ছিল তা নয়। প্রকৃতিবিদ্যা আর শিকার অভিযান, এই দুই বিষয়ে লেখা প্রবন্ধনিবন্ধ আর বই—আমার পড়াশুনো এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন, স্যাণ্ডারসন-এর 'থার্টিন ইয়ার্স্ অ্যামং দ্য ওয়াইল্ড বিস্টস্ অব ইণ্ডিয়া', ক্যাপ্টেন গ্লাসফার্ড-এর 'রাইফ্ল্ অ্যাণ্ড রোমান্স ইন দি ইণ্ডিয়ান জাঙ্গল্', থিওডোর রুজভেল্ট-এর 'আফ্রিকান গেম ট্রেইল্স্'। আর সেইসঙ্গে ব্রিটেনের পাকা শিকারিদের উনিশ শতকে লেখা নানা বই। 'সকালে ছোট-হাজরির আগে গোটা দুই-তিন গণ্ডার কিংবা বাঘ'—এটা বললে আজকের দিনে কেউ বিশ্বাসই করবে না। এসব বইতে আকছার এই ধরনের মন্তব্য থাকত। সেকালে বনজঙ্গল আর বন্যপ্রাণী কতটা কী ছিল, এ থেকে তা আন্দাজ করা যায়। আগেই বলেছি, আমার মামু আমিরুদ্দিনকে আদর্শপুরুষ মনে করতাম। ভারতীয় শিকারের ব্যাপারে তিনি যা করতেন, সেটাই ছিল আমাদের কাছে বেদবাক্য। অবশ্য, মামুর হাতযশের বেশির ভাগটাই ছিল আমোদপ্রিয় বিভিন্ন দেশীয় রাজার রাজকীয় কেতায় শিকারে যাওয়ার সফরসঙ্গী হিসেবে। নিজে যোগাড়যন্ত্র ক'রে কোনোদিন তিনি শিকার অভিযান করেছেন কিনা, সে বিষয়ে আমি নিঃসংশয় নই। যেসব প্রাণী শিকার করেছেন আর বনে জঙ্গলে ঘুরেছেন, সে সংক্রান্ত তাঁর কতটা কী জ্ঞান ছিল, আমি নিশ্চিন্তভাবে জানি না। আজকের মাপকাঠিতে দেখলে মনে হয়, তাঁর অস্ত্রশস্ত্রগুলো ছিল কতকটা মান্ধাতার আমলের। একটা ডবল-ব্যারেল ১২ বোরের ইংরেজের তৈরি পুরনো আমলের হ্যাপার পান, আর্মি অ্যাণ্ড নেভি কোঅপারেটিভ সোসাইটির জন্যে বানানো একটি কম্বিনেশন ১২ বোর/৪৫০ ব্ল্যাক পাউডার রাইফেল, ১৮৭০-এর

কাছাকাছি আমলে এক নামকরা ফরাসি বন্দুক প্রস্তুতকারীকে অর্ডার মাফিক দামাস্কাস ইস্পাতের ব্যারেলযুক্ত স্বর্ণখচিত মনোগ্রাম করা একটি সুচারু কিন্তু সাবেক ধরনের ১৬ বোর ডবল ব্যারেল রাইফেল। সেইসঙ্গে ২৫ গোলাবারুদ ভরবার সংযোজক টিউবযুক্ত একটি সামরিক মার্টিন হেনরী ক্যাভালরি কার্বাইন ৫৭৭/৪৫০—সাকুল্যে এই ছিল তাঁর অস্ত্রশস্ত্রভাণ্ডার। এর ওপর ছিল একটি ওয়াকিং স্টিক পিন-ফায়ার গান ৪১০ বোর, ছোট গুলির কার্তুজের জন্যে ৩২ গেজের একটি তথাকথিত 'রুক রাইফল্' রিম ফায়ার সিঙ্গল ব্যারেল চকচকে বোর হ্যামার গান। ব্যারেলের তলার লিভারটি বুড়োআঙুলে পাশের দিকে ঠেলে ব্যারেলটি সামনে দু-এক ইঞ্চি সরিয়ে দিয়ে ফুটোর মধ্যে গুলি ভ'রে ব্যারেলটিকে টেনে এনে যথাস্থানে জুড়ে দিতে হত। ছোটদের মধ্যে আমরা যারা বয়সে বড় ছিলাম, তাদের কাউকে কাউকে বেওয়ারিশ বেড়াল আর কাক মারতে এই বন্দুকটি চালাতে দেওয়া হত। খেতওয়াড়ির মতো বেশ জনাকীর্ণ অঞ্চলে যেরকম দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে আমরা তা ব্যবহার করতাম, তাতে আজ ভেবে অবাক হই যে, নেহাত বরাতজোর ঐ সময় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। হ্যামারলেস গান ম্যাগাজিন রাইফেলের তখনও তেমন চলন হয়নি। যাঁরা প্রবীণ এবং কিছুটা বেশি রক্ষণশীল শিকারি, তাঁরা সমানে হ্যামারলেস গানের নিন্দে করতেন। তারা ভয় দেখিয়ে বলতেন যে, ঐ বন্দুকের হ্যামার দেখা যায় না ব'লে অজান্তে কখন গুলি ছুটে যাবে কেউ বলতে পারে না।

রাজারাজড়া, বড়ো জমিদার এবং খেতাবধারী আর প্রমাণিত খয়েরখাঁ ধরনের লোক—এর বাইরের ভারতীয়দের অস্ত্রের লাইসেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে তখন বেজায় কড়াকড়ি ছিল। অস্ত্রের লাইসেন্স থাকাটাকে সমাজে পদমর্যাদার বিষয় ব'লে মনে করা হত। ফলে, তা পাবার জন্যে লোকে নানা ফন্দিফিকিরের আশ্রয় নিত। লাইসেন্স বিলি করা হত টিপে টিপে। প্রার্থীর স্বভাবচরিত্র কেমন, আর্থিক সঙ্গতি কতখানি, দরখাস্ত মঞ্জুর করার আগে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করে নেওয়া হত। অথচ প্রায়ই এই লাইসেন্স হাতানো হত নিছক 'লোক দেখানো'র উদ্দেশ্যে। সরকারি ফর্মে কারণাবলীর উল্লেখ করার জায়গায় শিকার আর আত্মরক্ষার পাশাপাশি ছাপার অক্ষরে সেটা লেখাও থাকত! আমির মামু ছিলেন নায়পাল। সেই সুবাদে দরকারমতো ঢের বেশি বন্দুক বিনা লাইসেন্স আর বিনা ফি-তে আইনানুযায়ী রাখতে পারতেন। ভারতীয় অস্ত্রবিক্রেতা ছিল কম। তাদের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধের অনেক ধরকাট ছিল। এই ব্যবসার অধিকাংশটাই ছিল বোম্বাইয়ের আর কলকাতার আর্মি অ্যাণ্ড নেভি স্টোর্স, আই. হলিস অ্যাণ্ড সন (বোম্বাই), আর. বি. রড্ডা অ্যাণ্ড কোং আর কলকাতার ম্যাণ্টন অ্যাণ্ড সন-এর মতন ব্রিটিশ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের হাতে। আগ্নেয়াস্ত্র আর গোলাবারুদ এবং শিকার আর ক্যাম্পিং-এর যাবতীয় সরঞ্জামের তালিকা সমস্ত জে পি এবং ঐ গোছের লোকদের নামের লিস্ট ধ'রে ফি বছর বড়দিনের ঠিক আগে ডাকযোগে পাঠানো হত। আমি আর

আমার মামাতো-পিসতুতো ভাইদের মধ্যে, আমরা যারা একই মনের মানুষ ছিলাম, সবাই আমরা কবে ডাকপিওন আসবে, সেই আশায় পথ চেয়ে থাকতাম। ক্যাটালগ আসামাত্র আমরা তা ছোঁ মেরে নিয়ে গোগ্রাসে গিলতে বসতাম। নতুন নতুন বন্দুক আর রাইফেলের—আলাদা আলাদা ক'রে নলের ভেতরকার ব্যাস, জোরে গুলি ছোঁড়ার ক্ষমতা কোন্‌টার কত, আঘাত হানার শক্তি ফুট/পাউণ্ডের হিসেবে কার কতটা, কোন্ বুলেটের বারুদ কী টাইপের আর কোনটার কী ওজন—এসব বিবরণ আমরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প'ড়ে রপ্ত করতাম। না কিনে শো-কেসের জিনিস দেখে বেড়ানোর ধাঁচে নিজেদের মধ্যে চলত সমানে আলোচনা। কাদের তৈরি কোনটা বেশি ভালো, কাজ হয় বেশি—ঠায় এই নিয়ে তর্কের ঝড় উঠত। যার যেটা পছন্দসই, তার নাড়িনক্ষত্র সবার মুখস্থ থাকত, পরে ঠায় একনাগাড়ে গড়গড় ক'রে আমরা তা আওড়ে যেতে পারতাম। পরবর্তীকালে আমার ক্ষেত্রে এই ভূত ঠাই বদ্‌লে মোটর সাইকেলের কলেবর নিয়ে আমার ঘাড়ে চেপে বসেছিল। মজাও পেয়েছিলাম অঢেল।

১৯১৭ তে শুরু ক'রে মাঝে মাঝেই আমার খোদ নিজের আগ্নেয়াস্ত্র হয়েছে। তাভোইতে থাকতে পেয়েছি বি.এস.এ., ৪১০ বোরের এক নলা বন্দুক। তাই দিয়ে বর্মায় আর ভারতে আমার পাখি সংগ্রহের প্রায় সবটাই গড়ে উঠেছে। শিকারও করেছি তাই দিয়ে। আমার একত্রিশতম জন্মবার্ষিকীতে আমার স্ত্রী তহমিনা আমাকে লিঙ্কন জেফ্রিজ-এর ২০ বোরের হ্যামারলেস ইজেক্টর দোনলা শটগান উপহার দেন। তারপর এই ছাপ্পান্ন বছর ধ'রে ওটাই হয়েছে মাঠেঘাটে আমার সঙ্গের সাথী। মাঝখানের বছরগুলোতে আমার অঞ্চলভিত্তিক পাখি জরিপের সূত্রে কয়েক হাজার পাখি সংগ্রহের বেশিরভাগ কাজ আমি ওটা দিয়েই হাসিল করেছি। তাছাড়া আমার প্রিয় ঐ হাতিয়ারটা দিয়েই বনেবাদাড়ে বিস্তর শিকারও করেছি। রাইফেলগুলোর মধ্যে একটি ছিল উইঞ্চেণ্টার ৩৫১ ক্যালিবারের সেমি-অটোমেটিক রিপিটার। ১৯১৮ সালে আমার দাদা হামিদভাই নিজের অস্ত্রভাণ্ডার থেকে আমাকে ওটা সওগাত করে। বিপজ্জনক নয়, এমন মাঝারি ধরনের জন্তুজানোয়ার শিকার করার পক্ষে চমৎকার। কিন্তু এর একটা বদভোস, যখন তখন জ্যাম হয়ে মানুষকে শঙ্কায় ফেলে দেয়। প্রায়ই যে হয়, তা অবশ্য নয়। কিন্তু তেমন কাহিল অবস্থায় পড়লে, এর ওপর আর তখন পুরোপুরি ভরসা রাখা যায় না। ১৯২২ সালে এটা সরিয়ে সে জায়গায় একটা ৪২৩ (১০.৫ মিমি) মাউসার বোল্ট অ্যাক্‌শন ম্যাগাজিন রাইফেল নিই। আমি সেই রাইফেল দিয়ে অধিকাংশই বড়ো বড়ো জন্তু মেরেছি। গোড়ায় তাভোইতে (বাইসন), পরে ভারতে (দুটো দুটো চিতা, বেশ কয়েকটা কৃষ্ণ ভল্লুক, সম্বর, চিতল হরিণ, নীলগাই, কৃষ্ণসার ইত্যাদি)। বি-এন-এইচ-এস-এ সহকারী কিউরেটর পদে যোগ দেওয়ার পর একটি ৬.৫ (.২৫৬) ম্যানলিশের শোয়েনাওয়ার কারবাইন দিয়ে আমার অস্ত্রাগার বৃদ্ধি করি। আকারে ছোট ব'লে যেমন হাতে নিতে সুবিধে, তেমনি নিশানা হত নিখুঁত, ছুঁড়েও আরাম। সফ্‌ট্-

নোজ বুলেট লাগিয়ে এ দিয়ে নীলগাই আর সম্বরের মতন বড়ো জাতের সব জন্তু ঘায়েল করা যায়। আবার বড়ো বড়ো পাখির নমুনা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে (সোরস, বাজ ইত্যাদি) .২২-এর বদলে নিকেল-রঙা নিরেট বুলেট ভ'রে এ দিয়ে শটগান রেঞ্জ থেকে মেরে দেখা গেছে, বাড়তি কোনো ক্ষতি হয়নি।

তাভোইতে থাকতে শেষদিকে আমার .৩২ ক্যালিবারের কোল্ট অটোমেটিক পিস্তল বিনিময় ক'রে আমি পেয়েছিলাম যে মডেলের একটা মাউসার পিস্তল, সেটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মান অশ্বারোহী বাহিনীতে ব্যবহার করা হত। সে অসাধারণ অস্ত্র। প্রচলিত পিস্তলের চেয়ে একটু বেশি গোদা-গোদা। ব্যারেলটা প্রায় ১২ ইঞ্চি লম্বা। কিন্তু কাঠের খাপে পুরে সেটাকে পরনের জিনের গায়ে কিংবা কোমরে ঝুলিয়ে দিলে সচরাচর ব্যবহৃত কারবাইনের মতোই কাঁধে রেখে নিশানা ঠিক ক'রে ছোঁড়া যাবে। আধা অটোমেটিক সেই অস্ত্রে পরের পর ছোঁড়ার জন্যে ১০-গুলির ম্যাগাজিন থাকত। ৯,০০০ মিটার দূরের জিনিস তাক ক'রে সমান লাইনে আনা যেত। এতে লক্ষ্যভেদ নিখুঁত হত। তবে হাতাহাতি দূরত্বে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে হয়তো এই পিস্তল ততটা কাজে আসত না। আমি দেখেছি, ১৫০ বা ২০০ গজ রেঞ্জে এটা খুব কাজের হয়েছে। আমার এক মামাতো ভাই ছিল আসফ ফৈজি। আজীবন সে আমার বন্ধু। এক সময়ে দুজনে মহা উৎসাহে একসঙ্গে শিকারে গিয়েছি। আমি বোম্বাইতে ফিরে আসার পর আসফ আমাকে ওর .৩৬৬ (৯.৫ মিমি) মাউসার ম্যাগাজিন রাইফেলটি দান করে। এই অস্ত্রটিও আমার যখন যেমন দরকার সেইমতো অসাধারণ রকমের কাজে লেগেছে।

১৯০৯ বা তার কিছুটা আগে পরে, যখন আমরা খেতওয়াড়িতে থাকতাম, আমার কমবেশি সমবয়সী যে ছেলেরা খেলাধুলো বা আর পাঁচটা কাজের সূত্রে একজায়গায় হত, তার মধ্যে একজনকে মনে পড়ে। সে ছিল আমার এক দূর সম্পর্কের ভাই। তার নাম ইস্কান্দার মির্জা। একসময় সে হঠাৎ কপালের জোরে ক্ষমতার মগডালে উঠে গিয়েছিল। তারপর পাকিস্তানে মিলিটারি প্রথম গদি বেদখল করে নিলে তার শোচনীয় পতন ঘটে। এ থেকে একটা নৈতিক শিক্ষা মেলে। উচ্চাকাঙ্ক্ষার এই পরিণাম দেখে এ জাতীয় সব ভুঁইফোড়েরাই সাবধান হতে পারে। ছেলেবেলায় ইস্কান্দারের সঙ্গ পেয়ে খুবই ভালো লাগত। আমাদের সব রকম দুষ্টুবুদ্ধি আর দস্যিপনায় ইস্কান্দার ছিল পালের গোদা। ওর ছিল 'জেম' এয়ারগান। ওর হাতের টিপ দেখে আমাদের হিংসে হত। এটা সেই সময়ের কথা, যখন আমরা বন্দুকহাতে খেতওয়াড়ির আশপাশের ছাদে আর চিলেকোঠায় অতর্কিতে হানা দিয়ে চড়াই নিধন করে বেড়াচ্ছি। এ ছাড়া অন্যান্য সব খেলাতেও ইস্কান্দারের স্থান ছিল গড়পড়তাদের বেশ ওপরে। ক্রিকেটে তো খুবই ভালো। শনিবার-রবিবারে প্রায়ই আমরা চলে যেতাম স্যাণ্ডহার্স্ট রোডের পাশে একটা ফাঁকা জমিতে। (এখন যেখানে হরকিষাণদাস হাসপাতাল তার কাছে।) আমরা ইস্কুলের ছেলেরা সেই মাঠে ক্রিকেট ম্যাচ খেলতাম।

ইস্কান্দারকে বোলার হিসেবে সবাই তখন দলে টানতে চাইত। ওর ছিল বল দেওয়ার একটা বিশেষ কারসাজি। বল দিতে দিতে তার মধ্যে আচমকা এমন একটা ইয়র্কার ছেড়ে দিত যে, ব্যাটসম্যানের চক্ষু চড়কগাছ হত। সেই ফাঁকে উইকেটটাও সে পেয়ে যেত। জীবনে পরের দিকে রাজনীতির খেলাতেও সে চালাকি ক'রে আলটপকা ইয়র্কার চেলে নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়েছে। সেই একই কৌশলে। একটা দৃষ্টান্ত দিই। যখন খান আবদুল গফর খানের খুদাই খিদমতগার আন্দোলন চলেছে, ইস্কান্দার তখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ব্রিটিশের পলিটিকাল এজেন্ট। সেখানেও একই চাল চেলে অনেক মুশকিলের আশান করেছে। মনিবরাও তার জন্যে জোরসে ওর পিঠ চাপড়ে দিয়েছে। হয়ত আলাদা ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ইয়র্কারের চাল একটু বেশি হয়ে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত তাকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিজের উইকেটটি খোয়াতে হয়। গোড়ায় এই ক্রিকেটের জাদুতেই লর্ড উইলিংডনের সে মন ভুলিয়েছিল। লর্ড উইলিংডন নিজেও ছিলেন তাঁর সময়কার একজন নামকরা ক্রিকেট খেলোয়াড়। লর্ড সাহেবের প্রভাবে আর পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯২৪ সাল নাগাদ ভারতীয় সেনাবাহিনীর কিংস্ কমিশণ্ড্ অফিসার হিসেবে প্রথম ভারতীয় ব্যাচের একজন মনোনীত সদস্য হয়ে সে স্যাণ্ডহার্স্টে ট্রেনিঙে যেতে পেরেছিল। ভারতে কট্টর ইংরেজরা নবপ্রবর্তিত এই নীতিকে একরোখা হয়ে প্রবল বাধা দিয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের চাপ ঠেকাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ইচ্ছের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টকে গাঁইগুঁই ক'রে রাজি হয়ে যেতে হয়।

□

৩

বর্মায় ১৯১৪-১৭

খেতওয়াড়িতে প্রথম যখন পাখি-সংরক্ষণের কাজে হাত দিই, তখন সেই সূচনাপর্ব থেকেই আমি স্বপ্ন দেখে এসেছি যে, বড়ো হয়ে প্রাণীবিজ্ঞানকে আমি আমার বৃত্তি হিসেবে নেব। বিশেষ ক'রে, পক্ষিতত্ত্বকে আমার বিষয় করব। হব দুঃসাহসী এক অভিযাত্রী। বনে বনে বাঘভালুক শিকার করে বেড়াব। তাতে ছিল একটা গা-ছমছমে ডাকাবুকো ভাব। সেকালে এই অভিধার মান্যতা ছিল। এমন লোককে সমাজ মাথায় ক'রে রাখত। কিন্তু সেরকমটা হওয়া মুখের কথা নয়। তখনকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে উঠলে তবেই পাঠ্যক্রম অনুযায়ী প্রথাগত জীববিদ্যার পঠনপাঠন শুরু হতে পারত। তার আগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ক'রে পূর্ববর্তী বা প্রথম বর্ষের বেড়াটা টপকাতে হবে। তবে তো। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ঢুকে ঘাতাঙ্কাগণন আর অমনি সব শনির দশায় পড়ে এমনিতেই আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। এই কঠিন বাধা ঠেলে এগোতে পারার কোথাও কোনো আশা দেখছি না। দুর্দশার একশেষ হয়ে আমার তখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। ঠিক সেই সময় আমিরুদ্দিন মামাকে বর্মা থেকে লেখা জবিরভাইয়ের একটি ত্রাণপত্র এসে পৌঁছুল। জবিরভাই কেম্ব্রিজ থেকে কৃষিবিজ্ঞানে ডিপ্লোমা ক'রে অনেক আশা নিয়ে ১৯১০-এর আগস্টে দেশে ফিরেছিলেন। ফিরে এসে হন্যে হয়ে চেষ্টা করেছিলেন কৃষি বিভাগে কিংবা আর কোথাও উপযুক্ত একটা কাজ পেতে। না পেরে শেষকালে মরিয়া হয়ে তাঁর এক সম্পর্কিত ভাই সালাহ্ তৈয়বজীর কাছে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। রেঙ্গুনে তৈয়বজীর ব্যবসাপত্র ছিল। সালাহ্‌ভাই ইদানিংকালে টাংস্টেন ধাতুর আকরিক উল্‌ফ্রামের একটি খনির অংশীদার হয়েছিলেন। খনিটা ছিল টেনাসেরিমের তাভোই জেলায়।

তখনকার দিনে টিন আর উল্‌ফ্রামের খনি-অঞ্চল হিসেবে তাভোইতে নামডাক সবে হতে আরম্ভ করেছে। সেইসঙ্গে তার গন্ধে গন্ধে সোনা-ক্যাংলাদের ধরনের যত রাজ্যের ভাগ্যান্বেষী আর সন্দেহজনক চরিত্রের লোক এসে জুটে গিয়েছে। 'দো-আঁশলা, এণ্ডিপেণ্ডি, চ্যাংড়া আর ডালকুত্তা এবং যত সব ইতর শ্রেণীর খেঁকি কুকুর'—কেউ বাদ নেই। রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার জন্যে সমানে লড়ালড়ি হুড়োহুড়ি

গুঁতোগুঁতি চলেছে। অবশ্যই বিবেকের বালাই না রেখে। বাড়বাড়ন্ত চালকল আর করাতকলের জন্যে লোহালক্কড় আর যন্ত্রপাতির দোকানপত্র ছিল সালাহ্-র। মনে আছে, সেই সময়ে তার প্রধান নির্ভর ছিল বর্মা মুলুকে 'গ্রিপলি'র সেলিং এজেন্সি। বাজারে ঐ ব্র্যাণ্ডের তখন খুব কাটতি। বিজ্ঞাপনে বড়াই ক'রে বলা হত 'চামড়ার পাড়-বসানো'। সালাহ্-র তখন লোকের দরকার। সে জানতে চায় জবির এসে তার তাভোইয়েত উল্‌ফ্‌রাম খনির কারবারে যোগ দিতে পারে কিনা। ইতিমধ্যে জবির তখন এক বছর কি তারও বেশি শত চেষ্টাতেও চাকরি যোগাড় করতে না পেরে তিতিবিরক্ত হয়ে পড়েছিল। সালাহ্-র প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে সে রাজি হয়ে যায়। কেম্ব্রিজে থাকতে সে ভূতত্ত্বও কিছুটা আয়ত্ত করেছিল। খনিজ প্রযুক্তিতে সেই বিদ্যেটা কাজে লাগবে ব'লে সে আশা করল। আসলে কৃষি আর খামারের ওপরই ছিল তার সবচেয়ে বেশি প্রাণের টান। কিন্তু মনের মতন কাজ না পেয়ে খুব মুষড়ে পড়েছিল। কাজেই রেঙ্গুনের ডাকে সাড়া দেবে, এটাই সিদ্ধান্ত করল। ওর ইচ্ছে কালক্রমে যথেষ্ট টাকা কামিয়ে আর তা থেকে বাঁচিয়ে একদিন চাষের নিজস্ব খামার ফেঁদে বসবে।

উল্‌ফ্‌রাম খনিটির নিগ্রানি পেয়েছিলেন এক বর্মী। তাঁর নাম মাউৎ লুপে। তৈয়বজী ছিলেন তাঁর পার্টনার। খনিটি ছিল তালাইঙ্গিয়ায়। তাভোই নদী দিয়ে সাম্পানে যেতে এক রাতের পথ। জবিরের ওপর ছিল খনির সুব্যবস্থা আর তত্ত্বাবধানের ভার। এর জন্যে তাকে প্রায়ই সেখানে গিয়ে একনাগাড়ে কয়েকটা দিন থেকে আসতে হত। এরই পাশাপাশি সে তাভোই শহরে একটা ব্যবসা শুরু করে দেয়। তাভোই ছিল একাধারে জেলা সদর এবং খনিশিল্পের কেন্দ্র। উল্‌ফ্‌রাম খনিশিল্পের বাড়বাড়ন্ত অবস্থায় ইমারতি সাজসরঞ্জাম খনির যন্ত্রপাতি আর অন্যান্য জিনিসের বেজায় চাহিদা থাকে। জবিরের ছিল তারই ব্যবসা। স্লেজ-হ্যামার, গাইতি-কোদাল, খনিতে ড্রিল করার ইস্পাত, করোগেটেড লোহা, পিপেভর্তি সিমেণ্ট, পেরেক, কাতাদড়ি—এইসব মনভারি করা হাবিজাবি ভুসিমালে তার গুদাম ঠাসা থাকত। সেণ্ট্রাল মার্কেটের কাছে বাজার রোডে সে এক বর্মী মুসলমানের (জেরবাদি) বাড়ির একতলায় দোকান আর গুদামঘর ভাড়া করেছিল। বাড়িওয়ালার নাম ছিল মাউং এ চো। চিৎকার চেঁচামেচি করা ঝগড়াটে পরিবার নিয়ে বাড়িওয়ালা ওপরতলায় থাকত। একতলার সামনের দিকটা ছিল দোকানঘর, পেছনের দিকের ঘরগুলোতে থাকতাম আমরা। ভেতরের খোলা জায়গায় ছিল একটা পাতকুয়ো। ষাট বছর আগের কথা। তবু অপছন্দের বাসাটাতে ছড়ানো গা ঘিনঘিনে ভ্যাপসা গন্ধের কথা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে।

জবির কোনো কিছুর মধ্যেই ভালো ছাড়া খারাপ দেখতে পেত না। আজন্ম তার এই স্বভাব। স্পর্শকাতর আর নাকতোলা লোকেরা যেসব কাজ তাদের সাজে না এবং করলে মান যাবে ব'লে মনে করত, ন্যায়সঙ্গত হলে সে কাজে হাত দিতে তার কোনো ভেতরের বাধা বা লোকলজ্জার ভয় হত না। এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই যে,

আলো-আঁধারি ভবিষ্যতের একটা স্বপ্ন মনের মধ্যে সে জাগিয়ে রেখেছিল। তাকে বাস্তবে সত্যি করে তোলার তাগিদেই সে লোহালক্কড়ের দোকান দিয়েছিল। যতদিন খনিশিল্পের রমরমা অবস্থা ছিল, নিজের কল্পনাকে কখনও তার আকাশকুসুম ব'লে মনে হয়নি। কিন্তু যেভাবে ও মানুষ হয়েছে, শিক্ষাদীক্ষা পেয়েছে, ওর জ্ঞানবুদ্ধির যে পৃষ্ঠপট—সব সত্ত্বেও, খুচরো দোকানদারিতে যা প্রায়ই করতে হয়, সেইমতো আনা কয়েকের বিনিময়ে আধ কিলো পেরেক বা নারকোলের দড়ি ওজন ক'রে ঠোঙায় মুড়ে খদ্দেরের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। অসাধারণ জেদী স্বভাবের মানুষ ব'লেই ওর পক্ষে এই অসাধ্যসাধন সম্ভব হয়েছে।

আমিরুদ্দিন মামুকে জবির যখন চিঠি পাঠায়, তখন তার এই রকমের অবস্থা। চিঠিতে এ কথাও ছিল যে, কলেজের পড়াশুনো চালিয়ে যাওয়ার আমার প্রবল বাসনা থাকলে অবশ্যই সে ক্ষেত্রে আমি যেন না যাই। সেইসঙ্গে বলা হয়েছিল, পত্রপাঠ গিয়ে তার কাজে যোগ দিলে জবির তার সদ্য শুরু করা নতুন ব্যবসায় আমাকে পার্টনার করে নেবে। ছোট থেকেই দোকানদারি আর দোকানিকে আমি কিছুটা ছোট নজরে দেখতাম। তবে ব্যবসা আর ব্যবসায়ীদের দেখতাম আলাদা দৃষ্টিতে। কেন সেটা, আমি সম্ভবত নির্দিষ্ট ক'রে বলতেও পারতাম না। আমার নিজের গুরুজনেরা অনেকেই ছিলেন ব্যবসায়ী। বেশক্ সেই কারণেই ব্যবসাকে উচ্চ পর্যায়ে স্থান দিয়েছিলাম। ভুলে গিয়েছিলাম যে, তাদের বিসমিল্লা হয় ঘরে ঘরে জিনিস ফেরি ক'রে। তারপর নানা ধাপ পেরিয়ে ছোট দোকানদারের স্তর পেরিয়ে তবে জাতে ওঠে।

যাই হোক, জবিরের চিঠি যখন এল, তখন আমার মনে ঝড় বয়ে চলেছে। ঘাতাঙ্কগণন আর উচ্চতর বীজগণিতের হাত থেকে চাইছিলাম সুকৌশলে মুক্তি। কলেজের পড়াশুনোয় ইস্তফা দিয়ে এবার নিজেকে 'ব্যবসা'য় ঠেলে দেবার জন্যে তৈরি হ'ব—এটা ভেবেই খুশিতে ডগমগ হচ্ছিলাম। কলেজের গণিত নিয়ে তখন আমি এতটাই বিপর্যস্ত যে, কোনো রকমে পালাতে পারলে বাঁচি। কিন্তু তার ফলে, আমার পেশাদার প্রাণিতাত্ত্বিক হওয়ার স্বপ্ন যে মাটি হয়ে যাবে—এসব কথা, অন্তত তখনকার মতো, আমাকে আদৌ ভাবায়নি। যখন আমার বছর আঠারো বয়স, যখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের পাঠক্রম নিয়ে সমানে আট মাস ধরে বেহাল হয়ে চোখে অন্ধকার দেখছি—এটা সেই ১৯১৪ সালের কথা। সে বছর সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা হয়ে আমি রেঙুন রওনা হই। তার একমাস আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। রাজসম্রাটের ল্যাংবোট হলে বকশিশ স্বরূপ স্বায়ত্তশাসন মিলবে—এই খুড়োরকল দেখিয়ে ব্রিটিশ মনিবেরা চাওয়া না চাওয়ার তোয়াক্কা না ক'রে ভারতকে লড়াইয়ের জোয়ালে জুতে দিয়েছিল। জার্মান রণপোত 'এম্‌ডেন' নাকি তখন বঙ্গোপসাগরে ছেলেখেলা শুরু করেছে। যাত্রীদের বাঁচিয়ে শত্রুর জাহাজগুলোকে ডুবিয়ে দিচ্ছে। মুখে মুখে এইসব উদ্ভট গল্প। এইসব মিলিয়ে সে আমলে সমুদ্রপথে রেঙুন বাড়তি

উত্তেজনার ইন্ধন জুগিয়েছিল। নিত্যনতুন সব জনরব। প্রায় ভানুমতীর সব খেল। কী কাণ্ডই না করে চলেছে 'এম্‌ডেন'! যুগপৎ দুতিনটি দুরবিচ্ছিন্ন জায়গায় একই সময়ে বোঁ ক'রে দেখা দিয়ে আবার, পরক্ষণেই সাঁ করে উধাও। ওরই মধ্যে তার সব কর্ম ফতে। বোমার ঘায়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে উপকূলবর্তী শহরের পর শহর। জলে তলিয়ে গেছে জাহাজের পর জাহাজ। তার আগে অসমসাহসে মালজাহাজের যাত্রীদের প্রাণগুলো রক্ষা করেছে। বলতে বলতে গল্পেরও সবিশেষ ডালপালা গজায়। অগৌণ 'এম্‌ডেন'কে নিয়ে তৈরি হ'ল যেন ঠাকুরমার ঝুলি এবং ক্রমেই ফুলেফেঁপে তার কলেবর বৃদ্ধি হল। তবু বলতেই হবে, ঐ রণপোতের ক্যাপ্টেন স্মিভ্‌ট্‌ ছিলেন একজন অসামান্য বীরপুরুষ। সুভদ্র সাহসী শত্রু। আমি যখন সমুদ্র পেরোই, 'এম্‌ডেন' তখন বঙ্গোপসাগরে টহল দিচ্ছিল—এটাই সবার ধারণা ছিল। দূরে সন্দেহজনক দু একটা জাহাজ দেখা গেছে ব'লে কেউ কেউ কখনও সখনও জুজুর ভয়ও দেখিয়েছে। কিন্তু মাঝরাস্তায় তেমন কিছুই ঘটে নি। বর্ষা যাই-যাই করলেও তখনও চলে যায়নি। ফলে, তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্র আমাদের যাচ্ছেতাইভাবে তুলোধোনা করেছে। আমার চোখে পড়েছিল, এই মিথ্যে ভড়কি দেওয়া আর গতিপথ পরিবর্তনের পেছনে জাহাজের ক্যাপ্টেনের হাত ছিল। বোটের দৈনিক কুচকাওয়াজের ক্রমবর্ধিত হারে যোগ দেওয়ার ব্যাপারটাতে লোকে যাতে আরও বেশি গুরুত্ব দেয়, এটা ছিল তারই ফন্দি। অবশ্যই তাতে কাজ হয়েছিল।

আমাদেরটা ছিল সাবেক বি-আই (ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ডাকজাহাজ)। কলকাতা-রেঙ্গুন যাতায়াত করছে এক পুরুষের বেশি। জোয়ারভাঁটা খেলা রেঙ্গুন নদীর মোহানায় পৌঁছনোমাত্র একজন পাইলট স্টিমারে উঠে এল। আমরা আস্তে আস্তে হড়কাতে হড়কাতে জাহাজঘাটার দিকে এগোলাম। নদীতে গিজ গিজ করছে স্টিমারলঞ্চ, সাম্পান আর খড় ভর্তি বজরা। সামনেওয়ালা ভাগো করতে করতে মুহুর্মুহু বেজে চলেছে জাহাজের ভোঁ। দুপাশ দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে করোগেট টিনের ছাউনি দেওয়া সারবাঁধা চালকল আর করাতকল। জঙ্গল থেকে ভেলায় চড়িয়ে ভাসিয়ে আনা কাঠের স্তূপ ভাটার সময় জমা কাদায় আধডোবা হয়ে এদিক-ওদিক ঠ্যাং ছড়িয়ে ছত্রাকারে পড়ি ঘেষে পড়ে রয়েছে। হাতি দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে গুদামে সেসব কাটবে কুটবে, তার অপেক্ষায়।

যাত্রারম্ভ শুরু কলকাতা থেকে। পৌঁছুতে লেগেছিল প্রায় চল্লিশ ঘণ্টা। আমার জীবনে এ এক নতুন ঘটনা। এর আগে ছুটিছাটাতে ক্বচিৎ কদাচিৎ ফেরীস্টিমারে বোম্বাই বন্দর পেরিয়ে কিহিমে গিয়েছি। আমার সমুদ্রাভিযানের অভিজ্ঞতার ভাঁড়ে এতদিন এই ছিল আমার ব্যাঙের আধুলি। এবারের যাওয়ায় ছিল নতুনের চমক। থাকা, খাওয়া আর ঘুমোনো—সবটাই জাহাজে। সফর করতে হয়েছে আমাকে 'ইউরোপিয়ান ডেকে'। কাজেই জাহাজে থাকার ব্যাপারটা আমার পক্ষে খুব একটা

স্মরণীয় বা সুখকর হয়ে উঠতে পারেনি। আখতার, বুবু আর সালাহ্ ভাই—দুজনেই সিকাই মাউং তাউলের জেটিতে আমাকে নিতে এসেছিল। ওরা ছিল একটা ভাড়া করা বাংলোতে। মাত্র কিছুদিন আগে বাড়িতে আগুন লেগে ওদের সর্বস্ব পুড়ে যায়। আমি যখন যাই, তখন ওরা ব্রুকলিন স্ট্রিটের এক মার্কামারা ফিরিঙ্গিপাড়ায় ছোট্ট গরকায়েম ফ্ল্যাটে তখনকার মতো কোনোরকমে ঠেলাগোঁজা করে থাকে। ওদের দুই যমজ ছেলের একজন নাদির তার মা-বাবার কাছে থাকত। নাদিরের তখন বয়স পুরো একবছরও হয়নি। যমজের আরেকজন আহ্সান। সে মানুষ হচ্ছিল বরোদায় তার দাদা-দাদী আব্বাস আর আমিনা তৈয়বজীর কাছে। আরও একটু ভদ্র গোছের পাড়ায় আরও বড়োসড়ো জায়গায় বাসা বদল করার পরেই আহ্সান তার মা-বাবার কাছে চলে আসে। তখন ওর বয়স দুই কি তিন।

নিম্ন ব্রহ্মদেশে একটা খাঁড়ির গায়ে ছোট্ট শহর তাভোই। ১৯১৪ থেকে ১৯২০ আমি ছিলাম এই শহরের বাসিন্দা। এর মধ্যে মাস পনেরো (১৯১৭-র অক্টোবর থেকে ১৯১৯-এর ফেব্রুয়ারি) বোম্বাইতে থেকেছি। আমার জীবন আর কর্মক্ষেত্রে এটা ছিল যেমন ঘটনাবহুল, তেমনি সবচেয়ে স্মরণীয় পর্ব। বর্মায় গোড়ার কিছুদিন থেকে নিজেকে ধাতস্থ ক'রে নিয়ে—এখন যার হালফ্যাশনের নাম হয়েছে 'ওরিয়েন্টেশন'—রেঙ্গুন থেকে বি. আই. এসেন কোম্পানির মান্ধাতার আমলের প্যাডেলের স্টিমারে আমি তাভোই রওনা হই। সাপ্তাহিক গেনাং যাতায়াতে তখন বোধহয় এটাই ছিল এ জাতীয় জলযানের শেষ জীব। তাভোই নদীর মুখে এসে পৌঁছুতে লেগেছিল প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা। তারপর সেখান থেকে কিছুটা ছোট হলেও আরও আধুনিক ধরনের অল্পজলে গুণটানা একটি স্টিমারলঞ্চে দু ঘণ্টা ধ'রে উজানে যেতে হল। লঞ্চের নাম ছিল 'ইয়েৎযুয়াৎ'। জোয়ারভাঁটা খেলা ঘোলা জলের খাঁড়ির ডেকের ওপরকার জায়গা—প্রধানত উপকূল বরাবর যাতায়াত করা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্টিম নেভিগেশন কোম্পানির স্টিমারগুলোতে 'সাদা-চামড়ার গরিবগুর্বো', 'ইউরেশিয়ান' এবং বিলিতি কেতার লোকদের জন্যে এটা সংরক্ষিত থাকত। এ জায়গার ভাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর চেয়ে সস্তা আর সাধারণ ডেকের চেয়ে সামান্য বেশি ছিল। এঁকেবেঁকে প্যাঁচালো পথ দিয়ে যেতে হচ্ছিল। দুপাশে কোথাও গরাণ, কোথাও তাল আর পেছনে দূরস্থিত তাভয়া ছিল ধানের ক্ষেত। ১৮৭০-এর কাছাকাছি কোনো সময়ে ইংরেজরা তেনাসেরিম দখল করার পরেও কিছুকাল আন্দামানের মতো এটা ছিল দণ্ডিত অপরাধীদের নির্বাসন দেবার জায়গা। তারা কেউ বর্মী, কেউ চীনে, কেউ ভারতীয়। হরেক জাতের মানুষ। খালাস পাবার পর অনেকেই বর্মী মেয়ে বিয়ে ক'রে সেখানেই ঘরসংসার পেতেছে। স্বভাব পরিবর্তন ক'রে তারা হয়ে গেছে সেদেশের মর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক। এর বাইরে অনেকেই আবার কিছুই না বদলে পুরনো ইতিহাসেরই জের টেনে চলেছে। এইসব মনুষ্যত্বের লোকগুলোকে নিয়ে তৈরি সেখানকার জনপদ।

খনির যখন বেজায় রমরমা চলেছে, তখন এইরকম সব ফেরেরবাজ, শয়তান, জুয়াচোররাই গন্ধে গন্ধে মাছির মতো সেখানে এসে ভিড় করেছে।

বর্মায় গিয়ে প্রথম ক'মাস জবির ভাইয়ের সাগরেদি করে লোহালক্কড়ের দোকানদারি, আপিসের রুটিন কাজ, টাইপ করা, সেইসঙ্গে এই ব্যবসার কায়দা কৌশল সব শিখে নিতে হল। এই ছিল আমার কাজ। জে. এ. আলি ব্রাদার্স অ্যাণ্ড কোং নতুন এই প্রতিষ্ঠানের বড়ো অংশীদার ছিল জবিরভাই। নিজেও যেমন সে আদাজল খেয়ে কাজ করত, অন্যদের কাছ থেকেও কড়ায় গণ্ডায় কাজ উসুল করে নিত। সপ্তাহের শেষে দম ফেলবার একটু সময় পেতাম। তখন গাঁয়ের দিকে চলে গিয়ে বেরিয়ে প'ড়ে এদিকে সেদিকে ঘুরে বেড়াতাম। জবিরের ছিল একটা ভারি সুন্দর সাদা টাট্টু ঘোড়া। শনিবার বিকেলের দিকে দোকান বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি টাট্টু ঘোড়ায় চেপে মাইল তিনচার দূরে চা-বাগিচা আর ফলের বাগানে চলে যেতাম। জবিরের বন্ধুদের সব বাগান। সেখানে পাখি দেখে বেড়িয়ে যেমন আয়েশে কাটিয়েছি, তেমনি সময়টাকে কাজেও লাগিয়েছি। তখন আমার বাইনাকুলার ছিল না বটে, কিন্তু ছিল কমবয়সের প্রখর দৃষ্টিশক্তি। পাখি দেখাটাও ছিল শখের ব্যাপার। সুতরাং বাইনাকুলার না থাকাটা তেমন গুরুতর বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তখনও আমি নেহাত অকালকুষ্মাণ্ড। ভারতের পাখিদের সম্বন্ধে যাও বা কিছু জানতাম, সে তুলনায় বর্মার মামুলি পাখিগুলো চেনার ব্যাপারেও ছিলাম ঘোর অজ্ঞ। কোন্‌টা ঠিক কী পাখি জানতে পারছি না। আশপাশের লোকদের জিজ্ঞেস করলে বলে, জানি না তো। আমার ভাঁড়ারে একটি মাত্র রেফারেন্স বই—মারে-র 'বার্ড্‌স্ অব ইণ্ডিয়া'। বইটা আদৌ কাজের নয়। অপদার্থ আরও এই কারণে যে, তাতে যথাযথভাবে কোনো ছবি দেওয়া নেই। ঠেকায় পড়ে শেখার মধ্যে একটা মজা আছে। গোড়ায় গোড়ায় নাজেহাল হওয়াটা অনিবার্য হলেও, শেষপর্যন্ত তা সুখের হয়। টিঁকেও থাকে ঢের বেশিদিন। সংখ্যায় আর রকমারিত্বে তাভোই জেলার জঙ্গলগুলো ছিল যেন প্রাণী রাজ্যের এক আজব সোনার খনি। বিশেষ ক'রে, পাখির ক্ষেত্রে। তার অনেকটাই অবশ্য আমার কাছে ছিল সম্পূর্ণ অজানা। আমি নিজের মতো ক'রে একটা ছোট তথ্যপঞ্জি তৈরির কাজে লেগে গেলাম। কাঠঠোকরা যে কত তা গুনে শেষ করা যায় না। এই জাতের পাখি আমার প্রথম চোখে পড়ে কালো আর হর্তুকি রঙের ব্লাক-অ্যাণ্ড-বাফ (মেইগ্লিপ্টেস জুগুলারিস)। আমাদের হরতনছাপের (হেমিসির্কাস ক্যানেন্টে) পাখির সঙ্গে তার মিল আছেও বটে, আবার অনেকটা নেইও বটে। বহুবর্ণ বুনো হাঁসও জোরালো রকমের অভিনব ঠেকেছে। কিন্তু আমার কাছে খুব চমকপ্রদ বোধ হয়েছিল, যখন সেখানে প্রথম নীলকণ্ঠ জাতীয় সাদা-ডানার কালো পাখি (প্ল্যাটিস-মুরাস লিউকপ্টেরাস) দেখি। ও রকম পাখি ভারতে কখনই আমার নজরে পড়েনি। এটা খুব আশ্চর্যের যে, তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর একটা ব্যাপারও একেক সময় মনের মধ্যে গেঁথে যায়। যেমন আজ ষাট বছর পরেও, সেই

পাখিটা ঠিক কোথায়, কোন্ গাছের কোন্ ডালে, কিভাবে ব'সে ছিল—সব খুঁটিনাটি সমেত আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল ক'রে ভেসে ওঠে।

যেন মেঘ না চাইতেই জল, এইভাবেই আমি একজনের দেখা পেয়ে যাই। তিনি হলেন জে. সি. হপউড। ইম্পিরিয়াল ফরেস্ট সার্ভিসের লোক হিসেবে তিনি তখন সেখানকার ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার। ভারি পরোপকারী মানুষ। যখনই চেয়েছি, তিনি আমাকে বুদ্ধি দিয়ে সাহায্য করেছেন। বর্মাদেশের পাখির বিষয়ে তাঁর ছিল অগাধ জ্ঞান। স্টুয়ার্ট বেকার তখন 'ফনা অব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া—বার্ডস্' বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ বার করার তোড়জোড় করছিলেন। হপউড তখন তাঁর হয়ে ঐ অঞ্চলের পাখপাখালি, পাখির বাসা আর ডিমের নমুনা সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছিলেন। বিহারে থাকতেন চার্লস্ এম, ইংলিস্। সেখানে ছিল তাঁর চা-বাগান আর নীলকুঠি। ভারতীয় পাখির বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের, বিষয়ে প্রকৃত পণ্ডিত। তাঁর সঙ্গে মাঝে মধ্যেই পত্রালাপ হত। আমাদের দুজনের মধ্যে প্রায়ই নোট বিনিময়, নমুনার আদানপ্রদান হত। তাভোইতে আমার সংগৃহীত কিছু নমুনা সম্ভবত এখনও ইংলিসের সঙ্কলনের মধ্যে রয়ে গেছে। ১৯৫৪ সালে তিনি মারা গেলে তাঁর সংগ্রহগুলো এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণিবিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে থাকার সময় ড. ডিলন রিপ্লে সেখানকার প্রাণিতত্ত্ববিষয়ক মিউজিয়ামের জন্যে ইংলিসের সংগ্রহের অধিকাংশটাই কিনে নিয়েছিলেন। বর্মায় আমার থাকার প্রথম মেয়াদ ১৯১৪ থেকে ১৯১৯-র মধ্যবর্তী সময়। যথাবিধি প্রাণিবিজ্ঞান পড়ার পাট চুকিয়ে আবার সেখানে ফিরে গিয়েছি ১৯১৯ সালে। চলে যাওয়া আর ফিরে আসার মাঝের পর্যায়ে পাখিসংক্রান্ত কাজ করেছি অবরে সবরে। যখন শখ হয়েছে করেছি।

লোহালক্কড় আর যন্ত্রপাতির খুচরো বিক্রি আর খাদ থেকে টিন আর উল্‌ফ্রাম তোলা, এছাড়াও জে. এ. আলি ব্রাদার্সের ছিল আরও নানা ব্যবসা। দিন-আনি-দিন-খাই উৎপাদকদের কাছ থেকে ছোট ছোট ভাগ ক'রে বিক্রি খনিজ আর ধোঁয়া দিয়ে শুকোনো কাঁচা রবারের পাত—এইসব কিনে রেখে পরে দাঁওমতো বড় কারবারিদের কাছে বেচা হত। তখন লড়াইয়ের বাজার। কেবলি দরের উঠতি-পড়তি হত। ফলে, মজুত ক'রে রাখাটা অনেক সময় ফাটকা খেলায় দাঁড়িয়ে যেত।

১৯১৫-র নভেম্বরে মাস দুই-তিন তাভোইয়ের পুরো ব্যবসাটা সামলাবার ভার আমার ঘাড়ে এসে পড়েছিল। জবির ঐ সময় ভারতে চলে গিয়েছিল বিয়ে করতে। বউ নিয়ে যাতে গুছিয়ে সংসার পেতে বসতে পারে, তার জন্যে জবির বোম্বাই যাওয়ার আগেই আমরা বাজার রোডে দোকানের পেছনের নোংরা বাসা পাল্টে উঠে এসেছিলাম শহরপ্রান্তের একটা একতলা বাড়িতে। পাড়াটাও ছিল ভালো লাগার মতন। দেয়াল কাঠের। ছাদে কাঠের টালি। উঠোনের বালাই নেই। সটান রাস্তা থেকে বাড়িতে ঢোকার ব্যবস্থা। তবু সেই ছাতা-পড়া 'আস্তাবল' ছেড়ে এসে আমরা

যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। সাফিয়া ভাবী (পিতৃকূলের পদবি : বড়ো বদরুদ্দিন তৈয়বজীর অনুসারী) এসে যেতে তাঁর রমণীসুলভ হাতের ছোঁয়ায় সাজানো-গোছানো ভারি আরামে থাকার একটি আশ্রয়। এরপর ১৯২১ সালে জবির সস্ত্রীক তাভোই ছেড়ে পাকাপাকিভাবে থাকতে রেঙুন চলে যায়। আমাদের হবু অর্থসংস্থানকারী ওসমান মুস্তিখান অ্যাণ্ড কোম্পানির অংশিদারিত্বে সেখানে লোহালক্কড়ের ব্যবসার একটা শাখা খোলার ব্যবস্থা করতে। সুপ্রতিষ্ঠিত এই কারবার পত্তন করেছিল বালুচ ঠিকাদাররা। (খনিশিল্পে সে সময় মন্দা দেখা দিয়েছিল। তাভোইয়ের লোহালক্কড়ের ব্যবসাতেও ভাঁটা পড়তে শুরু করে। সেটা মাথায় রাখলে বলতেই হয়, জবির ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিল।) জবির রেঙুন চলে গেলে আমি আর আমার স্ত্রী ওদের ঐ বাড়িটাতে মহাসুখে বাস করতে লাগলাম।

কিছুদিনের মধ্যেই নতুন বউকে নিয়ে তাভোইতে জবির ফিরে এসে ব্যবসার কাজে আবার সস্ত্রীক ব্রিটেনে পাড়ি দেয়। তার সঙ্গী হয় আনখা পার্টনারদের একজন, ইউসুফ খান। রেঙুন শাখার জন্যে বিলেত আমেরিকায় ব্যবসায়িক যোগসূত্র স্থাপন করাই ছিল ওদের উদ্দেশ্য। মুস্তিখানদের তিন ভাইয়ের মধ্যে ইউসুফই ছিল সবচেয়ে মিষ্টি স্বভাবের। পেটে যেমন বিদ্যে ছিল, তেমনি যুক্তি দেখালে বুঝত। কথা ছিল, রেঙুনের ব্যবসায় ইউসুফ সরাসরি আমাদের সঙ্গে থাকবে। কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, লণ্ডনে পৌঁছনোর দিন কয়েকের মধ্যেই প্রচণ্ডরকমের এক হার্ট অ্যাটাকে ইউসুফ মারা গেল। ফলে, সব প্ল্যান ভেস্তে যাওয়ায় কিছু না করেই জবিরকে ফিরে আসতে হল। অংশীদারিরত্বর গোটা ব্যাপারটাই আদতে কথা চালাচালির স্তরেই আট্‌কে ছিল। কাজে কিছুই এগোয়নি। এই অবস্থায় ইউসুফ চলে যাওয়ায় মুস্তিখান-ভাইদের মন এমন ভেঙে গেল যে, লোহালক্কড়ের পার্টনারশিপ ব্যবসায় তাদের আর কোনো আগ্রহই রইল না। ইউসুফের ভাইদের অসহযোগিতা দেখে এবং ওদের সঙ্গে এঁটে ওঠা শক্ত হচ্ছিল ব'লে বছরখানেক ধরে চেষ্টাচরিত্র ক'রে ব্যর্থ হয়ে শেষে হাল ছেড়ে দিতে হল। ১৯২০ সালে দেশে ফিরে এবার জবির হাতে করে নিল তার চাষবাসের স্বপ্নের হারানো খেই। অদম্য আশায় বুক বেঁধে, দাঁত দিয়ে মাটি কামড়ে পড়ে থেকে আর নিজেকে চাব্‌কে সোজা ক'রে—বলিহারি দিই জবিরকে—শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে তার স্বপ্ন সফল করেছে।

জবির আর সাফিয়া যে সময়ে রেঙুনে গিয়ে পাকাপাকিভাবে বাসা বেঁধেছিল,তার বছর দুই পর আমার স্ত্রী আর আমি শহরতলির দিকে আরও আরামদায়ক একটা মনোরম কটেজে উঠে গিয়েছিলাম। বিলক্ষণ 'কেতাদুরস্ত' এই পাড়াটাকে বলা হত সিভিল লাইন্স্। বাড়ির সঙ্গে একটা বেশ বড়ো কম্পাউণ্ড। আর ঘন পাতায় ছাওয়া কয়েকটা কাজুবাদামের গাছ। কটেজটা সুন্দর আর তার ছিরিছাঁদ ভালো হলে কী হয়—ঠিক পাকা দালানকোঠা নয়। ঘর যাতে স্যাঁতসেঁতে না হয়, তার জন্যে নিচে

খুঁটি পুঁতে মাটি থেকে ওপরে ওঠানো। অ্যাজবেস্টাস সিটের দেয়াল। কাঠের টালির ছাদ। ঘরের পাশে অতটা জমি থাকার পূর্ণ সুযোগ নিয়েছিল তহমিনা। উঠোনে সব্জি চাষ আর বাড়ির মুর্গি মুর্গি পালন। এতেই মিটে যেত রান্নাঘরের চাহিদা। আর আমরা বাড়িতে তারপর থেকে টাটকা গাছ থেকে তোলা সবুজ কচি কড়াইশুঁটির সঙ্গে টাটকা মাংসের ডাক রোস্ট মহানন্দে খেতে শুরু করে দিলাম। সেইসঙ্গে বন থেকে রুপোলি কাঠময়ুরের ডিম এনে ফুটিয়ে বাচ্চা করা হয়েছিল। একটি চিতা-বেড়াল (ফেলিস বেঙ্গলেন্সিস), একটি গেছো ছুঁচো (টুগাইয়া গ্লিস), বানরসদৃশ নিশাচর একটি উড়ুকু লেমুর (গ্যালিওপিথেকাস ভোলান্স), আর একটি রংচঙা রাজ-ধনেশ। তাছাড়া, লেডি-ডগ 'জিগ' আর সারাক্ষণ বকবকম করা পায়রা 'জেনারেল ডায়ার' সাহেব তো ছিলেনই। সতীর্থ পোষ্যদের সঙ্গে ওর যেরকম ব্যবহার ছিল, সেটা লক্ষ্য করেই জালিয়ানওয়ালাবাগের ঐ 'বীরপুরুষ'টিকে মনে পড়ে যেত। তাই ওর এই নামকরণ করা হয়েছিল। বড় জায়গা পেয়ে আমরা হাতপা ছড়িয়ে থাকতে পারছিলাম। হামিদভাই (ফার্লো পেয়ে) আর শরিফা ভাবী ছুটির একটা সপ্তাহ আমাদের কটেজে বেশ মনের আনন্দে কাটিয়ে গেল। তহমিনা ওদের সঙ্গে রেঙ্গুন গেল, সেখান থেকে বরাবরের মতো বোম্বাইতে ফিরে যাবে ব'লে। কেননা কাঠের কারবার মার খেয়ে যাওয়ায় আমরা ঠিকই করেছিলাম তাভোইয়ের ব্যবসা গুটিয়ে ফেলব। বি আই এসেন কোম্পানির একটা প্রচলিত রেওয়াজ ছিল, ওদের মেলবোটে ওদের প্রথম শ্রেণীর যাত্রী হয়ে যারা কলকাতায় যাচ্ছে, তাদের নামগুলো রেঙ্গুনের দৈনিক পত্রে ঘোষণা করা। একদিন সকালে কাগজে নামের তালিকাটি দেখে আমার খুব মজা লেগেছিল। যাত্রীদের সেই ছাপানো নামের তালিকায় লেখা 'মিস্টার হামিদ আলি আর মি. আলির তিন মিসেস।' আলিসাহেব যে সত্যিকারের একজন মুসলমান, এরপর আর তাতে কারো কোনো সন্দেহ থাকবে না। শরিফা আর তহমিনার সঙ্গে জবিরের বউ সাফিয়াও একই গোয়ালের গরু হয়ে একযাত্রায় মিশে গেছে।

তাভোই এশিয়ান ক্লাবের বাড়িটা বন্ধক করা ছিল। আমি টাকা দিয়ে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিই। ফলে, তার মালিকানা অযাচিতভাবে আমার ঘাড়ে এসে পড়ে। আমাদের ব্যবসা গোটানোর কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত থাকতে হবে ব'লে ক্লাবের বাড়িতে আমি উঠে এলাম। বছর কয়েক আগে আমাদের কয়েকজনের উদ্যোগে তাভোই অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশন গড়ে উঠেছিল। তাভোই ছেড়ে একেবারে চলে না আসা পর্যন্ত আমি কিছুকাল ছিলাম তার সেক্রেটারি। আসলে এটা ছিল সব দেশের লোক নিয়ে তৈরি একটি ফুটবল ক্লাব। যেসব উৎসাহী খেলোয়াড়দের এনে খেলার টিমে আমি ভর্তি করেছিলাম, তার মধ্যে একজন ইংরেজ ছিলেন। তাঁর নাম এফ. ডব্লু. স্কট। স্কট ছিলেন আই-সি-এস। একেবারে অন্য ধরনের খানিকটা পাগলাটে খুব বন্ধুবৎসল মানুষ। উনি সে সময়ে তেনাসেরিম ডিভিশনের সেশন জজ। ক্লাবের

খেলার মাঠে যখন তখন রাস্তার লোক ঢুকে পড়ত। তাদের অধিকাংশ ছিল গোয়ালা। রাস্তা সংক্ষেপ করতে তারা মাঠের ঘাস মাড়িয়ে যেত। খেলার মাঠের কট্টর সুনিযুক্ত গার্জেন হিসেবে তিনি প্রচণ্ডভাবে তেড়ে যেতেন আর বাগে পেলেই তাদের মারধর করতেন। একবার এজলাসে বসবার ঠিক আগে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। আমি তখন বাইরের ঘরে বসে আছি। স্কট ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা, দশ সের দুধের কত দাম? আমি জানতাম ওঁর মাথায় ছিট আছে। এ সত্ত্বেও, কেন কী ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। শুনেটুনে যেটুকু ধরতে পারলাম তা এই খেলার মাঠের পাশ দিয়ে গাড়ি চড়ে কাছারিতে যাওয়ার পথে হঠাৎ উনি দেখতে পান দুধের ভাঁড় নিয়ে একজন গোয়ালা মাঠের ভেতর দিয়ে শর্টকাট করছে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামিয়ে, লাফিয়ে নেমে লোকটার পেছনে ছুটতে থাকেন। ভয়ে দুধের ভাঁড় ফেলে দিয়ে লোকটা ছুটে পালায়। স্কট তখন তার পুরো দুধ মাটিতে ঢেলে ফেলে দেন। এখন তিনি চান লোকটার ক্ষতিপূরণ করতে। আরেকবার দেখেছিলাম ওঁর চরিত্রের আরেকটা দিক। আদালতের কাজ শেষ ক'রে বাড়ি ফেরার পথে সাঁ ক'রে আমার ঘরে ঢুকে গা এলিয়ে দিয়ে ধপ ক'রে ইজিচেয়ারটাতে বসে পড়লেন। মুখ ফ্যাকাসে, ছানাবড়া চোখ, যারপরনাই একটা করুণ মুষড়ে পড়া অবস্থা। ওঁর মনে যেন কিসের একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। তার তাড়সে উনি যেন কাঁপছিলেন। পরে তিনি যা খোলসা করে বললেন তা এই যে এইমাত্র এক খুনের মামলায় এক ডাকাতকে ফাঁসিতে ঝোলানোর রায় দিয়ে এসেছেন। পুলিশ নিয়ে যাবার আগে ওর শেষ ইচ্ছা কী, তা জানতে রায় শোনার পরেও লোকটার এতটুকু কোনো ভাববিকার চোখে পড়ল না। খুব নির্বিকারভাবে ঠাণ্ডা মাথায় একটা ডুরিয়ান ফল খাওয়ার শেষ ইচ্ছের কথা জানায়। যে সাজা দিয়েছে, আর যে সাজা পেয়েছে, এই দুইয়ের বিপরীত প্রতিক্রিয়া পাশাপাশি রাখলেই মনুষ্যচরিত্রের স্বরূপ বিলক্ষণ বুঝে নেওয়া যায়।

□

৪

দৃশ্যান্তরে বোম্বাই আর বিবাহ পর্ব

মাত্র আঠারো বছর বয়সে আমি ব্যবসায় নিজেকে ঠেলে দিই। প্রথাগত বিদ্যে নেই। সে কাজে না ছিল কোনো তালিম, না ছিল স্বাভাবিক টান। বছর দুয়েক যেতেই এ নিয়ে আমার মন খুঁতখুঁত করতে থাকে। ১৯১৭-র শেষদিকে আমার বাড়ি যাওয়ার ছুটি পাওনা ছিল। ওপরওয়ালার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ঠিক হল, ছুটির মেয়াদ বাড়িয়ে নিয়ে আমি বোম্বাইয়ের দভোর্স কলেজ অব কমার্সে বাণিজ্যিক আইন আর হিসাবশাস্ত্র বিষয়ে বছরের যথাবিধি একটি কোর্স শেষ করে আসব। এই সিদ্ধান্তটি আমার পক্ষে শাপে বর হয়ে দাঁড়াল। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের জীববিদ্যা অধিকর্তা তখন রেভারেণ্ড ফাদার ব্ল্যাটার। কোন্ বিষয়ে আমার আসল ঝোঁক, সেটা উনি চট করে ধরতে পেরেছিলেন। ওঁর ক্রমাগত তাড়নায় আর উৎসাহেই প্রাণিতত্ত্ব নিয়ে সেই বছরেই আমি বি এস্ সি (তখন বলত বি-এ অনার্স) শেষ করি। অধ্যাপক জাল পি. মুল্যানের পড়ানোর গুণেই এটা করতে পেরেছিলাম। তিনি যেমন অসাধারণ মানুষ, তেমনি শিক্ষক হিসেবেও ছিলেন অপূর্ব। ১৯৫০ সালে ওঁর মৃত্যু হয়। ততদিনে উনি আমার এক উঁচুদরের বন্ধু হয়ে গেছেন।

সেন্ট জেভিয়ার্সে যে চটি পাঠ্য বই দিয়ে প্রাণিতত্ত্বের প্রথম পাঠ শুরু করি, তার নাম 'অ্যানিম্যাল টাইপ্‌স্ ফর কলেজ স্টুডেন্টস্'। সে বই টেনে মুখস্থ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কানে তালা ধরানো কামানের গর্জনকারী চল্লিশা দিয়ে এর শুরু। জীববিদ্যায় যাদের আমার চেয়েও টান বেশি, তারা ছাড়া অন্য যেকোনো ছাত্র তাতে না ভড়কে পারবে না। খোদ গ্রন্থকার সশরীরে উপস্থিত থেকে এ বিষয়ে আমাদের দীক্ষা দিয়েছিলেন। তাই রক্ষে। প্রথম অধ্যায় 'অ্যামিবা'র প্রথম বাক্যটি শুরু হয়েছিল (আজও তা মনে গেঁথে আছে) এই ব'লে 'অ্যামিবা বা 'বহুরূপী অণুকায় প্রাণি' হল সরলতম অঙ্গসংস্থানসম্পন্ন এককোষী প্রাথমিক বর্গের এমন এক প্রাণি, যা একমাত্র অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দর্শনযোগ্য, এতৎসহ সমবর্গের মুখগহ্বরহীন জড়ুল আকারের প্রাণি।' কানের ভিতর দিয়া মরমে পশার মতো কিসব তত্ত্বকথা। অধ্যাপক মুল্যান ছিলেন, তাই এই বিভীষিকার হাত থেকে উদ্ধার ক'রে, জীববিদ্যায় আমার আগ্রহ শুধু টিকিয়েই

রাখেননি, বরং স্থায়ীভাবে তার আঁচ খুঁচিয়ে গনগনে করে তুলেছিলেন। মুল্যান মানুষটা ছিলেন চুপচাপ শান্তশিষ্ট। ওঁর ছিল মানুষ চেনার অসাধারণ ধারালো চোখ। মুখে মিচ্‌কি হাসি। তেমনি নিখুঁত কাণ্ডজ্ঞান। সেইসঙ্গে কারো প্রসঙ্গেই হোক কোনো বিষয়েই হোক—ওর বাক্যবাণ খুব মর্মভেদী হত।

দাভার্সে আমার হাজিরা দেবার সময় ছিল রোজ সকাল আটটা থেকে দশটা। হাতে থাকত টায়-টায় সময়। এরপর প্রাণিবিদ্যার ক্লাস শুরু হওয়ার আগেই এল্‌ফিনস্টোন সার্কেলের এক চিলতে বর্ষাতি থেকে স্ট্যানলি প্রেটারকে ডেকে আমার ছোটধাঁচের ডগলাস-এর পেছনে বসিয়ে আমাকে হুড়মুড়িয়ে ছুটে যেতে হত সেণ্ট জেভিয়ার্সে। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান প্রেটার বছর দশেক আগে যখন ইস্কুল ছেড়ে বি এন্ এইচেসেতে 'বোতলধোয়ার' চাকরি নেয়, তখনও ওর গোঁফের রেখা দেখা দেয়নি। এরপর যখন এন. বি. কিনেয়ার প্রথম মাসমাইনের কিউরেটর হন, তাঁর আমলে মিউজিয়াম সহকারী হিসেবে শিক্ষানবিশির সময় ওর ভেতরে যে বড়োরকমের সম্ভাবনা আছে, সেটা বোঝা যায়। তাভোইতে থাকতে প্রকৃতিবিজ্ঞান, প্রধানত পাখিসংক্রান্ত বিষয়ে প্রেটারের সঙ্গে নিয়মিত পত্রালাপ করতাম। দুজনেরই আগ্রহ আছে, এমন আরও নানা বিষয়ে কালক্রমে তার পরিসর বেড়ে যায়। আমাদের দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব আর সদ্ভাব গড়ে ওঠে। পরে বহু বছরের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভেতর দিয়ে গিয়ে যেন নিয়তির বিধানেই সোসাইটিতে আমরা হয়ে গেলাম পরস্পরের সহকর্মী। কিন্তু যখন ওর তরফ থেকে ওকে কর্মীদলে বৈজ্ঞানিক সদস্য করে নেওয়ার দাবি এল, সোসাইটির কর্মসমিতি থেকে বলা হল, ও যদি ফাদার ব্ল্যাটারের অধীনে জীববিদ্যায় আনুষ্ঠানিক পাঠক্রম শেষ করে, তাহলেই সেটা সম্ভব হবে।

বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে প্রেটারের এই বহুমুখিতা সম্পর্কে আমার ছিল গভীর অনুরাগ আর শ্রদ্ধা। বিজ্ঞানে মৌলিক কিছু দিতে পেরেছে, এমন দাবি করতে পারে না। ছিল বইয়ের পোকা। সব গোগ্রাসে গিলত। প্রকৃতিবিজ্ঞানে কোথায় কী ঘটছে, তার হালফিল খবর থাকত ওর নখাগ্রে। সবকিছু মনে করে রাখার ছিল অসাধারণ ক্ষমতা। কঠিন টেকনিকাল বিষয় হজম করাটা ছিল ওর কাছে জলভাত। পণ্ডিতি পেশাগত জবরজঙ্গভাব কেটেছেঁটে সহজবোধ্য ভাষায় সাধারণ মানুষকে সে বুঝিয়ে দিতে পারত। প্রাণিবিজ্ঞানের তত্ত্ব সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার মধ্যে আনা—আসলে এটাই ছিল প্রেটারের প্রধান গুণ। এ কাজে সে যে কতটা সিদ্ধহস্ত ছিল, ওর বেশির ভাগ লেখাতেই তার পরিচয় মেলে। ওর লেখার ধরনে প্রসাদগুণের সঙ্গে থাকত রসকষ। সেণ্ট জেভিয়ার্সে জুলজির প্র্যাক্টিক্যালে দুজন দুজন ক'রে জুড়ি বেঁধে কাজ করতে হত। আমার বেশ মনে আছে, যেদিন প্রেটারকে আমি দোসর হিসেবে পেতাম, আমি যেন বেঁচে যেতাম। বিশেষ ক'রে, আরশোলার শব ব্যবচ্ছেদের মতন অরুচিকর দিনগুলোতে।

স্বাধীনতার পর অকারণে আতঙ্কগ্রস্ত তার বউ আর ধন্দে-পড়া অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বন্ধুবর্গ—এই দুইয়ের পাল্লায় পড়ে প্রেটার পড়ি-মরি ক'রে দঙ্গলে মিশে দেশ ছেড়েছিল। আমার যে কী দুঃখ হয়েছিল বলার নয়। আমার মনে হয়, প্রেটারও বুঝেছিল চলে যাওয়াটা তার ঠিক হয়নি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইংলণ্ডকে কখনই সে নিজের ভিটে ব'লে মেনে নিতে পারেনি। জন্মাবধি জীবনের বেশির ভাগটাই তার কেটেছে ভারতে। মাঝে মাঝে বেফাঁস মুহূর্তে চেনা মানুষজন আর পরিচিত পরিবেশে ওর ফিরে যাওয়ার আকুতি ধরা পড়ে যেত। ফেরার রাস্তা যে ও রাখেনি, সেটা বুঝেই, নিজের অভিমানে লাগার ভয়ে এমন ভান করত যেন পরবাসে ও বেশ সুখেই আছে। ওর মৃত্যুর বছর কয়েক আগে লণ্ডনের বাড়িতে গিয়ে দেখা ক'রে ওর বর্ণনাতীত দুর্গতি দেখে আমার খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ওর শরীরের একটা দিক পক্ষাঘাতে পঙ্গু। বিছানাতেই শুয়ে থাকে; নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। বিছানার একপাশে রেডিও। ওটাই ওঁর একঘেয়েমি কাটানোর একমাত্র উপায়। ওঁর বউমেয়ে কেউ বাড়ি নেই। বাইরে চাকরি ক'রে সেই টাকায় সংসার চলে। ঘরে এমন কেউ নেই, যাকে ডাকলে একটু জল গড়িয়ে দেবে বা যার সঙ্গে দিনভর দুটো কথা বলতে পারবে। না চাকরবাকর, না দ্বিতীয় কোনো লোক। থাকবার মধ্যে আছেন ওপরতলার ভাড়াটে নরম মনের এক বৃদ্ধা। মাঝেমধ্যে উঁকি দিয়ে তিনি দেখে যান সব ঠিক আছে কিনা। যে ছিল ছটফটে স্বভাবের মানুষ আর সর্ব বিষয়ে সজাগ স্বদেশের তেমনি পরিবেশে যে থাকতে অভ্যস্ত, যেখানে কাজের লোক অষ্টপ্রহর হুজুরে হাজির—এমন লোকের পক্ষে এটা যে কী পোড়াকপালে ব্যাপার, সেটা আমি হাড়ে হাড়ে মালুম করতে পারি।

প্রাণিবিদ্যার ক্লাস হয়ে গেলেই আমরা তড়িঘড়ি ফিরে যেতাম সোসাইটিতে যে যার ঘরে। সে সময় এবং তার পরেও ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত সোসাইটির অফিস থেকে গিয়েছিল মদ-ব্যবসায়ী ফিপসন কোম্পানির বাড়িতে। সপ্তাহে প্রায় রোজ লাইব্রেরিতে ব'সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতাম। কখনও বা সংরক্ষিত পাখির ঘরে রকমারি নমুনা হাঁটকে হাঁটকে ভারতীয় পাখপাখালি দেখে চেনবার চেষ্টা করতাম। তেনাসেরিমে থাকতে যে প্রজাতিগুলো নিয়ে আমি ফাঁপরে পড়েছিলাম, তার কতকাংশের কোনটা কী তা নির্দিষ্টভাবে চিনতে আমাকে সাহায্য করত প্রেটার আর কিনেয়ার।

জুলজির ক্লাসে আমি আলটপকা পেয়ে গিয়েছিলাম আরেক সহপাঠীকে। আবাল্য আমার সারাজীবনের বন্ধু। সে ছিল আমার দূর সম্পর্কের ভাই। আসফ আলি আসগর ফৈজী। 'এ-এ-এ' ব'লে সবাই তাকে চিনত। খুব মেধাবী ছাত্র। সব সময় প্রাইজ তার বাঁধা। কেম্ব্রিজে আইন পরীক্ষায় প্রথমশ্রেণীর অনার্স ডিগ্রি পাওয়ার পর ও যখন জীববিদ্যাকে তালাক দেয়, জানতে পেরে আমি খুব দুঃখ আর হতাশ বোধ করেছিলাম। এক্ষেত্রেও সে ঈর্ষণীয় সব স্কলারশিপ আর কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। তাছাড়াও, আসফ একজন চৌকস খেলোয়াড় ছিল। সাধারণত শটগান আর রাইফেল

যারা ভালো চালাত, কম বয়সে তাদের চেয়ে ও ছিল এককাঠি ওপরে। কেম্ব্রিজে ওর কলেজ সেন্ট জন্স-এর হয়েও টেনিস আর ক্রিকেট খেলেছে। এক সময়ে ছিল কলেজের টেনিস টিমের ক্যাপ্টেন। আন্তর্জাতিক টেনিসে বিখ্যাত 'ফৈজী ব্রাদার্স' আজহার আর আতহার এঁরা ছিলেন আসফের চাচা-জাঠা। নিজেকে সে এঁদের সুযোগ্য শিষ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কেম্ব্রিজে ও ছিল আরবি ভাষার স্কলার। তাতে প্রাইজও কম পায়নি। বাস্তব জীবনে আরবি ভাষার চর্চা পরেও সে বজায় রেখেছিল। আরবি ভাষায় অসাধারণ দখল থাকায় সরাসরি ও মুসলিম, বিশেষ ক'রে, ইসমাইলিদের আইনের একেবারে গোড়ায় পৌঁছুতে পেরেছিল। দোষগুণ সমেত যুক্তি নিষ্ঠভাবে তার ব্যাখ্যা দিতে পেরেছিল। এ বিষয়ে তার বেশ কয়েকটি বই আছে। দেশবিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে সে সব বই পাঠ্য হিসেবে পড়ানো হয়। মুসলিম দেশগুলোতেও লোকে ওর বইয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে। এত উজ্জ্বল বহুমুখী প্রতিভা থেকেও আসফের শেষ জীবনটা পারিবারিক নানা ভাগ্যবিপর্যয়ে ভারি দুঃখে কেটেছে। নিজের মধ্যে নিজেকে একান্তে গুটিয়ে নিয়ে ও কেমন যেন মনুষ্যবিদ্বেষী হয়ে পড়েছিল।

১৯১৭-তে তো বোম্বাইতে ফিরে এলাম। এসে উঠলাম আমার বড়ো বুবু আশরফউন্নিসা—সংক্ষেপে আশরফ আর দুলাভাই শামস্-এর কাছে। আমার ছেলেবেলা যেখানে চড়াই শিকার করেছি, সেই আড়গড়ার ওপরতলায় ওদের খেতওয়াড়ির ফ্ল্যাটে। দুলাভাই ছিলেন একাধারে শিকারি আর সলিসিটার। মামু আমিরুদ্দিন তৈয়বজীর পুরনো আমির-মঞ্জিলের একাংশে জোড়া হয়েছিল এই নতুন বাড়িটা। মামুর যখন এন্তেকাল হয়, তখনও আমি বর্মায়। পরে তাঁর এই স্থাবর সম্পত্তি ভাগবাঁটোয়রা আর বিক্রি করা হয়। ভ্রাতৃবৎসল সব বোনদের মতোই আশরফ আর আমার বোন কামু আমাকে জানতে না দিয়ে তলে তলে আমাকে বিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র আঁটছিল। আত্মীয় মহলেই এক খুবসুরত লেড়কি ওদের এমনই মন কেড়েছিল যে, উৎসাহে ওরা নেচে উঠেছিল। তাভোইতে চিঠির পর চিঠিতে এবং পরে সামনাসামনি ধরতাই হিসেবে, থেকে থেকেই আলগোছে সুক্ষ্মভাবে একথা সেকথায় কোনোরকম সুত্র ছাড়াই প্রসঙ্গটা পেড়েছে। যদিও আমার ধারণা, এটা আমি ওদের ভালোরকমেই বুঝতে দিয়েছিলাম যে, ঠিক ঐ সময়টাতে মেয়েদের বিষয়ে আমার কোনো আগ্রহ নেই। মনে হয়, সিরগাঁওয়ের জেনানা হাইস্কুলের কিণ্ডারগার্টেনে তহমিনার সঙ্গে ১৯০৪ বা ১৯০৫ সালে একসময়ে আমি পড়েছি। ওর বাবা সি. এ. লতিফ মুক্তেশর ব্যবসা করতেন। ব্যবসা আরও বড়ো করার জন্যে পরে উনি সপরিবারে বিলেত চলে যান। ক'বছর পরে ঐ ইস্কুলে ঝরঝরে পুরনো একটা গ্রুপছবি দেখানোর আগে পর্যন্ত বাচ্চা বয়সের মেয়েটিকে আমি আদৌ মনে করতে পারছিলাম না। সারে-র এক বনেদি বোর্ডিং স্কুলে থেকে লণ্ডনে ম্যাট্রিক পাশ করার পর বিশ্ববিদালয়ে ওর পড়ার ব্যাপারে তহমিনার

বাবা মেয়ের উৎসাহে জল ঢেলে দিয়ে একটা ফিনিশিং স্কুলে ভর্তি করে দেন—যেখানে কমবয়সী মেয়েরা কেতাদুরস্ত সমাজের চালচলন আর আদবকায়দাগুলো ঠিকঠাক রপ্ত করে নিতে পারে। ভদ্রোচিত ব্যবহারের যেসব তত্ত্বকথা সেখানে শেখানো হত, তহমিনা প্রায়ই মজা করে তার কিছু কিছু বিবরণ দিত। তার একটা আমার মনে আছে। যেমন বাড়িতে পার্টি ডেকে টি-পটে কম চা-পাতা দিয়ে পাতলা লিকার চামচ দিয়ে নাড়তে নাড়তে 'মাপ করবেন' ব'লে সারাক্ষণ কুণ্ঠারসঙ্গে মুখে একটা মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে তুলতে হবে। ১৯১৫ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়ায় লণ্ডনের হাওয়া গরম হতে থাকায় অচিরে যুদ্ধ শেষ হওয়ার লক্ষণ নেই দেখে লতিফ পরিবার স্বদেশে ফিরে আসে। এসে আস্তানা নেয় চৌপাটিতে আড়েনওয়ালা ম্যানসনের ভাড়া করা চমৎকার একটা ফ্ল্যাটে। রাস্তাটা পেরোলেই হার্ভে রোড। সেখানে ওদের নিজস্ব নতুন বাড়িটা তখনও সম্পূর্ণ হয়নি। সে বাড়ির নাম দেওয়া হয়েছিল 'লতিফিয়া'। আমার বোনেরা, যেন হঠাৎ গিয়ে পড়েছে এইরকমের একটা ভাব দেখিয়ে, আমাদের দুজনের দেখাসাক্ষাতের ব্যবস্থা করে। মতলবটা ওরা আগেই এঁটে রেখেছিল। এরপর ওদেরই ছক অনুসারে ঘটনা গড়িয়ে চলল। গোড়ায় আমি একটু ভয়ে ভয়েই ছিলাম। আমিতো থাকি তাভোইতে। আদিম অবস্থায় পড়ে থাকা এমন এক অনগ্রসর এলাকা, যেখানে বলবার মতো না আছে আমোদপ্রমোদ, না আছে কোনো সামাজিক জীবন। একেবারেই কাঠখোট্টাভাবে আমাকে থাকতে হয়। যে মেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা পরিবেশে বিদেশে বড়ো হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে, নগরজীবনের সব রকম সুখসুবিধে পেতে যে মেয়ে অভ্যস্ত, সে এধরনের ভবিতব্যকে কীভাবে নেবে।

তহমিনা ব্রিটেন থেকে ফিরে আসার পর কামুর সঙ্গে প্রথম দর্শনেই দুজনের গলায় গলায় ভাব হয়ে যায়। আমাদের সম্পর্কিত এক ভাই হাসান এফ. আলির সঙ্গে কামুর বিয়ের পর ওরা জাপানে গিয়ে সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়। ১৯২৯-এর জুলাইতে তহমিনা মারা যাওয়া পর্যন্ত ওদের বন্ধুত্বে কখনও ভাঁটা পড়েনি। আমি বর্মায় থাকতে থাকতেই কামু ময়েন দিয়ে ময়দা মাখার কাজটা আগেভাগেই শুরু করে দিয়েছিল। পরে দেখেছিল যে, আমাদের দেখা হওয়ার আগে থেকেই কামুর সূত্রে ও আমার বিষয়ে বিলক্ষণ ওয়াকিবহাল। ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়ার পর যখন দেখলাম তহমিনার রুচি-অভিরুচি ভালোলাগা-মন্দলাগা প্রায় অবিকল আমারই মতন, তখন যেন আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। শহুরে কৃত্রিমতায়, আলাদা এক পরিবেশে মানুষ হয়েও অন্তরে সে থেকে গেছে গ্রামদেশেরই মেয়ে। ভাগ্যিস, ওর বিলিতি শিক্ষার অন্ত্য পরিচ্ছেদে পালিশ হওয়ার (ফিনিশিং) ইস্কুল ওকে এন্তেকালে (ফিনিশ) পৌঁছে দিতে পারেনি। সামাজিকপার্টি, বিশেষ ক'রে যেখানে অভিজাত মহিলার দল আর শুধু খোশগপ্প—এসব ছেড়ে তহমিনা সব সময় আমারই মতো পালাতে পারলে বাঁচে। বিনা অনুষ্ঠানে অল্পমাত্রায় সেইসব বন্ধুদের সঙ্গেই মেলামেশা করতে ভালবাসত,

যাদের সঙ্গে প্রবৃত্তি আর দৃষ্টিভঙ্গিতে মেলে। ভণ্ডামি, ধাপ্পাবাজি আর ঘটাপটা—এসব ছিল তার দুচক্ষের বিষ। কোনো রকমের কোনো দেখ্‌নাই সে সহ্য করতে পারত না। গ্রামদেশের বনবাদাড় দেখতে, জলেজঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে, উর্দু ইংরিজি দুটো ভাষাতেই ভালো বই আর কবিতা পড়তে সে ভালবাসত। ওর ছিল ফুল আর বাগানের শখ। পরে আমি যখন পক্ষিতত্ত্ব নিয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা করি, ও তখন পাখপাখালির ব্যাপার নিয়ে রীতিমতো মেতে ওঠে। এক কথায়, আমার চাওয়ার সঙ্গে ওর চাওয়ার যথেষ্ট মিল খুঁজে পেয়ে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বেশ একটু ভরসা পেয়েছিলাম। পরের দিকে দেরাদুনে থাকার সময় আমরা ভালো মুশায়রায় যাওয়ার প্রচুর সুযোগ পেয়েছি। আশৈশব বিদেশে থাকায় মুশায়রার সব রস ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে দেখে ওর মন খারাপ লাগছিল। সুতরাং উর্দুতে দুরস্ত হওয়ার জন্যে তহমিনা এবার আদাজল খেয়ে লাগল। একাজে প্যালা দেবার জন্যে এক পেশাদার মুন্‌শিকে বহাল করা হল। সেইসঙ্গে রাখা হল একটি দোভাষী অভিধান। কিছুদিনের মধ্যেই উর্দুভাষা হয়ে উঠল ওর ধ্যানজ্ঞান বিশেষত, উর্দু শায়ের। নিজের বাড়িতে বা তাঁবুতে, যখন যেখানেই থাকুক, প্রতিদিন অবসরের বেশির ভাগ সময়ই ওর প্রিয় ইন্তেখাব (কবিতা সঙ্কলন) নিয়ে বসে পড়ত। পাশে সর্বদা মোতায়েন থাকত উর্দু-ইংরিজি অভিধান।

এটা যেমন আমার, তেমনি তহমিনারও, সৌভাগ্য বলতে হবে যে, ফুর্তির মেজাজ আর অমায়িক স্বভাবের জন্যে আমার ভাইবোনদের এতটা মন সে জয় করে নিয়েছিল। আর এ বাড়ির লোকজনদের স্বচ্ছন্দে আপন করে নিতে পেরেছিল। কামু আর ফরহাত—এই দুজনের সঙ্গে ওর ছিল বিশেষ পেয়ার। ও হাঁফ ছেড়ে বাঁচত ওদের কাছে পেলে। খুশি যেন ধরত না। আমার মেজো বুবু ফরহাত ক্রমে এমন হয়ে পড়ল যে, তহ্‌মিনা বলতে অজ্ঞান। ও ছিল আশরফের চেয়ে দু-বছরের ছোট। যথাক্রমে বাড়ির চতুর্থ সন্তান। আমি ঢোকার ঢের আগেই জেবন্নেসা ইস্কুলে ইংরিজি শিক্ষার প্রাথমিক পাঠ সে চুকিয়ে ফেলেছিল। এরপর মামী হামিদা বেগমের হাতনুড়কুত হয়ে তাঁর সংসারের বোঝা আর খেতওয়াড়ির বৈষয়িক দায়দায়িত্বে মেজোবুবুকে কিছুটা নিজের ঘাড়ে তুলে নিতে হয়। সেইসঙ্গে নিতে হয় বাড়ির ক্রমবর্দ্ধমান ছানাপোনাদের সেবাযত্ন করার ভার। শৈশবে ও ছিল আমার প্রায় মায়ের মতো। আমার উর্দু শিক্ষার হাতেখড়ি ওর কাছে। ফরহাত মারা যায় ১৯৮২-র শেষে। আজীবন ও থেকে গিয়েছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় দিদি। বাড়ির 'খোকাবাবু' হওয়ার সুবাদে আমার ছিল আলাদা সুবিধে। যা আবদার করতাম তাই পেয়ে যেতাম। আমার চেয়ে যারা বড়ো, তাদের ক্ষেত্রে সেটা ঘটত না। আমি ছিলাম যেন তার মোমের পুতুল। আমাকে দিদির এই মাথায় তোলার জন্যে অন্যায় সুযোগ আমিও যখনই পেরেছি নিয়েছি। দিদির ছিল হাসিখুশি নম্র স্বভাব। ছিল চনমনে রসজ্ঞান। সেইসঙ্গে ছিল সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলার আশ্চর্য ক্ষমতা। যে গুণ হামিদের ছিল। যাদের

সঙ্গে সামান্য মুখচেনা আলাপ, তারাও তার মুখ মনে করে রাখত। আব্বাস (তৈয়বজী) মামুর বড়ো ছেলে শিকারি-সলিসিটার শাম্‌স্‌। তারই ছোট ভাই শুজাউদ্দিনের (আমরা ডাকতাম শুজাভাই ব'লে) সঙ্গে ১৯১১ সালে ফরহাত বুবুর বিয়ে হয়। আব্বাস মামুর তিন তিনটি ছেলের সঙ্গে আমার তিন তিনটি বোনের বিয়ে হয়। শাম্‌স্‌-এর সঙ্গে আশরাফ, শুজার সঙ্গে ফরহাত এবং সালাহ্‌-র সঙ্গে আখতার—বলতে গেলে, ওদের বিয়ের বাজার একচেটেভাবে একা আমরাই যেন দখল করে নিয়েছিলাম। বুবু যখন আমাদের কাছে এসে থাকত, আমাদের যে কী আনন্দ হত বলার নয়। প্রথমবার এসেছিল কিহিম আর কোটাগিরিতে। হায়দ্রাবাদ আর কেরালায় তখন আমি কাজ উপলক্ষে ঘাস-বিচালি-ঘাস করে বেড়াচ্ছি। পরে এসেছিল যখন আমরা দেরাদুনে থাকি। বুবু এলেই সারা বাড়ি আনন্দে ভরে যেত। মুখে ওর সব সময় হাসি। খুব রগড় করে কথা বলত। জোরগলায় আমাদের পড়ে শোনাত মুসাদ্দাস-এ হালি, গালিব আর ইকবাল, কখনও বা প্রেমচাঁদের নাম-করা কোনো নভেল। শুজাভাই যখন নিজাম রাজসরকারের রাজস্ব অফিসার হয়ে হায়দ্রাবাদের বাইরে দূর দূর অঞ্চলে কর্মসূত্রে যেখানেই থেকেছে, ছুটিতে তহমিনাকে নিয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ সেসব জায়গায় আনন্দে কাটিয়ে এসেছি। শুজাভাই কাজ থেকে অবসর নেবার পরেও গিয়েছি ওঁদের দৌলতাবাদের ভারি সুন্দর বাড়িটাতে।

পুরনো কথায় ফিরে আসি। তহমিনার সঙ্গে তখন আমার বিয়ের পাকা কথা হয়ে গেছে। এই বিশেষ অবস্থায় একটা টেলিগ্রামের শব্দগুলো উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে প'ড়ে এমন উল্টো বুঝিলি রাম হয়ে দাঁড়ায় যে, তাতে হাসির খোরাক থাকলেও, আমার হল লজ্জায় মাথা কাটা যাওয়ার দাখিল। অনেকের মনে থাকতে পারে, ১৯১৮ সালে দেশের পর দেশ জুড়ে মারাত্মক রকমের ইনফ্লুয়েঞ্জা এমন মড়ক লাগে যে, তার অব্যবহিত আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চার বছরে যত না লোক মরেছে, মড়কে মরে তার কয়েক গুণ বেশি। তখন আমি বোম্বাইতে। বাণিজ্য আর প্রাণিতত্ত্বে আমার শিক্ষানবিশি চলছে। তহমিনার বড়ো ভাই হাসান লতিফ তখন নিজামের রাজসরকারের জেলার ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার। সেই সময় খবর এল যে, হাসানের বউ, কয়েকজন ছেলেমেয়ে আর ঝি-চাকর—পরিবারের সবাই জ্বরে ধুঁকছে। বাড়িতে কেউ নেই ওদের দেখবার। ওর বোন সদ্য আমার বাগ্‌দত্তা। সুতরাং, আমার পক্ষে দুশ্চিন্তা করাটা স্বাভাবিক। মৃদু পারিবারিক আপত্তি সত্ত্বেও, আমি ঠিক করলাম পত্রপাঠ চলে গিয়ে ওদের চমকে দেব। ওদের নার্সিং-এর কাজে সাহায্যের জন্যে আমি হায়দ্রাবাদে যেতে ইচ্ছুক, বড়ো মুখ করে সেটা জানালাম। আমার টেলিগ্রাম পেয়ে হাসানের চক্ষু চড়কগাছ হওয়ার মধ্যে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। এ কথা ওর মনে হতেই পারে, সবে কলির সন্ধ্যে, এখনই শালাসম্বন্ধীর কাছে হাত পাতা শুরু। আসলে, যে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম, তার বয়ান ছিল এই 'শ্যাল আই কাম অ্যাণ্ড হেল্‌প্‌' সাহায্য করতে আমি আসব কি)—গন্তব্যে

পৌঁছে নবকলেবরে সেটা হয়ে গিয়েছিল 'স্মল ইনকাম সেণ্ড হেল্‌প্' (সামান্য আয় সাহায্য পাঠাও)। তারবার্তার ক্ষেত্রে জোড়াতালি দিয়ে মস্তক বিনিময়ের এমন যৎপরোনাস্তি আর কোনো নজির আমার জানা নেই। ঘটনাটি নিশ্চয়ই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকার দাবি জানাতে পারে।

১৯১৮-র ডিসেম্বর মাসে আমাদের বিয়ে হয়ে যায়। তখন আমার মাত্র বাইশ বছর বয়স। বিয়ে করার পক্ষে বয়সটা একরকম কমই বলতে হবে। এই ব'লে আমাকে বুঝিয়ে রাজি করানো হল যে, এরপর কে জানে আবার কবে দেশে ফিরতে পারব। যাই হোক, দেখা গেল, আমিও আর এ ব্যাপারে আজ নয় কাল করিনি। যুদ্ধ থেমে আমাদের ব্যবসায় অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশ কাহিল হয়ে পড়ছিল। বহু বছর না গেলে এরপর আর বিয়ে করাটাই সম্ভব হবে না। আমার রাজি হওয়ার পেছনে এটাও ছিল একটা কারণ। আমার চেয়ে চার বছরের বড়ো আমির ভাইও বছর খানেক আগে লায়লা হায়দারিকে বিয়ে করেছিল। তার যেমন রূপ, তেমনি গুণ। মোহভঙ্গ হওয়ায় নিজামের পুলিশ সার্ভিসে ইস্তফা দিয়ে জে. এ. আলি ব্রাদার্সের একজন হয়ে আমির ঠিক করেছে এবার কপাল ঠুকে ব্যবসায় নেমে পড়বে। ওর কচি বউ তখন সন্তানসম্ভবা। লায়লাকে তার হায়দ্রাবাদে মা-বাবার কাছে রেখে স্থির করেছে আমির একাই সাগর পাড়ি দেবে। অদৃষ্টের ফেরে স্ত্রীর সঙ্গে পুনদর্শন হয়নি। বর্মায় যাওয়ার কয়েক মাসের মধ্যে শোকাবহভাবে অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে ও মারা যায়। এ ব্যাপারটা এখন শিকেয় তোলা থাক। এ নিয়ে পরে বলব। ১৯১৯-এর জানুয়ারি নববিবাহিত দম্পতি আমরা কলকাতা থেকে জাহাজে রেঙুন রওনা হলাম। আমির হল আমাদের সহযাত্রী। বেচারা আমির। ও তখন জানতই না কপালে ওর কী ঘটতে যাচ্ছে।

□

৫

স্মৃতিপথে বর্মা

রেঙ্গুনের বিশেষত ভারতীয় সমাজে আখতার বুবু আর সালাহ্ তৈয়বজী—এই দুই খর্বকায় স্বামীস্ত্রীর ছিল বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা। শুধু বৃত্তিজীবী ডাক্তার-উকিল, উচ্চপদস্থ সরকারি আমলা, হাইকোর্টের জজ জাতীয় কুলীন সমাজ—কেবল এই গণ্ডিটুকুর মধ্যেই ওদের নামযশ সীমাবদ্ধ ছিল না। তার বাইরে যে দীনদুঃখীর দল, কেউ রিক্‌শা টানে, ছ্যাকরা গাড়ির গাড়োয়ান—মানুষ নির্বিশেষে সবারই প্রিয় এই দম্পতি। একটানা প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর তারা বর্মার বাসিন্দা। এই দীর্ঘ সময় জুড়ে এই জনপ্রিয়তা শুধু টিঁকে থাকেনি, সমানে বেড়েছে। এই প্রবাস-জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সালাহ্ শ্রমজীবী নানা ইউনিয়নের আর রাজনৈতিক সমিতির কখনও প্রেসিডেন্ট, কখনও সেক্রেটারি হয়েছেন। বর্মার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তিনি নেতা। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ভারতীয় সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে দ্বৈতশাসন আমলের বর্মা বিধান পরিষদের সদস্য। ঔপনিবেশিক প্রশাসনের কাছে সালাহ্ ছিলেন পথের কাঁটা। বিশেষভাবে মুসলিম নিবেশ। ভারতীয় আর জেরবাদি মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারে প্রেরণাময়ী প্রাণশক্তি। ১৯৪২ সালে জাপানিরা বর্মা দখল করে নিলে ভারতীয় নাগরিকদের নাগাল্যাণ্ড হয়ে মৃত্যুকণ্টকিত স্থলপথে অপসারণের কর্মযজ্ঞে সালাহ্ আর তাঁর ছেলে নাদির (পরে যিনি হন আই. এন-এর ক্যাপ্টেন এন. এস. তৈয়ব) অমানুষিক সাহস দেখিয়ে আর শারীরিক কষ্ট সহ্য ক'রে অসামান্য বীরোচিত ভূমিকা পালন করেন। এই সব কিছু মিলিয়ে আর হাঁটাপথ থেকে কালাজ্বরের বীজ রক্ত নিয়ে যখন মুসৌরি পৌঁছোলেন, তখন তিনি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। তিনি এসে উঠেছিলেন হামিদ আর শরিফার অতিথিবৎসল 'সাউথউড' ভবনের ছত্রছায়ায়। ক'দিন তাঁকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি চলল। যে রকম তাঁর বন্ধু আর চেনা মানুষের বহর, তেমনটি বড়ো-একটা চোখে পড়ে না। ওঁর সময়ে বর্মায়, বিশেষ ক'রে রেঙ্গুনে থেকেছে, কিংবা একবার শুধু ঘুরে গেছে, খ্যাত অখ্যাত নির্বিশেষে প্রায় যেকোনো ভারতীয় তৈয়বজীদের একডাকে চিনতেন। ওঁদের বাড়িতে সকলের সব সময় অবারিত দ্বার। এসো খাও-দাও থাকো। কেউ কোনো রকম ঠেকায় পড়লে সর্বতোভাবে ওঁদের সাহায্যের হাত বাড়ানোই

থাকত। এমন কী পঁয়ত্রিশ বছর আগে বর্মা ছেড়ে এসেছেন এমন সাবেক কালের মানুষও যে সহৃদয়তার সঙ্গে এঁদের কথা স্মরণ করেন, তা দেখে আশ্চর্য লাগে। এমন 'উদ্বাস্তু' নেই বললেই হয়, যারা কখনও না কখনও ওঁদের কারো না কারো অথবা দুজনেরই সংস্পর্শে না এসেছেন। কিংবা ওঁদের কাছ থেকে কিছু না কিছু আনুকুল্য বা সদয় ব্যবহার না পেয়েছেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেমে গেলে উল্‌ফ্রাম খনিশিল্প যখন মার খেতে শুরু করল, তখন আমরা ব্যবসার মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে আরম্ভ করি। ভারতীয় রেলপথের জন্যে স্লিপারের চাহিদা থাকায় বর্মায় আমরা সরকারি বনজঙ্গল ইজারা নিতে লাগলাম। সেই সময়টাতেই বড়ো সড়ো জানোয়ার মেরে আমি হাত পাকাতে লেগে পড়ি। রেলের স্লিপারের জন্যে সবচেয়ে ওরা বেশি চাইত এক জাতের মাজ কাঠ। বর্মায় এই কড়া জাতের কাঠকে বলা হত পীনকাডো (ক্সিলিয়া ডোলাব্রিফর্মিস)। তাভোই নদীর উজানিতে নাৎকিজিন আর হাইন্‌জে অঞ্চলের চোখ-জুড়ানো যে অরণ্য, যেখানে বৃষ্টি ভেজা পাতা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়ছে তো পড়ছেই—সেখানে প্রথমেই যে খোঁজগুলো নিতে হবে, তা এই : কী পরিমাণে এই কাঠ পাওয়া যেতে পারে; একটি গাছের সঙ্গে আরেকটি গা ের নিকটত্ব কতখানি; গাছ কাটার সুবিধে-অসুবিধে; গুদামে তুলতে আর করাতীদের হাতে কাঠের গুঁড়ি পৌঁছে দিতে কী রকম কী যানবাহন মিলবে; সেইসঙ্গে জাহাজে ক'রে ভারতে মাল পাঠাবার কতটা কী ব্যবস্থা করা যাবে; ধাপধাড়া গোবিন্দপুর জায়গা, তায় রাস্তাঘাটের স্বল্পতা, যোগাযোগের অভাব। সঙ্কীর্ণ পরিসরে মাঝপথে কেবলি গাড়ি আট্‌কে গিয়ে সাংঘাতিক ফাসাদ বাধায়। জলপথে মাল পাঠাতে গেলে আলাদাভাবে ভাড়া করতে হবে বে-রুটের উটকো জাহাজ কিংবা ভাড়া করা ইঞ্জিন জুতে চালানো দেশি গাদা বোট। এমন বেয়াড়া জায়গা থেকে মাল ভর্তি করতে হবে, যেখানে না আছে কোনো জেটি, না আছে মালবোঝাইয়ের কোনো সুবন্দোবস্ত। এত রকমের বাধা থাকায় শেষ পর্যন্ত আর কাঠের ব্যবসায় নামার ইচ্ছেটা ছাড়তে হল। কাগজেপত্রে হিসেব ক'ষে এবং আমার পার্টনারের অদম্য আশাবাদ দেখে একটা সময়ে মনে হয়েছিল, এই ব্যবসাটাতে হাত দিতে পারলেই ভাগ্য খুলে যাবে। আমার এক পার্শী বন্ধু ছিল। তার নাম জামশেদজি মানেকজি। সে ছিল রেঙুনের লোক। যেমন অসাধারণ তার উদ্যম, তেমনি ছিল সঙ্গতিসম্পন্ন মানুষ। 'তাভোই টিম্বার্স' নাম দিয়ে ওর সঙ্গে পার্টনারশিপে এই ব্যবসাটা আমরা ফেঁদেছিলাম। কিন্তু ওর মধ্যে ছিল অবুঝ অতি-আশাবাদ। গোড়ায় তাতেই মজে গিয়ে ক'বছর আগে টিন আর উল্‌ফ্রামের খনির ব্যবসায় রমরমা বাজারে ঘূর্ণির টানে প'ড়ে বিশ বাঁও জলে ওকে তলিয়ে যেতে হয়। ব্যবসা হিসেবে আমাদের তাভোই-টিম্বার্স আর্থিক ক্ষেত্রে মাটি ছেড়ে ওপরে উঠতে পারেনি। তবে অন্যান্য দিক থেকে বিশেষ ক'রে ব্যক্তিগতভাবে আমার কথা ধরলে, বলতেই হয়, যে, শিকার আর প্রকৃতিবিজ্ঞানের

দিক থেকে এটা আমার বিলক্ষণ জুতসই হয়েছে আর এ থেকে আমি বিস্তর ফায়দাও উঠিয়েছি। এরই সুবাদে বহু দূরের পাণ্ডব বর্জিত বনাঞ্চলগুলোতে যাওয়ার ভালো ভালো সুযোগ পেয়েছি। খোলা আকাশের তলায় তাঁবু গেড়ে দিনের পর দিন দূরবিচ্ছিন্ন ফরেস্ট বাংলোয় থেকে যেতে পেরেছি। কখনও কখনও কারেন উপজাতিভুক্ত আমার গাইডের কল্যাণে তার চেনাজানা স্বজাতীয় কারেন তাউঙ্গিয়া জুমচাষীদের সঙ্গে ছড়িয়ে থাকা কুঁড়েঘরে একসঙ্গে মাথা গুঁজে রাত কাটিয়েছি। সঙ্গে যেত এক হাসিখুশি মাদ্রাজি বাবুর্চি-বেয়ারা। একটা ইকমিক-কুকারে রেঁধে ট্যাপ-লাগানো জলপাত্র সমেত সেই গরম খানা বয়ে এনে দিত। আমার পিঠের রাকস্যাকে তল্পি, কাঁধে ঝোলানো থাকত বিশ্বস্ত মাউসার। চাল-ডাল আর এটা-সেটা একটা বস্তায় বেঁধে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সঙ্গে যেত একজন ভাড়া-করা কুলি। খ্রিস্টানধর্মে দীক্ষিত কারেন উ কিয়ান থা ছিল গাইড। ওর নিজের হাতি ছিল। জঙ্গল থেকে কাঠের গুঁড়ি টেনে নিয়ে গিয়ে করাতীদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার ঠিকেদারিটা আমরা ওকেই দিয়েছিলাম। জঙ্গলের নাড়িনক্ষত্র ওর জানা থাকায় যথাযথ জঙ্গলের গাছ হদিশকরার কাজটা ও ছাড়া চলত না। তাছাড়া, ও ছিল আগাপাশতলা জানপহেচানওয়ালা জঙ্গলের লোক, উপরন্তু পোড়-খাওয়া শিকারি। একটা ১২-বোরের মর্চে ধরা বেলজিয়ান একনলা ওর সব সময়ের সঙ্গী। বলত, ওটা দিয়ে ও নাকি হরদম শম্বর, রুরু, শুয়োর, এমনকী গৌরও মেরে থাকে। ঐ বন্দুক দিয়ে একটা বাঘ মেরেছে, একটা গণ্ডার মেরেছে। বলতে কী, একবার একটা পাগলা হাতিকেও সে ঘায়েল করেছে। বাবর বাদশা ভাষায় বলতে হয়, 'যার মুখের বাত, তাকেই দাও কেয়াবাত।' সে যাই হোক, উ কিয়ান থা কিন্তু তার নিজের জায়গার বন্যপ্রাণী আর গাছপালা সম্পর্কে মোটামুটিভাবে নিঃসন্দেহে অনেক কিছু জানত। ওর মুখ থেকে শুনে আমি স্থানীয় বনজঙ্গল আর লোককথার বিষয়ে অনেক কিছু জেনেছি। হাইন্‌জের দোআব অঞ্চলের সমস্ত কিছু ছিল ওর নখদর্পণে। তখন (১৯২২) একশিঙে গণ্ডার (লেসার ওয়ানহর্নড্ রাইনোসেরাস— রাইনোসেরাস সোণ্ডাইকাম) দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। আমার তখন খুব ইচ্ছে, লুপ্তপ্রায় সেই জীবটি দেখা আর সম্ভব হলে তার একটা ফটো তুলে রাখা। সে আমাকে রাস্তা দেখিয়ে বেশ কয়েকটা জায়গায় নিয়েও গিয়েছিল, যেখানে এই গণ্ডারের গতিবিধি আছে। আমাদের এমনই কপাল, কোথাও তার দেখা মেলেনি। একটি জলার কাছে অবশ্য গণ্ডারের মাটিতে গড়াগড়ি দেওয়া আর হেঁটে যাওয়ার চিহ্ন চোখে পড়ায় তার অস্তিত্বের নিশ্চিত প্রমাণ পেয়েছিলাম। এর অল্প কিছুদিন আগে তখনকার বর্মার ঔপনিবেশিক সরকার গণ্ডার মারা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ক'রে আদেশ জারি করেছিল। তাতেও অন্যান্য জায়গার মতোই গণ্ডারের শিং চুরি আদৌ আটকানো যায়নি। এতদিনে সম্ভবত ঐ জাতের একটি গণ্ডারও বেঁচে নেই।

আজ যখন নিম্ন-বর্মার মানচিত্রে হাইন্‌জে অববাহিকা চোখে পড়ে, তখন বেদের

ঢোল ফেলে ফেলে জঙ্গলে ঘোরার সেই পুরনো দিনগুলো মনে পড়ে গিয়ে হুতুশে হই। সে রকম সফরে আরাম ছিল না বটে, কিন্তু আনন্দ ছিল। মশা আর জোঁকের হাত থেকে নিস্তার নেই। সারাটা দিন একটানা বৃষ্টি। ভিজে জবজবে বিছানায় সারাটা রাত কাটানো। এতদিন হয়ে গেছে যে, সেসব আড়ালে চলে গিয়ে বরং সবই আজ রোমাঞ্চকর ঠেকে। যত যাই হোক, ষাট বছর আগে তো। সেসময় এতেই তোফা মজা পেয়েছি!

গোড়ার দিকে খনির রমরমার দিনে যখন ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখছি, সেই সময়ে আমার জীবনে আর কর্মকাণ্ডে ধাঁ করে উড়ে এসে জুড়ে বসেছিল এক আজব ধরনের ধোঁয়াটে মানুষ। তার একটু পরিচয় দিতে না পারলে আমার বর্মার যুগের কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বার্ট রিবেনট্রপ হল সেই মানুষটি। খনির ব্যবসা যখন তুঙ্গে, তখন সেই বানে নিজেকে কুটোর মতন ভাসিয়ে সে তাভোইতে এসেছিল। এক রহস্যময় চরিত্রের লোক ছিল সে। কোনো কোনো দিক দিয়ে অসামান্য। এমন কী পঞ্চমুখে প্রশংসার যোগ্য। আমাদের খনিসংক্রান্ত পার্টনারশিপের ঘোর দুর্দিনে ওর সঙ্গে তিন বছরেরও বেশি যখন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে রয়েছি, সেই সময় আমাদের ইজারা নেওয়া মেচোঙে গিয়ে আমি প্রায়ই এক নাগাড়ে তিন-চার দিন কাটিয়ে আসতাম। থাকতাম ওর সঙ্গে মাচার ওপর তালপাতার ছাউনি দেওয়া ওর ছিটেবেড়ার ঘরে। এতদিন একসঙ্গে থেকে আমি ওর জীবনবৃত্তান্ত আর পূর্বইতিহাস, বলতে গেলে, বিন্দুবিসর্গও জানতে পারিনি। মি. বার্টহোল্ড রিবেনট্রুপ, সি. আই. ঈ-র ছেলে ও। সার ডিয়েট্রিন ব্র্যাণ্ডিসের পরামর্শে ব্রিটিশরাজের ভারত সরকার ওঁকে এবং আরও কয়েকজন বনবিদ্যার বিশেষজ্ঞকে জার্মানি থেকে আমন্ত্রণ ক'রে এনেছিল। ভারতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বন নিয়ে সংগঠন গড়ে তুলবেন আর প্রাদেশিক ফরেস্ট সার্ভিসের পত্তন করবেন—এই ছিল উদ্দেশ্য। ১৯০০ সালে অবসর নেওয়া অবধি শেষের কয়েকটা বছর তিনি সিমলায় থাকতেন। বার্ট খুব সিমলার কথা বলত। বলত ওর বাবার সমসাময়িক অনেক সরকারি আমলার কথা। অবশ্য ও নিজে ভারতে জন্মেছে কিনা কিংবা ছেলেবেলায় কখনও থেকেছে কিনা, সেটা ওর মুখ থেকে কখনও শুনিনি। ওর মা জার্মান ছিলেন কিনা তাও জানি না। মায়ের প্রসঙ্গে কোনোদিনই ও কিছু বলেনি। কথায় কথায় এটুকু জানতে পেরেছিলাম যে, ওর এক বোন লণ্ডনে থাকে। রেনের ওপর যে ওর টান আছে, সেটা ওর বলার ধরনে বুঝতে পেরেছিলাম। এটাও জানা গিয়েছিল যে, ওর স্ত্রীও লণ্ডনে থাকে। হয় ওরা আর একসঙ্গে থাকে না, নয়তো ওদের বিয়ে ভেঙে গেছে। ওদের একটি মেয়ে আছে। ওর নিজের ব্যক্তিগত জীবন বা সম্পর্কিত মানুষজনদের বিষয়ে কিছুই বলত না। ওর সংস্পর্শে আসার পর যে ক'বছর কেটেছে, তার মধ্যে আমার যতদূর জানা আছে, বার্ট কখনও ওর আত্মীয়স্বজনকে চিঠি লেখেনি কিংবা তাদের কারো কাছ থেকে চিঠি পায়ওনি। ইংলণ্ডে

স্বগৃহে ফেরার তেমন বাসনার কথা কখনই সে প্রকাশ করেনি। এ ক'বছরে বাইরে থেকে কখনও ওর নামে কোনো টাকাপয়সা আসেনি, ও নিজেও কাউকে পাঠায়নি। শেষেরটা তবু বোঝা যায়, কেননা ওর ছিলোটাই বা কী যে পাঠাবে। ও যে নিজেকে কীভাবে টিকিয়ে রেখেছে সেটা ভেবেই আমার অবাক লাগত। কেননা বার্টোল্ডের নাই আঁক্ড়া অবাস্তব আশাবাদ থাকা সত্ত্বেও, মেচোঙের খনি কখনই লাভের মুখ দেখেনি। আমার মনে হয়, আশাবাদ আর ভবিষ্যতে ভরসা—এ দুই ঝালমশলা ভাঁড়ারে যদি যথেষ্ট থাকে, তাহলে অন্তত কিছুকাল শুধু ডালভাত খেয়েই স্বচ্ছন্দে চালিয়ে যাওয়া যায়। আশাবাদ বার্টের মজ্জাগত। কিন্তু তার ভিত্তিটা কী, তা ধরা যেত না। খনির উৎপাদনে তার হদিশ মিলত না।

পার্টনারশিপে মাইনিং ব্যবসা করতে গিয়ে বিশেষ অবধি 'জখম হয়ে মাঠ ছেড়ে' বর্মা থেকে তিন বছর পর ফিরলাম, তখন মন থেকে মুছে ফেলেছি বকাগুপ্রত্যাশা। ব্যবসা যে আমার কর্ম নয়, সেটা বুঝে গিয়েছি। খনি-কারবারের একক 'উপস্বত্বভোগী' ক'রে রিবেনট্রুপকে রেখে এসেছিলাম। তখনও সে আগের মতোই আশাভরসায় বুক বেঁধে অকুতোভয়ে লড়াই চালিয়ে গেছে। কিন্তু ইদানিং প্রায়ই ঘোর নৈরাশ্যে ও একেবারে মুষড়ে পড়ছিল। এর মাসকয়েক পর এক মর্মান্তিক খবর এসে পৌঁছুল। ওর যখন মানসিক অবসাদে এই ভেঙে পড়ার পর্যায় চলছিল, সেই সময়টাতে বার্ট একদিন রাত কাটিয়ে আসবে ব'লে এক জনমানবহীন জায়গায় চলে যায়। পিস্তলের গুলিতে আত্মহনন করে। এইখানেই আমার সর্বনেশে মাইনিং ব্যবসার ইতি। সেইসঙ্গে আরও একজনের চিরবিদায়, যে মাইনিং পেশার চিরাচরিত ধারার কখনও ছেদ পড়তে দেয়নি। বার্ট ছিল সেই দুর্দম আশাবাদীদেরই একজন, যারা ভাঙবে তবু মচকাবে না। জার্মানির ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে খনিপ্রযুক্তিবিদের তালিম নিয়ে বার্ট ব্রিটিশ গায়নার স্বর্ণখনিতে কয়েক বছর কাজ করে। সেখানে খুব একটা সুবিধে করে উঠতে পারেনি। ওর এক বন্ধু জে. ডব্লু. ডোনাল্ডসন ওকে তাই তাভোইয়ের টিন আর উল্ফ্রাম খনির কাজে ভিড়িয়ে দেয়। নদীর উজান অঞ্চলের এগানেতে তার ছিল রবার বাগান। আর পাগায়েতে ছিল উল্ফ্রাম খনি—পরে বর্মা ফিনান্স অ্যাণ্ড মাইনিং কোং লিঃ-কে সেটা বেচে দেয়। বার্ট ছিল কাছা-আলগা ধরনের নরম মনের দরদি মানুষ। খনিমজুররা আর গ্রামের লোকেরা ওকে খুব পছন্দ করত। ঘরে কিংবা কাজের ক্ষেত্রে কারো কোনো ঝামেলা হলে বা কেউ কেউ কোনো মুশকিলে পড়লে ওর কাছে ছুটে গিয়ে ওর সাহায্য পরামর্শ নিত। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, হেন কাজ ছিল না যা ও জানত না। ওর এই কর্মবৈচিত্র্যের মধ্যে একটি ছিল বাচ্চা প্রসব করানোর ওর অদ্ভুত ক্ষমতা। এটা করত বিনা পয়সায়, শখ ক'রে। ধাইয়ের কাজে ওর নাম আর হাতযশ চতুর্দিকে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, জঙ্গলে-ঘেরা দূরদূরান্তের অজ পাড়গাঁ থেকেও ওর ডাক আসত। দূরবর্তী বনাঞ্চল আর দূরপ্রান্তের গ্রাম থেকে মেয়ের

বাবারা ঠেঙিয়ে আসত ওকে ডেকে নিয়ে যেতে। এমন কী মাঝে মাঝে রাতদুপুরেও। বার্টের হাতের কাছে থাকত একটা গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ। তাতে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র কাটাছেঁড়ার যন্ত্রপাতি। সময়টা যত বিদঘুটেই হোক, ডাকলে কখনই ও কাউকে 'না' বলত না। মাঝে মাঝে এর বদলে নিজেদের খুশিমতো কখনও কলাটা মুলোটা, কখনও জালে ধরা টাটকা মাছ কিংবা ডিম-মুর্গি দিয়ে যেত। বার্ট লোকের সেবা ক'রে কানাকড়িও নিত না ব'লে এসব ছিল তাদের কৃতজ্ঞতাবশত স্বতঃপ্রবৃত্ত ভেট।

রিবেনট্রুপ নামটা খুব একটা সুপ্রচলিত বলে মনে হয় না। তাই পরের দিকে ঐ নামের একজনকে (১৯৩৭) লণ্ডনে হিটলারের রাষ্ট্রদূত হতে দেখে আমি কিছুটা কৌতূহলবশত আমার বন্ধু পক্ষিতত্ত্ববিদ কর্নেল মেইনেৎস্‌হাগেনকে জিজ্ঞেস করে পাঠাই যে, ভারতের বনবিভাগের ভূতপূর্ব ইনস্পেক্টর-জেনারেল এই রাষ্ট্রদূতের কোনোদিক দিয়ে কোনো আত্মীয় হন কিনা। কারণ, ঐ রাষ্ট্রদূত মহাশয়কে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন ব'লে তাঁর পক্ষে জেনে নেওয়ার সুবিধে ছিল। এরপর ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হতেই কর্নেল মেইনেৎস্‌হাগেন ওঁকে পাকড়াও করেন। তারপর আমাকে এই চিঠিটি লেখেন : '(লণ্ডন, ১৬, ১২, ৩৮) রিবেনট্রুপের কথা আপনি বলেছিলেন, মনে আছে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তো আমাদের ফন-মশাই (এবং 'ফন' মানে মিথ্যে কথা) ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক থাকার কথা ডাহা অস্বীকার করল (করবেই তো, কারণ ওর মতো ফ'তো লোক আর দুটি নেই এবং সেইসঙ্গে ও হল জার্মানির নিকৃষ্টতম জীব)। এও বলল যে, কাঠের কারবারের ধারেবাতাসে ও কখনও ছিল না।'

□

৬

বোম্বাই ১৯২৪-৯

বর্মা থেকে রণে ভঙ্গ দিয়ে চলে আসি ১৯২৪ সালে। এসে আমি আর তহমিনা আমার বোন কামু আর ভগ্নীপতি হাসানের কাছে কিছুদিন থাকি। ওরা থাকত পালি-হিলের নবনির্মিত প্রশস্ত এক বাংলোয়। সহৃদয় হাসান চেয়েছিল নামমাত্র খরচে পেয়িং-গেস্ট হয়ে যেন ওদের কাছে আমরা থেকে যাই। এর আগে সে 'স্যামুয়েল, স্যামুয়েল অ্যাণ্ড কোম্পানির ভারতীয় বিভাগের ম্যানেজার হয়ে জাপানের কোবে-তে ছিল। ভালোই করছিল সেখানে। কিন্তু ও চাইছিল দেশে ফিরে এসে স্থিতু হতে। বোম্বাইতে ওর পুরনো এক স্কুলের বন্ধু ছিল। রতনচাঁদ তালাকচাঁদ মাস্টার। তার ছিল শেয়ার আর সোনাচাঁদির ফলাও ব্যবসা। হাসান তার ব্যবসার পার্টনার হয়। ওর এই বন্ধুটি ছিল এক বেআক্কেলে ফাটকাবাজ। কপাল পুড়িয়ে দেউলিয়া হতে ওর দেরি হয়নি। হাসান তখন ওকে ছেড়ে দিয়ে নিজেই শেয়ারবাজারের দালালি শুরু করল। তাতে কিছু করতে না পেরে হাসান জাপানে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ঠিক হয়, জাপানে গিয়ে আগে ও গুছিয়ে বসবে। তারপর কামু ওদের তিন সন্তান—সাদ, লাইক আর আমির (জন্ম ১৯২৩)-কে নিয়ে ওর কাছে চলে যাবে। অতঃপর পালিহিলের বাংলোটি বার্মা-শেলের ম্যানেজারকে ভাড়া দেওয়া হবে। ডাণ্ডা-র জেলেপল্লী থেকে শুরু ক'রে পূব বরাবর—খার, ভিলে পার্লে, সান্তা ক্রুজ ইত্যাদি—আর বান্দ্রার দক্ষিণের এলাকা পালি- হিল আর তার সংলগ্ন এই গোটা তল্লাট জুড়ে তখন ছিল একটানা ধানক্ষেত। তার মধ্যে ইতস্তত বড়ো বড়ো আমগাছ আর তাল তেতুঁল। ডাণ্ডার লাগোয়া গল্‌ফ্‌-লিঙ্ক সমেত পালি-হিলের অধিকাংশটাই ছিল মূলরাজ খাটাউ-এর খাসজমি। সেখানকার বিশাল বাগানবাড়িতে ছিল রাশি রাশি কলমের আমগাছ। বেশির ভাগই আলফনসো আর পাইরি। প্রধানত বাংলো বানিয়ে নিজেদের থাকার জন্যে সে সময়ে জমির প্লট বিক্রি হত। ইউরোপীয় খদ্দেররা অগ্রাধিকার পেত। বলতে গেলে, প্রায় পুরো এলাকাটাই সাহেব-পাড়ায় পরিণত হয়েছিল। চোখজুড়ানো সব একতলা বাংলো। ঔপনিবেশিক ধরনের স্থাপত্য। টালির ছাদ। বেশির ভাগ বাড়িরই চারপাশ জুড়ে সযত্নরক্ষিত লন আর কেয়রি-করা ফুলের

বাগান। প্রকৃতপক্ষে, স্বাধীনতার আগে এবং তার কিছুকাল পরেও, পুরসভার এই আইন বলবৎ ছিল যে, প্রত্যেকটি প্লটের দুই-তৃতীয়াংশ খোলা রেখে কেবল এক-তৃতীয়াংশেই বাড়ি করা যাবে। সে সময়ে না ছিল পাকা রাস্তা, না ইলেকট্রিসিটি, না স্বাস্থ্যরক্ষার কোনো পৌরব্যবস্থা। ছিল শুধু গণ্ডিবাঁধা কয়েকটি এলাকায় জলসরবরাহ। তাও সবসময় মিলত না। একটা এতিমখানা ছিল—পেতিৎ পার্শী অরফ্যানেজ। এটাই ছিল এ পাড়া চেনবার সেরা নিশানদিহি। এখন সেটা হয়েছে আভাবাই পেতিৎ গার্লস্ হাইস্কুল। কী ভাগ্যিস সে সময়ে এ জায়গাটা ফিল্মস্টারদের নজরের বাইরে থেকে গিয়েছিল।

পাহাড়ের গড়ানে গল্ফ্ লিঙ্ক আর সামনের দিকে কার্টার রোড, যেখানে ধানক্ষেত আর গল্ফ্-লিঙ্ক গিয়ে ঠেকেছে, সে জায়গাটা ছিল বনজঙ্গলে ঢাকা। গাছ ছিল সুপ্রচুর। কারওয়াড়া টোপাকুল, আর দেশি খেজুরের ঝোপঝাড় এবং সেইসঙ্গে ছায়াবহুল বড়ো বড়ো তেঁতুলগাছ, বটগাছ আর দক্ষিণের কোঙ্কণ অঞ্চলের মার্কামারা সব গাছগাছড়া। পাখি হাতানোর পক্ষে এটা ছিল আদর্শ জায়গা। পালি হিলে থাকতে ১৯২৪ সালে সোসাইটির সবে প্রকাশিত খুবই কাজের বই প্রেটারের 'স্নেক্সন্ অব বম্বে অ্যাণ্ড সালসেট'-এর পরিশিষ্ট হিসেবে একটি নিবন্ধ লেখার জন্যে তৈরি হচ্ছিলাম। তখন সেই লেখার তথ্যসংগ্রহ আর পক্ষিনিরীক্ষণের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই বনটিকে আমি কাজে লাগাই। পাখির বিষয়ে লেখাটা আদতে অনেক বছর পরে সোসাইটির জার্নালে ছাপা হয় হুমায়ুন আবদুলালির সঙ্গে যুক্তভাবে। সেন্ট জেভিয়ার্সে প্রাণিতত্ত্বে বি-এ পড়বার সময়ই কলেজের তখনকার জীবতত্ত্বের ডিরেক্টর স্প্যানিশ জেসুইট ফাদার পালাসিয়সের উৎসাহ পেয়ে হুমায়ুন বাড়তি অনেক উপকরণ সংগ্রহ করে। বান্দ্রা থেকে লোকে তখন অফিস যেত কয়লার ইঞ্জিনে টানা ট্রেনে। মোটরগাড়ি তখন খুবই কম। পিচ-ঢালা না হওয়ায় রাস্তা ছিল ধুলোয় ভর্তি। ঐ সময় নাগাদ ইলেকট্রিক ট্রেন প্রথম চলতে শুরু করে। পোস্টের ওপরকার ব্র্যাকেটের গায়ে কাকদের বাসা বাঁধার ঝামেলায় লোহার ভারে ব্যাঘাত সৃষ্টির ফলে, শর্ট সার্কিটের ঠেলায় যখন-তখন রেল চলাচল বন্ধ হয়ে যেত। আলাদা ধরনের ব্র্যাকেট লাগিয়ে তবে কাকদের বাসা বাঁধা ঠেকানো হয়। পালি-হিল এলাকা ছাড়াও, আর যেসব ঘন জংলা জায়গা থেকে আমি পাখিসংগ্রহ করেছিলাম, তার মধ্যে পড়ত পোওয়াই, তুলসি আর বিহার লেক, ট্রম্বে হিল, মুলুন্দ, বিখরোলি, ভাণ্ডুপ, ঘোড়বন্দর, ভিন্দারের আশপাশ। রবিবারে আর ছুটির দিনগুলোতে প্রেটার, ম্যাকান আর জেকব্স্ (প্রিন্স অব ওয়েল্স্ মিউজিয়ামের সেক্রেটারি) একসঙ্গে হানা দিতে বেরিয়ে নানান নমুনা সংগ্রহ করে আনতেন। তার কিছু কিছু ছিল অভাবিতপূর্ব। যেমন—মালাবারের সদাসোহাগী আর তিন পদাঙ্গুলিযুক্ত মাছরাঙা পাখিদুটোর কথা আমার মনে আছে। বিখরোলিতে যেটা এখন গোদরেজের শিল্পচত্বর, পেছনে মুলুন্দ পাহাড়। এসমস্তই ছিল ঘন বন। গুচ্ছের

লেক-টেক নিয়ে এখন যেখানে 'আরে মিল্ক কলোনি' আর বরিভ্‌লি ন্যাশনাল পার্ক-এর গোটা অববাহিকা অঞ্চলটা জুড়ে ছিল একটানা ঘুরঘুট্টি জঙ্গল আর লম্বা লম্বা তালগাছ। বেশি দেখা যেত বন্যশূকর আর কাক্কার হরিণ। তাছাড়া ছিল শম্বর। অনেক সময় চিতাবাঘ ঢুকে পড়ত। এইরকম ছিটকে আসা একটি বাঘ শেষ মারা হয় ১৯২৯ সালে বিহার লেকের কাছে।

বাচ্চাকাচ্চাদের নিয়ে কামু চলে গেল জাপানে। পালির বাংলোয় ভাড়াটে বসল। আমরা চলে গেলাম চৌপাটিতে। তহমিনার বাবা সি. এ. লতিফ-এর হার্ভে রোডে উইলসন কলেজের পেছনে 'লতিফিয়া' বিল্ডিঙের একেবারে টঙের ফ্ল্যাটে। তহমিনা কিছুদিনের মধ্যে বম্বে প্রেসিডেন্সি উইমেন্‌স্ কাউন্সিলের সেক্রেটারির কাজ পেয়ে গেল। পুরো দিন নয়, মাত্র কয়েক ঘন্টার কাজ। ওদের আপিসটা ছিল টাউন হলের দক্ষিণাংশে। এই সময় জুওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া একজন পক্ষিতত্ত্ববিদ চেয়ে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেয়। আমার রেফারি হিসেবে ফাদার ব্ল্যাটার, ড. স্ট্রেসেম্যান আর বি. এন. এইচ. এসের নামোল্লেখ ক'রে আমি একটা দরখাস্ত করে দিই। আমার কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নেই। অন্যান্য প্রার্থীরা কেউ এম. এস. সি, কেউ পি. এইচ. ডি। সে ক্ষেত্রে আমার কোনোই আশা ছিল না। কার্যক্ষেত্রে সেটাই হল। চাকরিটা পেলেন এম. এল. রুনওয়াল। পরে সুন্দরলাল হোরা-র স্থলবর্তী হয়ে ১৯৬৫ সালে জুওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টর হিসেবে তিনি অবসর নেন। ভারতের আর কোথাও এই পদে লোক নেবে অদূরভবিষ্যতে তারও কোনো আশা নেই। স্বভাবতই এই সময় আমি খুব মুষড়ে পড়ি। সরকারি পদাকাঙ্ক্ষী তরুণদের এই সূত্রে আমার একটা উপদেশ দেওয়ার আছে : তারা যেন ইউনিভার্সিটির একটা ডিগ্রি নিয়ে রাখে, তা সে ডিগ্রির মূল্য যাই হোক না কেন। অবশ্য পেছনদিকে তাকিয়ে আজ আমি ভাবি, ভাগ্যক্রমে আমি কী বাঁচান বেঁচেছি বলার নয়। নইলে আমি নির্ঘাত একজন শিলীভূত আমলা হয়ে নিছক একটি জড়পিণ্ডে পরিণত হতাম।

একসময় বোম্বাই প্রেসিডেন্সির স্কুল-পরিদর্শক ছিলেন এক মহিলা। মিসেস দ্রাকুপ। এই প্রবীণ ভদ্রমহিলা কামু-কে খুব স্নেহ করতেন। ব্রোচে (১৯১৭) কামু তখন পার্শী গার্লস্ স্কুলে পড়াত। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে তিনি এসে ছেলের কাছে থাকছিলেন। ১৯২৫-৬ সালে তাঁর ছেলে তখন বোম্বাই সরকারের একজন সচিব। এক সময়ে বম্বে ডেভেলপমেণ্ট কমিটি চেম্বুরে একটি 'উদ্যান নগরী' গড়ার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। পরে তা ভেস্তে যায়। ইংরেজদের ভিলা টাইপের একটি বাংলো মডেল হিসেবে তখন তৈরি করা হয়। সেই চমৎকার বাংলোটাতে ছেলের সঙ্গে মা থাকতেন। সরকার তখন বাংলোটা বেচে দেবে ঠিক করেছে। বাংলোটা দেখার জন্যে মিসেস দ্রাকুপ একদিন আমাদের (তহমিনার আব্বা কামরুদ্দিন লতিফ, তহমিনা আর আমি) চা খাওয়ার নেমন্তন্ন করলেন। কামরুদ্দিন চাচার ইচ্ছে বাংলোটা কিনে তহমিনাকে দেওয়ার।

উনি তখন ভাবছিলেন চৌপাটির ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে শহরতলির দিকে চলে যাবেন। সেখানে একটা বাগান থাকবে। রান্নার তরিতরকারি আর ফুলফল বাড়িতেই ফলিয়ে নেওয়া যায়, এরকম একটা বাগানের জন্যে তহমিনা মনে মনে হেদিয়ে মরছিল। আমিও চাইছিলাম ভিড়ের বাইরে একটু খোলামেলা জায়গা, যেখানে পাখিরা মনের সুখে ঘুরে বেড়াতে পারে।

চমৎকার জায়গায় সুন্দর সুছাঁদ ক'রে বানানো বাংলোটি রাখাও হয়েছিল বেশ পরিপাটি ক'রে। চারদিক ঘিরে সবুজের সমারোহ। সুবিনাস্ত লন। আমরা তিনজনে তো দেখেই মজে গিয়েছিলাম। তার জের টেনে কামরুদ্দিন চাচা বাংলোটি কেনার ব্যাপারে পরদিন থেকেই সরকারের সঙ্গে পূর্ণোদ্যমে আলাপ-আলোচনা শুরু করে দিলেন। চাচা ছিলেন দুঁদে এবং ঠাণ্ডা মাথার ব্যবসাদার। শুরু হল দুপক্ষের দর কষাকষির টানাপোড়েন। ঘটনা যেদিকে গড়াচ্ছিল, তাতে সুভালাভালি ব্যাপারটা মিটে যাবে বলেই মনে হচ্ছিল। আমরা উত্তেজনায় ছটফট করছি। কিছুতেই আর তর সইছে না। এক মুহূর্ত দেরি না ক'রে তহমিনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছক কষতে বসে গেছে—ঘরে কোথায় কী আসবাব রাখা হবে, দরজা-জানলায় কী রকমের কী পর্দা লাগাবে, দেয়ালে কোথায় কী টাঙাবে। আর আমি পরীক্ষামূলক পক্ষিশালা গড়ে তুলে আমার বহুদিনের বাসনা চরিতার্থ করার স্বপ্ন দেখছি। সে সময়ে ওদিকে কোনো বাস যেত না। রেল ইস্টিশন তিন মাইল দূরে। লোকাল ট্রেনের নানা গোলযোগ লেগেই থাকত। কাজেই রোজ দুজনের শহরে যাতায়াত করাটা যে কতটা কষ্টকর আর ক্লান্তিকর হবে, হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু মোটের ওপর থাকার সুখের পাল্লা ছিল এত ভারী যে, অসুবিধেগুলোকে আমরা তেমন পাত্তা দিতে চাইনি।

যাই হোক, বিধির বিধান ছিল অন্য। সরকার যখন সবে চাচার প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে মেনে নিয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে হল চাচার এন্তেকাল। প্রকৃতপক্ষে, চাচার মৃত্যুর ঠিক পরের দিনই এসে গেল সরকার পক্ষের সাকরানপত্র। তখন আমাদের দুজনের যা আয়, তাতে ওর আব্বার মোটা রকমের সাহায্য ছাড়া নতুন জায়গায় গিয়ে অত খরচের দায় শুধু দুজনে বহন করা আদৌ সম্ভব ছিল না। কাজেই সখেদে আমাদের সেই সুযোগ হাতছাড়া করতে হল। এইভাবেই আমাদের পয়লা খোয়াব মাঠে মারা যায়।

সোসাইটিতে কাজটা পেয়ে গিয়ে আমি আর তহমিনা চৌপাটিতে ওর আব্বার কাছে থেকে গিয়েছিলাম 'লতিফিয়া'র ফ্ল্যাটে। সংলগ্নক অংশটিতে পেয়িং-গেস্ট হয়ে থাকত সইফ আর বদর। দু-ভাইয়ের একজন ল' কলেজে, অন্যজন সেণ্ট জেভিয়ার্সে পড়ত। ওদের আম্মা সলিমা আর আব্বা ফয়েজ তৈয়ব। ফয়েজকে সিন্ধুপ্রদেশের জুডিশিয়াল কমিশনার হয়ে করাচিতে চলে যেতে হয়। আমার শ্বশুরমশাই মারা যেতে আমরা দুজনে বাইকুল্লায় রেব্‌শ্ স্ট্রীটে 'ইউনিটি হল' নামের খাজা ছিমছাম করে

রাখা একটি বাড়ির ভারি আরামদায়ক এক ফ্ল্যাটে উঠে যাই। বাড়ির সামনে একটা ক্রিকেটের মাঠ। আমাদের দুটো বাড়ি পরেই ওয়াই-এম-সি-এ। মাঠ তাদেরই দখলে। সে আমলে এ অঞ্চল ছিল সসম্মানে মধ্যবিত্তদের থাকার জায়গা। নিরিবিলি পরিবেশে এখানে থাকার আনন্দ ছিল। এখন সেই জায়গা যা হয়েছে, দেখে ভাবতেই পারা যাবে না আগে কী ছিল। সে জায়গার আপাদমস্তক জুড়ে কুখ্যাত ওঁছা বস্তি। ময়দানকে কবর দিয়ে সেখানে ঠাঁই নিয়েছে নিম্নমধ্যবিত্তের গায়ে গায়ে লাগানো ঘিঞ্জি 'চাওল'। আমার বোন কামু তখন জাপানে। সেই সময় ১৯২৭ সালের ২৩শে জুন তহমিনা নতুন ফ্ল্যাটে আসার পর কামুকে লিখেছিলেন।

> মেবি নাটা পিয়ারা ফ্ল্যাট। এসে যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়। দোতলার ওপর। পাড়াটাও অতি চমৎকার। সামনে ময়দান। ফলে দম বন্ধ চাপা ভাব স্পর্শই করতে পারে না। বাগান নেই বটে, কিন্তু ময়দান আছে—আর কী চাই। সামনের দিকে একটা বড়ো ঘর। পর্দা দিয়ে সেটাকে দুখানা করে নিয়েছি। তার একটাতে বসি, অন্যটাতে খাওয়াদাওয়া করি। আর আছে দুটো ছোট ঘর। আর সুন্দর একটা স্নানঘর। দুটো ছোট ঘরের একটা আমাদের বেডরুম। অন্যটা সেলিমের 'নীড়'। সেখানে মাথা গুঁজে থাকে ওর নিজের নক্‌শায় তৈরি বন্দুকের আলমারি, ওর ডেস্ক, আমাদের বুককেস আর কয়েকটা আয়েশি চেয়ার। সেলিম সেখানে খোশমেজাজে থাকে। ওর ঐ গর্ত ছেড়ে নড়তে চায় না। কেউ বিরক্ত করলে সাহেবের গোঁসা হয়। আব্বার ওয়রিশান হিসেবে চিনেমাটির জিনিস এবং আর যা সব পেয়েছি, তাই দিয়ে আমাদের ফ্ল্যাটটা যা খোলতাই হয়েছে কী বলব। আমরা জ্যাকবীয় (সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম জেম্‌সের রাজত্বকাল) আমলের আসবাব কিনেছি, কিছু তৈরি করিয়েও নিয়েছি—আর সত্যি বলতে কি, 'যদিও বলাটা উচিত নয়', সব মিলিয়ে ফ্ল্যাটটা হয়েছে চেয়ে দেখার মতো। খাবার ঘরের টেবিলে টেবিলক্লথের বদলে রেখেছি ম্যাট আর হাত তোয়ালে। ভালো কাঠের টেবিল। নিখুঁত পালিশ। দেখতে ডিম্বাকৃতি।...মিসেস নাইডু আর পদ্মজা কাল রাতে আমাদের সঙ্গে খেলেন। খুব জমেছিল। দুজনেরই আছে মানুষকে মুগ্ধ করার ক্ষমতা। এত সুন্দর কথা বলেন। আর এমন রসিয়ে রসিয়ে রগড় ক'রে বলেন যে, হাসতে হাসতে আমাদের পেট ফেটে যাচ্ছিল।...

হঠাৎ একদিন বেরিয়ে পড়ল, আমাদের সেই তিনতলা বাড়িটার সর্বোচ্চ তলার বাসিন্দা আমার ইস্কুলের সময়কার বাল্যবন্ধু ওসমান সোভানি। ওসমানের বড়োভাই উমর খিলাফত অসহযোগ আন্দোলনে যতটা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়েছিল, ততটা না হলেও, রাজনৈতিক বড়ো বড়ো চাঁইদের বেশ ঘরের লোক হয়ে উঠতে পেরেছিল ওসমান। মওলানা শওকত আলি, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, শোয়েব কুরেশির মতন সব নামীদামী নেতা তাঁরা। আইবুড়ো ওসমানের সুন্দর সুরুচিপূর্ণভাবে সাজানো ফ্ল্যাটে তাঁদের পায়ের ধুলো পড়ত। রাজনীতি আমাদেরও অচিরে জলে নামিয়েছিল। কিন্তু আমরা ডাঙা ছেড়ে বেশি দূরে যাইনি। কারণ, আমার আর তহমিনার দুজনেরই

কিছু জিগরি দোস্ত ছিল 'বিরোধী দলে'। কী ভারতীয় কী ব্রিটিশ। তাদের সঙ্গে বন্ধুবিচ্ছেদ হয়, সেটা আমরা চাইনি। এ ছাড়াও, প্রকৃতিবিজ্ঞান পাখপাখালি—আমার এই আসল মনের টান থেকে আমি সরে যেতে চাইনি।

যেমনকার তেমনিভাবেই আমরা কৌশলে দুদিক বাঁচিয়ে চলেছিলাম। যতদূর মনে পড়ে, মিসেস নাইডু তখন কংগ্রেস সভাপতি। রাজনীতিতে তখন কখন-কী-হয় অবস্থা। প্রায়ই বল্‌তে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসছে। শ্রীমতী নাইডুকে সব সময় হাতের কাছে পাওয়া দরকার। তাছাড়া উনি ছিলেন গান্ধীজীর এমন এক ঘনিষ্ঠ সহযোগী যাকে তিনি মন খুলে সব বলতে পারেন। এইসব কারণে, মিসেস নাইডুকে বোম্বাইতে তাজ হোটেলে গিয়ে থাকতে হয়। শ্রীমতী নাইডুর ছিল ধারালো বুদ্ধিবৃত্তি, তেমনি অসাধারণ ছিল তাঁর রসজ্ঞান। আজকের মতো সেদিনও রাজনীতিকদের জাতটার মধ্যে এর শোচনীয় অভাব ছিল। মার-মার কাট-কাট অবস্থাতেও মিষ্টি কথায় সব গোষ্ঠীর সবাইকে উনি শান্ত করতে পারতেন। শ্রীমতী নাইডু নিজে রসবোধসম্পন্ন তো ছিলেনই, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, নিজেকে নিয়েও ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতে তাঁর এতটুকু বাঁধত না। তাঁর মধ্যে কোনোরকম হামবড়া ভাব একেবারেই দেখা যেত না। রাজনীতিকদের ভেতর এই গুণ খুঁজে পেতে হলে বোধহয় ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। ভেতর-মহলের লোকদের মধ্যে সম্ভবত এই একজনই ছিলেন যিনি গান্ধীজীর সঙ্গে সমানে সমান হয়ে হাসা পরিহাস করতে পারতেন, সেইসঙ্গে পরস্পরকে চিমটি কাটতে পারতেন। গান্ধীজী নিজেও কেউ ভালো রসিকতা করলে, এমন কী সেটা তার নিজের গায়ে বিঁধলেও তারিফ করতে জানতেন। নাইডু নিজেদের মধ্যে ঘরোয়া আড্ডায় মহাত্মাকে মিকি-মাউস আখ্যা দিতেন। গান্ধীজী হালকা মেজাজে ফোকলা মুখের হাসি হেসে তা মেনে নিতেন। রাজনীতিতে আসবার আগে থেকেই শ্রীমতী নাইডুর সঙ্গে তৈয়বজী পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিশেষ ক'রে, এই পরিবারের যাঁরা বরোদায় থাকতেন। বরোদা গোষ্ঠীর কুলপতি ছিলেন আমার আব্বাস মামা। ১৯৩০ সালে বর্দোলি আর লবণ-সত্যাগ্রহে গান্ধীজীর সহযোদ্ধা হয়েছিলেন আব্বাস মামা। ওসমানের বাড়িতে এসে একবার মিসেস নাইডু জানতে পারেন যে, ওর নীচের তলাতেই আমি আর তহমিনা থাকি। সেই থেকে ওপরে ওঠানামা করতে গিয়ে আমাদের ফ্ল্যাটে একবার ঢুঁ দিতেনই। তাতে লৌকিকতার কোনো মোড়ক থাকত না। যেমন আমরা, তেমনি উনিও এতে খুশি হতেন। আসর জমাতে, গল্পগাছা করতে এবং আর কাউকে নকল করে কথা বলতে তাঁর জুড়ি ছিল না। কখনও আমাদের শোনাতেন ওঁর সদ্য-লেখা কবিতা। পুরনো দিনের নানা কথা, নতুন কালের নানা গল্প বলতেন। তাতে মেশানো থাকত ওঁর অননুকরণীয় রসিকতা। ওঁর রাজনৈতিক সতীর্থদের দোষগুণ, ত্রুটিবিচ্যুতি আর পাগলামির বিবরণে থাকত তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি আর রসসৃষ্টির পরিচয়।

এমনি একদিন হুট্ করে এসেছিলেন। সঙ্গে এনেছিলেন দুজনকে। বোম্বাইয়ে খিলাফত আন্দোলনের নেতা মওলানা শওকত আলি। আসার ধকলে তখনও তিনি হাঁফাচ্ছেন। মওলানার সহকর্মী শোয়েব কুরেশিও ওঁদের সঙ্গে এসেছিলেন। কুরেশি ছিলেন যেমন সুপুরুষ, তেমনি অমায়িক। দুদিনেই ওঁর সঙ্গে আমাদের খুব ভাব হয়ে যায়। এরপর তিনি নিয়মিত আসতেন। মানুষটি সুকণ্ঠের অধিকারী। তিনি এসে প্রায়ই সুরেলা উদাত্ত গলায় পড়ে শোনাতেন হৃদয়-স্পর্শ করা, দেশপ্রেমে ভরপুর, ইসলামের গুণগানে পূর্ণ ইকবালের কবিতা। তাঁর কণ্ঠস্বর আমাদের কানে যেন মধু ঢেলে দিত। কবি হিসেবে ছাড়াও, ইসলামবাদের পূজারী হওয়ায় ইকবালের তিনি খুব অনুরাগী ছিলেন। ওঁর একটি আবৃত্তির ধ্বনিগম্ভীর মাধুর্য আজও আমার কানে লেগে আছে। ইউরোপে মুসলিম সাম্রাজ্যের একটি বড়ো ঘাঁটি ছিল সিসিলি। সেই দ্বীপের কী দশা হল। শিকুওয়াটিতে ছিল সেই সিসিলির যশোগান। শোয়েব ছিলেন মহা তুর্কিভক্ত এবং আনোয়ার পাশা বলতে অজ্ঞান। বলকান যুদ্ধে (১৯১২) ড. এম-এ আনসারির মেডিকেল মিশনের একজন স্বেচ্ছাসেবী হয়ে তুরস্কে গিয়েছিলেন। গোলাগুলি বৃষ্টির মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যেভাবে তিনি জানের পরোয়া না করে আহতদের উদ্ধার করে আনতেন, তা দেখে সবাই পঞ্চমুখে তাঁর প্রশংসা করেছিল।

১৯২৭ সালে ভারতে তখন সেই প্রথম রেফ্রিজারেটর বাজারে এসেছে। আমাদের পরিবারে আমি আর তহমিনাই প্রথম কিনে বাড়িতে আনি। বিশেষ ক'রে, আমের মরশুমে কেলভিনেটর থাকলে আর কথা নেই। বরফ-ঠাণ্ডা আলফন্‌সো, সে যে কী বস্তু ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না। বলতে বলতে মনে পড়ে গেল, আমাদের এক সহৃদয় বন্ধু তাঁর বাগানের আটটি সেরা আম একদিন আমাদের নাম করে পাঠিয়েছিলেন। উঁচুজাতের আমের জন্যে তাঁর বাগান ন্যায্যতই বিখ্যাত ছিল। সবে দিয়ে গেছে, এমন সময়, দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। হাঁপাতে হাঁপাতে বিপুল দেহভার নিয়ে ঘরে এলেন মওলানা। ওপরে ওসমানের ফ্ল্যাটে যাওয়ার মাঝপথে। নিজেকে অতিথিবৎসল দেখাবার চেষ্টায় তহমিনা এমন একটা ভুল করে বসল, যে ভুল পরে আর সে কদাচ করেনি—জিজ্ঞেস করেছিল, বরফ-ঠাণ্ডা আম একবারটি কি উনি মুখে দিয়ে দেখবেন? আর যায় কোথায় মহান মানুষটি সঙ্গে সঙ্গে এক কথাতেই রাজি হয়ে গেলেন। বললেন রেফ্রিজারেটরে ঠাণ্ডা করা আম কখনও তিনি খাননি। তহমিনা সবচেয়ে বড়ো ভুল করে বসল—ভদ্রতার খাতিরে আমভর্তি পুরো জামবাটিটা ওঁর সামনে ধরে দিয়ে। একজন পেল্লায় ঐ চেহারার মানুষকে ওটা দিয়ে যে ঠিক করেনি, তহমিনা সেটা পরে হাড়ে হাড়ে বুঝেছিল। আমরা রুদ্ধ নিশ্বাসে ব'সে সভয়ে দেখছি। মওলানা সেই অমৃতফল একটার পর একটা ঝড়ের গতিতে মুখে দিচ্ছেন আর মাঝে মাঝে মাথা নেড়ে আহা-হা, বাঃ-বাঃ করছেন, তার পরই ঐ অত বড়ো মানুষটার বিরাট খোলটার মধ্যে নিমেষে সব তলিয়ে যাচ্ছে। সব আম নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত অসহায়ভাবে

তাকিয়ে দেখা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করবার ছিল না। সেদিন বেশ ভালোরকমের আক্কেলসেলামি দিয়ে আমাদের মোক্ষম শিক্ষা হয়েছিল।

শোয়েব ছিলেন গান্ধী, জাতীয়তাবাদী, কংগ্রেসের লোক। পরে আদর্শ পাল্টে হন সম্পূর্ণ উল্টো পথের পথিক। আগাপাস্তলা কংগ্রেসবিরোধী, জিন্নাভক্ত আর পাকিস্তানসমর্থক। শোয়েব ছিলেন ভূপালের নবাব-সরকারের একজন মন্ত্রী। ভূপালের ভারতভুক্তির পর তিনি দেশ ছেড়ে পাকিস্তানের নাগরিকত্ব নিয়ে কেন্দ্রীয় পাক সরকারের মন্ত্রী হন।

শ্বশুরমশাইয়ের মৃত্যুর পর নিজেদের ফ্ল্যাটে চলে গিয়ে আমাদের পয়লা কাজ হয়েছিল একটা ছোটোমোটো গাড়ি কেনা। সাত হর্স-পাওয়ারের এমন একটা বেবি অস্টিন, যার ক্যানভাসের ছত্রি ওঠানো নামানো যায়। চাকায় ছিল সাইকেলের মতো লোহার স্পোক। আনকোরা নতুন গাড়ি। তার দাম পড়েছিল ১৭০০ টাকা। শক অ্যাবজর্বার আর স্ক্রিন-ওয়াইপারের দামটা ছিল আলাদা। এক গ্যালনে যেত পঁয়তাল্লিশ মাইল। বার্মা-অয়েল আর বার্মা শেল—এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর পরস্পরের মধ্যে গলা কাটা প্রতিযোগিতার ফলে পেট্রোলের দাম তখন প্রতি গ্যালন ১১ আনা। রাস্তার ধারে পেট্রোল-পাম্প তখন বড়ো একটা মিলত না। দু-গ্যালন ক্যানে পেট্রোল বিক্রি হত। তেলের টিনের রং ছিল বার্মা-অয়েলের সবুজ আর বার্মা-শেলের লাল। একটা ছেঁড়াখোঁড়া পুরনো পকেট নোটবুকে একটা হিসেব লেখা আছে, দেখছি সে সময়ে শিকারে বেরিয়ে পুণা ছাড়িয়ে লোনাব্দ গিয়ে বোম্বাইতে ফিরে আসতে আমাদের যাতায়াতী পেট্রোল খরচ পড়েছিল মোট ১ টাকা ৯ আনা।

ফোর্ট এলাকায় সাধারণত আমরা দুজনে গাড়িতে একসঙ্গে যাওয়াআসা করতাম। টাউন হলের দক্ষিণের অংশে ওর আপিসের (উইমেন্স্ কাউন্সিল) ওকে নামিয়ে দিয়ে আমি প্রিন্স অব ওয়েল্স মিউজিয়ামে। 'জেন্'কে (তহমিনার প্রিয় একজন লেখক ছিলেন জেন্ অস্টেন; তাই সে গাড়ির এই নাম রেখেছিল) পাশাপাশি লাগানো তক্তা বেয়ে উঠে তখনকার ন্যাচারাল হিস্ট্রি গ্যালারির বাইরের উঁচু বারান্দায় গাড়ি পার্ক করতাম। বোম্বাইয়ের আশপাশে—কখনও সালসেটে, মূল শহরে, কিংবা কখনও আরও দূরে। যেতাম কখনও পিকনিকে, কখনও পাখি ধরতে, কখনওবা টুকটাক শিকারে। এই গাড়িতেই গিয়েছি পুণা, ঔরঙ্গাবাদ, নাসিক আর বোম্বাইয়ের কমবেশি দুশো মাইল দূরত্বের মধ্যে ধীরেসুস্থে ছুটি ভোগ করে আসতে। রাস্তায় পিচ ছিল না। মাঝে মধ্যেই খানাখন্দ। আর তেমনি ধুলো। ঘর ছেড়ে এর বেশি দূরে যেতে ভরসা হত না। গাড়ি হালকা ব'লে দেখেশুনে পা টিপে চলতে হত। তাছাড়া ট্রাক লরি আর যমদূতের মতো ভারী যানবাহনগুলো অনবরত গাঁদাগুচ্ছের ধূলো খাইয়ে পাশ দিয়ে হুশ্ করে আমাদের টপ্কে যেত। অনেক নদীনালাতেই তখনও সাঁকো হয়নি। ফলে, ছোট গাড়ির পক্ষে অগম্য ছিল। মনে আছে, একবার পুণা-ঔরঙ্গাবাদ মেনরোড ধরে

যাচ্ছি। ভীমা নদীতে ব্রিজ না থাকায় বালির খাত বরাবর গাড়ি চালিয়ে পার হচ্ছিলাম। মাঝ নদীতে গাড়ির চাকা এমনভাবে হঠাৎ আট্‌কে গেল যে, না পারি এগোতে, না পিছোতে। সারাদিন মাঠে হাল দিয়ে ফিরছিল একজোড়া বলদ। এটা কিছু ব্যাপারই নয়, এইরকম ভাব দেখিয়ে খুব সহজস্বচ্ছন্দভাবে আমাদের গাড়িটাকে তুড়ি মেরে আধডুবন্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার করল। হালকা গাড়ি হওয়ার আর এক বড়ো সুবিধে হল, হঠাৎ পেট্রোল ফুরিয়ে গেলে একার হাতেই সেটা ঠেলেঠুলে কাছের পেট্রোল-পাম্পে বা ডিপোয় পৌঁছে যাওয়া যায়।

পুণা ছাড়িয়ে শোলাপুর অবধি কিংবা তারও পরে কিছুটা গেলে দেখা যেত—রাস্তার দুপাশে যতদূর দৃষ্টি যায় চারিদিকে ঠাসা কৃষ্ণসার। গাড়ির সামনে দিয়ে সারাক্ষণ রাস্তা পারাপার করত। গাড়ি থেকে নেমে মাঠে একটু হাঁটাহাঁটি করলেই জুতসই শিকার মিলে যেতে পারত। তার জন্যে গুলি ছোঁড়ার কোনো লাইসেন্স লাগত না। সপ্তাহান্তের 'শিকারী' নামধারীদের এটাই ছিল রেওয়াজ যে, যেসব মারা-হরিণ তাদের বাড়তি হয়ে যেত, সেগুলোকে তারা 'রেল-গতিক' ক'রে 'মরা-হরিণ' আর 'মালের মাশুল' খাতে বোম্বাইয়ের বড়োসড়ো হোটেলগুলোতে চালান করে দেওয়া হত। চালানপত্র সমেত পাঠিয়ে দেওয়া হত তাজ হোটেলেও। আগে বলাকওয়া করারও দরকার হত না। হোটেলগুলো সানন্দে প্রেরককে প্রতিটি ৫ টাকা দরে দাম চুকিয়ে ধন্যবাদসহ মাল খালাস করে নিত। যখন বৈধ শিকারের মরশুম শুরু হত, তখন এমন কী তথাকথিত হকদার শিকারীদের তরফ থেকেও প্রতিদিন হোটেলে হোটেলে বেশ কয়েক প্রস্থ চালান এসে পৌঁছুত। সেইসময় খাদ্যতালিকায় অবাধে হরিণের মাংসের উল্লেখ থাকত। ওসব জায়গার তুলো চাষের কালো মাটি বর্ষায় যখন প্যাচপ্যাচে কাদা হয়ে থাকত, তখন পুড়ত হরিণদের কপাল। থিকথিকে কাদায় জোরে ছুটে চটপট তারা পালাতে পারত না। তাদের সেই অসহায়তার পূর্ণ সুযোগ নিত পেশাদার শিকারীর দল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় ঢিলেভাব দেখা দেওয়ায় বিশেষ ক'রে, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এই ধরনের ব্যবসায়িক জীবহত্যা সাংঘাতিক আকার নেয়। তার সুযোগ করে দিল চার-হুইল-ড্রাইভের জীপগাড়ি, প্রচণ্ড জোরালো স্পট-লাইট মুক্তহস্তে আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স দেওয়া (ফসল রক্ষার অজুহাতে) ফলে, এই এলাকা থেকে কৃষ্ণসার একেবারে ঝাড়েবংশে লোপাট হয়ে গেছে।

আমাদের 'ইউনিটি হল' বাড়িটাতে প্রায়ই আসতেন সরোজিনী নাইডু আর তাঁর মেয়ে পদ্মজা। বাড়িতে যখন যা হত, আমাদের সঙ্গে ব'সে খেয়ে যেতেন। পরে 'জেন'-এ তুলে আমরা তাঁদের হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসতাম। ছোট দুর্বলাকায় ঐ গাড়িতে চারজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের স্বচ্ছন্দে জায়গা হয়ে যেত। একদিন সেই হিসেব গোলমাল করে দিলেন মওলানা শওকত আলি। সে এক স্মরণীয় ঘটনা। সামনের সিট ছাপিয়ে পেল্লায় আকারের শরীরটা নিয়ে বসেছেন মওলানা সাহেব। ড্রাইভারের

সিটে আমি। পেছনে ঠাসাঠাসি ক'রে ব'সে সরোজিনী আর তহমিনা। ফলে, গাড়িটা 'হয় যদি সুজন, তেঁতুল পাতায় তিনজন' বলতে পারেনি। ভারী ওজনের ঠেলায় গাড়িটা মওলানা সাহেবের দিকে হাস্যজনক ভাবে টাল খেয়ে গিয়েছিল। গাড়িটি যারা তৈরি করেছিল, তারা এ দৃশ্য দেখলে অবশ্যই আনন্দে আটখানা হত। দেখে বুঝত, 'ক্ষুদ্র যাহা তাহা ক্ষুদ্র নয়'—দায়ে পড়লেও সেও অসাধ্য সাধন ক'রে সবাইকে তাক লাগাতে পারে।

□

৭

কাজের পেছনে হন্যে ১৯২০-৯ আর জার্মানিতে ১৯৩০-৯

আমি তখন হন্যে হয়ে কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছি, পাচ্ছি না। জীববৃত্তান্ত বিষয়ে কেউ জুতসই কোনো কাজে লাগালে বর্তে যাই। এই ভেবে ঘাস-বিচালি-ঘাস করে চলেছি। আমার সম্পর্কিত ভাইরা করুণাপরবশ হয়ে তাঁদের তুলো রপ্তানির কারবারে, এন. ফতেআলি অ্যাণ্ড কোম্পানিতে আমাকে করণিকের একটা অস্থায়ী চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলেন। আমি সগর্বে সেই পদটির একটি জমকালো নামকরণও করে নিলাম—'ফালতু সহায়ক উপ-অবর হেড মুন্‌শি—গরকায়েম'। যে মাসমাইনেকে আলঙ্কারিক ভাষায় 'দস্তুরি' বলা হত, তার পরিমাণ ছিল আরম্ভে ১৫০ টাকা। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই জাপানে ওঁদের সূতোকল সংক্রান্ত শাঁসালো মক্কেল ফেল মেরে যাওয়ায় কোম্পানি রীতিমতো চোট খায়। তার ফলে, আমার মাইনেটাও ধপাস ক'রে ১০০ টাকায় পপাত ধরণীতলে হয়।

নিতান্ত ঠেকায় প'ড়ে অবস্থাগতিকে চাকরিটা আমাকে শোকরগুজারি ক'রে নিতে হয়েছিল। তাতে প্রাণের সায় ছিল না। আমার মেহেরবান নিয়োগকর্তাদের আপিসে রুটিনমাফিক কাজের মা-বাপ ছিল না। অতীতে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা, তার জোরে আমার আশা ছিল, আপিসের কাজে যাহোক একটা শৃঙ্খলা আনতে পারব। সব সত্ত্বেও সে চেষ্টা আমি করেওছিলাম। সেই কোন্ ১৮৭০ সাল নাগাদ পত্তন হওয়া সাবেকের এই প্রতিষ্ঠান। বৈষয়িক কর্মনির্বাহে তার কোনোই বিধিনিয়ম নেই। এত রকমের উত্থানপতন সাম্‌লে কী ক'রে আজও টিঁকে রয়েছে, সেটা ভেবেই আমি অবাক হয়েছি। সখেদে কবুল করছি, আমার সেই প্রারম্ভিক আশাবাদ আর দাগরাজির চেষ্টা সবই মাঠে মারা গেল। আমি বুঝতে পারলাম যে, ঐ কাছাখোলা পরিবেশে আমি কোনোরকম দাগ কাটতে পারিনি, তাছাড়া কর্তাদের মধ্যে পরিবর্তন আনার তেমন স্পৃহা ছিল না। সুতরাং, আমিও হাল ছেড়ে দিলাম। এত দিনের এত ঝড়ঝাপটা সহ্য করেও এন, ফতেআলি অ্যাণ্ড কোম্পানি যে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছে, তার একমাত্র কারণ শত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও পার্টনার পাঁচ ভাইয়ের আশ্চর্যজনক একতা

এবং প্রতিকূল অবস্থাতেও ঠাণ্ডা মাথায় পরস্পর খাপ খাইয়ে চলা।

এই সময় আমার আরেকজন আত্মীয়, যিনি তখন এডেনে তাঁর শাখা অফিস খুলতে চলেছিলেন, তিনি চাইলেন আমি তাঁর ব্যবসায় যোগ দিই। আমার বেকার অবস্থায় তাঁর প্রস্তাবটি আর্থিক দিক দিয়ে খুবই লোভনীয় ব'লে মনে হয়েছিল। এ সত্ত্বেও আমি যে তখন লোভ দমন ক'রে সে-প্রস্তাব উপেক্ষা করতে পেরেছিলাম, সে কথা ভেবে আনন্দ পাই। কেননা খুবই সফল ঐ বকধার্মিক ব্যবসায়ীটির যা পূর্বইতিহাস এবং যা সব দুনম্বরি ব্যাপার-স্যাপার ছিল, তাতে আমাকেও তিনি নিঃসন্দেহে ভিড়িয়ে নিতে চেয়েছিলেন। সেই অরুচিকর কাজ করতে আমার মোটেই প্রবৃত্তি হত না।

আমার কপাল ভালো যে, ঠিক এই সময় সোসাইটি বোম্বাই সরকারকে সমানে পটিয়ে পটিয়ে প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ মিউজিয়ামের নতুন চালু হওয়া প্রকৃতিবিজ্ঞান বিভাগে গাইড লেকচারারের পদে টাকা বরাদ্দ করতে রাজি করাতে পেরেছিল। আমি ঐ পদের প্রর্থী হই। সিলেকশন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন রেভারেণ্ড ফাদার ব্ল্যাটার। প্রার্থীপদে আমার নাম তিনি জোরালোভাবে সমর্থন করেন। ফাদার ব্ল্যাটার আর কিউরেটর প্রেটার—এই দুজনের জন্যেই কাজটা আমি পেয়ে যাই। প্রেটারের অধীনে থেকে গাইড-লেকচারারের কাজটা করতে হবে। আমি আর আমার দুলাভাই শাম্‌স্ ঠিক করেছিলাম যে, সে সময়কার চমৎকার এক ব্যাঘ্রাঞ্চল হায়দ্রাবাদের আদিলাবাদের উমুর বনভূমিতে গিয়ে ছুটিতে আমরা মজা ক'রে বাঘ শিকার করব। অদৃষ্টের এমনই বিধান যে, ঠিক ঐ পক্ষকালের মধ্যেই সিলেকশন কমিটির বৈঠক পড়ে যাওয়ায়, আমি তার একজন প্রার্থী হওয়ায়, বিরসবদনে আমাকে শিকারের দল থেকে বাদ যেতে হল। (পরে দেখা গেল, এই শিকার অভিযানের পরিণতি মর্মান্তিক হয়েছিল)। নতুন কাজ সবে আমি শুরু করেছি, এমন সময় বাঘের হাতে প'রে শাম্‌স্-এর মৃত্যুর খবর এল। তার গুলিতে জখম হওয়া বাঘটার পেছন পেছন ধাওয়া করার সময় ও যথেষ্ট সাবধান হয়নি। ফলে, বাঘ তাকে ছিঁড়ে খায়। ওর দুঃসাহসী তরুণ সঙ্গী আজিজ বাঘটার দিকে তেড়ে গেলে, বাঘ তাকেও বীভৎসভাবে আঁচড়ে কামড়ে দেয়। ওর ভাগ্য ভালো থাকায় সময়মতো বোম্বাইতে বেশ কয়েক সপ্তাহ মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই ক'রে সুচিকিৎসার গুণে ভালো হয়ে যায়।

আমার বড়ো বুবু আশরাফের সঙ্গে শাম্‌স্-এর বিয়ে হয়। শাম্‌স্ তার নিজের মর্জিতে চললেও মানুষটা ছিল অসাধারণ। একটু যেন কেমন ধরনের, তবু ওকে ভালো না বেসে পারা যেত না। সদাশিব মানুষ। নানা দিকে ক্ষমতাও ছিল। যেটা ধরত, গড়পড়তাদের চেয়ে ঢের ভালোভাবেই সে কাজ হাসিল করতে পারত। যতক্ষণ না সেটা তার পেশায় কিংবা পারিবারিক দায়দায়িত্বে ব্যাঘাত ঘটাত। ডাকটিকিট সংগ্রহ, শখের থিয়েটার করে বেড়ানো, গানবাজনা, দিনের পর দিন ক্রিকেটে আম্পায়ারিং করা আর নিত্য ক্লাবে যাওয়া—এইসব কাজে উদাম আর সময়ের অপব্যয় করতে

কখনও সে কসুর করত না। তবে তার সবচেয়ে প্রিয় ছিল বড়ো বড়ো জন্তু শিকার করা। বিধির এটাই বিড়ম্বনা যে, তাতে কখনই তার কপাল খুলত না। বাঘ মারবে—এটাই ছিল ওর জীবনের বড়ো সাধ। সেই আশাতেই ও যেন বেঁচে ছিল। ঘটনাক্রমে সেই আশা বুকে নিয়েই সে মারা গেল। এমনই শিকার-পাগল ছিল সে, যার জন্যে ফচ্‌কেরা ওর নাম দিয়েছিল 'নবাব হরদম শিকার জঙ্গবাহাদুর'।

নতুন প্রকৃতি পাঠ বিভাগের পাঠ্যসূচি তৈরি আর ব্যবস্থাপনার কাজটাতে আনন্দ পাচ্ছিলাম। প্রকল্পটির এই স্বল্প আয়ুস্কালের মধ্যেই যোগদানকারী ইস্কুলের বিদ্যার্থী আর শিক্ষকদের প্রকৃতিপাঠ বিষয়ে বুঝবার আগ্রহ আগের চেয়ে বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে ব'লে মনে হল। সাধারণ মানুষের মধ্যেও মিউজিয়ামের এই বিভাগটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠার স্পষ্ট লক্ষণ দেখা গেল। গোড়ায় কয়েকটি মাত্র মাধ্যমিক আর উচ্চ বিদ্যালয় আমরা বেছে নিয়েছিলাম। আগে থেকে বলা কওয়া ক'রে পালা ক'রে তারা ক্লাসের ছাত্রদের পাঠাত। প্রাণিজীবন সম্পর্কে সাদামাঠাভাবে গল্পচ্ছলে তাদের বলা হত। সেইসঙ্গে থাকত ম্যাজিক-লণ্ঠনের ছবি, মডেল আর মিউজিয়ামের সংগ্রহ করা নানা নিদর্শন। আমার বিশেষ ভালো লাগত অন্ধদের স্কুলের ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলতে। কারণ, তাদের জানবার অসাধারণ আগ্রহ ছিল। তাদের জন্যে বিশেষভাবে তৈরি মাথার খুলি আর হাড়গোড়গুলো কেবল ওপরসা হাত বুলিয়েই ওরা রপ্ত করে ফেলত। শারীরবিদ্যার বিষয়টা এইভাবে যেন মন্ত্রশক্তিতে সব কিছু খুঁটিয়ে আগাগোড়া আয়ত্ত করে ফেলত। দেখে আমার তাক লেগে যেত। সোসাইটির প্রকৃতিবিষয়ক এই শিক্ষাব্যবস্থার উপযোগিতা আর সাফল্য ছিল দেখবার মতো। কিন্তু হলে হবে কী, বোম্বাই সরকার আর্থিক অনটনের বাজে ছুতো দেখিয়ে মাত্র তিন বছর চলার পর টাকা যোগানো বন্ধ করে দেয়। অথচ এই খাতে সরকারি খরচ খুবই নামমাত্র ছিল। এতদনুযায়ী, স্বাধীনতা হতে না হতেই আমি আর প্রেটার যথাক্রমে সোসাইটির কিউরেটার আর অবৈতনিক সচিব হিসেবে উঠেপড়ে লাগলাম প্রকৃতি পাঠ প্রকল্পটিকে নতুন ক'রে আবার বাঁচিয়ে তুলতে। বোম্বাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তখন বি-জি খের। দরদি অমায়িক মানুষ হওয়ায় তাঁকে আমরা এমনভাবে চেপে ধরলাম যে, তিনি আর 'না' বলতে পারলেন না। সংগঠনের ভার দেওয়া হল এম. আর রাউতকে। প্রকল্পটির বহর আর কাজকর্মের পরিধি বাড়িয়ে দেওয়া হল। সময়টা ছিল ১৯৪৯-এর কাছাকাছি। সেই থেকে প্রকল্পটি টগবগ করে এগিয়ে চলেছে। ইদানিং মহারাষ্ট্রের যুবসম্প্রদায় আর সাধারণ মানুষের মধ্যে বন্যপ্রাণি আর প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার যে চেতনা আর আগ্রহ বাড়ছে, তা সত্যিই নজরে পড়ার মতো। প্রকৃতি এটা যে অংশত প্রকৃতিপাঠের এই কর্মকাণ্ডের ফলেই সম্ভব হয়েছে তা মানতেই হবে।

যাই হোক, আমি যে দুটি বছর ধরে সাইড লেকচারারের কাজ চালিয়ে গিয়েছি, আমার পক্ষে সেটাই ছিল যথেষ্ট। আমি এটা মালুম করতে পারছিলাম যে, পাখিই হল

আমায় আসল বিষয়কর্ম। কাজেই ঠিক করলাম যে, সে কাজে স্থিতু হওয়ার আগে পাখি-সংক্রান্ত বিধিবদ্ধভাবে ক্ষেত্রসমীক্ষার পাঠ্যক্রমটি আমাকে সেরে ফেলতে হবে। আমার আশা, পরিণামে সেটাই হবে আমার সর্বক্ষণের বৃত্তি। তা তো হল, কিন্তু অতঃপর পেটের ক্ষিধে মিটবে কেমন ক'রে? ও নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাইনি। ভারতীয় প্রাণিতত্ত্বের রাজ্যে পক্ষিবিদ্যা চিরদিন দুয়োরানি হয়ে থেকেছে। এমন কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান নেই, যেখানে এ বিষয়ে ট্রেনিং নেওয়া যায়। ব্রিটিশ মিউজিয়াম (প্রকৃতি বৃত্তান্ত) আর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের জুওলজিক্যাল মিউজিয়ামে চিঠি লিখে আমি জানতে চেয়েছিলাম যে, ওদের ওখানে কতটা সুযোগ সুবিধে আছে। ভারত আর ব্রিটেনে রাজনৈতিক দিক থেকে দা-কুড়ুল সম্পর্ক। অর্ধনগ্ন ফকিরের কিনা এতদূর সাহস যে, মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের সঙ্গে একপঙক্তিতে ব'সে বৈঠক করতে চায়। শুনেই তো চার্চিলের মুখ হয়ে গেছে প্যাঁচার মতো। দুদেশের সম্পর্ক তখন এতই একতরফা আর তিক্ততায় ভরা যে, ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ঠাণ্ডা জল ঢালা এড়ো এড়ো চিঠির ভাব দেখেই বুঝে গিয়েছিলাম যে, ওখানে কাজ করাটা সুবিধের হবে না। অন্যদিকে, অধ্যাপক এরভিন স্ট্রেসেমানকে তখনও আমি ব্যক্তিগত ভাবে না চিনলেও তিনি আমাকে স্বাগত জানিয়ে এমন আন্তরিকতার সঙ্গে সাড়া দিয়েছিলেন যে, তাঁর চিঠি পড়ে আমি মুগ্ধ হই। সঙ্গে সঙ্গে বার্লিনে যাওয়ার সঙ্কল্প করে ফেলি।

প্রাণিদের শ্রেণিভুক্তি বিষয়ক হাতেকলমের প্র্যাক্টিক্যাল ট্রেনিঙের অঙ্গ হিসেবে তাঁর অধীনে কাজ ক'রে আমি ভারতীয় পাখি নিয়ে একটি সংকলন প্রকাশ করি—এটা ছিল স্ট্রেসেমানের মনোগত অভিপ্রায়। তখন সবে বর্মা থেকে প্রায় ২০০ পাখির একটি সংগ্রহ এসে গিয়েছিল। এটি সম্ভবত হেনজাদা জেলা থেকে আমাদের সোসাইটির উদ্যমী সদস্য জে. কে. স্ট্যানফোর্ড, (আই.সি.এস.) যোগাড় করেছিলেন। একাজে তাঁর সহায়ক হয়েছিলেন সোসাইটির পশুচর্ম সংরক্ষণপটু ঈ. হেনরিক্স্। স্ট্যানফোর্ড এই সংগ্রহের কাজটি করেছিলেন ড. ক্লোদ বি. তিসেহার্স্টের নির্দেশক্রমে। এটা নিয়ে তিনি যা করার নিজেই করবেন স্পষ্টত সেটাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কোথাকার কে একজন আনাড়ি ভারতীয়কে দিয়ে একাজ করানোর কথা ভাবা হচ্ছে দেখে ভদ্রলোক তো রেগে কাঁই। তাও আবার কি, না একজন লক্ষ্মীছাড়া জার্মানের সহায়তায় (কাইজারের সঙ্গে যুদ্ধটা মিটতে না মিটতেই)। আমাকে বিন্দুবিসর্গ জানতে না দিয়ে সোসাইটিকে তিনি যা নয় তাই ব'লে একটা কড়া চিঠি দিলেন। এও জানালেন যে, স্ট্যানফোর্ড কিছুতেই এই হেনস্থার ব্যাপারটা মেনে নেবেন না। তখন সোসাইটির অবৈতনিক সচিব ছিলেন সার রেজিনাল্ড স্পেন্স। তাঁর আর প্রেটারের আস্থা ছিল আমার এলেমের ব্যাপারে। তাঁরা এ বিষয়ে একমত হলেন যে, স্ট্রেসেমানের সাহায্যে আর পরিচালনায় এতে একটা কাজের কাজ হবে। সোসাইটির সিদ্ধান্তের ব্যাপারে স্ট্যানফোর্ডের সত্যিই গুরুতর কোনো ক্ষোভ ছিল কিনা, সে বিষয়ে লিখিত পড়িত কোনো প্রমাণ নেই।

তিসেহার্স্তের এটা নিছক আপ্তগরজী কল্পনা ছিল কিনা, তাও জানা যায় না। সে সময়ে কিংবা তার পরেও স্ট্যানফোর্ডকে এ বিষয়ে সরকারি বা বেসরকারিভাবে কিছু বলতে শোনা যায়নি। বরং, সুইডেনের উপ্‌সালায় আন্তর্জাতিক অর্নিথোলজিক্যাল কংগ্রেসে, অথবা পরে কোনো সভাসমিতিতে দেখা হলে, কিংবা পত্রবিনিময়ে আমি সব সময় তাঁর সৌহার্দ্যপূর্ণ আন্তরিক মনের স্পর্শ পেয়েছি।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, সৌভাগ্যক্রমে পক্ষিতাত্ত্বিক হিসেবে বার্লিনযাত্রা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। সে সময়ে আমি ছিলাম একজন অখ্যাতনামা উঠতি পক্ষিতাত্ত্বিক মাত্র। স্ট্রেসেমান তখন ব্যক্তিগতভাবে আমাকে চিনতেনও না। এ সত্ত্বেও একেবারে প্রথম দিন থেকেই যেভাবে আমাকে তিনি সস্নেহে কাছে টেনে নিয়েছিলেন, যেভাবে লেগে থেকে হাতে ধ'রে কাজ শিখিয়েছেন, কীভাবে কী করব তার দিশা দেখিয়েছেন, তাতে আমার মন ভরে গিয়েছে। যতদিন তাঁর সঙ্গে থাকার সুযোগ পেয়েছি, কখনও এর ব্যতিক্রম হয়নি। মানুষটা ছিলেন একেবারেই সাদাসিধে। কোনোরকম হামবড়া ভাব ছিল না। অত বড়ো ডাকসাইটে পণ্ডিত, কিন্তু বাইরে থেকে বোঝবার জো ছিল না। তাঁর চনমনে, প্রায় বালকোচিত টরটরে ভাব দেখে কে বলবে ঐ মানুষটা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একজন বিদ্যের জাহাজ। ওঁর কাছেই আমি নাড়া বাঁধি। বন্ধু বলতেও উনি। শেষ পর্যন্ত আগাগোড়া ওঁকে আমি গুরু ব'লে মেনে এসেছি। শ্রেণিভুক্তিকরণ, বাস্তুসংস্থান বা প্রাণিভৌগোলিক বিষয় নিয়ে যখনই ফাঁপরে পড়েছি, ওঁর সাহায্য-সহযোগিতা প্রার্থনা করেছি। সঙ্গে সঙ্গে সবিস্তারে লিখে সমস্যার জট ছাড়িয়ে আমাকে তিনি খেই ধরিয়ে দিয়েছেন। সবটাই হাতে লেখা। সাঁট না বুঝলে সে লেখার পাঠোদ্ধার করা বড়ো সহজ ছিল না। কাগজে লাইনগুলো তেরছা হয়ে যেত। তাঁর যুক্তিতে কোথাও কোনো ফাঁক থাকত না। সঙ্গে যথোপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ। তাতে দ্ব্যর্থব্যঞ্জকতার বালাই থাকত না। সারা বিশ্বে ছড়ানো তাঁর অনুগামী। তার একজন মাত্র আমি। কী ক'রে যে স্ট্রেসেমান ঠিক যথাসময়ে সকলের চিঠির জবাব দিতেন। তার জন্যে বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান লেখালিখি থেকে শেষতম খবরটিও তাকে নখাগ্রে রাখতে হত। আবার তারই সময় ক'রে নিয়ে নিজের গবেষণা চালিয়ে যেতে হত। আর তারই সঙ্গে বিশ্বের পক্ষিতত্ত্ববিদদের প্রবীণ অগ্রজ হিসেবে আরও নানা দায়দায়িত্ব স্বভাবতই তাঁর ঘাড়ে এসে পড়ত। একা হাতে এত কিছু কী ক'রে যে তিনি সামলান, এটা যখনই ভেবেছি, আমি অবাক না হয়ে পারিনি।

কম বয়সে যাঁরা আমার মধ্যে পাখি সম্পর্কে আগ্রহ জাগাতে সাহায্য করেন, তাঁদের একজন ছিলেন বি. এন. এইচ. এস-এর কিউরেটার কিনেয়ার। গান্ধীবাদী যুগে ভারত-ব্রিটিশ সম্পর্ক বিষিয়ে যায়। সেইসঙ্গে মিলেছিল ব্রিটিশ মিউজিয়ামের নামের জাদু। দেখলাম এই দুইয়ের ফেরে প'ড়ে কিনেয়ার আর সে কিনেয়ার নেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে এসে পরে বার্লিনে পাকাপাকিভাবে ফিরে তাঁর ভোল বদ্‌লে

গিয়েছিল। বার্লিনে থাকা যে বিখ্যাত ভারতীয়দের আমরা ১৯২৯ সালে দেখি, তার একজন ছিলেন চম্পকরমণ পিল্লাই। ভারতের অস্থায়ী সরকার নামধারী বিপ্লবী দলের 'দেশত্যাগী' সদস্য। কাইজার এই সরকারকে কিছুটা স্বীকৃতি দেন। এর সভাপতি রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ভারিক্কিভাব নিয়ে চললেও, ছিলেন একটু ভ্যাব্‌লাগোছের লোক। উত্তর প্রদেশের তাঁর তালুকদারি বাজেয়াপ্ত করা হয়। অস্থায়ী সরকারের আরেক সদস্য এম. এন. রায় মস্কোয় গিয়ে তাঁর কর্মস্থল বদল করে নেন। তাঁকে না দেখলেও, এটাই আমার ধারণা। ইউরোপে যুদ্ধ যখন চলছে, পিল্লাই নাকি তখন ঘন ঘন কাইজারের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁকে জানাচ্ছেন—ভারতের ভেতরে অস্থায়ী সরকারের পক্ষভুক্ত লোকেরা কীভাবে অন্তর্ঘাতী (ব্রিটিশবিরোধী) প্রচার সমানে চালিয়ে যাচ্ছে। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের মতোই পিল্লাই ছিলেন মনে মুখে এক অকপট মানুষ। মুখে বলার চেয়ে কাজে করা আর ব্যবহারিক দিকটা নজরে রাখা এটাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাঁর নেতার সঙ্গে তাঁর ছিল এই জায়গাতেই তফাত। জার্মানি হেরে যাওয়ার পর এঁদের মাথার দাম হেঁকে ভারতের ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা জারি করেছিল। কাজেই নিজেদের মাথা বাঁচাতে দুজনেই জার্মানিতে থেকে গিয়েছিলেন। পিল্লাই যে একজন ভালো রাঁধুনি, একসময়ে আমরা তা আবিষ্কার করে ফেললাম। সময় সময় মশলার বদ্‌লি কীসব যেন দিয়ে ভারতীয় নানা মুখরোচক রান্না আমাদের তিনি রেঁধে খাওয়াতেন। ভারত স্বাধীন হলে, দীর্ঘ বহু বছর পর একবার তিনি তার জন্মস্থান কেরলে ফিরেছিলেন। কিন্তু পরে আবার জার্মানিতে ফেরত চলে যান এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। কাইজার রাহুর দশায় পড়ার পর রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ চলে গিয়েছিলেন জাপান। দেশ স্বাধীন হলে তিনি ভারতে ফিরে এসে পাকাপাকিভাবে দেরাদুনের বাসিন্দা হন। সেদিনের নেহরু সরকার এবং ব্যাপক সাধারণ মানুষ তাঁকে নিয়ে সেভাবে হৈ-হল্লা না করায় নিশ্চয়ই তাঁর বেশ একটু স্বপ্নভঙ্গের কারণ ঘটেছিল, যারা তাঁকে চিনত, তাদের কাছে সেটা এমন কিছু অপ্রত্যাশিত ব'লে মনে হয়নি। তবে তাঁর নিষ্ঠা আর ঐকান্তিকতা ছিল, সেইসঙ্গে আদর্শের জন্যে আত্মত্যাগও করেছেন, একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের জুওলজিক্যাল মিউজিয়ামে কাজ করার সময় বার্নার্ড রেন্‌শ-এর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়। ও ছিল এক তরুণ তীক্ষ্ণধী প্রাণিতত্ত্ববিদ। এর আগে ও সুণ্ডা দ্বীপপুঞ্জ থেকে পাখি আর অন্যান্য গোষ্ঠিভুক্ত প্রাণিদের নিয়ে খুব সুবিন্যস্তভাবে নিদর্শন সংগ্রহের কাজ করেছে। প্রজাতির উদ্ভব আর ক্রমবিবর্তনের পূর্বাপর মনে রেখে সে ক্ষেত্রে আবহজনিত কারণে ভৌগোলিক তারতম্যের সমস্যা—এই ছিল ওর অনুশীলনের বিষয়। পক্ষিতত্ত্ব বিভাগে ঠিক তখনই কোনো পদ খালি না থাকায় মিউজিয়ামের ম্যালাকোলজি ডিপার্টমেন্টে নতুন লোক হিসেবে তাঁকে নিয়োগ করা হয়। ম্যালাকোলজি বলতে, মোলাস্ক বা শামুক জাতীয় অমেরুদণ্ডী প্রাণি-বিষয়ক

তত্ত্ব। এ বিষয়টিতেও বার্নার্ড বিশেষজ্ঞ ছিল। দেখা হওয়ার পরই আমাদের দুজনেরই মধ্যে ভাব জমে যায়। এদিকে তহমিনার সঙ্গেও বার্নার্ডের মিশুকে অমায়িক স্বভাবের বউ ইল্‌স্‌-এর খুব ভাব হয়ে যায়। শান্তি আর যুদ্ধের মাঝের পর্বটিতে ওরা দুজনে হয়ে যায় আমাদের ঘনিষ্ঠতম বিদেশি বন্ধু। হিটলার চেকোস্লাভাকিয়াকে 'মুক্ত' করে নেবার পর প্রাগ মিউজিয়ামের ডিরেক্টর হওয়া সমেত প্রাণিতাত্ত্বিক বিদ্বগ্ধ সমাজে বার্নার্ডকে নানা কাজে যুক্ত থাকতে হয়েছে। মাত্র বছর কয়েক আগে ম্যুন্‌স্টারের ইউনিভার্সিটি জুওলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর পদ থেকে সে অবসর নেয়। বার্নার্ড রেন্‌শ-এর জীববিজ্ঞানী হিসেবে সহজ কথায় অর্থপ্রকাশের অসাধারণ ক্ষমতা। ও ছিল ভারি সংবেদনশীল, রুচিসম্পন্ন, শিল্পীমনের তীক্ষ্ণধী মানুষ। ওর প্রতি আমার আছে গভীর শ্রদ্ধা।

মিউজিয়ামের বার্ডরুমে আরও একজনের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। আর্নস্ট্‌ মেয়ার। স্ট্রেসেমানের আরেক শিষ্য। সেও ছিল এক উজ্জ্বল উদীয়মান তরুণ। ও তখন নিউগিনি অঞ্চলে এক বড়ো রকমের পাখিসংগ্রহের অভিযান সেরে সবে ফিরেছে। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধান্তে আবার ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় যুক্তরাষ্ট্রেই। যুদ্ধ লাগার আগেও ও জার্মানি ছেড়ে চলে যায়। রথ্‌স্‌চাইল্ড-এর যাবতীয় পাখির সংগ্রহ আমেরিকান মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রি কিনে নিয়েছিল। নিউইয়র্কের সেই মিউজিয়ামে ও শ্রেণিভুক্তিকরণ আর প্রজাতীকরণ নিয়ে ব্যাপকভাবে কাজ করেছিল। আর্নস্ট্‌ এখন হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণিতত্ত্বের অবসরপ্রাপ্ত সম্মানিত এমেরিটাস অধ্যাপক। আজকের দুনিয়ায় ও নিঃসন্দেহে পয়লা নম্বরের জীববিজ্ঞানীদের একজন। দুঃখের বিষয়, আর্নস্ট্‌ ওর গুরু স্ট্রেসেমানের নিরভিমান নম্র স্বভাবটি পায়নি। ওযে যে সে লোক নয়, ওর হাবভাবে দস্তুরমতো সেটা ও বুঝিয়ে দেবে।

এখানেই আমার প্রথম পরিচয়ের সুযোগ হয় হাসিখুশি কাজপাগল জীববিজ্ঞানী অস্কার হাইন রথ আর তার অসামান্য স্ত্রী মাগদালেনার সঙ্গে। পাখিদের আচরণবিষয়ক চর্চার এরা পথিকৃৎ। আধুনিক বিজ্ঞানে একদল এটাকে বড়ো বেশি মাথায় তোলে। প্রাণিদের আচরণবৈশিষ্ট্য নিরীক্ষাশাস্ত্রের বা এথোলজির জনক বলা যায় হাইন রথকে। শারীরবিদ্যা আর অঙ্গসংস্থান, কেবল এরই ওপর ভর ক'রে আগে পক্ষিবর্গের প্রজাতিগত সম্পর্ক স্থির করা হত। এই নতুন তত্ত্বটি তার খোলনল্‌চে বদ্‌লে সংস্থিতিতত্ত্ব আর জীববিদ্যার দুস্তর ব্যবধান ঘুচিয়ে দেয়। যেসব সমস্যা আর সম্ভাবনা আগে তেমন চোখে পড়েনি, জীবন্ত পাখি নিয়ে হাইনরথের গবেষণা সেদিকে আমার চোখ পড়িয়ে দেয়। ভারতীয় পাখি নিয়ে আমার কাজগুলোতে এর ফলে একটা গতি পায় এবং তাতে বসতিশাস্ত্রের ওপর বেশি জোর পড়ে। সমালোচকেরা আমার এসব কাজের খুব তারিফ করেন।

বোম্বাই থেকে বর্মা পাখিদের সংগ্রহটি আমি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। স্ট্রেসেমানের

অধীনে এ নিয়ে কাজ করার ফলে, শ্রেণিভুক্তিকরণের প্রয়োগকৌশল আর কার্যক্রম সম্পর্কে আমার সঠিক ধারণা গড়ে ওঠে। এর কোথায় কী চোরাগর্ত আছে, সে বিষয়েও আমি অবহিত হই। তার মধ্যে আছে—সূক্ষ্ম 'বিশ্বাসের সূচিমুখে'র সূত্রের ভিত্তিতে হঠকারী সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর বিপদ। মিউজিয়ামে ব'সে কাজ করা ছাড়াও জার্মানিতে পড়ার ছুটি নিয়ে গিয়ে আমি এমন একটা সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলাম, যা হাজারে একটা মেলে। হেলিগোল্যাণ্ড দ্বীপে তখন পরম উৎসাহী ড. রজল্ফ্ দ্রোস্ত-এর পরিচালনায় পাখিদের প্রব্রজন বিষয়ে তত্ত্বতল্লাসের কাজ চলছিল। স্ট্রেসেমানের খুঁট ধ'রে গিয়ে তাতে যোগ দেওয়ার একটা সুযোগ জুটে গেল। জার্মানির মূল ভূখণ্ড থেকে মাইল তিরিশ দূরে এল্‌বে আর ভেজের নদীর মোহানায় উত্তর সাগরের জল ফুঁড়ে উঠেছে ঊষর পর্বতময় এই হেলিগোল্যাণ্ড দ্বীপ। এটা উত্তর থেকে উড়ে-আসা পরিযায়ী পাখিদের সরাসরি যাতায়াতের পথে পড়ে। ত্রিভূজাকার এই দ্বীপের পাড় বরাবর ২০০ ফুট উঁচু পাহাড়। দ্বীপের শীর্ষদেশে—অর্থাৎ ওবেরল্যাণ্ডে—এক অসমতল মালভূমি। পুরোপুরি চমৎকার সবুজ। কিন্তু সেখানে বলতে গেলে গাছের নামগন্ধ নেই। ক্রমাগত ঝড়ের দাপটে কোনো গাছ সেখানে টিঁকতে পারে না। সুতরাং, পরিযায়ী পাখিদের সেখানে টেনে আনার জন্যে ওবেরল্যাণ্ডের উত্তরপ্রান্তে প্রায় আড়াইশো হাতেরও বেশি খুঁড়ে নীচু ক'রে লম্বা আর প্রায় বাইশহাতের মতো চওড়া একটা বাগান—স্যাপকুলে—ফাঁদা হয়েছে। ঘন ক'রে লাগানো হয়েছে লতাগুল্মের ঝোপঝাড়। সেইসঙ্গে পাখিদের জন্যে মিষ্টিজলভর্তি কিছু খানাডোবা। ঝোপঝাড়ের নীচে লুকনো থাকত নরম তারের জাল। ক্রমান্বয়ে ছোট হয়ে হয়ে সামনে কাঁচ লাগানো কয়েকটা বাক্সে সেই ফাঁদে পড়া পাখিরা গিয়ে আট্‌কে পড়ত। জড়ো হওয়া পাখিগুলোকে এরপর বার ক'রে রিং পরিয়ে দেওয়া হত। মালসার মতো জায়গাটা খুঁড়ে নীচু করা বাগানের চারপাশে প্রায় ন'ফুট উঁচু কংক্রিটের পাঁচিল তুলে তার গভীরতা বাড়ানো হয়েছিল। যাতে লম্বা আগাছাগুলোকে ঝড় না শুইয়ে দিতে পারে। আমি এই হেলিগোল্যাণ্ডেই রিং বা আংটি পরানোর কারিকুরি হাতে কলমে প্রয়োগ করতে দেখার প্রথম সুযোগ পাই। এরপর আমাদের সোসাইটির বিভিন্ন ক্ষেত্রসমীক্ষায় ব্যাপকভাবে খুব সাফল্যের সঙ্গে এই কৌশল কাজে লাগানো হয়।

হেলিগোল্যাণ্ডে ফাঁদপাতা বাগান ছাড়াও আছে আনুমানিক ৪২,০০০ দীপশক্তিসম্পন্ন একটি জোরদার বাতিঘর। বসন্ত আর শরতের মেঘাচ্ছন্ন কোনো কোনো রাত্রে এর আলোকচ্ছটা হাজার হাজার পরিযায়ী পাখির দলকে চুম্বকের মতো নীচে টেনে আনে। থাম্বার চারদিক-ঘেরা কাঁচের গায়ে আছড়ে প'ড়ে হকচকানো পাখিগুলো চারপাশের চাতালে পাখা ঝটপট করতে থাকে। তখন সেই বিপুল সংখ্যক পাখি বস্তাবন্দি ক'রে নিয়ে গিয়ে তাদের পায়ে রিং পরিয়ে দেওয়া হয়। উত্তর-পূর্ব ভারতের মেঘালয়ের জাতিঙ্গা গ্রামের একটি ঘটনা নিয়ে আমাদের কিছু কিছু কাগজে রীতিমতো হৈচৈ

বাধানো খবর বেরিয়েছিল। পাখিরা নাকি সেখানে 'গণ-আত্মহত্যা' করছে। এটাও মূলত সেই বাতিঘরের টানে কাতারে কাতারে পাখিদের নেমে আসার মতন ব্যাপার। বসন্ত আর শরৎকালে পাখিদের উড়ে আসার এই মরশুমে হেলিগোল্যাণ্ডের জীববিদ্যার ঘাঁটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আর শখের পাখিদর্শনকারীদের ঢল নামে। শুধু জার্মানি নয়, ইউরোপের নানা দেশ থেকেও অনেকে আসে। সেই দলে অনন্যমনা পাকা লোকও থাকেন যথেষ্ট। এইরকম কোনো রাতে গেলে দেখা যাবে বাতিঘরের এলাকাটা উৎসাহী ছেলেছোকরাদের ভিড়ে গমগম করছে। কুড়িয়ে নেওয়া পাখিগুলোকে ছালায় ভ'রে হুড়োহুড়ি ক'রে তারা ওঠানামা করছে। বাতিঘরের 'বাজাসাহেব' হল, যে সেটা দেখাশোনা করে। যেখান দিয়ে ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গেছে, তারই একটা তলায় সপরিবারে তার বাস। তার বউ রায়বাঘিনী স্বভাবে এক খাণ্ডারনি মহিলা। ছাড়াগরু হয়ে যারা ঘুরে বেড়াত, দারোয়ানের বউ ছিল তাদের কাছে সাক্ষাৎ যম। তার কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়ার বাহানা করে মাঝ রাত্তিরে ওদের ওপর চড়াও হয়ে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করত। মহিলার সেই বজ্রহুঙ্কারের ঠেলায় হোঁতকা-হোঁতকা মুসকো লোকগুলো একেবারে কেঁচোর মতন গুটিয়ে যেত। এরপর সেই মেনিমুখোরা গুটি গুটি পায়ে সিঁড়ি ভেঙে সুড় সুড় করে পালাত। দেখে অন্যদের পেট ফেটে হাসি আসত। তবে এও ঠিক যে, বাতিঘরে রাতের সেই তাণ্ডবনৃত্য যার দেখা আছে, সে কিন্তু লবেজান মহিলাটির প্রতি মায়া বোধ না করে পারবেন না।

আবহাওয়া অনুকূল থাকলে একেক রাত্রে স্বচ্ছন্দে কম ক'রে ১,২০০ পাখিকে রিং পরানো যায়। এ রকম পয়মন্ত রাত হলে, হেলিগোল্যাণ্ডের স্থানীয় বাসিন্দারা দল বেঁধে শ'য়ে শ'য়ে এসে জুটে যাবে। তাদের মাংসের ভাঁড়ার ভরে নেওয়ার এ সুযোগ তারা ছাড়বে না। বুরুজের নিম্নভূমিতে ছত্রাকার সবুজ মাঠে মাঠে গিজ গিজ করছে পাখি। কেউ অবসাদে নেতিয়ে পড়েছে অথবা কারো চোখ ধাঁধিয়ে গিয়ে সে মাটিতে পাখসাট খেয়ে পড়েছে। কিংবা বাতিঘরের আলোয় ধাক্কা খেয়ে এখন মরণাপন্ন। এখানেই সর্বনাশের শেষ নয়। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে মড়কের শকুনি হয়ে জুটেছে যত রাজ্যের রাস্তার বেড়াল। আমাদের গরু যেমন মা ভগবতী, দ্বীপের লোকদের কাছে তেমনি হল সেখানকার বেড়াল।

এককালে কনস্তান্তিনোপোল যেমন কুকুরের দৌরাত্ম্যে কুখ্যাত ছিল সেইরকম দশা হেলিগোল্যাণ্ডের। এ সবই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেকার ঘটনা। এখন হয়তো পুরনো হাল বদলেছে। কেননা এখন বাতিঘরের আলো নরম জাল দিয়ে ঘিরে রাখার প্রথা আন্তর্জাতিকভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে। যাতে পরিযায়ী পাখিরা সটান এসে আলোর গায়ে ধাক্কা খেয়ে মরতে না পারে।

□

৮

হায়দ্রাবাদ রাজ্যে পাখিসংক্রান্ত জরিপ

কিহিমে আমি তখন বেকার অবস্থায় পরের ঘাড়ে রয়েছি। ১৯৩০-এর গোড়ায় জার্মানি থেকে ফিরেছি। চাকরি-বাকরি পাইনি। বাইরে গিয়ে যেটুকু শিখেছি পড়েছি, তা কেমন করে কাজে লাগাব ভাবছি। এই সময় প্রথম পাখি নিয়ে অঞ্চলভিত্তিক জরিপের কথা হঠাৎ আমার মাথায় খেলে গেল। ভারতীয় উপমহাদেশের বিহঙ্গ সম্পদ নিয়ে আমরা না করি কোনো চর্চা, না তার কোনো হিসেব রাখি। বিশেষ ক'রে, দেশীয় রাজ্যগুলোতে। আমি আমাদের বোম্বাইয়ের সোসাইটিকে একটা প্রস্তাব দিলাম। আমি বিনা বেতনে এইসব এলাকার পক্ষিজীবন নিয়ে সুসম্বদ্ধ ক্ষেত্রসমীক্ষা করে দিতে পারি,—এই শর্তে যে, এ বাবদ প্রকৃত ব্যয়, ঘোরাঘুরির খরচ ইত্যাদি তাঁরা তুলে দেবেন। রাজ্য বনবিভাগ আর অন্যান্য সরকারি দপ্তর থেকে আমাদের সাময়িকভাবে ঘাঁটি গেড়ে থাকা এবং স্থানীয় সহায়তার ব্যবস্থা করা হবে; সেইসঙ্গে সোসাইটির পক্ষ থেকে আমাকে দু-একজন সরজমিন সংগ্রহকারী আর চর্মসংরক্ষণবিদ ধার দেওয়া হবে। আমাদের পক্ষিবিদ্যার জ্ঞানভাণ্ডারে হায়দ্রাবাদ রাজ্যে যেহেতু শূন্যতা সবচেয়ে বেশি, তাই এই রাজ্যের কাজেই সবার আগে হাত দেব। এ কথা মনে রেখে যে, ভের্‌নে সায়েন্টিফিক সার্ভে এ জায়গার সংলগ্ন পূর্বঘাট অঞ্চলে কাজ ক'রে যথেষ্ট ফায়দা পেয়েছে। সে সময়ে নিজাম প্রশাসনের যাঁরা হর্তাকর্তা ছিলেন, তাঁরা অনেকেই ছিলেন ভারত সরকারের কাছ থেকে ধারেপাওয়া ব্রিটিশ আই-সি-এস অথবা পলিটিকাল ডিপার্টমেণ্টের লোক। তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন শিকারী আর প্রকৃতিপ্রেমিক। পাখির বিষয়ে প্রবল আগ্রহ থাকায় তাঁরা সবাই ছিলেন সোসাইটির সদস্য। সুতরাং, সোসাইটির আবেদনে সায় দেওয়াটা তাঁদের পক্ষে ছিল স্বাভাবিক। তার ওপর, তখনকার অর্থমন্ত্রী সার আকবর হায়দারি ছিলেন আমার আত্মীয়। তাছাড়া আমি ভালো কাজ করতে পারি, এরকম আস্থা এরাজ্যে আরও অনেকের থাকায় সোসাইটির প্রস্তাবে আর আবেদনে তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন। তবু নিজাম সরকারের কর্তাদের সঙ্গে চিঠি চালাচালি যেন শেষই হতে চায় না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তাঁরা তিন মাসের জন্যে ৩,০০০ টাকা অনুদান মঞ্জুর করলেন। আর তার ঠিক পরে পরেই শুরু হল

হায়দ্রাবাদ রাজ্য পক্ষিতাত্ত্বিক সমীক্ষার কাজ। ওঁদের বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করে উঠতে না পারায়, সরকার অনুদানের মেয়াদ আরও দু মাস বাড়িয়ে দেয়।

হিউ হুইস্‌লার ছিলেন ভারতীয় পাখির ব্যাপারে তাঁর সময়কার ব্রিটিশ বিদ্যার্থীদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। ঈ. সি. স্টুয়ার্ট বেকারের মতো তিনিও ছিলেন ইম্পিরিয়াল পুলিশ সার্ভিসের চাকুরে। পাঞ্জাবে থাকাকালীন চাকরি থেকে তিনি অকাল অবসর নেন। ভারতে বছর ষোলো যে সময়টা তিনি কাটান, তারই মধ্যে মাঠেঘাটে ঘুরে যেরকম সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে আর বোধবুদ্ধির সঙ্গে পাখির সংগ্রহ আর তা নিয়ে চর্চা করেন, তাতে যে কেউ মনে করতে পারে যে, তাঁর পুলিশি কাজটা নিতান্তই ছিল নৈমিত্তিক আর অবসর সময়ের। এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার আগেই শুধু পাঞ্জাব নয়, তৎসংলগ্ন কাশ্মীর আর উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেরও, এবং সেই প্রসঙ্গে ব্রিটিশ ভারতের গোটা সাম্রাজ্যেরও পক্ষিতত্ত্বের অগাধ জ্ঞান সঞ্চয় করেছিলেন। দেশে ফিরে ব্যাটল্-ইন্ সাসেক্সে স্থায়ীভাবে বসবাস করার সময় নিজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে, বিশেষ ক'রে, ভারত আর প্যালেআর্কটিকের একদিকে কর্কটক্রান্তির উত্তরস্থ ইউরোপ, আফ্রিকা আর আরবদেশ আর অন্যদিকে হিমালয়ের উত্তরস্থ এশিয়া—এইসুদ্ধ গোটা উপভূমগুলের পাখিদের নিয়ে তিনি সমানে কাজ চালিয়ে গেছেন। তবে এখন তাঁর বেশির ভাগ কাজ শ্রেণিভুক্তিকরণ বিষয়ে। আর মাঝে মাঝে হাতেকলমে সেসব জেনে নিতে মাঠেঘাটে হানা দেন।

আশ্চর্যের ব্যাপার, আমার আরও অনেক ইংরেজ বন্ধুর মতোই, হুইস্‌লারের সঙ্গেও আমার সম্পর্কের সূত্রপাত হয় ঠোকাঠুকি আর কটুকাটব্য দিয়ে। ১৯২৮ সাল নাগাদ সোসাইটির জার্নালে 'দি স্টাডি অব ইণ্ডিয়ান বার্ড্‌স্' নাম দিয়ে তিনি একটি চমৎকার ধারাবাহিক নিবন্ধ লিখেছিলেন। তাতে লম্বা ল্যাজওয়ালা ভীমরাজ পাখির প্রসঙ্গে তাঁর লেখার প্রতিবাদ ক'রে আমি একটি পত্র পাঠাই। তখন পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় হয়নি, সম্ভবত তিনিও পাখির ব্যাপারে আমি কতটা কী জড়িত তার বিন্দুবিসর্গ জানতেন না। প্রকাশ্যে তাঁর কথার ওপর কথা বলায় স্পষ্টতই তিনি খুব চটে যান। তার উত্তরে বেশ একটু নাকতোলা ভাব দেখিয়ে সম্পাদক সার রেজিনাল্ড পেন্স এবং এস. এইচ. প্রেটারকে চিঠি দেন। পরে অবশ্য তাঁর নির্দেশনগুলো পুনর্বার খতিয়ে দেখে আমি যে ঠিকই বলেছি, সেবিষয়ে নিশ্চিত হয়ে জার্নালের পরবর্তী সংখ্যায় নিজেকে সংশোধন করে নেন। এরপর আমার অঞ্চলভিত্তিক পাখিসমীক্ষার কাজে তাঁর কাছ থেকে বহু বছর ধ'রে ঘনিষ্ঠ আর কার্যকর সহযোগিতা পেয়েছি। এই সময় তাঁকে আমার পাঠানো কিছু পক্ষিচর্মের প্রাপ্তিস্বীকার ক'রে তিনি একটি চিঠি লেখেন (তারিখ ২৪-১০-১৯৩৮)। তাতে ভীমরাজের লম্বা ল্যাজের ঘটনার উল্লেখ ক'রে বলেন : 'দীর্ঘ কয়েক বছর ধ'রে আপনার কাছ থেকে আমি যে সাহায্য আর দাক্ষিণ্য পেয়েছি, তার যৎসামান্য সংযোজন হিসেবে এবার আমি যথার্থই

একেবারে অকপটভাবে আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। স্রোতে ভেসে আমাদের পরস্পরের ক্রমে সহযোগী হওয়াটা আমার পক্ষে খুবই লাভের ব্যাপার হয়েছে। শুরু হয়েছিল সংঘর্ষ দিয়ে, যখন ভীমরাজের পুচ্ছের পালকের জালের বিষয়ে আপনি আমার ভুল ধরেছিলেন—দেখা গেল, ভুলটা ক'রে ঠিক উচিত কাজই করেছিলাম।'

সেই সময় অবধি যথানিয়মে এইরকমের পাখি জরিপের কাজ চালানোর হাতে কলমে কোনো অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। কাজেই আমি হুইস্‌লারকে ধরি এ বিষয়ে যুক্তিপরামর্শ দেবার জন্যে। সেইসঙ্গে এটাও জিজ্ঞেস করি যে,হায়দ্রাবাদ সংগ্রহের শ্রেণিভুক্তিকরণের ভার উনি নিতে পারেন কিনা। কেননা এরই লাগাও পূর্বঘাট এলাকা নিয়ে ভের্‌নে সায়েন্টিফিক সার্ভের সংগৃহীত পাখির ওপর ওঁর মনোগ্রাহী ভাষ্যটি উনি সবে শেষ করেছেন, এটা হবে সংযোজনা মাত্র। মনে হল, এ কাজে আমার সহযোগী হতে উনি খুবই রাজি। দিন কয়েকের মধ্যেই এ-ধরনের সমীক্ষায় ইতিকর্তব্য নির্দেশ ক'রে ওঁর প্রস্তাবের একটি চমৎকার তালিকাও পেয়ে গেলাম। একদিকে ওঁব এইসব অভিমত, অন্যদিকে মাঠে নেমে কাজ করার সময় আমার গুরু স্ট্রেসেমানের কাছ থেকে মাঝে মাঝে পাওয়া বুদ্ধিপরামর্শ আমার প্রভূত কাজে লেগেছে। কেবল ঐ প্রকল্পেই নয়, পরবর্তী সমীক্ষাগুলোতেও। হুইস্‌লারের ব্যবস্থাপত্রগুলো এত যথাযথ আর ভালো ছিল যে, এখানে প্রাসঙ্গিক হবে কিনা জানি না, তবু উল্লেখ করছি—এজাতীয় ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজ যাঁরা হাতে নেবেন. তাঁদের সকলেরই মডেল হিসেবে এ বই-এর পরিশিষ্টতে তা অন্তর্ভুক্ত করেছি। অঞ্চলভিত্তিক পাখি জরিপের ফলাফল দরাজ প্রশংসা আর তারিফ পেয়েছে। সে কাজের সাফল্যের একটা বড়ো কারণ ছিল এই যে, হুইস্‌লারের নির্দেশগুলো আমি অনুসরণ করে চলেছিলাম। হায়দ্রাবাদ সমীক্ষার গোটা পর্বে এবং তার পরবর্তী সমীক্ষাগুলোতেও তিনি সর্বক্ষণ পত্রযোগে আমাদের কাজে সমানে বলভরসা যুগিয়েছেন। ১৯৪৪ সালে তাঁর অকালপ্রয়াণ পর্যন্ত এই যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ ছিল।

বাজারে তখনও কুয়াশাপ্রতিম 'মিস্ট-জাল' ওঠেনি। এসেছে তারও ঢের পরে। গত কয়েক বছর এই জাল কাজে লাগিয়ে এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, পাখি সংগ্রহে বন্দুকের ব্যবহার আর প্রত্যক্ষ দর্শন পূর্ণাঙ্গ হয় যদি তার সঙ্গে কুয়াশা জাল খাটানো যায়। বিশেষ ক'রে, গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের জঙ্গলে আর পূর্ব-হিমালয়ের তরাই এলাকার ঠাসবন্দি ঘন ঝোপঝাড়ে অনেক পাখি আছে যারা লাজুক প্রকৃতির। সবার নজর এড়িয়ে থাকে ফলে, তাদের অস্তিত্ব জানাই যায় না। একমাত্র যথাযথভাবে পাতা জালে পড়লে অথবা সকাল-সন্ধ্যের আলো-আঁধারিতে কিংবা রাতের অন্ধকারেই এরা নজরে আসে। নইলে সহজেই চোখ এড়িয়ে যায়। বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থা আর আমাদের বোম্বাইয়ের সোসাইটির রিং পরানোর সূচনাপর্বে মাত্র ১৯৫৯ সালে ভারতে প্রথম জাপানি মিস্ট-নেটের চলন দেখা দেয়। এটা দেখার পর আমার ইতিপূর্বেকার সংগ্রহের

সামগ্রিকতা সম্পর্কে নিজের আস্থা আর আগের মতো নেই। এই জাল ব্যবহার করার অদৃষ্টপূর্ব বহু প্রজাতি তালিকাভুক্ত করা গিয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যদি আরও ভেতরে গিয়ে এই জাল ফেলা হয়, তাহলে আরও অনেক প্রজাতির কথা আমরা জানতে পারব।

আমি বরাবরই ভালো হস্তাক্ষরের অনুরাগী। লেখকের পরিচ্ছন্ন মন আর তার নিখুঁত হওয়া আর পরাকাষ্ঠায় পৌঁছুনোর প্রয়াস চোখে পড়ে। অবশ্য এরকম ঢালাওভাবে বলাটা ঠিক নয়। কেননা এই নিয়মের প্রমাণসহ ব্যতিক্রমও বড়ো কম নয়। যেমন স্ট্রেসেমান, যেমন রয় হকিন্স এবং এমনি আরও অনেকে। হুইস্‌লারের ক্ষেত্রে এটা যে কত সঠিক তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো যায়। তাঁর যাবতীয় মন্তব্য আর শ্রেণিভুক্তিকরণ সংক্রান্ত নোট, পরিমাপসূচক সারণি এবং এ জাতীয় আর যা কিছু—সমস্তই গোটা গোটা ক'রে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে নির্ভুলভাবে সোজা লাইনে তিনি লিখে গেছেন। যখন হস্তলিপি পর্যন্ত সর্বাত্মক মূল্যহ্রাসের পাল্লায় পড়ে ধুঁকছে, যখন সুন্দর কোন স্পষ্ট হাতের লেখাও সেকেলে ব'লে অচল হয়ে যাচ্ছে—হুইস্‌লারের চিঠি পেলে মন ভালো হয়ে যেত। উনি যে চিঠি লেখার পর কী করে তার হদিশ রাখতেন জানি না। কেননা তাতে কার্বনপেপার ব্যবহারের কোনো চিহ্ন দেখতে পাইনি। এ সত্ত্বেও ওঁর চিঠিতে আগে বলা কথার পুনরাবৃত্তি যা আগেকার কোনো কথা ভুলে যাওয়া—বড়ো একটা তার নজির পাইনি।

হায়দ্রাবাদ রাজ্যের সেইসব জায়গা নিদর্শন সংগ্রহের জন্যে আমি বেছে নিয়েছিলাম (অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৩১, মর্চ-এপ্রিল ১৯৩২), যেসব জায়গার যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল মান্ধাতার আমলের। অংশত দূরত্বের কারণেই জায়গাগুলো আমি বেছে নিয়েছিলাম। যেতে হত পায়ে হেঁটে অথবা স্প্রিংবিহীন ছই দেওয়া গো-যানে। যাকে বলা হত 'খাচার'। রাস্তা ধুলোয় ভর্তি। মাটিতে গাড়ির চাকা বসে যাওয়ার গভীর দাগ। অনবরত ঝাঁকানি খেতে খেতে মাঠ ভাঙা। কোথাও বা কাঁচা বনপথ। তার মাঝে মাঝে সাঁকোহীন নুড়িপাথর ভর্তি নালা, বেমরশুমে বেশির ভাগই শুকনো খটখটে। এদেরই এখন ভদ্রলোকের ভাষায় বলা হয় জীপযোগ্য রাস্তা। তখনও অবশ্য জীপের জন্মই হয়নি। নালা পার হওয়া ছিল এক বিষম ব্যাপার। তার দুপাড়ে গণ্ডশিলার ঘেষাঘেঁষি ভিড়। একদিকে যেমন হুড়মুড় ক'রে লগবগ লগবগ করতে করতে গরুর গাড়িটাকে অনেকখানি নীচে নেমে যেতে হত, তেমনি আবার নালা পেরিয়ে পাথরের ওপর দিয়ে খাড়াই বেয়ে উঠতেও হত অনেকটা। এই পুরোটা সময় গাড়োয়ানরা যেত গরুর ল্যাজ মুল্‌তে মুল্‌তে আর চাবুক মেরে সমানে হ্যাট হ্যাট হ-র্‌র্‌র্‌ করতে করতে। কতকটা রাস্তা গাড়ির পেছন পেছন আমি সাধারণত ছায়া দিয়ে ছাদ দিয়ে হেঁটেই যেতাম (তহমিনাও তাই)। বিশেষ ক'রে, গরুর গাড়িতে ক'রে যাওয়াটা খুবই যন্ত্রণাদায়ক হত। অবশ্য রোদ প্রচণ্ড কড়া হলে গাছের ছায়াতেও হাঁটা যেত না।

বিশ্রীরকমের সব গাড্ডায় প'ড়ে কাঠের ধুরো প্রায়ই রাস্তায় ভেঙে পড়ত। তাতে সময় নষ্ট হত বটে, তবে গাড়িওয়ালাদের কাছে ওটা এমন কিছু ব্যাপারই ছিল না। ওরা প্রত্যেকেই ছিল একেকজন চাঁছাছোলা ছুতোর। এসব ছোটখাটো ঝামেলা ওদের কাছে ছিল জলভাত। এরকম ঘটলে চট ক'রে ওরা চলে যেত জঙ্গলে। ওদের সর্বার্থসাধক রামদা দিয়ে একটা শক্ত কাঠের চারাগাছ কেটে নিয়ে এসে চেঁছে ছুলে কাজের যুগ্যি ধুরো বানিয়ে নিত। ব্যস, তারপরই আবার আমরা রওনা দিতাম। আমার মনে আছে দুপুরের রোদ এড়াবার জন্যে একবার বেলা পড়ে এলে আমরা গরুর গাড়ি নিয়ে পূর্ণিমার কাছাকাছি একটা দিনে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়লাম। বনজঙ্গলের মধ্যে ছোট একটা গ্রামে ছিল আমাদের ঠিক পরের ক্যাম্প। সেখানে সাতটা আটটার মধ্যে আমাদের পৌঁছে যাওয়ার কথা। পথে আবার সেই ধুরো ভেঙে যাওয়া। সেইসঙ্গে অপ্রত্যাশিত আরও নানা বাধাবিপত্তি। ফলে, সব সাম্‌লে আমাদের গন্তব্যে পৌঁছুতে রাত ১টা বেজে গেল। খিদেয় ভোঁচকানি লাগার উপক্রম। শরীরও আর বইছে না। ভালোর মধ্যে এই যে, সারা রাস্তা জুড়ে তখন চাঁদের আলো। আমরা তৎক্ষণাৎ ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। ঠিক করলাম খাওয়াটা না হয় সকালের দিকেই করা যাবে। রহিম ছিল আমাদের এক অসামান্য বাবুর্চি কাম-বেয়ারা। দেশভাগের আগে উত্তর প্রদেশ যে রন্ধনপটুদের জন্ম দিয়েছিল, ও ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম সেরা। রহিম খানা পাকাতে সময় নেবে, এটা আমাদের হিসেবের মধ্যেই ছিল। কেননা রসুইঘর খুলে আগে রান্নার জিনিসপত্র সব টেনে টেনে বার করতে হবে। তারপর তো রান্না। কিন্তু এমনটা হলে যে রহিমের মাথা কাটা যাবে! সাহেবরা পেটে খিদে নিয়ে শুতে চলে যাবে। ও তা হতে দিতে পারে না। তড়িঘড়ি ও কাঠের উনুনে আঁচ ধরিয়ে দিল। যা যা না হলেই নয়, শুধু সেই সেই জিনিস ভাঁড়ার থেকে বার করে আনল। মিনিট কয়েকের মধ্যেই ও আমাদের খেতে বসিয়ে দিল। পথে আসতে আমি যে চিঙ্কারাটা মেরেছিলাম, তার কিডনি আর লিভার ঝাঁঝরিতে চমৎকার ক'রে সে ভেজেছে। তার সঙ্গে ওর নিজের জন্যে আনা ঠাণ্ডা কয়েকটা চাপাটি। খাবার এমন কিছু নয়। তবু না খাইয়ে রহিম আমাদের কিছুতেই শুয়ে পড়তে দিল না। কাজের লোক রহিম ছিল যেমন বশংবদ, তেমনি বুঝসমঝদার। যে-যুগ আর ফিরে আসবে না, ও সেই যুগের লোক। বিলুপ্ত প্রজাতির মানুষ। ভবিষ্যতে আর এমন লোক দেখার আমাদের সৌভাগ্য হবে না, হায়রে।

রুটের বাস ছিল যেন ডুমুরের ফুল। তার ওপর এসব এলাকা থেকে বাসরাস্তা ছিল বহুদূর। তখনও এ রাজ্যে মোটরচালিত যানবাহনের তেমন কোনো সরকারি সুব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। মফস্বল শহরগুলোতে প্রাইভেট বাস ক্বচিৎ কদাচিৎ মিলত। জনমনুষ্য নেই, এমন সব জায়গায় বাস এসে দাঁড়াত। স্থানীয় করিতকর্মারা সেকেলে ফোর্ড কিংবা শেভ্রোলের ভোল বদ্‌লে তাকে বাসের আকার দিত। মাচা ক'রে তার

ওপর বসাত তিন-ভাজ প্লাইউড অথবা কলাই-করা লোহার খাঁচা। তাতে অবাধে যত ইচ্ছে লোক ভরে নেওয়া হত। এসব বাসও সহজে ভাড়া পাওয়া যেত না। অনেক বাপু বাছা ক'রে তবে তাদের রাজি করানো যেত। নয়তো তাদের কড়কাবার জন্যে স্থানীয় থানার দারোগা কিংবা আমলাদের গিয়ে ধরতে হত। অবশ্য সার্ভে পার্টিকে সাহায্য করতে হবে, এমন অনুজ্ঞাপত্র ওপরওয়ালাদের কাছ থেকে কোনো ফাঁক গ'লে যদি তাদের হাতে পৌঁছে থাকে তবেই। একাধারে ড্রাইভার আর মালিক এই বাসওয়ালারা প্রায় সবাই ছিল একটা চিজ বটে। যেমন তাদের ব্যবহারের ছিরি, তেমনি তাদের কথার দাম। ভাড়া ঠিক ক'রে পই পই ক'রে বলে দেওয়া হয়েছে যেন একেবারে ঠিক সময়ে আসে; ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় আসবে ব'লে কথাও দিয়েছে। সকাল ছ'টার মধ্যে বাস এসে যাবে। আমরাও সব মালপত্র ওঠাতে থাকব। সব বাঁধাছাঁদা ক'রে লটবহর নিয়ে আমরা বসে আছি। কোথায় কী। সাতটা বাজল। আটটা বাজল। বাসওয়ালাদের পিণ্ডি চটকাতে চটকাতে আমরা কেবল পায়চারি করে চলেছি। তারপর হেলতে দুলতে যখন এল, মুখে এতটুকু কাঁচুমাচু ভাব নেই। দেরি হওয়ার সেই চিরাচরিত বাহানা—ড্রাইভার 'চা খাচ্ছিল' কিংবা 'খানা খাচ্ছিল'। একচোট হম্বিতম্বি আর ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দেবার পর, একবার এটা ওখানে ওটা সেখানে ক'রে, ফিরে গোছগাছ ক'রে একে একে সব মালপত্র তোলা হল। জিনিস তো কম নয়। নিদর্শন ভরবার বাক্সপ্যাঁটরা, হ্যারিকেন লণ্ঠন, কলাই-করা লোহার বালতি, চাল আটার বস্তা, ঘি আর কেরোসিনের টিন, সেইসঙ্গে হাবিজাবি আরও অনেক কিছু। যেমন ঠাসা হল বাসের ভেতরে, তেমনি খানিক তোলা হল বাসের ছাদে। (ওপরে তোলা হয়েছে ফাঁক ফাঁক ক'রে বোনা চুড়াকার বাঁশের খালুই। তার মধ্যে আছে জ্যান্ত মুর্গি। ক্রমান্বয়ে তা আমাদের খাওয়ার পাতে এসে পড়বে)। এমন সময় ড্রাইভারের মনে পড়ে যায়, পেট্রোল নিতে হবে তো। সুতরাং, ঠেঙিয়ে চলো এবার পেট্রোল-পাম্পে। ইলেকট্রিক তো নেই। হাতে পাম্প ক'রে ভরা। তাতে যাবে আরও সময়। এত সব কাণ্ডকারখানা যথানিয়মে সাম্‌লে রওনা হতে হতে সেই ন'টা। ততক্ষণে বেলা বেশ তেতে উঠেছে। এরপর যে সটান গন্তব্যে পৌঁছে যাব তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। অনেক কিছু যদির ওপর তা নির্ভর করছে। যদি রাস্তা ঠিক থাকে। যদি গোঁ গোঁ করা শ্বাসরুগি ইঞ্জিনের শরীরস্বাস্থ্য ভালো থাকে। যদি অসংখ্যবার রিট্রেড করা ক্ষয়ে যাওয়া অলক্ষুণে টায়ার রাস্তার ধকল সইতে পারে। ক্যাম্পের জায়গা সর্বত্র এক নয়। কোথাও পি-ডব্লু-ডির ডাকবাংলো, কোথাও বনবিভাগের বিশ্রামাবাস। কোথাওবা ভূতপর্ব সরাইখানা বা স্রেফ পরিত্যক্ত ফাঁকা বাগান। স্বাধীনতার আগে সেসময়ে ডাকবাংলো আর ফরেস্ট বাংলোগুলোতে, বিশেষ ক'রে যেখানে লোকে তেমন যেত না, উপকরণ সেখানে সাধারণতঃ খুবই কম থাকত : গোটা দুই লোহার খাট, (তোষক বালিশ, কিচ্ছু না), কয়েকটা কাঠের চেয়ার আর টেবিল, আর এটা সেটা। ব্যস্। সম্পূর্ণ স্বনির্ভব হয়ে

সেখানে যেতে হত। বেডিং, তোয়ালে, সুজনি, বালতি, রান্নার সরঞ্জাম, ল্যাম্প, হাঁড়িকুড়ি, বাসনপত্র। কী নয়। গরুর গাড়িতে চাপিয়ে বিলকুল নিয়ে যেতে হত সব কিছু—অপ্রত্যাশিতভাবে গোশালায় থাকতে হলে সঙ্গে ফোল্ডিং ক্যাম্পখাটও রাখতে হত। ঝামেলায় পড়ে কখনও কখনও লজ্‌ঝরে চৌরি বা চটিতেও আমাদের থাকতে হয়েছে। যখন বেশিদিন থাকতে হয়েছে, সেই গোয়ালঘরই তহমিনার হাতের ছোঁয়ায় আরামদায়ক 'বাড়ি'র চেহারা নিয়েছে। কোনো ক্যাম্পে পৌঁছে দলের সবাই যখন সংগ্রহের কাজে বেরিয়ে যেত, তহমিনা তখন শুরু করে দিত তার কাজ। গোটা জায়গাটা ঝাটপাট দিয়ে ধোয়ামোছা ক'রে, তারপর তাতে বুলিয়ে দিত নারীসুলভ হাতের ছাপ। রংবেরঙের পর্দা, বিছানার চাদ্দর, ফুলদানি, ইত্যাকার টুকিটাকি জিনিসে ঘর সাজাতে বসে যেত। ক্যাম্পে যাবার সময় এসব জিনিস সঙ্গে না নিয়ে ও নড়ত না। আর এই দিয়েই ও সব কিছুর খোলনলচে বদ্‌লে দিত। যেসব জায়গায় মোটর বাস যায় না, সেখানে অগতির গতি গরুর গাড়ি আর মুটে মজুর। সেসব ক্ষেত্রে এক ক্যাম্প থেকে আরেক ক্যাম্পের দূরত্ব কম রাখা হত। যেন আট-দশ মাইলের বেশি না হয়। মোটরে যেতে পারলে এই দূরত্ব হত বড়জোর তিরিশ থেকে পঞ্চাশ। নিদর্শন রাখার বাক্সগুলো খোলা, কাজেব টেবিলগুলো গোছগাছ করা এবং মোটামুটিভাবে নিজেরা গুছিয়ে বসা—ঘণ্টা দুয়েকের ভেতর এসব সেরে ফেলতে হত। এতেই বেলা গড়িয়ে যেত। ইতিমধ্যে নমুনা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সন্ধ্যাকালীন রোঁদে বেরোবার জন্যে তৈরি হয়ে যেতাম। ঠেকে শিখে আর অবস্থা বুঝে আমার কাজের ধরনটা দাঁড়িয়েছিল এই রকম : আমার সহকারী ছিল যে চর্মসংরক্ষণকারী, তাকে ডেকে তার কী কী করণীয় বুঝিয়ে দিতাম। ক্যাম্পের চারপাশ ঘুরে সহজলভ্য পাখিগুলোর নমুনা সংগ্রহের ভার তার ওপর ছেড়ে দিতাম। পরের দিকে আমার পাখি-জরিপের কাজে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যে সফরসঙ্গী হয়েছে, সে ছিল পূর্ব ভারতের এক খ্রিস্টান। সোসাইটির ফিল্ড অ্যাসিস্টান্টদের একজন। ওর সহকর্মীরা ওর দিক টেনে আমাকে বার বার বলত আমি পর্তুগিজ ঔপনিবেশিক আমলের গোয়ানদের সঙ্গে এক না ক'রে ওকে যেন একটু আলাদা চোখে দেখি। ওর নাম জন গ্যাব্রিয়েল। কথা বলত কম। খুব নির্ভরযোগ্য। এত তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে ও ছাল ছাড়াত যে, দেখে সবাই আশ্চর্য হয়ে যেত। ওর ছাড়ানো পাখির প্রত্যেকটা চামড়া হত নিখুঁত। ফুলচুষি আর ফুটকি-পাতার মতন ছোট পাখি ছাড়াতে জন ছাড়া আর কেউ এগোত না। তাও কী, অধিকাংশই বিচ্ছিরি রকমের জখম হওয়া। তারই খোল ভর্তি ক'রে সেটাকে শুধু যে প্রদর্শনযোগ্য অনুশীলনের বিষয় করত তাই নয়, তার পালকগুচ্ছ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রকট হত। উপপ্রজাতির লক্ষণবিচারে যা একান্তভাবে অপরিহার্য। এ কাজে যারা একবার হাত দিয়ে দেখেছে, তারা জানে, এটা কী কঠিন ধৈর্য পরীক্ষার কাজ। কত সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আমিই তো দেখেছি, সকালে পাখিসংগ্রহের পালা শেষ হলে

গ্যাব্রিয়েল বসে গেছে ছাল ছাড়াবার কাজে। ডিনারের আগেও ছোট থেকে মাঝারি আকারের ছাব্বিশটা চামড়ার কাজ পরিপাটি আর নিখুঁতভাবে বানিয়ে ফেলেছে। ওকে যদি বলা যেত যে, অমুক অমুক পাখি বিশেষভাবে খুঁজে দেখে কোন্‌টা কী তা নির্ভুলভাবে নির্দিষ্ট করবে। নিশ্চিন্তভাবে ওকে এসব ভার দেওয়া যেত। সকালে রোঁদে বেরিয়ে যে যার কাজ সেরে দুপুরের আগে আমরা যখন ফিরতাম, গ্যাব্রিয়েলকে এটা জিজ্ঞেস করা আমার নিত্যকর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, ঐদিন ওর কপালে কী জুটল। রোজ ছিল ওর বাঁধাগতের একই উত্তর—নিজস্ব ঢঙের চিত্রময় ছকের বাঁধাবুলি : 'আমি চেষ্টা করলাম, বহুৎ চেষ্টা করলাম আচ্ছা-আচ্ছা পাখি যাতে পাই। লেকিন একটাও নজরে এল না,' ব'লে (ওর ঝোলা থেকে হতাশ ভঙ্গিতে টেনে বার করত তালগোল পাকানো মামুলি ময়না অথবা এলেবেলে আর কোনো পাখির লাশ), 'তাই আমি বললাম কী করব, নিয়েই যাই।' কবুল করছি, 'আচ্ছা-আচ্ছা' পাখির অভাবে মাঝে মাঝে ওর দুনিয়াদারির পন্থা একইভাবে আমিও অবলম্বন করেছি। তার কারণ, উপপ্রজাতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সাধারণ পাখিরও গুরুত্ব আছে। স্বভাবে আর আচরণে ফিল্ড অ্যাসিস্টেন্ট এবং শিবির পরিচারক হিসেবে ওর গুণের কোনো ঘাটতি ছিল না। একটাই ওর বড়োরকমের গলদ ছিল। যখন ও বসত। যখনই মুখে গরাস তুলত, চামচে আর দাঁতে ঠোকাঠুকি হয়ে এমন একটা খ্যনখেনে আওয়াজ হত যে, তাতে যেকারো মেজাজ খিঁচড়ে যেত। বিশেষ ক'রে, প্রচন্ড স্নায়বিক চাপের মধ্যে ওরকমটা হলে মাথা ঠিক রাখাই শক্ত হত।

সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার স্থানবিবরণসূচক বড়ো বড়ো ম্যাপে নানা ধরনের যেসব প্রাকৃতিক চরিত্র দেখানো থাকে, সেসব ভালো ক'রে খতিয়ে দেখে কোথায় কতটা কী পাওয়ার সম্ভাবনা আছে তা দেখে আমরা জায়গা বাছতাম। তারপর স্থানীয় বনবিভাগের কর্মী আর গ্রাম্য শিকারিদের সঙ্গে কথা ব'লে মাইল দশেক পরিধির একেকটা এমন এলাকা নির্দিষ্টি করে নেওয়া হত, স্বচ্ছন্দে পায়ে হেঁটে যেখানে খোঁজখবর করা যায়। মোটামুটিভাবে করা আমার এই প্ল্যান অন্যান্য অঞ্চলভিত্তিক সমীক্ষাতেও আমি সুচারুভাবে কাজে লাগিয়েছি। কিছু কোনো জীবমণ্ডল আর বহিরাকৃতি নজর এড়িয়ে যায় নি কোনো পাখির নমুনা অসংগৃহীত আর অলিখিত থাকেনি। সে সময়ে এইভাবেই মনকে বুঝিয়েছি। এর বহুকাল পরে, যখন কুয়াশা জালের ব্যাপক চলন হয়েছে, তখন বুঝতে পেরেছি যে, কিছু নিশাচর আর মুখচোরা প্রজাতি সম্ভবত আমার গণনার বাইরে থেকে গেছে।

১৯৩১ সালের হায়দ্রাবাদ পক্ষিতাত্ত্বিক সমীক্ষায় যেখানে শুরুর চালটা চেলেছিলাম, সেটা হল মানানুর। আমার অঞ্চলভিত্তিক জরিপে সেটাই প্রথম পদক্ষেপ। সমুদ্রতল থেকে ২০০০ ফুট ওপরে নাল্লামালাই পাহাড়ের আম্রবাদ মালভূমিতে বেশ বড়োসড়ো ছড়ানো জনপদ এই মানানুর। মাহবুবনগর জেলার তালুকের সদর। এর চারদিক ঘিরে

চমৎকার সংরক্ষিত মিশ্রিত আর্দ্র পর্ণমোচী বন। সেখানে সেগুন আর অর্জুনজাতীয় নাল্লামাড্ডি (টার্মিনালিয়া টোমেণ্টোসা) গাছ এখানেই আমি প্রথম আরণ্যক ভূস্বর্গ দেখি। পরে অবশ্য দেশের নানা প্রান্তে এমন আরও অনেক দেখেছি। মানানুর অঞ্চল আমার স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করার কারণ এর বন্যপ্রাণী সম্পদ। সেইসঙ্গে এখানকার মতো এত বাঘ আর কোথাও দেখিনি। রোজ খুব ভোরবেলায় একজন স্থানীয় চেঞ্চু পথপ্রদর্শককে নিয়ে যখন হাঁটতে বার হতাম, গোটা বনপথ জুড়ে বাঘ, চিতাবাঘ, ভাল্লুক আর অন্য বন্যপ্রাণীদের টাটকা পায়ের ছাপ দেখে উত্তেজনায় আমার গায়ে কাঁটা দিত। তার চেয়েও বেশি রোমাঞ্চ হত, যখন তাদের কাউকে কাউকে সশরীরে জ্যান্ত দেখতে পেতাম। এটা প্রায়ই ঘটত সকালে পাখি সংগ্রহ করার সময়। আমরা দ্বিতীয় ঘাঁটি পেড়েছিলাম আরও বারো মাইল দক্ষিণে ফারাহাবাদে। জায়গাটা আরেকটু উঁচু মালভূমিতে (২,৮০০ ফুট)। সরকারের পরিকল্পনা ছিল ওখানে শৈলাবাস করার। কথার কথাই থেকে গিয়েছে, কথামতো কাজ হয়নি। এটা ছিল আদিবাসী চেঞ্চু উপজাতির বাসভূমি। নৃতত্ত্ববিদ ফ্যুরের হাইমেনডর্ফ এদের নিয়ে অনেক গবেষণার কাজ করেছেন আর তথ্য নথিবদ্ধ করেছেন। পাহাড়ের ওপর ছোট্ট রেস্ট-হাউস। পায়ে চলা রাস্তা ছাড়া সেখানে পৌঁছুবার আর উপায় নেই। কাজেই চেঞ্চু কুলিদের মাথায় দিয়ে সব লটবহর আর সাজসরঞ্জাম ওপরে তুলতে হল। কুলি বলতে চেঞ্চু মেয়ে মরদ আর বাচ্চা। আমার আশঙ্কা ওদের বেগার খাটতে হয়। স্থানীয় তহশিলদারই ওদের জুটিয়েছে। সরকারি হিসেবে ওরা মাথাপিছু রোজ পেত এক সের জোয়ার। এটা এখনও আমার কাছে অবিশ্বাস্য লাগে যে, পয়সার বদলে জিনিসে মজুরি দেওয়া সেখানকার প্রথা ছিল। আমাদের বলা হয়েছিল যে, সভ্যসমাজ থেকে অত দূরে থাকায় ওদের কাছে পয়সার কোনো মূল্য নেই। এই রকমভাবে মজুরি পেতেই ওরা নাকি পছন্দ করে। ক্যাম্পে থাকাকালীন ওদের খাটাখাটুনির জন্যে পারিশ্রমিক বাবদ সমতল থেকে আসবার সময় আমরা বেশ বেশি পরিমাণে সঙ্গে জোয়ার এনেছিলাম। সে সময় জোয়ারের দাম পড়েছিল টাকায় ১২ সের। আমাদের বাজেটের পক্ষে ওটা কোনো ব্যাপারই ছিল না।

বেগার-প্রথা ছিল প্রকৃতপক্ষে একরকম দাসপ্রথা। দেশের অন্যান্য জায়গায় আইন ক'রে তুলে দেওয়ার পরেও নিজামের রাজ্যে কিন্তু এই প্রথা বহুকাল বহাল ছিল। সরকারি যে কোনো কাজে গতরখাটা মজুর যোগানো ছিল গ্রামের মোড়ল বা'পাটেল'দের পক্ষে বাধ্যতামূলক। কাজেই সে তখন গ্রামের যেকোনো সমর্থ পুরুষমানুষের ওপর চড়াও হয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে সরকারি কাজে যুতে দিত। তা সে লোকটার হাতে তখন আর যে কাজই থাক না কেন। সরকার নির্ধারিত দৈনিক মজুরি কত ছিল তা আগে বলেছি। একবার হল কী, আমাদের সার্ভে পার্টিকে এক দুরধিগম্য জায়গায় যেতে হয়েছে। পালা ক'রে সমানে কাজ হবে, তার জন্যে মাল বওয়ার লোক

চাই। তখন বেলা হয়েছে, গ্রামের মরদেরা ক্ষেতির কাজে বেরিয়ে গেছে। পাটেল ঘরে ঘরে হানা দিয়ে দেখে কেউই ঘরে নেই। শেষে এক জায়গায় গিয়ে দেখল ছোট একটা কর্মক্লান্ত দল মড়ার মতো ঘুমোচ্ছে। পাটেল তাদের ঘুম ভাঙিয়ে তুলে আমাদের কাজে ভর্তি করে দিল। তারা তখন এই ক'রে কাঁই-মাই জুড়ে দিল যে, তারা হল গাইয়ে বাজিয়ে মানুষ। দূরের এক গাঁ থেকে এখানে এক বিয়েবাড়িতে তাদের বায়না করে আনা হয়েছিল। সারা রাত গানবাজনা করার পর ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছিল। কিন্তু কে শুনছে তাদের কাকুতিমিনতি। পাটেলকে তামিল করতেই হবে তার তহশিলদারের হুকুম। এই ব'লে তাদের টানতে টানতে এনে আমাদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিল। ওদের কপাল ভালো ছিল বলতে হবে। কেননা পাঁচ মাইল দূরে ঠিক পরের গ্রামটাতেই নতুন লোক পাওয়া গেল। আমিও গাইয়ে বাজিয়েদের রেহাই দিতে পেরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। যাক, লোকগুলো ফিরে গিয়ে এবার নিশ্চিন্তে দুচোখের পাতা এক করতে পারবে।

আর একজন তহশিলদার আমাকে এনে দিয়েছিল সরকারের বাঁধা রেটের একটি নির্ঘণ্ট। কর্তব্যরত রাজকর্মচারীদের কত দামে জিনিস বেচতে হবে তা নির্দেশ ক'রে নিজাম সরকার এই ফতোয়াটি কয়েক বছর আগে জারি করেছিল। তাতে দেখা যায় একটি বকরি ১ টাকা, মুরগি ২ আনা (এখনকার ১২ পয়সা), অন্যান্য জিনিসও এরই অনুপাতে। সেইসঙ্গে তো ফাউ। সব দামই নিজামের মুদ্রা হালিতে। যেটা ব্রিটিশ আমলের ভারতীয় টাকার দুই-তৃতীয়াংশ। ১৯৩১ সালে সব জিনিসের দাম যে একই ছিল, তা নয়। তবে জিনিসের মূলামান তখনও কম থাকায় সার্ভের জন্যে নিজাম সরকারের বরাদ্দ টাকাতেই আমরা কাজ চালিয়ে যেতে পেরেছিলাম।

বরগামপাদ থেকে কয়েক মাইল দূরে গোদাবরী নদীর ধারে এলাকায় অজ গাঁ নেলিপাকা। সেখানে শুধু জরাজীর্ণ কয়েকটা চালাঘর। গ্রামের শেষ প্রান্তে আমরা একটা পরিত্যক্ত বাথানে থাকার জায়গা পেয়েছিলাম। পুরনো ছিটেবেড়ার দেয়ালের বাধা পেয়েও তার ফাঁক গলে' বিকেলের প্রচণ্ড রোদের হলকা ঘরে ঢুকত। গ্রামে রটে গিয়েছিল যে, বোম্বাইওয়ালাদের একটা আজব দল এসেছে, তারা নাকি যাবতীয় ধরনের পাখি মেরে কোন্‌টার কী স্বাদ পরখ ক'রে কাগজে টুকে নেবে। কাজেই আসামাত্র আমাদের ছেঁকে ধরল অপোগণ্ড ছেলেছোকরার দল। আর বেশ কিছু দেহাতি লোক। তারা আমাদের সঙ্গ দিতে চাইল স্থানীয় শিকারি হিসেবে। তারা যে সব পেশাদার চোরা-শিকারি, সে বিষয়ে রাখঢাক না থাকায় সবাই তা জানত। ওরা বলল যে, একটা প্রকাণ্ড কুমির একটা ছোট চরে রোজ রোদ পোয়াতে আসে। নদীর ধার বরাবর মিনিট কয়েক হেঁটে গেলে কাছেই পড়ে সে জায়গাটা। কুমিরটাকে আমি যদি মারতে ইচ্ছুক হই, তাহলে এরপর যখনই ওকে দেখা যাবে ওরা এসে আমাকে খবর দেবে। আমি তাতে এক পায়ে রাজি। দুদিন পরে আমি তখন সকালের পাখি

সংগ্রহের কাজ সেরে দুপুর নাগাদ সবে ফিরেছি, দেখি একজন গ্রাম্য শিকারি আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। এক ঘণ্টা আগে কুমিরটাকে সে দেখেছে। ও আমাকে পথ দেখিয়ে সেখানে নিয়ে যেতে চায়। এসব ক্ষেত্রে যা হয় তাই। গিয়ে দেখি ভোঁ ভাঁ। কুমিরের চিহ্ন নেই। বায়নাকুলার দিয়ে চরের চারপাশ নদীর ধারের ঝোপঝাড় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে ২০০ মিটার উজানে হঠাৎ নলবনে একটা কালো কিছু আংশিকভাবে নজরে এল। একটা আধডোবা কুমিরের মাথাও হতে পারে। আরও ভালো ক'রে দেখে বোঝা গেল, ওটা কোনো মানুষের ফুলে ফেঁপে ওঠা লাশ। পরে জানা গিয়েছিল, ওটা ছিল এক বৃদ্ধার গলিত দেহ। পুত্রবধুর সঙ্গে তুমুল কলহের পর সেই যে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান আর ফেরেননি। আমার তখন বেজায় আতঙ্ক হচ্ছে। কারণ, ঐ জায়গাটার ঠিক নীচে থেকেই আসে ধোয়াধুয়ি করার আর খাওয়ার জল। তার মানে, এতদিন আমরা ঐ বৃদ্ধা মহিলার ক্বাথমিশ্রিত জলে যে প্রাণধারণ করে আছি তা তো দেখাই যাচ্ছে। চিৎকার ক'রে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে আত্মীয়স্বজনেরা সেই দুর্গন্ধময় জল থেকে বুড়ির শবদেহ তুলে নিয়ে এল। কিন্তু আগে পুলিশ এসে তদন্ত ক'রে সাফ সাফ অনুমতিপত্র দেবে, একমাত্র তার পরেই দেহসৎকার করা যাবে। পচাগলা লাশে 'নীলচে ছোপ' ধরায় ব্যাপারটা জরুরি বুঝে মাথার চাঁদি ফাটানো রোদের মধ্যে আত্মীয়স্বজনদের ছুটতে হয়েছে ন'মাইল দূরবর্তী থানায়। থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা অবশ্য এত ভরসন্ধ্যেয় নিজেকে এ নিয়ে বিব্রত করতে রাজি হননি। সুতরাং, পরের দিন সকালে সাড়ে সাতটার এদিক ওদিক না হওয়া পর্যন্ত সাহেবের টিকি দেখা যায়নি। অকুস্থলে তিনি এসে হাজির হলেন মরণাপন্ন একটি টাট্টুঘোড়ায় চেপে।

গন্ধে গন্ধে দারোগাটি বুঝে নিয়েছিল ভগবানের কৃপায় এইবার তার একটা বড়ো রকমের দাঁও মারার সুযোগ এসে গিয়েছে। এদিকে শোকগ্রস্ত আত্মীয় পরিজনেরা সমানে তার হাতে পায়ে ধরছে। আমিও কথা শোনাতে ছাড়ছি না। দারোগা অনড় অটল। সহজে সে ছাড়বে না, তা বোঝাই যাচ্ছে। দারোগা বলে চলেছে যে, ওর যা ডিউটি তা ওকে করতেই হবে। এক্ষেত্রে ওর হাত পা বাঁধা। ময়নাতদন্ত করতে হবে, যথাযথভাবে খোঁজখবর নিতে হবে। এসব শেষ না হলে ওর পক্ষে সৎকারের অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়। এইসব বাধ্যতামূলক প্রক্রিয়া কার্যকর করার ধুয়ো তুলে লোকটা এমন গো ধরে বসে রইল যে, তার মানে, ঐ লাশ ওখানেই পড়ে থেকে অন্তত আরও চব্বিশ ঘণ্টা ধরে দুর্গন্ধে পাড়ার লোকের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে। যখন দেখলাম লোকটা প্যাঁচ ছেড়ে কিছুতেই বেরোবে না, আমার কোনো যুক্তিই লোকটা কানে তুলছে না—আমি হাল ছেড়ে দিয়ে সকালের পাখি ধরার কাজে বেরিয়ে গেলাম। তিন ঘণ্টা পরে ফিরে এসে দেখি সেই লাশ, হাউমাউ ক'রে কাঁদা আত্মীয়স্বজন আর সেই দারোগাটি—সব বিলকুল উধাও। গোটা পাড়ায় টুঁ শব্দ নেই, আগের মতোই

স্বাভাবিক। ভাবাই যায় না। বোঝা গেল, আমি পেছন ফিরতেই ন্যায়ের ধ্বজাধারণীটিকে স্বমতে আনতে মৃতের ছেলের স্রেফ পঞ্চাশ টাকা গাঁটগচ্চা গেছে। শোকগ্রস্ত আত্মীয়েরা নিজেদের ভেতর থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে কোনোরকমে টাকাটা যোগাড় করেছে। ব্যস, তক্ষুনি যবনিকাপাত। মনের সুখে যে যার বাড়ি ফিরে গেল। তখন আমার পুরনো একটা কথা মনে পড়ে গেল। আমার এক পাড়াগেঁয়ে বন্ধুবরকে তার জিজ্ঞাসার উত্তরে কর্পোরেশনের মিল্ক ইনেস্পেক্টর বলেছিল, 'মাইনেটা কম, তবে রোজগারটা ভালো।' তৎকালীন 'হজরত খুদাবন্দ' নিজাম বাহাদুরের হায়দ্রাবাদি রাজত্বে আমলাওয়লাদের এটাই মোটামুটি চলতি প্রথা। সম্ভবত একমাত্র ঐ রাজ্যেই নয় এবং একমাত্র সে আমলেই নয়।

পাণ্ডব বর্জিত সেইসব জায়গায় রসদ আর সরবরাহ মিলত না ব'লে হপ্তা দুই পরপরই বনবাস ছেড়ে সভ্যতায় এবং হায়দ্রাবাদ শহরে প্রত্যাগমন ক'রে শূন্য বস্তা ভরে নিয়ে যেতে হত। কতদিন পরে পরে, তা নির্ভর করত সমীক্ষাক্ষেত্র কত দূরে আর কত বেমক্কা জায়গায় তার ওপর। এই বিরতির দিনগুলোতে আমরা এসে থাকতাম হাশামভাই আর তার পরিবারদের সৈফাবাদের বাড়িতে। হাশাম ছিল আমার সবচেয়ে বড়ো ভাই। আমার চেয়ে বয়সে আঠারো বছরের বড়ো। গোড়ার দিকে খেতওয়াড়িতে থাকার সময় ওর ছেলে সুলেমান ছিল আমার পাখিপোষার সঙ্গী। হাশামভাই যখন বোম্বাইতে আইন পড়ছে, ওর বয়স তখন সবে উনিশ। বাড়ির গুরুজনেরা ঐ বয়সেই ওর বিয়ে দিয়ে দেন। হায়দ্রাবাদে ওঁদের এক অবস্থাপন্ন পারিবারিক বন্ধু ছিলেন। তাঁর একমাত্র মেয়ে দিলবারউন্নেসার সঙ্গে হাশামের বিয়ে হয়। আইনের ডিগ্রি নিয়ে অচিরে সে হায়দ্রাবাদে গিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে আইন ব্যবসা শুরু করে। খেতওয়াড়ির বসতবাড়ির সঙ্গে ওর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। এর বছর দুয়েক পরে জন্মায় সুলেমান। হাশামকে আমরা বলতাম হাশুভাই। হাশুভাই তখনও নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেনি। সুতরাং, সুলেমানের ইস্কুলে যাওয়ার বয়স হলে, ওকে বোম্বাইতে মামী হামিদা বেগম আর মামু আমিরুদ্দিনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই মামু-মামীর কাছেই হাশাম নিজেও তাঁদের সন্তানবৎ লালিতপালিত হয়েছিল। হাশাম ছিল খুবই ধর্মপ্রাণ মানুষ। যারপরনাই সদর্থে। পরকে এ বিষয়ে কখনই ও জ্ঞান দেবার চেষ্টা করত না। ওর ছিল 'আপনি আচরি ধর্ম পরকে শিখাও'-এর আদর্শ। নিষ্ঠাবান আর সৎ ব'লে ওর সুনাম ছিল হায়দ্রাবাদের কর্মচারী মহলে সর্ববিদিত। সে সময়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ঈর্ষ্যাপরায়ণ লোকেরা হোমরাচোমরা সরকারি কর্মচারীদের বাসায় কাজ করার জন্যে লাগানে-ভজানে গোছের লোক ঢুকিয়ে দিত। তাই লোকে বলত, দেয়ালেরও কান আছে। এ সত্ত্বেও, প্রথমে জেলা জজ এবং পরে হায়দ্রাবাদ হাইকোর্টের জজ হিসেবে চাকরিজীবনে হাশুভাইয়ের নামে অপযশ আর গায়ে কালি দিতে পারেনি। স্বভাবে অসামাজিক না হলেও, খুব ঘনিষ্ঠ লোকজন,

বিশেষত পরিবারের মানুষ—এর বাইরে একমাত্র কর্মসূত্রে সরকারি মহলে ছাড়া আর কারো সঙ্গে বড়ো একটা মেলামেশা করত না। সে সময়কার হায়দ্রাবাদি আবহাওয়ায় গল্পের গরু কথায় কথায় গাছে উঠত, তাতে ওর দিক থেকে সেটা ঠিক কাজই ছিল। ও কী চরিত্রের মানুষ সবাই তা জানত, পছন্দও করত। ওর ধারেকাছে কারো যাওয়ার স্পর্ধা হত না। সবাই জানত অমন সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ আর নিরপেক্ষ বিচারক আর হয় না। এরই জন্যে নিজাম জীবিতকালে তাকে 'নবাব হাশাম ইয়ার জং' খেতাব দেন এবং মৃত্যুর পর তার চরিত্র আর গুণাবলীর প্রশংসা করে স্বলিখিত একটি শোকগাথা পাঠিয়ে সম্মানিত করেন। এমন রাজকীয় গুণগান খুব কম লোকের ভাগ্যেই জুটেছে। হায়দ্রাবাদে সেকালের নবাবি আবহাওয়ায় ওর ঐ বেখাপ্পা স্বভাব নিয়ে ওকালতিতে বৈষয়িকভাবে খুব কিছু করে উঠতে পারত বলে মনে হয় না। বেশিদিন বটতলার উকিল হয়ে না থেকে একেবারে গোড়ার দিকেই নিজামের বিচারবিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়াটা ওর পক্ষে শাপে বর হয়েছিল।

একে দুজনের বয়সের এতটা তফাত, তার ওপর কম বয়স থেকেই ওর বোম্বাইয়ের বাড়িছাড়া হয়ে থাকা—এই কারণে, আমার আর সব ভাইবোনদের সঙ্গে যতটা, হাশুভাইয়ের সঙ্গে আমার ততটা ভাব গড়ে উঠতে পারেনি। ছেলেবেলায় সুলেমান আর তার ভাই (দুই)-বোনের (চার) সঙ্গে হায়দ্রাবাদে গিয়ে ইস্কুলের ছুটি কাটিয়ে এসেছি। তার বেশি নয়। ফলে, হাশুভাইকে ভালোভাবে জানার আমার তেমন সুযোগ হয়নি। এ সত্ত্বেও, বড়ো হয়ে নানা উপলক্ষে ওর সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারি। হাশুভাই ছিল নিপাট ভালো মানুষ। যাকে লোকে বলে দেবতুল্য। আমরা দুজনে ছিলাম সম্পূর্ণ আলাদা ধাতের মানুষ । ধ্যানধারণা আর জীবনকে দেখার ভঙ্গিতে দুজনের কোনোই মিল ছিল না। তবু ওর প্রতি আমার গভীর ভালবাসা, পরম অনুরাগ আর শ্রদ্ধা পোষণ করে এসেছি।

১৯৩১ সাল। তখনও হায়দ্রাবাদ জুড়ে ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজ চলছে। এই সময় সোসাইটির জার্নালে ধারাবাহিক ভাবে বেরোচ্ছিল 'দি প্রিজার্ভেশন অব ওয়াইল্ডলাইফ ইন ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার'। একেকটি প্রদেশ আর দেশীয় রাজ্য ধরে ধরে নিবন্ধগুলি লেখা হচ্ছিল। হায়দ্রাবাদ রাজ্য সম্পর্কিত অংশটি লেখার জন্যে সোসাইটি আমাকে অনুরোধ জানাল। কারণ, ওখানেই আমি ঘাঁটি গেড়ে থাকায় সরাসরিভাবে আমার তথ্য যোগাড়ের সুযোগসুবিধে রয়েছে। ১৮৯৭ সাল পর্যন্ত যতটা যা দেখা যায়, বাঘ মারা বা অন্য কোনো শিকারে কোনোরকমের বিধিনিষেধ ছিল না। মাত্র ১৯১৪ সালে এই আইন জারি করা হল যে, সরকারের লিখিত অনুমতি ছাড়া রাজ্যের কোথাও কেউ শিকার করতে পারবে না। কেবল সপরিবার নিজাম, পাইগা অভিজাতকূল আর জায়গিরদাররা এর আওতায় পড়বেন না। কিন্তু ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত নিজামের রাজ্যে কোনো অস্ত্র আইনের বালাই ছিল না। ফলে, গোটা রাজ্য রকমারি ধরনের গুলিবন্দুকে

ছেয়ে গিয়েছিল। তার বেশির ভাগটাই অবশ্য ছিল সেকেলে গাদাবন্দুক। তবে খানাডোবার ধারে গিয়ে পশুপাখি নির্বিচারে মারার পক্ষে ঐ বন্দুকই ছিল যথেষ্ট। বনজঙ্গলে গেলেই দেখা যেত যেকোনো জলাশয়ের ধারে যো-সো ক'রে মাচা বাঁধা আর ডাঙায় গর্ত করা। চোরাশিকারিদের এটাই ছিল চলিত প্রথা। আমার কম বয়সে শিকারের দিনগুলোতে খুব প্রিয় আর মনে রাখার মতো বই ছিল ক্যাপ্টেন এ.আই. আর. গ্লাসফুর্ড-এর 'রাইফ্‌ল্ অ্যাণ্ড রোমান্স ইন দি ইণ্ডিয়ান জাঙ্গল্' (আনুমানিক ১৯০৫ সালে প্রকাশিত)। লাইসেন্সবিহীন গাদাবন্দুকের যথেচ্ছ ব্যবহার দাক্ষিণাত্যের চতুস্পার্শ্বের বন্যপ্রাণীকুলের সেই সময়েই যে কী সর্বনাশ ডেকে আনছে, সে সম্পর্কে ঐ বইতে তখনই কড়া মন্তব্য করা হয়েছিল। সুতরাং, অনেক দেরিতে বিধিনিষেধ আরোপ করায় এবং চোরা শিকারিরা কোনো মরশুমের আর সেইসঙ্গে বধ্য প্রাণীর বয়সের তোয়াক্কা আর স্ত্রী পুরুষভেদ না করায় বড়ো বড়ো প্রাণীরা প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জীপের চলন হওয়া, সামন্ততন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে রূপান্তর আর তার ফলপরিণামে অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ আর বনসম্পর্কিত আইনকানুনের বারোটা বেজে যাওয়া—এই সব কিছুর যোগফলে অবস্থা ক্রমশ খারাপ থেকে আরও খারাপের দিকে গেছে।

আমার অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে, শিকারযোগ্য প্রাণীদের যারা রক্ষী, সেই মুস্তাজিমেরা এবং সংরক্ষিত রাজকীয় শিকারস্থল 'শিকারগড়ে'র যারা নজরদার—এরা সব দুর্নীতিগ্রস্ত এবং মহা ছ্যাঁচড়া। স্থানীয় হালহকিকত বিষয়ে ওদের দেওয়া তথ্য কখনই খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য হয় না। এটা অনায়াসে ধরে নেওয়া যায় যে, চোরাশিকারের অনেকটাই ঘটে থাকে হয় এদের যোগসাজশে অথবা এদের পা ঢিলে দেওয়া আর গাফিলতির জন্যে। আর এই চোরাশিকারের বড়ো পাণ্ডা হল ছোটবড়ো সরকারি আমলার দল। যে হায়দ্রাবাদ রাজ্য উনিশ শতকের গোড়াতেও ছিল কিছু কিছু সেরা বাঘ আর বড়ো বড়ো শিকারযোগ্য প্রাণীর আবাসস্থল, মাত্র একশো বছর পরে তার আজ এই হাড়ির হাল হয়েছে। একদিকে রাজ্য সরকারের তালুকদার থেকে শুরু ক'রে পুলিশ বা রাজস্বের অধস্তন দারোগা, মায় ফরেস্টার পর্যন্ত, অন্যদিকে জেলাকোর্টের উকিল সম্প্রদায়, স্থানীয় ব্যবসাদার মহল এবং শাঁসালো দোকানমালিক—সমাজে কল্কে পাওয়ার জন্যে প্রত্যেকেরই দাবি, তিনি নাকি কমপক্ষে একটি বা দুই বা ততোধিক বাঘ মেরেছেন। বাহবাস্ফোট আর মুখেন মারিতং জগৎ-এর ব্যাপারটা হিসেবের মধ্যে রেখেও বলা যায় যে, মাত্র চল্লিশ বছর আগেও যে ভুরি পরিমাণ বাঘ এ রাজ্যে ছিল, তার সঙ্গে আজকের তুলনা করলে মন খারাপ না হয়ে পারে না। নিজাম নিজে শিকারে যেতেন না। কিন্তু বড়ো দুই নবাবজাদা পয়লা নম্বরের কসাই। আমার ক্ষেত্রসমীক্ষা শেষ হওয়ার অনতিকাল পরে ১৯৩৫ সালের মে মাস নাগাদ তখনকার আসন্ন উত্তরাধিকারী আজম জাহ্ বাহাদুর সদলবলে পাখাল,

মুলুগ ইত্যাদি বিভিন্ন শিকারগড়ে যান শিকার করতে। ওদের বিলাসবহুল মাচানগুলোতে ছিল পরিপূর্ণ গৃহসুখের ব্যবস্থা। তাতে ফিল্ডটেলিফোনেরও ব্যবস্থা ছিল। বিটের সময় সেখান থেকে মুহুর্মুহু রিপোর্ট পাঠানো হত। এক নাগাড়ে তেত্রিশ দিন ধরে চলেছিল এই শিকারপর্ব। তাতে যেমন অসংখ্য ভালুক, শম্বর আর অন্যান্য শিকার মিলেছিল, সেই অনুপাতে মারাও পড়েছিল পঁয়ত্রিশটি বাঘ।

□

৯

ইতিমধ্যে নীলগিরি

১৯৩২-এর এপ্রিলে হায়দ্রাবাদ রাজ্যে পক্ষিতাত্ত্বিক সমীক্ষার কাজ শেষ হয়ে যায়। ত্রিবাঙ্কুর কোচিন সরকারের সঙ্গে সোসাইটির তরফে সেখানে পাখি জরিপের ব্যাপারে কথাবার্তা চলছে। কী ফলাফল হয় তার জন্যে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। মাঝের এই সময়টা কোথায় কাটাব ঠিক করা নেই। আমাদের কপালের জোর বলতে হবে যে, আমাদের হায়দ্রাবাদের এক পারিবারিক বন্ধু মিসেস নন্দী জানালেন, নীলগিরি পাহাড়ের ছোট্ট নিরিবিলি কোটাগিরি শৈলাবাসে ওঁর 'মঁ অব্‌রি' নামের একটা ছুটিতে থাকার যে কটেজ আছে, সেখানে গিয়ে আমরা অনায়াসে থাকতে পারি। শুনে আমরা যেন হাতে স্বর্গ পেলাম। তখন পর্যন্ত আমি দক্ষিণ ভারতের বর্ষণমুখর চিরহরিৎ শোলার বন দেখিনি। অন্যদিকে নীলগিরিতে মাসকয়েক থাকার সুযোগ পেলে ত্রিবাঙ্কুরের জলহাওয়ার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া যাবে। এক ঢিলে দু পাখি মারা সম্ভব হবে। তাছাড়া মাঝের এ ক'মাসে নিরিবিলিতে আমি হায়দ্রাবাদ রাজ্যের পাখির ওপর আমার রিপোর্ট লেখা সেরে ফেলতে পারব। এ কাজটা করতে পারলে আগে যেখানে কাজ হয়নি, সেইসব রাজ্যও এই প্রকল্প হাতে নিতে পারবে। পঞ্চাশ বছর আগে কোটাগিরি ছিল ভারি সুন্দর নিদ্রালস এক শৈলাবাস। খ্রিস্টানদের নানা সম্প্রদায়ের সব মিশন—'সেভেন্থ ডে অ্যাডভেঞ্চারিস্টস' এবং অন্যদের মধ্যে 'ওয়ান বাই ওয়ান ব্যাণ্ড', যাদের নামও কখনও আমরা শুনিনি—কোটাগিরি ছিল তাদের খুব পছন্দের জায়গা। 'সভ্য' মানুষদের অনেককেই এখানকার রাস্তাঘাটে দেখা যেত। তারা অনেকেই অবসরপ্রাপ্ত পাদ্রি। মহিলা আর পুরুষ। সব থুথ্‌থুরে বুড়োবুড়ি। দেখে মনে হত, একটু আরামে মরতে পারবে বলেই যেন এখানে তাদের আসা। যতই এর পরিবেশ তরুগুল্মময় নিরুপদ্রব হোক, এর জলহাওয়া আর নৈসর্গিক প্রকৃতির যতই মায়া থাক—কোটাগিরি ছিল খুবই একঘেয়ে নিষ্প্রাণ জায়গা। কর্মিষ্ঠ কমবয়সীদের বাসের অযোগ্য। কেউ যদি দুদিনের জন্যে জিরোতে আসে কিংবা সমতলের গরম আর ধুলো থেকে পরিত্রাণ পেতে আসে তো সে আলাদা কথা।

চারপাশে এমন কেউ নেই যার বোধবুদ্ধি আছে, যার সঙ্গে কথা ব'লে মন

খোলসা করা যায়। এ আর কাঁহাতক ভালো লাগে। দুমাস যেতে না যেতেই আমরা দুজনেই হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। এই সময় সরকারি হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার মিষ্টভাষী তরুণ ডাক্তার কে. এম. অনন্তনের সঙ্গে দৈবাৎ আলাপ হয়ে গেল। একটা ছোটখাটো উপসর্গের জন্যে একদিন হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। সেখানেই আলাপ। অনন্তনের বাড়ি কেরালায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় স্বেচ্ছায় মিলিটারির ডাক্তার হয়ে মেসোপোটেমিয়ায় চলে গিয়েছিলেন। লড়াইয়ের শেষে আর্মি মেডিকেল কোরের ক্যাপ্টেন হিসেবে অবসর নিয়ে মাদ্রাজ সরকারের বেসামরিক ডাক্তারের কাজ নেন। খোশমেজাজের সেই ডাক্তার আর তাঁর আনন্দময়ী আটপিঠে স্ত্রী দেখতে দেখতে আমাদের হলায় গলায় বন্ধু হয়ে গেলেন। আমাদের মতন ওঁরাও ছিলেন নিঃসন্তান। আমরা সবরকম কাজেকর্মে আনন্দআহ্লাদে একসঙ্গে থাকতাম। কখনও জঙ্গলে হাঁটা, পাখি দেখা, পিকনিক করা, গাড়িতে ঘোরা, ঘরে ব'সে খেলা মজা করা—সব একসঙ্গে মিলে। প্রত্যেক মাসের শেষে ডা. অনন্তনকে মাইনে আনতে উটকামণ্ডে যেতে হত। প্রায় বিশ কিলোমিটার রাস্তা। ওঁর ছিল একটা আদ্যিকালের দু-আসনের মরিস অক্সফোর্ড। পেছনে একটা ডিকি সিট। তারই মধ্যে ঠেলাগোঁজা ক'রে উঠে বসতাম। উটিতে যেতে পাহাড়ি রাস্তায় বেশ কিছু চড়াই পেরোতে হত। খাড়াই বেয়ে ওপরে তুলতে হয়রান বালখিল্য গাড়িটাকে অনেক বাপুবাছা করতে হত। সেইসঙ্গে কিছুটা কাঁধও লাগাতে হত। রাস্তায় পড়ত বোটানিকাল গার্ডেন। সেখানে আশপাশে মিলত পাখি দেখার মওকা আর সেইসঙ্গে হত বনভোজন। ডাক্তারের ঝুলিতে থাকত অফুরন্ত মজার মজার গল্প আর নানারকম অভিজ্ঞতার কথা। এরই মধ্যে সোসাইটি থেকে খবর এসে গেল যে, ত্রিবাঙ্কুর রাজদরবার তাদের রাজ্যে পাখি জরিপের প্রস্তাবটি মঞ্জুর করেছে। সেইসঙ্গে জানতে চেয়েছে কত তাড়াতাড়ি এই কাজ শুরু করে দেওয়া সম্ভব হবে। কাজ পেয়ে গিয়ে কোটাগিরি ছেড়ে আসতে তেমন কষ্ট হয়নি।

কোটাগিরিতে থাকতেই র‍্যাল্‌ফ্ মরিস-এর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। মরিস ছিলেন তখনকার মহীশূর রাজ্যের বলিগিরিরঙ্গন পাহাড়ের এক কফি বাগিচার মালিক। সেইসঙ্গে একজন প্রথম শ্রেণীর প্রকৃতিবিজ্ঞানী আর দুর্ধর্ষ শিকারী। পরবর্তী জীবনে তিনি কায়মনোবাক্যে বন্যপ্রাণি সংরক্ষণের ব্রত গ্রহণ করেন। ১৯২০ থেকে ১৯৪০—এই সময়কালের মধ্যে সোসাইটির জার্নালে দক্ষিণ ভারতীয় পাহাড় পর্বতে শিকার আর প্রকৃতিবিদ্যার অভিজ্ঞতালব্ধ নানা বিবরণ নিয়মিতভাবে লেখেন। লেখাগুলো পাঠকদের কাছে একাধারে পাঠ্য আর মনোগ্রাহী হয়েছিল। র‍্যালফ-এর স্ত্রী হিদার ছিলেন চমৎকার মানুষ। যেমন শক্তপোক্ত তেমনি সর্বগুণসম্পন্ন। হিদারের বিধবা মা থাকতেন কোটাগিরিতে লংউড শোলার প্রান্তে একটি সুদৃশ্য বাংলোয়। তাঁকে ওরা প্রায়ই দেখতে আসতেন। কোটাগিরিতে প্রথম দিনের আলাপেই আমি আর তহমিনা ওঁদের

দুজনের প্রীতিবন্ধনে বাঁধা পড়েছিলাম। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ওঁরা ছিলেন আমাদের প্রিয়তম এবং সবচেয়ে দামি বন্ধুদের অন্যতম। তহমিনা আমাদের চিরতরে ছেড়ে চলে যায় ১৯৩৯ সালে, র‍্যালফ ১৯৭৭ সালে আর তার দুতিন বছরের মধ্যে বিদায় নেন হিদার—আমাদের ছাড়াছাড়ি হয় এইভাবে।

আমার আর র‍্যাল্‌ফ-এর দীর্ঘদিনের পরিচয় ছিল জার্নালে লেখার মারফত আর চিঠি দেওয়া নেওয়ার সূত্রে। এইভাবেই আমরা পরস্পরের আগ্রহ আর কাজের খবর রাখতাম। ত্রিবাঙ্কুরে আমাদের আসন্ন পক্ষিসমীক্ষার খবর শুনে সস্ত্রীক র‍্যালফ আমাদের এই ব'লে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন যে ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজ শুরু করার আগে আমরা যেন ওঁদের সঙ্গে ওঁদের কফি বাগিচায় কয়েকদিন কাটিয়ে আসি। এও জানালেন যে, কোটাগিরি থেকে উত্তর ত্রিবাঙ্কুরে মারাইয়ুর দিয়ে ঢোকাই সবচেয়ে সুবিধে। সেই সপ্তাহটা বা দিন দশেকের সেই হোন্নামেত্তিতে বাস আমার পক্ষে খুবই কাজের হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের বনজঙ্গল সম্পর্কে র‍্যাল্‌ফ্-এর ছিল নিখুঁত জ্ঞান। ফলে, ওঁর সাহায্যে গোটা রাজ্যের বিভিন্ন ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য খেয়ালে রেখে সমীক্ষার জন্যে বেশ সম্ভাবনাপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ একটা কর্মসূচি আর সফরনামা ছকে ফেললাম। মরিসদের সেই সম্ভ্রান্ত বাড়িটার কথা ভাবলে এখনও মন কেমন করে। ক'টা দিন মহা আরামে কাটিয়েছিলাম সেখানে। সেটা এজন্যেও স্মরণীয় যে, দক্ষিণ ভারতের কফি বাগিচার একজন ইউরোপীয় সুরুচিসম্পন্ন মালিক কী প্রকারে জীবন নির্বাহ করেন, বাড়ির ভেতরে থেকে তা দেখার সুযোগ মিলেছিল ব'লে। তাঁকে দিশে দেখাবার বড়ো একটা কেউ ছিল না। নিজেকেই পথ কেটে এগোতে হয়েছে। তারই পরিণামে এই সাফল্য আর আত্মপ্রসাদ। না ছিল কারো সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক রাখার উপায়, না ছিল কোনো সুখসুবিধে। দরকার হয়েছে শক্তপোক্ত শরীরের, দিনরাত হাড়ভাঙা খাটুনির আর নিঃসঙ্গ বনবাসে থাকার একাগ্রতার। হতে হয়েছে সপূর্ণ স্বাবলম্বী। করতে হয়েছে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব কিছু। হতে হয়েছে একাধারে ছুতোর, রাজমিস্ত্রি, জলকলের কাজ জানা লোক, ইলেকট্রিশিয়ান, মোটর মেকানিক আর টুকিটাকি ফাইফরমাশ খাটার লোক। ক্ষেত্রীয় উদ্ভিদবিদ্যা, গাছের রোগ আর কীটনিয়ন্ত্রণ—এসব বিষয়ে ভালোরকম মৌলিক জ্ঞান অর্জন ক'রে হাতেকলমে উদ্যানবিদ হতে হয়েছে। তাছাড়া স্থানীয় ভাষা ভালো ক'রে আয়ত্ত ক'রে, বিরাটসংখ্যক কুলিমজুরদের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে সুকৌশলে তাদের দিয়ে খুশি মনে কাজ চালাবার বিদ্যেটাও রপ্ত করতে হয়েছে। প্লান্টারের ঘরণী হতে গেলে যা যা গুণ থাকা দরকার, তার সবই ছিল হিদারের মধ্যে। কড়া ধাতের মানুষ সে। যথাযথভাবে গোছালো সুখপ্রদ বাড়ির গৃহিণী হিসেবে ওর একটা আত্মভিমান ছিল। বাড়ির সব কাজ নিজে হাতে ক'রে। কারো অসুখ করলে টোটকা ওষুধ দেওয়া, বাচ্চাদের দেখাশোনা সেবাযত্ন করা, গরু দোয়ানো, উঠোনে তরিতরকারি চাষ করা, ফুলের বাগান করা। ঠেকায় পড়লে

যেকোনো কাজ ও করতে পারত। শ্রমিকদের আর তাদের বাড়ির লোকদের হিতাহিত সম্পর্কে তার ছিল সত্যিকারের দরদ। তার স্বামীর মতোই বনবাসে সে পেত ঝাড়া হাত পা হয়ে (হিদার বলত) শান্তিতে থাকার সুখ। আগে এক সময়ে হিদার বড়ো জানোয়ার শিকার অভিযানে যাওয়ার জন্যে এক পা বাড়িয়ে থাকত। বিবলিগিরিরঙ্গ আর আশপাশের পাহাড়ী এলাকা এই শিকারের জন্যে বিখ্যাত ছিল।

একবার হয়েছিল এক অবাক কাণ্ড। আজও সেটা আমার কাছে রহস্যই থেকে গেছে। অনেক পরেকার এ ব্যাপারটা মরিসকে নিয়ে। ১৯৫৩ সালে জম্মু ও কাশ্মীর সরকার ওঁদের রাজ্যের দাচিগাম আর অন্যান্য অভয়ারণ্যের (তখন বলা হত 'জীবাশয়') বন্যপ্রাণি পর্যবেক্ষণ এবং তার সুপরিচালনার ব্যাপারে সলাপরামর্শ দেবার জন্যে দুতিন জন অভিজ্ঞ সংরক্ষণবিদদের একটি দল পাঠাবার জন্যে সোসাইটিকে অনুরোধ জানান। স্বাভাবিকভাবেই এই দলে মরিসকে বেছে নেওয়া হয়। কিন্তু মরিস তখন পীড়াদায়ক স্লিপ্‌ড্ ডিস্ক্-এ ভুগছিলেন। মাঝে মাঝেই প্রচণ্ড ব্যথায় শয্যাশায়ী করে ফেলত। যাই হোক, দেশটাকে চোখে দেখা আর তার বন্যপ্রাণিকুল সম্পর্কে জানবার লোভে যাব না যাব না ক'রেও শেষপর্যন্ত রাজি হয়ে যান। একদিন শ্রীনগরের ক্যাম্প থেকে টাট্টু ঘোড়ায় চেপে যখন আমরা রওনা হয়েছি, তখনই ব্যথাটা চাড়া দিয়েছে। আমি কেবল ভাবছি এতটা লাফিয়ে চলা রাস্তার ধকল উনি সামলাবেন কী ক'রে। আমরা পাশাপাশি যাচ্ছিলাম। এমন সময় ওঁর ঘোড়ার একটা পা ইঁদুরের গর্তে পড়ায় যেই সে আছাড় খেয়েছে, র‍্যাল্‌ফ্ তার মাথার ওপর দিয়ে ছিটকে শক্ত মাটিতে সপাটে চিৎপটাং হয়ে পড়ে গেলেন। আমি ভাবছি—এই রে, ওঁর পিঠের হাড় বুঝি মট্‌কে গেল। এবার আমাদেরও সার্ভের বারোটা বেজে গেল। দেখি কী, তাজ্জব ব্যাপার। মরিস সাহেব সটান উঠে পড়েছেন। একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছেন, এই যা। ব্যথা একদম সেরে গেছে, পরে আর কোনোদিন হয়ওনি।

আমার কর্মজীবনের সবচেয়ে ফলপ্রসূ সময় ছিল ১৯৩০ থেকে ১৯৫০। এই পর্যায়ে যে কাজটা ক'রে আমি সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছি, সেটা হল ত্রিবাঙ্কুর কোচিনের পক্ষিতাত্ত্বিক সমীক্ষা। যেমন ক্ষেত্রসমীক্ষা ক'রে, তেমনি কাজের ফলাফল লিপিবদ্ধ ক'রে। পরে সেই তথ্যপঞ্জি ভিত্তি করেই 'দি বার্ডস অব কেরালা' বইটি আমি লিখে ফেলি। সহ্যাদ্রি বা পশ্চিমঘাট পর্বতমালার একান্তে দক্ষিণভারতীয় পাহাড়গুলোর অতুলনীয় সৌন্দর্য, অন্যদিকে পৃথিবীর আদিযুগের সেই চিরহরিৎ অরণ্যের ঠাসবুনট আর মহিমা—এছাড়াও এর প্রাণিকুল আর উদ্ভিদ জীবনে এমন এক বিশেষত্ব আছে, যা তাকে বাকি উপদ্বীপ থেকে আলাদা এক স্বাতন্ত্র্য দেয়। দক্ষিণের পশ্চিমঘাটের স্থানপুঞ্জের (নীলগিরি, পালনি প্রভৃতি) অংশভাক কেরলের উচ্চতর পাহাড়ি ভূখণ্ডের সঙ্গে পূর্ব হিমালয়, পশ্চিম চীন, বর্মা আর মালয়েশিয়ার উদ্ভিদবর্গ আর প্রাণিকুলের বিচিত্র মিলের কথা পূর্বতন প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা ইতিপূর্বেই বলে গেছেন। দু অঞ্চলের

বসবাসকারীদের মধ্যে ২০০০ কিলোমিটারেরও বেশি ব্যবধান। বাস্তুসংস্থানের দিক দিয়ে দুই সম্পূর্ণ আলাদা ভূখণ্ড। এমন সৃষ্টিছাড়া ব্যাপারটা আমাদের ফাঁপরে ফেলে। দু অঞ্চলের নদীতে আর পাহাড়ি ঝোরায় যেসব মাছের প্রজাতি মেলে, অন্তবর্তী আর কোনো ভূখণ্ডে তা পাওয়া যায় না। মাছের এই ব্যাপারটাই আমাদের সবচেয়ে বেশি ধাঁধায় ফেলে। কেননা এক জায়গার জলের সঙ্গে অন্য জায়গার জলের যোগসূত্র ছাড়া এটা ঘটতে পারে না। এই উপদ্বীপের মৎস্যবর্গ এবং এখানকার ভূতত্ত্ব, ভূতাত্ত্বিক অঙ্গসংস্থান আর আবহতত্ত্ব খুঁটিয়ে বিচার করেছেন বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী ড. সুন্দরলাল হোরা তাঁর 'সাতপুরা হাইপথেসিস' লেখাটিতে। তাঁর ধারণায়, হিমালয়ের পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে এককালে দক্ষিণ পশ্চিম ভারতের সংযোগ ছিল। মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে পশ্চিমাভিমুখি হয়ে রাজমহল পাহাড়পর্বত ছাড়িয়ে সাতপুরা পর্বতমালা টপ্‌কে পশ্চিমঘাট বরাবর দক্ষিণ মুখো হয়ে দক্ষিণাঞ্চলের শেষপ্রান্তে পৌঁছে শ্রীলঙ্কায় গিয়ে তা শেষ হয়েছিল। যুগের পর যুগ ধরে সেই সংযোজক উচ্চভূমির ক্রমান্বয়ে ক্ষয় হয়েছে। এক সময়কার অবিভক্ত বসতির ভগ্নাবশেষ হয়ে দক্ষিণভারতীয়রা আজ ছিন্নমূল জীবন যাপন করছে। ড. সুন্দরলাল হোরার এই ব্যাখ্যা আমার কাছে সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। ত্রিবাঙ্কুর কোচিনের পক্ষিসমীক্ষায় গিয়ে এই সমস্যাটিকে আমি বিশেষভাবে মাথায় রাখি।

পাখির ওপর আমার সমীক্ষাটি সোসাইটির জার্নালে ধারাবাহিকভাবে ছাপা হলে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রপত্রিকায় তা নিয়ে যেসব সমালোচনা আর মন্তব্য বার হয়, আমার পক্ষে তা খুবই সন্তোষজনক হয়েছিল। যাদের মতামতকে আমি মূল্য দিই, তেমন অনেকেই লেখাটির প্রশংসা করেন। হিউ হুইসলার লেখেন (৮.৯.১৯৩৬)। 'তোমার ত্রিবাঙ্কুরের চমৎকার কাজের প্রশংসা ক'রে দি আইবিস পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাটি পড়লাম। টাইসহার্স্ট সম্পাদক হিসেবে খুব কড়া লোক। সহজে কাউকে ভালো বলেন না। উনি যদি কোনো কিছুর প্রশংসা করেন, তাহলে বুঝতে হবে তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।' টাইসহার্স্টের প্রশংসায় আমি যে বেশিরকম আত্মপ্রসাদ পেয়েছিলাম তার একটা কারণ ছিল। ১৯২৯ সালে স্ট্রেসেম্যান আর স্ট্যানফোর্ড সম্পর্কিত বর্মার অনুস্মৃতিটি আমার মনে ছিল। ঐ ঘটনার পর টাইসহার্স্ট কখনই প্রকাশ্যে আমার সম্পর্কে কোনো আন্তরিকতা দেখাননি। সে সময়ে নিউইয়র্কের প্রকৃতিবিজ্ঞান বিষয়ক মিউজিয়ামের পক্ষিবিভাগের কিউরেটার ছিলেন আর্নস্ট্‌ মেয়র। তিনি বলেন (২৭.১.১৯৩৬)। 'আপনার রিপোর্টের সবচেয়ে মূল্যবান যে অংশ, তা হল নিরীক্ষিত প্রজাতিগুলির জীবনবৃত্তান্ত আর বাস্তুসংস্থান বিষয়ক তথ্য। বিষয়টি নিয়ে আপনি সুচারুভাবে যে আলোচনা করেছেন তার জন্যে আপনাকে অভিনন্দন জানাই। এই ধরনের সমীক্ষায় আপনার আলোচনা অন্যদেরও পথ দেখাবে।' অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক কেনেথ মেসনকে (ভারত সরকারের

প্রাক্তন সার্ভেয়ার জেনারেল) হুইসলার ত্রিবাঙ্কুর আর কোচিনের পক্ষিতাত্ত্বিক বিবরণের আমার লেখা মুখবন্ধটি পাঠিয়ে দেন। পত্রোত্তরে মেসন লেখেন :

> লেখাটি বিস্তর ভৌগোলিক আগ্রহ নিয়ে আমি পড়েছি। যেসব ভৌগোলিক কারণ পাখিদের জীবনে ছাপ ফেলে, তার ওপর লেখা আর সিদ্ধান্তগুলোকে দাঁড় করাবার জন্যে প্রয়োজনে গণ্ডির বাইরে পা রেখেছেন। দক্ষিণ-ভারতের ভূগোল যতটা আমার জানা আছে, তাতে দেখেছি, তার প্রত্যেকটি বিশেষ প্রশ্ন লেখকের কবজায় আছে। নিজস্ব সিদ্ধান্ত টানতে উপযুক্তভাবে তিনি তা ব্যবহার করেছেন। এর অন্তর্গত একটি গৌণ বিষয় হল, আমার মনে হয়, এখনকার ভূতাত্ত্বিকেরা ধরে নেন যে, পুরনো জলবিভাজিকার চূড়াটি রয়েছে উপদ্বীপীয় ভারতের পশ্চিমে—যেখানে এখন লাক্ষাদ্বীপের প্রবাল গঠিত হয়, তারই আশপাশে কোথাও সেইসঙ্গে গোটা পর্বতশ্রেণীর চূড়াদেশের অধোগতির পশ্চিমঘাটে স্খলন সংঘটিত হয়। অতএব, দক্ষিণের উপদ্বীপীয় ভারত পূর্বাংশের অর্ধেকেরও কম এবং পৃথিবীর আদিযুগের জলবিভাজন রেখা সরে গিয়ে বর্তমানে পূবের দিকে হয়েছে। এতে সেলিম আলির যুক্তিতে কোনো আঁচড় তো পড়েই না, বরং তাকে আরও জোরালো করে।

উপদ্বীপীয় ভারতের শিলাপ্রস্তরবিদ্যায় যাঁরা আগ্রহী, তাঁদের খুব কাজে লাগবে ব'লে, যেমন আমার ক্ষেত্রে ঘটেছিল—এই তথ্যটি এখানে জুড়ে দেওয়া হল।

'ফনা অব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সিরিত'-এর পক্ষিবিষয়ক খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণের গ্রন্থকার ঈ.সি. স্টুয়ার্ট বেকার ছিলেন তখন ব্রিটিশ অর্নিথোলজিস্ট্‌স্ ইউনিয়নের সেক্রেটারি। 'ত্রিবাঙ্কুরের পক্ষিকুল সম্পর্কে আপনার অতি উৎকৃষ্ট লেখাগুলির' প্রাপ্তিস্বীকার উপলক্ষে জানান : 'এ কথা না ব'লে পারছি না যে, প্রাণিবর্গ সংক্রান্ত কাজে 'এক-ছাঁচে ঢালা ভুলভ্রান্তি'র উল্লেখ ক'রে আপনার সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে আমি দুঃখ পেয়েছি। হুইসলার আর টাইসহার্স্ট আমার সম্পর্কে যেরকম বিদ্বেষ পোষণ করেন, আমার ভয় হচ্ছে, আপনার মধ্যেও সেটা চারিয়ে গেছে।...গত ১২ বছরে আমি ৮ খণ্ড বই লিখেছি, তবে তা শেষ করতে আমাকে দিনে রোজ গড়ে ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা সমানে খাটতে হয়েছে।' ওঁর চিঠির উত্তরে গোড়ায় তার অবদানের আমি যে একজন বড়ো অনুরাগী, প্রকৃতই আমি তা মনে করতাম,—সে কথা জানিয়ে অনবধানবশত যদি তাঁকে ব্যথা দিয়ে থাকি, তার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিই। সেইসঙ্গে এটাও জানাই যে, আমার সমালোচনাটি ছিল সম্পূর্ণতই আমার নিজস্ব এবং নিতান্ত সরল বিশ্বাসেই আমি করেছিলাম। তার পেছনে অন্য কারো প্ররোচনা ছিল না। চিঠিতে এও বলি 'এটা (কাজের সমালোচনা) না থাকলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কখনই এগোতে পারে না।' এ থেকে বোঝা যায় যে, পক্ষিতত্ত্ববিদরাও রক্তমাংসের মানুষ।

ত্রিবাঙ্কুরে ভাগ্যক্রমে পাওয়া মহার্ঘ নিদর্শনগুলির একটিকে আমি তখন শাহীবাজ ব'লে ভুল করেছিলাম। হুইসলারও প্রথমদৃষ্টে বলেছিলেন জের্ডন্‌স বাজা। ব্রিটিশ

মিউজিয়ামে খুব ভালো ক'রে করে দেখে বলা হয়, আসলে ওটা পালকযুক্ত পদাঙ্গুলিবিশিষ্ট বাজপাখি (ফেদারটোড হক ঈগল)—যার লাতিন নাম 'স্পিজেটাস নিপালেন্সিস কেলারতি'। হুইসলারের মতে, 'আমি মনে করি, বিশ্বে এ যাবৎ সংগৃহীত শিকারি পাখিদের একটি বিরলতম নিদর্শন। এ পাখি আগে কখনও আমি দেখিনি। তাজ্জব ব্যাপার এই যে, এরই অনেকটা ক্ষুদে সংস্করণ হল বাজা।' নিদর্শনটা আমি পেয়ে গিয়েছিলাম একেবারেই বরাত জোরে। কোচিন ফরেস্ট ট্রামওয়ের শেষ গুমটি ছিল পাহাড়ের মাথায়। বাজপাখিটা ছোঁ মেরে মুর্গি নিতে এলে ইঞ্জিনের ফায়ারম্যান ইঞ্জিনের জালানির গাদা থেকে একটা চেলাকাঠ তুলে নিয়ে পাখিটাকে মারে। আমরা তখন রেলরাস্তা বরাবর কয়েক মাইল দূরে কুরিয়ারকুট্টিতে ক্যাম্প করে আছি। লোকটা জানত যে, আমরা পাখির ধান্ধায় ঘুরছি। ক্যাম্পের পাশ দিয়ে যাবার সময় ট্রেন থামিয়ে পাখিটাকে ও আমাদের হাতে তুলে দেয়। কবুল করছি যে, আমি ধরেই নিয়েছিলাম স্রেফ ওটা একটি মামুলি শাহীবাজ। অত বড়ো বড়ো পাখি প্যাকিং বাক্সে আঁটানোই মুশকিল। সুতরাং পাখিটা পেয়ে আমি খুব একটা খুশি হতে পারিনি। অথচ নিদর্শনটা এত ভালো আর আমাদের সংগ্রহে শিকারি পাখি সংখ্যায় এত কম যে, হাতছাড়া করাও সম্ভব হচ্ছে না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত গজ গজ করতে করতে পাখির চামড়াটা কোনোক্রমে বাক্সে ভরে নিলাম। ক্যাম্প বদ্‌লি করার সময় এই এক ফ্যাচাং। একবার প্যাক করো, তারপর সব বার ক'রে আবার প্যাক করো। জ্বালাতনের একশেষ। কাজেই পরে যখন দেখা গেল যে, সেই কষ্ট সার্থক হয়েছে তখন আমি আনন্দে আটখানা তো হবই।

পক্ষিজীবনের বৈভব আর বৈচিত্র্য—যেদিক দিয়েই দেখা যাক, আমার মতে, কেরলের স্থান ছিল পয়লা নম্বরে। অন্তত পঞ্চাশ বছর আগে এটাই ছিল এদেশের পক্ষিজীবনের চিত্র। বিশেষ ক'রে কিছু এলাকা, যেমন, উত্তরাংশের ত্রিবাঙ্কুরে পেরিয়ার নদীতীরবর্তী তাট্টাকড় অঞ্চল। উপদ্বীপীয় ভারতে আমি আমার অভিজ্ঞতায় এত সমৃদ্ধ পক্ষিঅধ্যুষিত জায়গা আর দেখিনি। একমাত্র পূর্বাংশের হিমালয়ের সঙ্গেই এর তুলনা চলে। সমীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর কয়েক বছর অন্তর নিয়মিত আমি কেরলে গিয়েছি। যতবার গিয়েছি ততবারই বিষণ্ণ হয়ে ফিরেছি। যত দেখেছি ততই আমার পিলে চম্‌কে গেছে। যেভাবে একের পর এক আহাম্মক সরকার এসেছে আর গেছে। দৃশ্যের পর দৃশ্যে এসেছে ধড়িবাজ রাজনীতিকের দল। চিরহরিৎ বনজঙ্গলের অহল্যাভূমি উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে সেখানে ফিরে আসা দেশ ছাড়াদের এনে বসিয়েছে। কিংবা বন উজাড় করে দিয়ে তথাকথিত 'উন্নয়ন' প্রকল্পের নামে জলবিদ্যুৎ তৈরির বাঁধ বানিয়েছে। আর কাঠভিত্তিক শিল্পের কাঁচামাল যুগিয়েছে। তাট্টাকড়কে আজ আর দেখে চেনা যায় না। শিল্পোন্নয়নের ঢাক ঢোল পিটিয়ে বেশির ভাগ সব অপূর্ব বন কেটে সাফ ক'রে সেখানে এক ফসলা বাণিজ্যিক কৃষিক্ষেত বানিয়ে কিংবা পেরিয়ার নদীতে বাঁধ দিয়ে

সৃষ্টি সংসার জলে ডুবিয়ে ভুষিনাশ করা হচ্ছে। সেইসঙ্গে চলছে প্রতি বছর বনের ১,৫০০ হেক্টর ক'রে চিরহরিৎ অহল্যাভূমি কেটে সাফ ক'রে সে জায়গায় ইউক্যালিপ্টাস, রবার আর তেল নিংড়ে নেবার জন্যে নারকোল গাছ। যেখানে একদিন মরালের মতো হেলেদুলে চলত ফরেস্ট ট্রামওয়ে, সেই পরম্বিকুলমের আর্দ্রতা আর আর্দ্রপর্ণমোচী মেশানো চিরসবুজ বনের হাজার হাজার হেক্টর সেরা জমি ন্যাড়া করে দিয়ে সেখানে হয় সেগুনের চারা এনে বসানো হচ্ছে, নয় জলস্তরের তলায় ডুবিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একই পথে এই মুহূর্তে বিপন্ন হওয়া পরিবেশ বাঁচানেওয়ালা আর কেরল সরকারে যে ঢিসুম ঢিসুম চলেছে, আপাতত হয়তো তার একটা নিষ্পত্তি হলেও হতে পারে।

বাড়ির হাবিজাবি জিনিসের ভেতর থেকে আমার স্ত্রীর পুরনো একটা সাংসারিক হিসেবের খাতা উদ্ধার করা গেছে। তাতে ত্রিবাঙ্কুর কোচিনের সার্ভের খরচ খরচা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করা আছে। সেটা দেখে অবাক হচ্ছি যে, ঐ দুই রাজ্যে পাঁচ মাস ধরে ক্ষেত্রসমীক্ষায় মোট খরচ হয়েছিল ২,৪৫৮ টাকা। দেখে নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। একজন কাজের লোক সমতে আমরা কর্তাগিন্নি। বোম্বাই থেকে আমাদের প্রত্যেকের রেলভাড়া আর একগাদা মালের মাশুল। সব তার মধ্যে। চার জনের তিন বেলার খাইখরচা, কাজের লোকের মাইনে, ক্যাম্প ঠাঁইনাড়া করতে প্রাইভেট বাস ভাড়া করা, গ্রাম্য শিকারি আর জঙ্গলের দিশারিদের দৈনিক মজুরি, হ্যানত্যান, এটাসেটা সব নিয়ে। তাছাড়া পাখির চর্মসংরক্ষণকারীর মাইনে, ফিল্ড-ভাতা আর ট্রেনভাড়া, গুলিবারুদের খরচ (.৪১০ ডাস্ট শতকরা ৯ টাকা, ২০-বোরের শর্ট কার্তুজ সাড়ে-ন'টাকা ক'রে), ভালোভাবে সংরক্ষণের উপকরণ, নমুনাগুলি পার্সেল ক'রে পাঠাবার ডাকখরচ—এসব বহন করেছে আমাদের সোসাইটি। দুই রাজ্য সরকার মিলে সার্ভে বাবদ দিয়েছিল ৪,৫০০ টাকা। কাজ সম্পূর্ণ করার পর দেখলাম আমার হাতে থেকে গেছে করকরে ২,০০০ টাকা। ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই যে, সে সময়ে কত কমের মধ্যে কত বেশি কাজ আমরা হাসিল করতে পেরেছি। ভারতীয় পক্ষিবিদ্যার বরাত ভালো ছিল ব'লে বিভিন্ন আঞ্চলিক এত বেশি জায়গা জুড়ে, আগে যেখানে কখনও হাত পড়েনি, সেখানেও ব্যাপকভাবে কাজ করা সম্ভব হয়েছে। আর দিনেরাতে যখনই দরকার পড়েছে ছাই ফেলতে ভাঙা কুলোর মতো বিনা পয়সায় পাওয়া গেছে আমাকে। বর্তমানে ক্ষেত্র-গবেষকদের মাইনের যা বহর, জিনিসপত্র আর পারিশ্রমিকের যা খরচ, তাতে এ ধরনের ধীরসুস্থে, একেবারে গভীরে গিয়ে এ ধরনের সমীক্ষা চালানোর কথা তো ভাবাই যায় না। বোম্বাইয়ের সোসাইটির মতন অনুদানহীন প্রতিষ্ঠানের তা সাধ্যেরও বাইরে।

□

১০

দেরাদুন আর বাহাওয়ালপুর ১৯৩৪-৯

চার বছর হয়ে গেছে জার্মানি থেকে ফিরেছি। স্থায়ী কোনো কাজ নেই, নিজেদের একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। আমরা ভাবলাম—না, এভাবে বেদের টোল ফেলে বেড়ানো নয়, বন্ধুবান্ধবের ঘাড়ে থাকা আর নয়। এবার একটু মনের মতন নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে থাকতে হবে। যেখানে জীবনযাত্রা বোম্বাইয়ের মতন ব্যয়বহুল নয়। আবার এমন এঁদো জায়গাও হবে না, যেখানে মেশবার মতো মানুষজন নেই বা বুদ্ধির দিক দিয়ে একেবারেই ভোঁতা। হামিদভাই তখন আই-সি-এস থেকে অবসর নিয়ে মুসৌরিতে ডেরা বেঁধেছে। হামিদভাই সব শুনেটুনে বলল, সেক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে আদর্শ জায়গা হবে দেরাদুন। শৈলাবাসের পাদদেশে। ওর কথা শুনে আমরা আর দ্বিধা করিনি। যেসব আকর্ষণের এতদিন স্বপ্ন দেখে এসেছি, তার সঙ্গে এবার আরও একটা যোগ হল। থাকাও যাবে হামিদের কাছাকাছি। শুধু আমার প্রিয় ভাই ব'লে নয়; ও যেমন যুক্তিবাদী তেমনি ইহজাগতিক মানুষ। হামিদভাই ছিল আমার আদর্শপুরুষ। ওর ওপর আমার প্রচণ্ড টান ছিল।

ছেলেবেলা থেকেই, চোখে দেখারও আগে—আমি ছিলাম হিমালয় বলতে পাগল। শয়নে জাগরণে আমি স্বপ্ন দেখতাম, পরবর্তী জীবনে যদি পাকাপাকিভাবে থাকার জায়গা বেছে নেবার সুযোগ পাই, তাহলে আমি নিঃসন্দেহে বেছে নেব হিমালয়ের পাদদেশ। জীবনে যেসব জিনিস পাওয়ার জন্যে মরে যাই, সেই মনোরম অরণ্য, পরম রমণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য আর শিকার করে বেড়ানোর অঢেল সুযোগ—সেখানে সবই যেন আমার দোরগোড়ায় এসে যাবে। আমি হয়ে যাব সেখানকার একেবারে মাটির মানুষ। এর চেয়ে কাব্যময় আর কী হতে পারে? ১৯২৫ সালে আমি তখন বোম্বাইতে এক দেশলাই কলে কাজ করি। দেশলাইয়ের কাঠি তৈরির উপযোগী কাঠ সম্বন্ধে বৈষয়িক খবরাখবর নেবার জন্যে কারখানার মালিক আমাকে দেরাদুনে পাঠান। আমাকে যেতে হয়েছিল ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটে। সে যাত্রায় জীবনে সেই প্রথম আমি হিমালয় দেখি। ফিরে দেখার সে বাসনা বার বার আমার মনে জেগেছে। বেড়ালের ভাগ্যে এতদিনে শিকে ছিঁড়ল। আমার স্বপ্ন অংশত সফল হতে চলেছে। আমার আর

তহমিনার জীবনের সবচেয়ে সুখের সময় এই পাঁচ বছরের দেরাদুনে বাস। সহৃদয় কত বন্ধু পেয়েছি। পেয়েছি ভাবনাচিন্তা উস্কে দেওয়ার মতন ব্যাপক মানুষের সঙ্গ। দেখে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যাওয়ার মতন প্রাকৃতিক পরিবেশ। আমার কথা বলতে পারি, আমার মন ভরে গিয়েছিল। এত ভালোও আমার কপালে সয়নি। আমার জীবনে নেমে এল এক বিয়োগান্তক পরিণতি। তহমিনাকে অস্ত্রোপচার করার দরকার হল। তেমন একটা বিপদের ঝুঁকি ছিল না। রক্তদুষ্টি হয়ে যাওয়ার ফলে ১৯৩৯-এর জুলাইতে তহমিনা মারা যায়। তহমিনা চলে যাওয়ার ফলে আমি মহা ফাঁপরে পড়ে গেলাম। দেরাদুনে থাকব, না অন্য কোথাও চলে যাব। আমার সবচেয়ে ছোট দিদি কামরুন্নিসা। যাকে আমরা কামু ব'লে ডাকতাম। ও ছিল আমার চেয়ে দু বছরের বড়ো। কামু আর ওর স্বামী (আমার জ্যাঠা ফয়জুল হুসেনের ছেলে) দুজনে মিলে ধরে বসল আমার এভাবে একা একা থাকা চলবে না। আমি যেন বোম্বাই চলে গিয়ে ওদের বান্দ্রার পালি-হিলের চমৎকার বাড়িটাতে ওদের সঙ্গে থাকি। তখনও পালি-হিল ছিল সবুজে ছাওয়া শহরতলির এক নিরিবিলি আবাসিক এলাকা।

শহুরে জীবনের ওপর আমার কোনোদিনই টান ছিল না। দেরাদুনে আমরা প্রায় প্রকৃতির কোলে অতগুলো বছর কাটিয়েছি। তারপর সেধে আবার সেই বোম্বাইতে ফিরে যেতে মন চাইছিল না। অন্যদিকে এটাও ঠিক যে, তহমিনা ছেড়ে চলে যাওয়ায় দেরাদুনে সেই আগের জীবন আর ফিরে পাচ্ছিলাম না। আর কোনোদিন তা ফিরে আসবেও না। প্রধানত দুটো কথা মাথায় রেখে আমি আমার আখের ঠিক করে ফেললাম। প্রথমত, কামু আর হাসান বরাবর ছিল আমাদের দুজনেরই খুব আদরের আর কাছের মানুষ। ওরা ভালবেসে অত ক'রে বলায় ওদের কথা ঠেলতে পারছিলাম না। সেইসঙ্গে ভেবেছি বোম্বাইয়ের ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটির কথা। ওদের রয়েছে অত সুন্দর পাখির সংগ্রহ, লাইব্রেরি ভর্তি বই, আত্মীসূয় সহকর্মীর দল এবং আরও নানা সুযোগ সুবিধে। তার জোরে আমি আমার কাজ চালিয়ে যেতে পারব। ওদিকে রয়েছে দেরাদুনের প্রবল পিছুটান। অতীতের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, মনের কষ্ট মনে রেখে সেদিন আমি ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলাম। পরের জীবনে যেটুকু সাফল্য আমি অর্জন করতে পেরেছি, তা সম্ভব হয়েছে অনেকটাই সেদিনকার সেই সিদ্ধান্তের গুণে। সদাপ্রসন্ন হাসান আলির বাড়িতে নিজেকে মনে হত যেন কোনো মঠের জ্ঞানভিক্ষু। সব তরতরিয়ে চলছে। সংসার চালানো, হিসেব রাখা—এসব কোনো মাথাব্যথা নেই। কুটোটি ভেঙে দুখানা করতে হয় না। ঝাড়াহাতপা হয়ে সারাটা সময় পক্ষিতত্ত্ব নিয়ে কাজ করে যেতে পেরেছি। আমাকে ওরা আদরে রেখেছে, আমার সব জুলুম সহ্য করেছে। কখনও তার অন্যথা হয়নি। তার জন্যে ওদের ধন্যবাদ জানাব, তারও উপায় নেই। আমি ওদের যত্নের ফলে, কাজ ক'রে যে স্বীকৃতি পেয়েছি, আমার পরিবার আর আমার দেশের মান রাখতে পেরেছি—আশা করি, ওরা

বুঝবে যে, তারই মধ্যে আমার রয়ে গেছে কিছুটা প্রতিদান। ওদের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতার সামান্য চিহ্ন।

দেরাদুনে থাকতেই, ১৯৩৪-এর আগস্টে অর্থনৈতিক পক্ষিতত্ত্ব বিষয়ক একটি কমখরচের গবেষণাপ্রকল্পের খসড়া তৈরি ক'রে প্রস্তাবাকারে পাঠাই। বহু আগে থেকেই আমার মনে হচ্ছিল যে, পাখিদের খাদ্য আর খাদ্যাভ্যাস নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করতে পারলে তা থেকে সুদূরপ্রসারী ফল পাওয়া যাবে এবং তা এক নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেবে। কৃষি আর বনবিদ্যা—এই দুটি মৌলিক শিল্পের ওপর এর যথেষ্ট প্রভাব পড়বে। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যুরো অব বায়োলজিক্যাল সার্ভে-র ফোর্বস্, ম্যাক্ অ্যাটি কোটাম, আর যুক্তরাজ্যের কলিঞ্জ এবং জার্মানি, জাপান আর অন্যান্য নানা দেশের বিজ্ঞানীদের গবেষণা আর প্রকাশিত রচনা এবং তাদের সঙ্গে পত্রালাপ এ কাজে আমাকে উৎসাহ যোগায়। আমার এই প্রস্তাবটি বিবেচনা করে দেখার জন্যে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির কৃষি ডিরেক্টর ড: ডব্লু বার্নস্-এর মারফত 'ইম্পিরিয়াল (এখন ইণ্ডিয়ান) কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (আই সি এ আর)' এর কাছে পাঠাই।

পরিকল্পনাটির মুখবন্ধে আমি একথা বলি যে, ভারতে কৃষিবিদ্যা, উদ্যানবিদ্যা আর বনবিদ্যায় পক্ষিকুলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে কখনই স্বীকৃতি বা মান্যতা দেওয়া হয়নি। এই প্রভাব দ্বিবিধ : একদিকে, মাঠের খাদ্যশস্য আর বাগানের ফল পাখিরা প্রচুর পরিমাণে খেয়ে নষ্ট করে, অন্যদিকে, যেসব পোকামাকড় আর শস্যের অনিষ্টকারী মুষিকাদি জীব রয়েছে, তারা বহু প্রজাতির পাখির খাদ্যতালিকা ভুক্ত এবং কিছু প্রজাতির পাখির একমাত্র খাদ্য। আমাদের দেশ বহুলপরিমাণে কৃষি আর বনসম্পদের ওপর নির্ভরশীল। কাজেই এই দুই ক্ষেত্রে পাখির যে চাপ পড়ে, তাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে একই পাখি একাধারে কখনও উপকারী আবার কখনও অনিষ্টকারী। ডিম ফুটে বাচ্চা হওয়া থেকে বড়ো হওয়া এবং প্রতিটি ঋতু ধরে ধরে পাখির গোটা জীবন এবং জীবপরিবেশ খুঁটিয়ে বিচার করা জরুরি। তা থেকে আমরা পাখির অর্থনৈতিক স্থিতি নির্ধারণ করতে পারব। যেসব পাখি অংশত শাকাহারী আর অংশত আমিষাশী, তাদের বিশেষভাবে খতিয়ে দেখা দরকার। কে কী জাতীয় খাবার কতটা ক'রে খায়, তা ল্যাবরেটারিতে পাকস্থলী পরীক্ষা করে সচরাচর বলা যায়। তবে সব সময়ে নয়। সেইসঙ্গে বিধিবদ্ধভাবে ক্ষেত্রসমীক্ষা ক'রে পাখির খাদ্যাভ্যাস, পছন্দের আহার, আচার আচরণ আর সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির গতি নির্ধারণ করাও কম জরুরি নয়। এ সবই আমার প্রস্তাবে ছিল।

নরমদেহী কীটপতঙ্গরা পাখির পাকস্থলীতে গিয়ে এমন পিণ্ডি পাকিয়ে যায় যে, কোন্‌টা যে কী তা চেনা দুষ্কর হয়ে পড়ে। মাঠে গিয়ে পাখি কীভাবে কী খায় এবং তাদের ধরা শিকারের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ক'রে এ ঘাটতি অনেকাংশে পূরণ করা যায়। তেমনি আবার, অনেক প্রজাতির পাখির অভ্যেস ফুলের মধু খাওয়া। মধু খেতে গিয়ে

মাথার পালকে লেগে এক ফুল থেকে অন্য ফুলে সঞ্চারিত হয়। এদিক থেকে তারা গাছের বংশবিস্তারে সাহায্য করে। ঐসব পাখির পাকস্থলী থেকে বড়জোর কিছু বিবর্ণ তরলপদার্থ মিলতে পারে। তা থেকে ঐ পদার্থের উৎস্থল (কোন্ প্রজাতির ফুল) কী, সে বিষয়ে জানবার আশা কম। পাখিটি কোন্ ফুলে ব'সে মধু খাচ্ছে সেটা লক্ষ্য করলে তবেই সে খবর জানা যায়। কোনো একটি অঞ্চলে কোনো প্রজাতির পাখির সামগ্রিক অর্থনৈতিক হদিশ করতে হলে স্থানীয় লোকসংখ্যা—সমূহ জীবের সংখ্যা—সেখানকার বাস্তুসংস্থানের সঠিক হিসেব প্রজনন সম্পর্কিত এবং সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির গতি। এই যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

এ কাজ করতে হলে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্ষেত্র পক্ষিতাত্ত্বিক, ল্যাবোরেটারিতে তাঁর সহায়ক একজন অভিজ্ঞ কীটবিদ, এর ভুক্ত বীজ আর উদ্ভিদ শনাক্তকরণে সক্ষম একজন উদ্ভিদবিদ থাকা প্রয়োজন। পক্ষিকুলের জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে সামুহিকভাবে সমন্বিত কর্মযোগ দরকার। সেইসঙ্গে হাতের কাছে তৈরি থাকা চাই প্রতিনিধিমূলক বীজসংগ্রহ এবং এই ধরনের অন্যান্য তুলনাত্মক অন্যান্য নির্দেশক সুত্র। যুক্তরাজ্যে এবং ইউরোপের আরও নানা দেশে ব্যাপকভাবে এই নিয়ে গবেষণা হয়েছে, এখনও হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে পূর্বেকার ব্যুরো অব বায়োলজিকাল সার্ভে মার্কিন দপ্তরের যা শাখা বিশেষ—কৃষি আর বন সম্পদের পক্ষে আদতে প্রয়োগসাধ্য খুব মূল্যবান বিরাট তথ্যভাণ্ডার গড়ে তুলেছে। তাছাড়া এর বিশুদ্ধ বিজ্ঞানচর্চার দিক তো আছেই। আমার পরিকল্পনাটি পাঠিয়ে ঐ সমীক্ষার প্রধান জীবতত্ত্ববিদ মিঃ ডব্লু. এল. ম্যাক্অ্যাটির অভিমত জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান 'পরিকল্পনাটি খুবই সুচিন্তিত'। তিনি এ বিষয়ে কয়েকটি পরামর্শ দিয়ে উল্লেখ করেন—আপেক্ষিক শস্যকীটগুলির ওপর নিবারক প্রভাব দেখানোর চেষ্টা অতটা না করাই ভালো; কেননা খুব কম ক্ষেত্রেই তা যথেষ্ট লক্ষ্যযোগ্যভাবে স্পষ্টত দেখানো যায়। সেক্ষেত্রে বরং বিভিন্ন জীব আর উদ্ভিদের সঙ্গে সম্পর্ক টেনে পাখিদের পরিচিত প্রবণতাগুলির ওপর পক্ষিকুলের সংরক্ষণের অর্থনৈতিক যুক্তিকে দাঁড় করাতে হবে।

আমি এমনই ভ্যাবলা ধরনের আশাবাদী ছিলাম যে ভেবে বসে আছি যে আমার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হল ব'লে। আজ নয় কাল। আমার আহাম্মকি ধরা পড়ল যখন দু-বছর পর সব চেষ্টা শেষ পর্যন্ত মাঠে মারা গেল। ইতিমধ্যে অবিরাম চিঠি চালাচালি। আজ অমুকের কাছে, কাল তমুকের কাছে জবাবদিহি করা। আজ এ-কমিটি, কাল সে-কমিটির তলব। তাও কী, পরিকল্পনাটির পেছনে একাধারে সোসাইটি, ডঃ বার্নস্ আর বোম্বাই প্রাদেশিক কৃষি রিসার্চ কমিটির প্রবলতম সমর্থন থাকা সত্ত্বেও। প্রধানত, বুদ্ধি খাটিয়ে এর ওর 'পিঠ চুলকানো' অথবা আর যেটা করা, তাকে বলা যায়, 'দরাদরি'র একটা সুভদ্র সংস্করণ। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সি আই সি এ আর (কেন্দ্রীয় ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ)-এর কাছে টাকা চেয়ে নানা ধরনের উন্নয়ন বা

গবেষণার প্রকল্প পেশ করা হয়েছে। এটাই ছিল সে সময়ের রীতি। (যতদূর জানি, আজও সেটা বহাল আছে)। বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধি আর বিচিত্র ধরনের 'বিশেষজ্ঞ'দের নিয়ে তৈরি উপদেষ্টা কমিটি সেসব খুঁটিয়ে দেখবেন। বোম্বাই যদি পাঞ্জাবের স্কিম সমর্থন করে—অন্য কথায়, বোম্বাই যদি পাঞ্জাবের 'পিঠ চুলকোয়'—তাহলে তার প্রতিদানস্বরূপ পাঞ্জাবও তাই করবে। এই ছিল সচরাচর কাজকারবারের ধরন। আমার অর্থনৈতিক পক্ষিতত্ত্ববিষয়ক পরিকল্পনাটি নীতিগত ভাবে অনুমোদন পেলেও, সি আই সি এ আর-এর তালিকায় অগ্রাধিকার পর্যায়ে সপ্তদশে স্থান পেল। আমার স্কিম যিনি সোৎসাহে সমর্থন করেছিলেন এবং তার ভাবনার সূচনা থেকেই নানা ওঠাপড়ার ভেতর দিয়ে তাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই ড: বার্ন্‌স্ তিতিবিরক্ত হয়ে এবং অতীতের নানা অভিজ্ঞতায় নাজেহাল হয়ে লিখলেন—অবস্থা যা, তাতে এই স্কিমে টাকামজুরির পালা কবে আসবে, আদৌ আসবে কিনা কিছুরই ঠিক নেই এক্ষেত্রে আমার উচিত এর আশা একেবারে ছেড়ে দিয়ে আর কোনো কাজে লেগে পড়া। আমার পক্ষে এটা ছিল খুবই শোকাবহ ব্যাপার। তবে ঘটনা যেদিকে গড়াচ্ছিল, তাতে এমন হওয়াটা একেবারে অভাবনীয় বলে মনে হয়নি। সর্বসাধারণের ক্ষেত্রে, এমন কি বৈজ্ঞানিক আর জাতীয় স্তরে রাজনীতির এই কুচুটে ভূমিকা আমার চোখ খুলে দিয়েছিল। এ জাতীয় কোনো পরিকল্পনা সরকারি দরদালানের কূটকচালে অলিগলি আর আইনের রোকটোক, 'প্রতিপক্ষে'র ধোঁকাবাজি—এত জায়গার এত রগড়ানি খেতে খেতে আর সেইসঙ্গে পদে পদে লালফিতের জট ছাড়াতে ছাড়াতে শেষ পর্যন্ত কী ক'রে কাজ কামাল করে, সেটাই এক আশ্চর্যের ব্যাপার।

আমাদের সোসাইটির একজন ক্ষেত্র সংগ্রাহক ছিলেন ভি এস. লাপেরসন। ১৯৩৩ সালে যোধপুর রাজ্যে একটি মনোরম সংগ্রহের কাজ করেন। হিউ হুইসলার আর আমার দুজনেরই তাঁর অনুসারী হয়ে গোটা রাজপুতানা মরুভূমির স্বল্প পরিজ্ঞাত পক্ষিজীবন নিয়ে আরও সবিস্তারে জরিপের কাজ করার সাধ ছিল। পরবর্তী কাজের ক্ষেত্র হিসেবে আমার নজর গিয়ে পড়েছিল বাহাওয়ালপুর রাজ্যের দিকে। ছেলেবেলায় ইস্কুলছুটির দিনগুলোতে সিন্ধুপ্রদেশে হামিদভাইয়ের কর্মসূত্রে ঘোরাঘুরির সময়টাতে আমি তার সঙ্গী হতাম। সেই অনুষঙ্গ নতুন ক'রে জাগিয়ে তোলার ইচ্ছেটা আমায় পেয়ে বসল। রাজপুতানা স্টেট্‌স্ এজেন্সির তদানীন্তন ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট এবং আমীরের সরকারের 'শিকার অফিসার' হিসেবে নিযুক্ত ব্রিটিশ ভারতের পুলিশ সার্ভিসের অবসরপ্রাপ্ত সদস্য মি. অ্যাটকিনসন—দুজনেই ছিলেন আমাদের সোসাইটির সমর্থক সক্রিয় সদস্য। এঁদেরই ব্যক্তিগত আগ্রহে ১৯৩৯-এর গোড়ার দিকে বাহাওয়ালপুর রাজ্যে পাখি জরিপের কাজ আরম্ভ হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, এটাই ছিল শেষ ক্ষেত্রসমীক্ষা, যাতে তহমিনা যোগ দিয়েছিল। এই সমীক্ষা শেষ হওয়ার কয়েকমাস পরেই সে মারা যায়। ভারতীয় রাজন্যদের সম্বন্ধে আপাদমস্তক রংবাজ বলতে যা

বোঝায়, বাহাওয়ালপুরের আমীর ছিলেন হুবহু তাই। এর বছর কয়েক আগে যুবরাজ হিসেবে তার 'শেষ চানকান'—স্বরূপ ইংলণ্ড সফর সেরে ড্যাং-ড্যাং ক'রে ঘুরে এলে যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়ে যে, সেখানকার কোন্ জিনিস তাঁর মনে সবচেয়ে বেশি দাগ কেটেছে—তার উত্তরে তিনি নাকি বলেন, 'নটিনীদের শ্রীচরণ।' তাঁর দরবারের মোসাহেব আর প্রসাদভোগীরা তাঁর অসাধারণ সব দুষ্প্রবৃত্তিতে সুড়সুড়ি দেবার জন্যেই সদাসর্বদা হুজুরে হাজির থাকত। তার মধ্যে একজন ছিল আমীরের যাবতীয় অশ্লীল ছবিলেখার ভাণ্ডারী। মোগল মিনিয়েচারে, বিশেষ ক'রে, পশুপাখিদের অনুচিত্রে, আমার আগ্রহের কথা জানতে পেরে একদিন আমাকে পাশে ডেকে নিয়ে যায়। তারপর একজন বিশেষ অতিথিকে বিশেষ খাতির করার ভাব নিয়ে সিন্দুকের তালা খুলে বেশ কিছু মোগল আর রাজপুত মিনিয়েচার পেন্টিং দেখায় আর বলে মহামান্য রাজবাহাদুর নাকি বিশেষত এইসব ছবির ভারি অনুগ্রাহী। ছবি হিসেবে সব ক'টিই অনবদ্য। যেমন রংরেখা, তেমনি পারিপাট্য। তবে সব ছবিতেই দেখানো হয়েছে—অর্ধবসনে নবাবজাদারা (যদিও মণিরত্নখচিত 'দস্তার'গুলো মাথার ওপর যেমন তেমনি আছে) আর তাদের সঙ্গিনী মহিলারাও যথোপযুক্ত বিবসনা। তারা এমন সুকৌশলে আর অকল্পনীয় ভঙ্গিতে পরস্পরকে জড়াজড়ি করে আছে, যার পাশে কোথায় লাগে খাজুরাহো।

রাজধানীতে আসা নামজারি করা অতিথিদের প্রথম তিন দিন রাজ অতিথি হিসেবে গণ্য করা হবে—এটাই ছিল অতিথিসৎকারের প্রচলিত নিয়ম। তিনদিন হয়ে গেলে তখন মনে রাখতে হবে যে, এখন থেকে অতিথিনিবাসের খরচ নিজেদের মেটাতে হবে। রাজ্যের অতিথিবৎসলতার একটা অদ্ভুতরকমের চাংড়ামির দিক হল, অতিথিদের কাউকে প্রথম শ্রেণী আর কাউকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ফেলার। পরদিন সকালে নাস্তা আসবার আগে পর্যন্ত আপনি জানতেই পারবেন না আপনাকে কোন্ কোঠায় ফেলা হয়েছে। ডাইনিং টেবিলের সামনেই বড়ো বড়ো ক'রে যে তালিকা দেওয়া আছে, সেটা থেকেই আপনি পেয়ে যাবেন শ্রেণী নির্ণয়ের সূত্র। ঐ টাঙানো নোটিসের স্তম্ভ দুটির দিকে তাকিয়ে বুঝে নিতে হবে যথাক্রমে প্রথম শ্রেণীর বা তার নীচে দ্বিতীয় শ্রেণীর অতিথিরা কে কী আশা করতে পারেন। তাতে দফাওয়ারি লেখা আছে : 'প্রথম শ্রেণীর অতিথি ২টি ডিম, দ্বিতীয় শ্রেণীর অতিথি ১টি ডিম। প্রথম শ্রেণীর অতিথি ২টি টোস্ট, দ্বিতীয় শ্রেণীর অতিথি ১টি টোস্ট—একাদিক্রমে এইভাবে খাদ্যতালিকা দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার আপনাকে কোন্ চোখে দেখছে, সেটা একেবারে দ্বিধাহীনভাবে আপনাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে, অবশ্যই খুব পাষাণহৃদয়ে। সুতরাং পরদিন সকালের নাস্তায় আমাদের একেকজনকে ২টি ক'রে ডিম দিতে দেখে আমরা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচলাম।

মরুভূমিতে রং বদলে বহুরূপী সেজে প্রাণীরা শত্রুর চোখে ধুলো দেয়। এই বিষয়টা বরাবর আমাকে খুব টেনেছে। বাহাওয়ালপুরে সার্ভে করতে গিয়ে এই

সমস্যাটাকে খুব কাছ থেকে তলিয়ে দেখার আমি চমৎকার সুযোগ পেয়ে যাই। এশিয়া আর আফ্রিকার বিভিন্ন পক্ষিকুল আর জীবনাবস্থা নিয়ে বিশেষভাবে তত্ত্বতাবাশ করেছিলেন মেইনের্ৎস্‌হাগেন। নিখুঁত সাক্ষ্যপ্রমাণের সাহায্যে তিনি যে তত্ত্বটি খাড়া করেন তা এই ভূতলে কী পরিমাণ অতিবেগুনি রশ্মি প্রবেশ করবে এবং সেখানকার সমগ্র জীবন আবহমণ্ডলে আর্দ্রতার ঘনত্ব অনুযায়ী তা নিয়ন্ত্রিত হয়। মরুভূমিতে আর্দ্রতা কম ব'লে উচ্চতর শতাংশ হারে সেখানে অতিবেগুনি রশ্মি ঢুঁকে পড়ে। সে তুলনায় সংপৃক্ত আবহ এই অনুপ্রবেশে প্রবলভাবে বাধা দেয়। এই কারণে, অতিবেগুনি আলো যেখানে যত বেশি প্রকট, সেখানে ফ্যাকাসে ভাবও তত বেশি (মরুভূমির ভূখণ্ডের আর সেখানে বসবাসকারী প্রাণীরা যেমন); উল্টো দিকে, অতিবেগুনি আলো যেখানে যত কম এসে পড়ে, সেখানকার ভূস্তরের রংও তত কালচে এবং সেখানকার প্রাণীদের রংও তত গাঢ় হয়। যে এক বা একাধিক কারণে মরুভূমির ওপরটা ফিকে হয় আর সেখানে বসবাসকারী প্রাণীরাও মরুভূমির রং পায় ব'লে ঐ পরিমণ্ডলে তারা দৃষ্টিপথে কম পড়ে। দৈবাৎ কখনও বৃষ্টি হলে দেখেছি যে, জলে ভিজে মরুভূমির পাখি—যেমন মাঠচড়াই আর শিকরে—তাদের রংও তাদের পায়ের নীচের ভিজে জায়গাটার মতোই খয়েরি রূপ নিয়েছে। যে পাখিদের গায়ের রং শুক্‌নো ফ্যাকাসে মরুভূমির পটভূমিতে প্রায় চোখেই পড়ে না, জলে ভেজা জায়গাটার মতোই সমান সুযোগ পেয়ে তাদের রং অনেক বেশি গাঢ় হয়ে যেতে দেখা যায়। এ থেকে মেইনের্ৎস্‌হাগেনের এই মতটাই জোর পায় যে, মরুভূমি প্রাণীদের সঙ্গে সেখানকার পরিবেষ্টনীয় বর্ণসাযুজ্যের কারণটা সম্ভবত এক আর অভিন্ন। বাহাওয়ালপুরের বিবরণ প'ড়ে মেইনের্ৎস্‌হাগেনের চিঠি পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। তিনি লেখেন : 'পালকের ওপর বৃষ্টি পড়লে কী হয়, সে সম্বন্ধে আপনার পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে আমার খুবই জানবার আগ্রহ ছিল। এটা ভেবে অবাক লাগে যে, প্রত্যক্ষগোচর ছোট ছোট সত্য কী ক'রে লোকে দেখেও দেখে না। আমার মনে হয়, আপনি যা বলেছেন তার মধ্যে বহু কিছু আছে। আশা করি, আমার মরক্কো সম্পর্কিত লেখায় আপনার ধ্যানধারণা কাজে লাগানোর অনুমতি আমাকে দেবেন।'

□

১১

আফগানিস্তান

বিখ্যাত ব্রিটিশ পক্ষিবিদ কর্নেল আর. মেইনের্ৎস্হাগেন পাখি সংগ্রহে আফগানিস্তান যাবেন মনস্থ করেছেন; পাখির ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করতে পারে, এমন একজন সফরসঙ্গী তিনি খুঁজছেন—এই খবর দিয়ে ইংলণ্ড থেকে আমার বন্ধু হিউ হুইসলার ১৯৩৫-এর কোনো একটা সময়ে আমাকে চিঠি লিখে জানতে চাইলেন যে, আমি যেতে প্রস্তুত আছি কিনা। তাঁকে আমি এই ব'লে উত্তর দিই যে, আমি খুবই খুশি হয়ে যাব, কেননা আফগানিস্তান আমাদের একেবারে পাশের দেশ হলেও, সেখানকার পাখপাখালির বিষয়ে বলতে গেলে কিছুই জানি না। যাই হোক, চিঠিতে আমি এও জানালাম যে, আমার নিজের বিশেষ আগ্রহ যেহেতু বসতিবিদ্যা, তাই সারাক্ষণ কেবল চর্মসংরক্ষণ আর এটা ওটা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে আমার ভালো লাগবে না। এসব কাজের জন্যে বাড়তি লোক নেওয়া দরকার। হুইসলার এই ব'লে আমাকে সাবধান করে দেন : 'লোকটা কিন্তু বেজায় খুঁটআখুটে—হওয়াটাই উচিত—বিজ্ঞানের যেকোনো শাখাতেই হোক, নিদর্শন তৈরির কাজ যেন ষোলআনা নিখুঁত হয়। কাজেই এবিষয়ে তোমাকে চর্মসংরক্ষণকারীদের ওপর কড়া নজর রাখতে হবে।' ১৯৩৬ সালে কেনিয়ায় অন্য একটি সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত থাকায় ১৯৩৭-এর আগে মেইনেৎস্হাগেন আফগানিস্তান অভিযানের কাজে হাত দিতে পারেননি।

পক্ষিবিদ্যার সুবাদে আমার যত জনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বর্ণময় স্বকীয় আর, নানা দিক থেকে, পছন্দের যোগ্য মানুষদের একজন হলেন রিচার্ড মেইনেৎস্হাগেন। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে তাঁর মিলিটারি জীবনের বেশির ভাগটাই কাটে পূর্ব আফ্রিকায়। ঔপনিবেশিক আমলের কেনিয়া আর টাঙ্গানাইকা নিয়ে তাঁর লেখা 'কেনিয়া ডায়রি' এবং আরও কয়েকটি বই আছে। সৈনিক, বড়ো জানোয়ার শিকারি আর পক্ষিবিদ—নানা ভূমিকায় তাঁর কার্যকলাপের বিবরণে লেখাগুলি খুবই মনোমুগ্ধকর হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কার্যোপলক্ষে আর স্বাস্থ্যপুনরুদ্ধারে স্বল্পকাল তিনি ভারতে ছিলেন। এদেশের সঙ্গে খুবই সামান্য পরিচয়। হিন্দি বা উর্দু ভাষা কিছু রপ্ত করতে পেরেছিলেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে, তার উত্তরে বলেছিলেন

যে, মাত্র একটি খুব ব্যবহারযোগ্য শব্দ তিনি আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। সেটি হল 'শুয়ার কা বাচ্চা।' সেটাকে উনি সাঁটে বলতেন 'এস্-কে-বি'। ঘরোয়া আলাপে বিপক্ষে'র লোকদের ক্ষেত্রে হরদম তা ব্যবহার করতেন। সেখানে ভাবকালির ছিটেফোঁটাও ওঁর মধ্যে ছিল না। কখনও জানের ভয় করতেন না। তেমনি ছিল শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করার ক্ষমতা।

আফ্রিকায় একবার ওঁর জীবনে একটা ঘটনা ঘটেছিল। তখন উনি কম বয়সী একজন লেফটেন্যান্ট। নান্দি উপজাতি বিদ্রোহ করেছে। তাদের দমন করার জন্যে আসকারি (আফ্রিকান সেপাই) নিয়ে রাতের বেলায় গুঁড়ি মেরে মেরে লাইবনের (সর্দার) গাঁয়ে গেছেন তাকে ধরতে। তাকে ধরে নিয়ে আসবার সময় বিরাট একদল সশস্ত্র যোদ্ধা ওদের ওপর চড়াও হয়। মেইনের্ৎস্‌হাগেন তাদের এই ব'লে শাসান যে, যদি তারা তৎক্ষণাৎ পিছু না হটে, তাহলে তিনি বন্দীকে গুলি করে মারতে বাধ্য হবেন। এ সত্ত্বেও ওরা মারমূর্তিতে ধেয়ে আসতে থাকে। যখন বোঝা গেল, অবিলম্বে ওরা তাঁকে আর তাঁর মাত্র ক'জনের সেপাই বাহিনীকে পাকড়ে ফেলবে, তখন উনি ঠাণ্ডা মাথায় রিভলভারটা তুলে লোকটাকে গুলি করে মারলেন। আর সেই উপজাতির লোকেরাও বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করে। এভাবে বীরত্ব দেখানোর পুরস্কারস্বরূপ তিনি ডি-এস-ও সম্মান পান।

তাঁর কাছে যে জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য', এর আরও একটি কাহিনী থেকে আমরা তা জেনেছিলাম। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উনি ছিলেন মধ্যপ্রাচ্য রণাঙ্গনে। শোনা গেল, একটি স্বল্পবল নিয়ে আত্মরক্ষাকারী ব্রিটিশ অবস্থানের ওপর তুরুক পক্ষ থেকে বিপুল দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার তোড়জোড় করছে। সেই শুনে তিনি ঘোড়ায় চড়ে একা একাই সেই তুরুক শিবিরে গিয়ে হাজির হলেন। মেইনের্ৎস্‌হাগেন সঙ্গে নিয়েছেন একটা বার্তাবাহী ব্যাগ। শত্রুপক্ষকে সজ্ঞানে ধোঁকা দেবার জন্যে তাতে কৌশল ক'রে ভরে দেওয়া হয়েছে একটা জাল প্ল্যান। সম্পূর্ণ অন্য একটি সেক্টরে বড়ো রকমের একটা আক্রমণে যাবে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী। সবটাই ছিল সাজানো ব্যাপার। শিবিরের প্রহরীরা তাকে দেখে ফেলামাত্র শোরগোল তুলে গুলিগোলা ছুঁড়তে শুরু করে দিয়েছে। উনি তখন উল্টোমুখো হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে পালাতে শুরু করেছেন। তুরুকদের ছোঁড়া গুলি শাঁই শাঁই ক'রে পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে। রাস্তায় সমানে ধুলো উড়ছে। এরই মধ্যে কায়দা ক'রে 'গোপন' দলিলভর্তি ব্যাগটা একসময়ে টুক ক'রে মাটিতে ফেলে দিতে ভোলেননি। দিব্যি নিরাপদে ব্রিটিশ শিবিরে তিনি যেমন ফিরে আসতে পারলেন, তেমনি ফন্দিটা ঠিকমতো খেটে গিয়ে শত্রুপক্ষও একেবারে বোকা বনে গেল। গোপন নির্দেশ ধরে ফেলেছে ভেবে ওরা নতুন করে সৈন্যসন্নিবেশ করল। এদিকে ব্রিটিশরাও মস্ত বিপদের হাত থেকে সে যাত্রায় বেঁচে গেল।

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ করার সময়কার আরেকটি ঘটনার কথা মেইনের্ৎস্‌হাগেন বলেছিলেন।

তখন ওঁর ওপর ভার পড়েছিল একজন পাইলটকে নিয়ে আকাশ থেকে নীচে মেসোপোটেমিয়ার গ্রামগুলোতে প্রচারপত্র ছড়িয়ে দেওয়া। এরা ছিল তুরস্কের 'অত্যাচারিত' মানুষ। প্রচারপত্রে বলা হত মহানুভব ব্রিটিশেরা ওদেরই মুক্তির জন্যে তুরুস্কদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এ কাজে যে বিমানটি ব্যবহার করা হত, সেটি এক ইঞ্জিনের টু-সিটার বাইপ্লেন। দেখেই বোঝা যায়, একেবারে লজ্ঝড়। পেটানো ছাল্‌টি কাপড়ে তৈরি তার পাখা। পাইলটও ছিল তেমনি বেপরোয়া। বিমানঘাঁটিতে সে বাণ্ডিলের পর বাণ্ডিল ইস্তাহার ঠেসে ঠেসে ভরছিল। চুপচাপ ব'সে দেখতে দেখতে একটা সময়ে রিচার্ড একটু বিচলিত হলেন। কিন্তু শেষে ব্যাপারটা বিপদের দিকে চলে যাচ্ছে দেখে তিনি কথাচ্ছলে জিজ্ঞেস করে বসলেন—কতটা ওজন এতে বইবার কথা। পাইলট পেছনের দিকে ফিরে নিঃস্পৃহভাবে উত্তর দিল : 'ও, সেটা ওরা সাব্যস্ত করবে ময়নাতদন্তের সময়'—ব'লে আবার সেই বাণ্ডিলের পর বাণ্ডিল ভরতে লাগল। যখন আর এক তিলও জায়গা রইল না, তখন থামল।

যেমন উনি নিজের বিপদ গায়ে মাখতেন না, তেমনি ছিল মেইনের্ৎস্‌হাগেনের দৈহিক যন্ত্রণা সহ্য করার ক্ষমতা। আমরা যখন কাবুলে একটা নলবনে পাখি সংগ্রহের কাজ করছি, তখন একদিন অসাবধানে একটা ছুঁচোলো শলায় পা দিয়ে ফেলেন। সেটা ভেঙে মাংস ভেদ করে প্রায় দেড় আঙুল ভেতরে গিঁথে যায়। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে জলকাদা ভেঙে এগিয়ে চললেন। এদিকে তখন সমানে তাঁর পা দিয়ে রক্ত পড়ে যাচ্ছে। শেষকালে অনেক ব'লে ক'য়ে তাঁকে ফিরে যেতে রাজি করানো গেল। এম্‌ব্যাসির ডাক্তারকে দিয়ে বিঁধে থাকা শলাটা বার করার জন্যে খোঁড়াতে খোঁড়াতে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন, সেই সময় হঠাৎ একটা শ্মশ্রুল শকুনি তাঁর চোখে পড়ে যায়। যেসব পাখি আমার খুঁজছিলাম, ওটা ছিল সেই তালিকাভুক্ত। পাখিটা ছিল অন্য একটা দিকে। শ'তিনেক গজ দূরে। শলা বিঁধে আছে, রক্ত পড়ছে। সব ভুলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সেখানে চলে গিয়ে আগে সেটাকে গুলি করে মারলেন, তারপর এসে গাড়িতে উঠলেন।

মেইনের্ৎস্‌হাগেন বোম্বাইতে পৌঁছোন ১৯৩৭ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি। এরপর থেকে অতি নিষ্ঠার সঙ্গে সব কিছু ডায়রিতে লিখে রাখতেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে অনুগ্রহ ক'রে 'বিপদের ভয় তোমারই!' ব'লে পড়তেও দেন। ততদিনে আমাদের নড়বড়ে সম্পর্ক নিবিড় বন্ধুত্বের রূপ নিয়েছে। ডায়রিতে লিখেছিলেন : 'এরপর আমি গেলাম বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটিতে। প্রেটার আর সেলিম আলির সঙ্গে সেখানে দেখা হল। শেষোক্ত ব্যক্তিটি আমার মনে অনুকূল ছাপ ফেলেছে। যতটা তাকে দেখলাম ভালো লাগল। সামনে কয়েকমাস একসঙ্গে ঘোরার পক্ষে উপযুক্ত সঙ্গী হবে। দেখে মনে হয় বুদ্ধিমান। কিন্তু দেখতে একেবারে হতকুচ্ছিত। গান্ধীর সঙ্গে অমিল নেই।

পাখিদের চর্মসংরক্ষণের জন্যে বাড়তি সহায়ক হিসেবে এন. জি. পিল্লাইকে আমি বাছাই করি। ত্রিবাঙ্কুরে পাখি জরিপের কাজে গেলে ত্রিবাঙ্কুর মিউজিয়ামের সুপারিশে পিল্লাইকে আমি সঙ্গে নিই। পিল্লাই একজন উপযুক্ত প্রাণিবিদ, ভালো কর্মী। সবচেয়ে বড়ো কথা, যেমন নম্রভাষী তেমনি ভারি সুভদ্র। বেআন্দাজি পাঁচমিশেলি দলে ওর মতন লোক খুব খাপ খেয়ে যাবে। আফগানিস্তানের জন্যে তৈরি এই সংগঠনের দিক থেকে ও বড়ো বেশি মুখচোরা আর নরম স্বভাবের মানুষ। এটাই ছিল ওর দোষ। তার জন্যে ওকে ভুগতেও হয়েছে। লোকে মাঝে মধ্যে পারলেই ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে হেনস্থা করেছে। চর্মসংরক্ষণের কাজে দেরাদুন থেকে সেখানকার বাসিন্দা ডাইসনকে আমি নিয়েছিলাম। জাতে খ্রিষ্টান। লোকটা ছিল বজ্জাত। আগে আগে বিভিন্ন সমীক্ষার কাজে দেখেছি, ওর ধাতই হল কাজে ফাঁকি দেওয়া আর দেরিতে আসা। কেউ যদি ওর পেছনে হুড়ো দেওয়ার থাকে, তাহলে ওকে দিয়ে গাধার খাটুনি খাটিয়ে নেওয়া যায়। কাজও ভালো করে। আমার স্থির বিশ্বাস ছিল যে, মেইনের্ৎসহাগেন তার ঠিক উপযুক্ত লোক। দরকারের বেশি কাজও ওকে দিয়ে তিনি করাতে পারবেন। আফগানিস্তানে যাওয়ার পথে পেশোয়ার থেকে একজন সুপুরুষ পাঠানকে 'বেয়ারা' হিসেবে আমরা দলে নিয়েছিলাম। খুব কাজের লোক ছিল সে। তাছাড়া বিদেশিদের সঙ্গে তার কাজ করার পূর্বঅভিজ্ঞতা ছিল। সাহেবদের ধরনধারণ সে জানত (যদিও বোঝাই যেত, ব্যাপারটাকে ও তেমন একটা পাত্তা দিত না।) মেইনের্ৎসহাগেন আমাদের দলের সঙ্গে একজন উপযুক্ত উদ্ভিদবিদ খুঁজতে বলেছিলেন। লখ্নৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক আমার বন্ধু বীরবল সাহ্নি, এফ-আর-এস একজন সুযোগ্য কমবয়সী ছাত্র কে. এন কল-কে নেওয়ার জন্যে সুপারিশ করে পাঠিয়েছিলেন। মেইনের্ৎসহাগেন তার ইণ্টারভিউ নেন। ছেলেটিকে তার ভালোরকম পছন্দও হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে বাতিল করেন। কেন কী কারণে আমার জানা ছিল না। না নেওয়ার কারণটা আমি এখন জেনেছি। তাঁর ডায়রিতে প্রসঙ্গত লিখেছেন : 'লখ্নৌ ৮.৩.১৯৩৭। এক তরুণ হিন্দু ছাত্র, ভূতাত্ত্বিক। আমার সঙ্গে আফগানিস্তান যেতে চায়। ছেলেটির বয়স কম, সৌজন্যবোধ আছে এবং বুদ্ধিমান। কিন্তু একসঙ্গে দু দুজন রাজদ্রোহবাদীকে সারাদিন প্রত্যহ তিন মাস একনাগাড়ে আমার পক্ষে হজম করে যাওয়া একটু কঠিন হবে। সেলিম হল পুরোদস্তুর রাজদ্রোহবাদী এবং কমিউনিস্ট, কল-ও তাই (জওহরলাল নেহরুর স্ত্রীর ভাইদের একজন) ওকে নিলে সর্বনাশ ডেকে আনা হবে।'

কাবুলে যাওয়ার জন্যে পেশোয়ারে আমরা একটা পুরনো টিংটিঙে খোলা শেভ্রোল ট্রাক ভাড়া করি। আমাদের যাবতীয় জিনিস—তাঁবু, আর ক্যাম্পিঙের সরঞ্জাম, নিদর্শন রাখার বাক্সপত্র, রেশনের বস্তা, ব্যক্তিগত লটবহর—সব চাপিয়ে দিই। সামনে শিখ ড্রাইভার তার পাশে আমি আর মেইনের্ৎসহাগেন। পিল্লাই, ডাইসন, পাঠান

বেয়ারা, ক্লীনার আর বলার মতো নয়, এমন দু একজন কুপুষ্যি গোছের লোক—এরা সব মালপত্রের সঙ্গে পেছনে বসেছে। সময়টা ছিল এপ্রিলের গোড়া। বরফ সবে গলতে শুরু করেছে। পিচ না থাকায় রাস্তায় জলকাদা। মাঝে মাঝে কুটিল বাঁক। সেইসঙ্গে ধপ করে আচমকা খাদের দিকে খাড়াখাড়ি হয়ে নেমে গেছে শত শত ফুটের গড়ান। স্টিয়ারিং হাতে সর্দারজি যেন এক মূর্তিমান জেহু (বাইবেলে বর্ণিত এক বেপরোয়া রথচালক রাজা)। রাস্তা কমাতে সটান কার্ণিক মেরে এত জোরে গাড়ি চালাচ্ছিল যে, আমরা ভয়ে মরি। পিছল বাঁকগুলোতে গাড়ির চাকা হড়কে যাচ্ছে, স্পীড কিন্তু কমছে না। আমরা বার বার হাঁ-হাঁ করে উঠছি। সর্দারজী সেসব কানেই তোলে না। আতঙ্কে আমাদের মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠেছে। সারা রাস্তা ইষ্টনাম জপতে জপতে শেষমেশ কাবুল পৌঁছে আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। তখন সন্ধ্যে গড়িয়ে গেছে। পাকা দুদিন লাগল। খাইবারপাসের ভেতর দিয়ে প্রথমে জালালাবাদ। তারপর সেখান থেকে কাবুল। কাবুলস্থ ব্রিটিশ মিনিস্টার (কর্নেল সার কের ফ্রেজার-টিটলার)-এর দৌলতে আমাদের রাখা হল বিলাসবহুল বৈদেশিক দূতাবাসে (ভারত সরকারের টাকায় তৈরি)। সে সময়কার দুনিয়ায় এ জাতীয় শ্রেষ্ঠ ভবনের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারার মতন ছিল এই বাড়ি (তার পেছনের কারণ নিঃসন্দেহে এই যে, যাতে ব্রিটিশ রাজের মাথাটা উঁচু হয়)। বাড়ির যা বহুমূল্য সাজসজ্জা তা আজকের যেকোনো আন্তর্জাতিক পাঁচ-তারা হোটেলকেও হার মানায়। কাবুলের উত্তরাঞ্চল থেকে শুরু করে আমু দরিয়া (সোভিয়েট ইউনিয়নের সীমান্ত) পর্যন্ত—এই পুরো এলাকা জুড়ে ছিল আমাদের কাজ। কাজ শেষ করতে আমাদের আট সপ্তাহ লেগেছিল। এটা হয়েছিল নাদির শা-র আমলে। নামজাদা ভুঁই-ফোঁড় বাচ্চাইশাককে গদিচ্যুত করেছিলেন নাদির শা। তার আগে গদিনশিন ছিলেন রাজা আমানুল্লা। তিনি উঠে পড়ে লেগেছিলেন সংস্কারের কাজে। বেশি তাড়াহুড়ে ক'রে করতে যাওয়াটাই তাঁর কাল হল। আমাদের কাজে আগাগোড়া আতিথ্য আর সহযোগিতা দিয়েছেন আফগান সরকার। আমাদের হয়ে যোগাযোগ করার জন্যে এমনকী একজন মেহমানদার অফিসারও (একটু ঢিলেঢালা আর আয়েশি প্রকৃতির) নিযুক্ত করেছিলেন। তার কাজ ছিল আমাদের সফরসঙ্গী হয়ে ঘোরা, সরকারি বা অন্য যেকোনো প্রতিবন্ধকতা নিরসন করা, স্থানীয় সহায়তা আর দ্রব্যসামগ্রী যোগানের ব্যবস্থা করা এবং সাধারণভাবে দেখা যাতে অবাধে যথেচ্ছভাবে গ্রামাঞ্চলে আমরা চলাফেরা করতে পারি। এবং, মেইনের্ৎস্হাগেন তার সম্পর্কে খাঁটি কথাই বলেছিলেন, 'লোকটি এ কাজে কুঁড়ের বাদশার কর্মকুশলতাই প্রমাণ করেছিল।'

ইংরেজ রাজত্ব যখন ড্যাংডেঙিয়ে চলেছে, তখন ইংরেজরা সাধারণত সমুদ্র পেরিয়ে এদেশে আসত, তাদের দেখে আমার মনে হয়েছে, মুখচোরা ভালোমানুষের অধমদের কাছে তারা মূর্তিমান যম। ব্রিটিশদের চরিত্রের আরেকটা দিক আমার চোখে পড়েছে, সেটা হল—যেই তুমি সেই তেড়িয়া লোকটির সামনে বুক টান করে দাঁড়িয়ে

সমানে চোপা করেছ, তখনই সে তোমাকে ইজ্জত দেবে। আমার ক্ষেত্রে এটা হয়েছে, তেমনি মেইনের্ৎস্‌হাগেনের ক্ষেত্রেও এটা হতে দেখেছি। তাঁর সম্পর্কে তাঁর এক জীবনীকার লিখেছেন, তিনি 'দৈহিকভাবে ছিলেন বলবান, উগ্রচণ্ডা আর নির্মম'—সুখের বিষয়, খুব আংশিকভাবে ঠিক। তাঁর গুণ ছিল অনেক। এ সত্ত্বেও, তাঁর প্রকৃতির মধ্যে একটা পরিস্কার খেঁককুটে ভাব ছিল। তাঁর বিবেচনার অভাব কখনও কখনও নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে পৌঁছে যেত। নরম মাটিতেই বেড়ালে আঁচড়ায়। বড়ো বেশি নম্র হওয়ার ফলে মেইনেৎস্‌হাগেনের কাছে পিল্লাই হয়েছিল অবিকল সেই নরম মাটি। দেখলেই বোঝা যেত, সাহেবের ভয়ে তাকে সব সময় তটস্থ হয়ে থাকতে হত। কেননা তাঁর মতে ওর কোনো কাজটাই ঠিক হয় না কিংবা যেভাবে করা উচিত সেভাবে করে না। ওঁর ধারণায়, আমিও একই গোত্রের—সেটা পরে আমি ওঁর ডায়রি প'ড়ে জেনেছি। সাহেবের তর্জনগর্জন যখন বেশি হয়ে যেত, তখন আমি তাতে হস্তক্ষেপ না করে পারতাম না।

একবার এক কাণ্ড হল। মেইনের্ৎস্‌হাগেন এদেশে আসার সময় সঙ্গে এনেছিলেন ওয়াটারপ্রুফ ক্যানভাসের ভিলেসডেনের দুটো ছোট সবুজরঙের তাঁবু। কেনিয়ায় এই তাঁবু দুটি ছিল তাঁর খুব প্রিয়বস্তু। এতই প্রিয় যে, ও দুটো খাটানো বা গোটানোর কাজটা আর কারো ওপর ভরসা করে ছেড়ে দিতে পারতেন না। এ কাজ উনি নিজে হাতে করতেন। একদিন হল কী, ঝড়বৃষ্টির পর পিছল রাস্তায় আমাদের উড়নবাজ সর্দারজীর চালানোর গুণে চাকা হড়্‌কে গিয়ে ঐ ট্রাক কুপোকাত হয়ে গাড়ির চালের ওপরকার সব মালপত্র ছিট্‌কে রাস্তার ধারের নালায় পড়ল। জলে-পড়া জিনিসগুলোর মধ্যে ঐ দুটো দামি তাঁবুও ছিল। দুটো তাঁবুই একেবারে ভিজে ঢোল। সন্ধ্যে তখন ঘন হয়ে নেমেছে। তখন আর ট্রাকটাকে খাড়া করে তোলার লোক পাওয়া সম্ভব নয়। লাগাও খোলা মাঠটাতেই রাতটা আমরা কাটিয়ে দেব ঠিক করলাম। তাঁবু বার করে টাঙিয়ে নেওয়া হল। সারা রাত ঝির ঝির করে বৃষ্টি হতেই থাকল। ফলে, সকালে দেখা গেল ভেজা তাঁবু আরও ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। মেহমানদার ভোরে উঠে মাইল দুই দূরের এক গ্রাম থেকে লোক ধরে আনতে গিয়েছিল। তারা এলে তাদের দিয়ে ঠেলে ঠুলে গাড়িটাকে আবার নিজের পায়ে দাঁড় করানো হল। ভিজে তাবুগুলোকে সেই অবস্থাতেই হড়বড় করে গুটিয়ে নিয়ে আমরা সকাল ৯টায় পরবর্তী ডাকবাংলোয় পৌঁছে গেলাম। বাইরে তখন মেঘভাঙা রোদ ঝকঝক করছে। ডাকবাংলোয় পৌঁছেই আমি আর মেইনের্ৎস্‌হাগেন বেরিয়ে পড়লাম জায়গাটার খোঁজখবর নিতে আর পাখি সংগ্রহ করতে। পিল্লাই আর অন্যেরা ছিল। তারা তাঁবুগুলো খাটাবে। ঘণ্টা দুই পরে সাহেব এসে দেখেন যে, তাঁর সাধের তাঁবু খুলে রোদের মধ্যেই বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। সকালের সংগ্রহ হতাশাজনক, নাকি তাড়াতাড়ি নাকেমুখে গোঁজা নাস্তা পেটটাকে গড়বড় করেছিল—কারণটা ঠিক কী ছিল আমার জানা নেই, তবে এটা

বুঝলাম যে, ঐ তাঁবুদুটোতে চোখ পড়তেই সাহেবের মাথায় যেন আগুন ধরে গেল। দেখি উনি দাঁতমুখখিঁচোনো মৃগীরুগির মতন রাগে বেহুশ হয়ে কাঁপছেন।

ডাক পড়ল পিল্লাইয়ের। খেঁকিয়ে উঠে তাকে প্রশ্ন করা হল : কে বলেছে তাকে ওঁর তাঁবুর ব্যাপারে নাক গলাতে? কেন সে বিনা অনুমতিতে ওঁর তাঁবুতে হাত দিয়েছে? এইরকম হজরং বজরং কত কী। বেচারা পিল্লাই ভয়ে কোনো কথা বলতে পারছে না। ঐরকম সম্পূর্ণ অনুচিত আর অন্যায়ভাবে চোটপাট করতে দেখে আমি আর মুখ বুঁজে থাকতে পারলাম না। আমিও দু-কথা শুনিয়ে দিয়ে মেইনের্ৎস্‌হাগেনকে বললাম--পিল্লাইয়ের জায়গায় আমি থাকলে, ও যেটা করেছে আমিও সেটাই করতাম। চটপট গুটিয়ে নিতে হবে পরে, কিন্তু দুটো তাঁবুই ভিজে ন্যাতা হয়ে আছে। অথচ বাইরে খটখট করছে সকালের রোদ। তাঁবুদুটো শুকিয়ে নেওয়া দরকার। সে অবস্থায় ক্যাম্পে থেকেও পিল্লাই যদি ও দুটোকে রোদে মেলে দেবার মতন কাণ্ডজ্ঞান না দেখাত, তাহলে মেইনের্ৎস্‌হাগেনই তখন পিল্লাইয়ের নির্বুদ্ধিতার জন্যে ওকে ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দিতেন। দিলে সেটা নিশ্চয়ই অন্যায় হত না। ও ঠিক যেটা করার করেছে ব'লে কেন এখন চিৎকার চেঁচামেচি করে ওর বাপান্ত করা হচ্ছে? আমাকে ফোড়ন কাটতে দেখে সাহেব গোড়ায় রেগে গিয়ে হাতপা ছুঁড়লেও, একটু বোধহয় ব্যাপারটার নিরর্থকতা বুঝতে পেরে শেষে ঠাণ্ডা হলেন। বুঝলাম আমার ওষুধে কাজ হয়েছে।

আফগানিস্তানে আমাদের দৈনন্দিন কার্যসূচি ছিল এইরকমের সকালের নাস্তা শেষ করে আমি আর মেইনের্ৎস্‌হাগেন দুজন দুদিকে বেরিয়ে পড়তাম। রাস্তা চেনাবার জন্যে সঙ্গে থাকত স্থানীয় শিকারি। পাখি নিরীক্ষণ আর সংগ্রহ করার কাজ সেরে আমরা দুপুর নাগাদ ফিরতাম। ক্যাম্পে ফিরে পাখিগুলো ঝাড়াই-বাছাই ক'রে তাদের গা থেকে পোকা বাছার জন্যে তৈরি রাখা। এই অভিযানে পাখি ছাড়াও, মেইনের্ৎস্‌হাগেনের আরেকটি বিশেষ আগ্রহ ছিল পাখিদের গায়ে বসা ম্যালোফ্যাগা (পাখনাঅলা উকুনেপোকা) সংগ্রহের। ঐ নামের যেসব বিচ্ছিরি ক্ষুদে পোকাদের আমরা জানি, তাদের মতন এরা রক্তচোষা নয়। এরা পালকের মধ্যে বাসা বেঁধে পালকের পচা অংশগুলো খেয়ে বেঁচে থাকে। কে কোন প্রজাতির পাখির গায়ে বসবে সেটা ওদের নির্দিষ্ট করা থাকে। যে জাতের পোকা বেনেবৌয়ের গায়ে বসবে, সে জাতের পোকা কিন্তু ময়নার গায়ে বসবে না। যদি দুটো ভিন্ন প্রজাতির পাখির গায়ে একই জাতের পোকা বসেছে দেখা যায়, তাহলে বুঝতে হবে যে, ঐ দুটি পাখির জাতকুলের বংশধারায় বোধহয় কোনো মিল আছে। ক্রমবিবর্তনের ধারা আর শ্রেণিবিভাজন সম্পর্কিত ধারণা পেতে এই উকুনেপোকারা খুবই সহায়ক।

লাঞ্চের পর শুরু হয়ে যেত ঘরে ব'সে করবার যাবতীয় কাজকর্ম। অনেক সময় অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পরেও আমরা কাজ করে যেতাম। পাখিটাকে একখণ্ড মসলিন

কাপড়ে মুড়ে ক্লোরোফর্মে ভেজানো কাঁচা কাপাসের তুলোর সঙ্গে খুব আঁট ক'রে বন্ধ বাক্সে পুরে ফেলা হত। কয়েক মিনিট পরে পাখিটাকে বার ক'রে মোড়কের কাপড় থেকে খুঁটে খুঁটে এবং পাখির পালক ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে মরা উকুনেপোকাগুলো বার করা হত। তারপর চিমটে দিয়ে তুলে কাঁচের শিশিতে অ্যালকোহলের ভেতর রেখে দেওয়া হত। শিশির গায়ে একটা ক'রে লেবেল সেঁটে দেওয়া হত, যাতে লেখা থাকত কোন্ প্রজাতির গা থেকে পাওয়া গেছে, কবে, কোথায় এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়। এই কাজে মেইনের্ৎস্হাগেন যখন ব্যস্ত, তখন আমি পাখিগুলার ওজন নিতাম, ছাড়ানো পাখা আর অনাবৃত গায়ের রং কী তা লিখে রাখতাম। তারপর ছালছাড়ানো পাখিগুলোকে কাটাছেঁড়া করে তাদের লিঙ্গনির্ণয় করতাম। পেট চিরে দেখতাম কোন্ শস্য খেয়েছে এবং পরগাছা কোন্ কীট অন্ত্রে বাসা বেঁধে আছে। সাহেব তার পোকা বার করার কাজ সেরে চর্মসংরক্ষণকারীদের সঙ্গে ব'সে গিয়ে তাদের কাজে হাত লাগাতেন। আমি বসে যেতাম আমার সকালের ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজের বিবরণ লিখতে। এইখানে একটা মজার ঘটনার কথা বলে নিই। তা থেকে বোঝা যাবে সাহেব মানুষটি কেমন ছিলেন। আমাদের অভিযান যখন শুরু হবে, তার ঠিক আগে, আমার সঙ্গে করে আনা ভাঁড়ার আর সাজসরঞ্জামের তালিকাটা দেখতে দেখতে তাতে দুটো পেট্রোম্যাক্স আলোর উল্লেখ থাকায় মুখ বেঁকিয়ে ঠাট্টা করে বললেন, আমি নাকি বড্ড ভোগবিলাসী। চল্লিশ বছর কি তারও বেশি এই যে তিনি মাঠেঘাটে ঘুরে পাখি সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছেন, কই তাঁর তো এসব শৌখিন জিনিসের কখনও দরকার হয়নি। ওঁর তো দিব্যি শুধু হারিকেন লণ্ঠনেই কাজ চলে গেছে। আমি ওঁকে জানাই যে, ওটা আসলে আমি রাখি নিজের জন্যে। রাত্তিরে কম আলোয় আমার কাজ করতে অসুবিধে হয় ব'লে। উনি কয়েকটা নাকসিঁটকানো মন্তব্য করে বললেন, মানুষজনেরা আজকাল বড়োবেশি ননীর পুতুল হয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা ঐখানেই মিটে গেল। আমাদের পয়লা ক্যাম্পে সন্ধ্যেবেলায় যথারীতি পেট্রোম্যাক্স জ্বালা হয়েছে। সন্ধ্যেবেলার সংগ্রহের কাজ সেরে ফিরে এসে দেখি, আমার দুটো আলোই বেদখল করে নিয়ে দুটো পেট্রোম্যাক্সই দুপাশে রেখে সাহেব বসে আছেন। আর তার উজ্জ্বল আলো দিব্যি উপভোগ করছেন। তাঁর অভ্যস্ত পুরনো হারিকেনের আলোর তেমন একটা অভাব বোধ করছেন ব'লে আদৌ মনে হল না। পরে এটাই গোটা সফরে তাঁর নিত্যকার অভ্যেস হয়ে দাঁড়াল। রাত্তিরে কাজ করতে হলে বরং আমাকেই পেট্রোম্যাক্সের কাছে কোনো রকমে একটু জায়গা করে নিয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসতে হত। এমনি মানুষ ছিলেন মেইনের্ৎস্হাগেন।

দুজন খ্রিস্টান, একজন হিন্দু, একজন শিখ আর দু-জাতের তিন মুসলমান—এই নিয়ে ছিল আমাদের অভিযাত্রী দল। গণৎকারদের রোজকেয়ামতের বিধানে বলা হয়েছিল, আমরা কেউ যে বেঁচে ফিরতে পারব তার আশা নেই। বিশেষ ক'রে, যারা কাফের। কেননা, আফগানরা যেরকম কট্টর গোঁড়া মুসলমান আর সেটা এমনই এক

অরাজক দুর্বৃত্তের দেশ যে, সেখান থেকে জানমাল নিয়ে ফেরা সম্ভবই নয় ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রকৃত ঘটনা হল, আমাদের গোটা সফরে কোনো একজনও জিজ্ঞেস করেনি আমাদের কার কী ধর্ম। আমরা দেখলাম আফগান দেশের মানুষজনেরা সম্ভব দিলদরাজ আর অতিথিবৎসল। আমরা পাখি সংগ্রহের কাজে গিয়ে দেখেছি, আমাদের দেখে প্রায়ই মাঠের কাজ ফেলে গ্রামের মানুষেরা ছুটে এসে বলেছে, 'তোমরা আমাদের খাতিরের মেহমান। আমাদের বাড়িতে এসে একটু চা খেয়ে যাও।' যেখানেই আমরা তাঁবু ফেলেছি, রাস্তার ধারে ট্রাকের ওপর খোলা পড়ে থেকেছে আমাদের যার যা মালপত্র, খাবার দাবার, এমনকী গুলিগোলা পর্যন্ত। কখনও একটা কোনো জিনিসও খোয়া যায়নি। কখনও কোনো লোক আমাদের কোনোভাবে একটুও জ্বালাতন করেনি। একমাত্র মাছি ছাড়া। ভবিষ্যৎবাণী আর তার পেশার লোকদের এই হল বিদ্যের দৌড়। এসব বলার সময় বোধহয় আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের মনের কোণে ছিল সীমান্ত এলাকার উপজাতিয়দেরই ছায়ামূর্তি।

বহুৎ সময় নষ্ট হয়েছে যাতায়াতে। কাবুল থেকে গিয়েছি উত্তরে। পাঁচ-ছ'টি জায়গায় ক্যাম্পে থেকেছি। একেক জায়গায় কেটেছে পাঁচ থেকে ছ'দিন। কখনও কখনও থাকতে হয়েছে তাঁবুতে। বেশির ভাগ জায়গাতেই মাথার ওপর ছাদ পেয়েছি। যাকে পুরোপুরি ডাকবাংলো বলে সেরকমটা বিশেষ মেলেনি। বেশ খানিকটা বাহারে ডাকবাংলো মিলেছিল বামিয়ানে। প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার কেন্দ্র ছিল বামিয়ান। পুরাতত্ত্ব আর ইতিহাসের দিক থেকে বামিয়ানের খুব নামডাক। এক সময়ে এখানকার পাহাড় কুঁদে গড়া হয়েছে পঞ্চাশ ফুট কি তারও বেশি উঁচু বিশালকায় বুদ্ধমূর্তি। প্রচুর বিদেশি ভ্রমণকারী এখানে আসে। মেহমানদারের কল্যাণে এখানে আমাদের জায়গা পেতে তেমন অসুবিধে হয়নি। যেখানেই দরকার হয়েছে, মেহমানদার আগে আগে গিয়ে আমাদের থাকার ঠাঁই করে দিয়েছে। এ ক্যাম্পের সঙ্গে ও ক্যাম্পের যোগাযোগ রক্ষা করা হত টেলিফোনে। থানা আর ফাঁড়ি বা বিভিন্ন অফিস কাছারির মধ্যে এবং 'স্নায়ুকেন্দ্র' কাবুলের সঙ্গে সরকারি যোগাযোগ বজায় রাখা হত টেলিফোনে। সুতরাং আমাদের গন্তব্যস্থানগুলোতে আগে থেকে ফোন ক'রে জানিয়ে মেহমানদার অনায়াসে সব ব্যবস্থা করে রাখতে পারত।

কমন ফেজান্টের (জীবক) কৌলিক বাসভূমি হল মধ্য-এশিয়া। এই পাখি আমাদের প্রথম নজরে পড়ে উত্তর আফগানিস্তানের সমতলভূমিতে। দেখে অবাক হলাম, সুবিস্তৃত জলা জায়গার নলবনে ওদের স্বাভাবিক বসতি। বলতে গেলে ধারেকাছে এমন গাছ নেই যেখানে ওরা ঘুমোতে পারে। আমাদের আফগান পাখির সংগ্রহ আমার মধ্যে বেশি আগ্রহ জাগিয়েছিল এই কারণে যে, তার মধ্যে অনেক পাখি ছিল, যে পাখি এর আগে আমি জীবনে কখনও দেখিনি। যেমন, স্নোকক আর সীসী পারট্রিজ। অবশ্য, এই গোটা অভিযানপর্বে আমার সবচেয়ে বেশি যা চোখ টেনেছিল,

তা হল ওদেশে থাকাকালে সর্বক্ষণ আমরা দেখেছি পরিযায়ী পাখিদের বসন্তকালীন (উত্তরাভিমুখি) সমানে দেশান্তর যাত্রা। আফ্রিকা থেকে পূর্ব-এশিয়ায় উড়ে চলেছে লালপেয়ে বাজ (ফ্যালকো ভেসপেটিনাটেবস) আর ছোট করোটিয়া বাজ (ফ্যালকো নাউম্যানি) আর ভারতের সমতলভূমি থেকে অবিশ্বাস্য সংখ্যক রোজি প্যাস্টর (গোলাপি শালিখ) ঝাঁকে ঝাঁকে চলেছে তুর্কিস্তানে নীড় বাঁধার জায়গায়। ওদের প্রধান পরিযায়ী দলটাকে আমরা প্রথম পেয়ে গেলাম দানাঘোরিতে। আফগানিস্তানে এই পাখিদের বলে 'সাচ'। ৪ঠা মে থেকে ১০ই মে পর্যন্ত তারা মাঝপথে খাওয়া আর বিশ্রাম করার জন্যে নেমেছিল। দক্ষিণ থেকে ক্রমাগত আরও পাখি এসে ওদের দল ভারী করছিল। মেইনেৎস্হাগেন হিসেব করে দেখেছিলেন ৬ই মে তারা ১৫,৪০০ এই হারে এসে জমা হয়েছে। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে নিশ্চয় পাঁচ লক্ষের মতো শালিখ দানাঘোরি সমতলে এসে হাজির হয়েছিল। তারা অধিকাংশই জলা জায়গায় নলবনে ঘুমোবার ঠাঁই করে নিয়েছিল। ঐসময়ে মাঠে কোনো ফসল ছিল না। কেবল গুবরেপোকা কাঁচপোকাই তখন তাদের একমাত্র খাদ্য। সাচ পাখিকে আফগানরা কৃষির পক্ষে উপকারী বলে মনে করে। তাই ওদের গায়ে হাত দেয় না। এমন কি যখন 'হালাল মাংসও' পাতে পড়ে না, তখনও। মাঠ চিল (সির্কাস এরুজিনেসাস) পাখিদের সদলবলে দেশান্তর যাত্রার আরেক দৃশ্য চোখ কেড়েছিল বামানিতে। সেদিন ছিল ২৪শে এপ্রিল। হঠাৎ বিকেল ছ'টা নাগাদ ওরা এসে পৌঁছুতে শুরু করে। ওরা আসছিল দক্ষিণ-পূর্ব আর দক্ষিণদিক থেকে। তার মানে দাঁড়ায়, ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে। সবই ছিল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ পাখি। নামার ভঙ্গিতে বোধ হচ্ছিল খুবই ক্লান্ত। রাতটা ওরা চাষ করা ক্ষেতেই কোনোরকমে মাথা গুঁজে রইল। ছেষট্টি পর্যন্ত আমরা গুনতে পেরেছিলাম। কিন্তু তারপর আর অন্ধকারে দেখা যায়নি। ভারতবর্ষে বিরাট জলা জায়গায় প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মাঠচিল সারা দিনে একটা-দুটো দেখতে পাওয়াটাই ভাগ্যের কথা। সে জায়গায় উত্তরে জননক্ষেত্রের দিকে অভিযাত্রী একসঙ্গে অত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মাঠচিলের জমায়েত দেখতে পাওয়াটা ছিল এক অবিস্মরণীয় রোমাঞ্চকর ব্যাপার। ওরা নিশ্চয় সাতসকালেই রওনা দিয়েছিল। কেননা আমরা সকালে উঠে দেখি মাঠ একদম ফাঁকা। পরদিন একই সময়ে গোটা দশেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ পাখি একই দিক থেকে এসে ঐ চষা মাঠেই রাত কাটিয়ে পরদিন ভোরেই যেখানে যাবার চলে গিয়েছিল।

আফগানিস্তানের এই অভিযানপর্বের বৃত্তান্ত শেষ করব আরও দুটো ঘটনার কথা ব'লে। একদিন সকালে পাখি সংগ্রহের কাজে বেরিয়েছি। সঙ্গে মেহমানদারের দেওয়া একজন স্থানীয় লোক। হঠাৎ খাড়া পাহাড়ে চোখ পড়তেই দেখি সেখানে রক নাটহ্যাচ (বাদামভুক ছোট পাখি)-এর বাসা। আগে কখনও দেখিনি। আমি ওপরে উঠে একটা খাঁজে ফটো তোলার দূরত্বে দাঁড়িয়ে ক্যামেরা ফোকাস করে অপেক্ষা করছি। অনেকক্ষণ ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর যখন সে সদ্য বাসায় ফিরেছে ও আমি

শাটার টিপতে যাব, এমন সময় সঙ্গের লোকটা 'এখানে ফটো তোলা বারণ, ব'লে ফট ক'রে লেন্সের সামনে আড়াল করে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি রেগে গিয়ে ঠেলা দিয়ে তাকে পাশে সরিয়ে নির্বিবাদে ফটো তুলে নিলাম। লোকটাকে আমার বেয়াড়া ধরনের ব'লে মনে হয়েছিল। যাই হোক, ফিরে এসে আমি মেহমানদারকে এ বিষয়ে বলি। মেহমানদার মুখে কিছু না বললেও ওর রাগতভাব প্রকাশ পেল। আমি উর্দুতে বলায় ফার্সিভাষী গাইড বুঝতে পারেনি আমি কী বলছি। আমার বলা শেষ হলে, মেহমানদার মুখে সহজ ভাব এনে লোকটাকে একটা কাগজ পেনসিল আনতে বলল। মুখ বুঁজে কাগজে দুলাইন খত লিখে ভাঁজ করে লোকটাকেই থানায় দিয়ে আসতে বলল। আধ ঘণ্টার মধ্যে লোকটা ফিরে এল ডাক ছেড়ে হাপুসনয়নে কাঁদতে কাঁদতে। এসেই আমার পায়ের ওপর পড়ে মাপ চাইতে লাগল। আমি তো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছি। কী ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না। পরে যা জানতে পারলাম তা এই মেহমানদার কার্যত কাগজটাতে লিখেছিল—'এই লোকটা আমাদের অতিথিকে বেইজ্জত করেছে। ওকে ঝাড়বেন তিনটে উত্তম।' চোখের জলে ভেসে মাপ চাইতে চাইতে বিট্‌কেলট বলে কী যে, আসলে ও বলতে চেয়েছিল 'দরগাটা নাপাক করবেন না।' বোধ হয়, ঐ দিকটাতেই আধ মাইলটাক দূরে নাকি একটা ধর্মস্থান আছে, সে তো আমার নজরেও পড়েনি।

আরেকবার হয়েছে কি, গোটা ডাকবাংলোয় দুর্গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসার যোগাড়। তখন আমরা হাইবাকে। ভাবলাম মরা ইঁদুর পঁচেছে। কার্পেট উল্টে, আলমারির পেছন দিক, ঘরের আনচকানাচ, সম্ভব অসম্ভব কোনো জায়গাই আমরা খুঁজতে বাকি রাখছি না। ইঁদুরের চিহ্ন নেই। তবু দুর্গন্ধ যে কে সেই আছে। তখন আচমকা আমার মনে পড়ে গেল, তিন-চার দিন আগের কথা। সেদিন সংগ্রহের পরিমাণ প্রয়োজনের মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল দেখে মেইনের্ৎস্‌হাগেন কাঁধের লাঠির ফাঁস খুলে একটা পাখি বুকপকেটে ভরে নিয়েছিলেন। সেকথা আমি ওঁকে মনে করিয়ে দিলে সেটাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দিলেন। এবং সমানে খোঁজার কাজ চলতে থাকল। দিন দুই পরে (প্রায়শ শার্ট পাল্টানো আমাদের হয়ে উঠত না), তার সেই শার্টটা গায়ে দিয়ে সাহেবের মনে হল বুকের কাছটা কেমন যেন ভেজা-ভেজা লাগছে। স্পষ্টতই নীলকণ্ঠ পাখিটি 'পরিপক্ক' হতে হতে ততদিনে একেবারে সারাৎসারে পৌঁছে গেছে। মেইনের্ৎস্‌হাগেন গরুচোরের মতো মুখ করে আমাকে এসে বললেন, 'সেলিম, তোমার কথাই ঠিক। পেয়েছি সেটাকে।' আর তিনিই কিনা এতদিন সমানে গজগজ করেছেন এবং একা চৌকিদার নয়, সবারই সমানে বাপান্ত করেছেন। আর গোটা বাংলোটাকে উল্টেপাল্টে একশা করেছেন।

□

১২

১৯৪৫-এ কৈলাস মানস-সরোবরে পক্ষিতাত্ত্বিক তীর্থযাত্রা

দেরদুনে থাকতে পশ্চিম হিমালয়ে পাহাড়ে চড়ার বিস্তর সুযোগ পাই। প্রধানত, কাশ্মীর হিমাচল-প্রদেশ গাড়োয়াল আর কুমায়ুনে। অনেক সময়েই আর্থার ফুটের প্রাণবন্ত সান্নিধ্যে আর অভিভাবকত্বে। পর্বতারোহণে তাঁর ছিল প্রবল উৎসাহ। কর্নওয়াল আর সুইজারল্যাণ্ডের আল্পস্-এ পাহাড়-চড়ায় তিনি ছিলেন দুরন্ত। দুন স্কুলের বলতে কি তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা হেডমাস্টার। গরমের লম্বা ছুটিতে আমরা দুজনে সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়াতম। ওপরে ওঠার ব্যাপারে মাথামোটা ছিলাম ব'লে তেমন গুরুতর রকমের পর্বতারোহণ আমাকে টানত না। দশ বারো হাজার ফুটের বেশি উঁচুতে আমরা পর্বতারোহণ করতাম না। কিন্তু এইসব সফরে গিয়ে হিমালয়ের যে পর্যাবরণ—বনজঙ্গল, গাছপালা, জীবজন্তু, বিশেষত পক্ষিকুল—এসব বিষয়ে আমার কাজ চালানো গোছের পরিচয় লাভের সুযোগ পেয়েছিলাম।

যেসব প্রকৃতিবিদ এসব পাহাড়ে চড়েন, তাঁরা একের পর এক জীবন বলয় ছেড়ে যত ওপরে উঠতে থাকেন, ততই দেখতে পান মনোহরণ করা এক বিচিত্রদৃক্ চিত্রপট—উদ্ভিদ আর পাখির রকম উত্তরোত্তর কীভাবে বদ্‌লে যাচ্ছে। বসতিবিদ্যায় আগ্রহীরা দেখে মোহিত হয়ে যাবেন, কীভাবে একটি উচ্চতামণ্ডলে বা জলবায়ু অঞ্চলে কমবেশি তার স্বকীয় বিশেষ বিশেষ গাছপালা আর পাখির অস্তিত্ব রয়েছে। কখনও কখনও এই রূপান্তর লক্ষণীয়ভাবে প্রকট যে একটু অভ্যেস হয়ে গেলে সে জায়গার কেবল প্রজাতিদের দেখেই যে কেউ উচ্চতা মাপার যন্ত্রছাড়াই মোটামুটি নিখুঁতভাবে সেখানকার উচ্চতার পরিমাপ বলে দিতে পারে। হিমালয়ে বেড়ানোর এটাই প্রকৃতপক্ষে আমার একটা বড়ো আনন্দ। বিশেষ ক'রে নেপালের পর্বে ভূটান সিকিম আর অরুণাচল প্রদেশ অঞ্চলে। এই এলাকা অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি আদ্র এবং এখানকার জীবনবলয়গুলি ঢের বেশি আকস্মিকভাবে একটির সঙ্গে আরেকটি অন্তর্লগ্ন। এসব জায়গার পাহাড়তলিতে যেমন গ্রীষ্মমণ্ডলের আবহাওয়া, তেমনি পর্বতশিখরের কাছাকাছি সুমেরসদৃশ ঠাণ্ডা। হিমালয় পর্বতমালার দক্ষিণাঞ্চল ভালোভাবে চিনে নেওয়ার পর

তার বিশাল দেয়ালের ওপারে কী আছে তা দেখার কৌতূহল বেড়ে গেল। ১৯৩৯ সালে তিব্বতে পক্ষিতাত্ত্বিক অভিযানে যাবার একটা ছক করা হয়েছিল। কিন্তু সে প্ল্যান ভেস্তে গেল। তার প্রথম কারণ হিটলারের রণহুঙ্কার আর দ্বিতীয় কারণ প্রকৃতই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়া। এদিকে মাস যায়, বছর যায়—যুদ্ধ কোনোদিন যে থামবে তার লক্ষণ নেই। জিনিসপত্র আর যানবাহন জোটানো মুশকিল। তাছাড়া যুদ্ধকালীন নানা প্রতিবন্ধকতা তো আছেই। এসব সত্ত্বেও, ভেবে দেখলাম আজ না হলে আর কোনোদিনই হবে না—সুতরাং অভিযানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত পাকা করে ফেললাম। দরবারে যাঁরা বন্ধুস্থানীয় ছিলেন, তাঁরা কথা দিলেন যথাসাধ্য সাহায্য করবেন। বড়িহাঁস, কালোসারস এবং যাদের দেখা পেলে বর্তে যাই এমন আরও কিছু পাখি ভারতে শুধু শরতের মাসগুলোতেই দেখা যায়; এদের বাসা বাঁধার ধরনধারণ বা বাস্তুসংস্থান বিষয়ে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। পশ্চিম তিব্বতে এদের প্রজননস্থলের খোঁজ পেয়ে আমরা সেখানে ছোটখাটো একটা দল নিয়ে যাব সাব্যস্ত করে ফেললাম। আমি এর মধ্যে কিছু পাখির ওপর কাজ করতে সবিশেষ আগ্রহী ছিলাম। কৈলাস পাহাড় আর মানস সরোবরে পক্ষিতাত্ত্বিক তীর্থযাত্রা—পরে এইভাবে আমি আমাদের অভিযানটিকে বর্ণিত করেছিলাম।

আমরা ঠিক করি, আলমোড়া থেকে আমাদের তীর্থযাত্রার পথ হবে লিপুলেখ গিরিপথ (১৬,৭৫০ ফুট)। এটা সবচেয়ে কম কষ্টকর পথ। তাছাড়া তখন মে মাস। বছরের এই সময়টাতে একমাত্র এই গিরিপথই বরফমুক্ত থাকে। জুনের শেষ আর জুলাইয়ের মাঝামাঝি যখন হয়, একমাত্র তখনই নিয়মিতভাবে তীর্থযাত্রা শুরু হয়। প্রকৃতপক্ষে ফিরতি পথেও বাধ্য হয়ে আবার আমাদের লিপুলেখ পেরোতে হবে। কারণ, জুলাইয়ের প্রথম দিকে অন্য সমস্ত গিরিপথ বরফে ঢাকা থাকবে। কুমায়ুনে (৫,২০০ ফুট)-র আলমোড়া থেকে তীর্থযাত্রার রমণীয় অরণ্যদেশের ভেতর দিয়ে একটার পর একটা জীবনবলয় পেরিয়ে এঁকে বেঁকে কখনও বিহিম খাড়াই বেয়ে উঠেছে, কখনও নেমেছে। সামনের তুষারাবৃত শেষ গ্রাম গারবিয়াঙে পনেরো দিনে পৌঁছে যাওয়া যাবে। আমার দলে ঠিক করেছিলাম পাঁচজন থাকবে। সুচা সিং খেরা (আইসিএস), ১৯৬৫ সালে ক্যাবিনেট সেক্রেটারি পদ থেকে অবসর নেন; বোম্বাইয়ের আইনজীবী আমার সম্পর্কিত এক ভাই সঈফ তৈয়বজী; সিঙ্গাপুরের (জাপান 'শোনান' দখল করে নেওয়ায় তখন বোম্বাইতে উদ্বাস্তু) একজন সতীর্থ পক্ষিতাত্ত্বিক আর ফটোগ্রাফার লোক-ওয়ান-থো; সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরা একজন তরুণ জ্যোতিষ্পদার্থবিদ আর পক্ষিনিরীক্ষক প্রীতম সেন; আর আমি। কোনো না কোনো কারণে প্রথমোক্ত তিন জনকে যাত্রা বাতিল করতে হয়। শারীরিক সামর্থ্যের স্বআরোপিত পরীক্ষায় পাশ করতে না পেরে সঈফ; শেষ মুহূর্তে লোক-এর আমাশা হওয়ায়, এবং খেরার ঐ ধরনেরই অনিবার্য কোনো কারণ ঘটায়। কাজেই রওনা হতে পারলাম

কেবল প্রীতম আর আমি। আলমোড়া থেকে আমরা যাত্রা শুরু করি ১৪ই মে, ১৯৪৫। তার ঠিক আগের দিন যুদ্ধে হিটলারের জার্মানির চূড়ান্ত পতন ঘটেছে। সেই উপলক্ষে চারদিকে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় চলেছে বহ্ন্যুৎসব। কাড়ানাকাড়া বাজিয়ে মানুষ জয়োল্লাসে ফেটে পড়েছে। প্রীতম আর আমি বাদে আমাদের দলে ছিল সাতজন দোতিয়াল আর একজন কুমায়ুনি কুলি। তাঁবু, ব্যক্তিগত মালপত্র আর খাওয়ার জিনিস। বোঝা কম নয়। খাবারের মধ্যে ছিল সবার্থসাধক ছাতু। ছোকরা গোছের এক কুমায়ুনি খেম সিংকে আমরা আলমোড়া থেকে নিয়েছিলাম। সে ছিল একাধারে সরদার, রাঁধুনি এবং ঝালে-ঝোলে-অম্বলে সব কিছু। দোতিয়াল নয়, এমন একমাত্র মোটবাহক ছিল একজনই। ও ছিল খেম সিং-এর ফালতু আর হাতনুড়কুত। ভেড়ার পালকে যেমন ছাগলে চরায়, ওরও ছিল সেই সর্দারির ভূমিকা। আজকের দিনে হিমালয়ে যাওয়ার খরচ যে হারে বাড়ছে, তার সঙ্গে সে সময়কার খরচের তুলনা করলে অনেকেই অবাক হবে। আমার ডায়রি ঘেঁটে দেখতে পাচ্ছি—যাত্রাকালে এক মণের বেশি মাল (৪০ কেজির মতো) বইতে একজন কুলি নিত দৈনিক নগদ ৩ টাকা (খাইখরচা সমেত) এবং বসে থাকলে ২ টাকা। খোরাকির যোগান আর আনানেওয়ার ব্যবস্থা তার নিজের। ভারত সীমান্তের শেষ গ্রাম গারবিয়াং-এর দূরত্ব প্রায় ২৩৭ কি.মি.। যেতে আমাদের লেগেছিল পনেরো দিন। মারাত্মক সব চড়াই উৎরাই। কোথাও কোথাও হাজার ফুট কি তারও বেশি ওঠা-নামা। গোটা রাস্তা। বয়সও তখন কাঁচা ছিল, বুদ্ধিও পাকেনি। পিঠের ঝোলায় হাবিজাবি সব জিনিস ঠেসে ভরে নিতাম। ফলে, জান বেরিয়ে যেত সেই ভারী বোঝা বইতে। বিশেষত খাড়াই বেয়ে ওঠার সময়। আর তাই নিয়ে বড়াই করতাম। আমার স্পষ্ট মনে আছে, একবার কী হল—সেদিন খুব গুমট ছিল। সে জায়গার রাস্তাও ছিল তেমনি দুর্গম। একবার করে আঁকাবাকা পথে কয়েক শো ফুট যেমন উঠছি, তেমনি অতটা বা তারও বেশি নামছি। সমানে এইভাবে ওঠা-নামা করছি। তার যেন আর শেষ নেই। এইরকমের একটা চড়াই ভেঙে যখন নীচে পৌঁছেছি তখন আর আমার শরীর বইছে না। ঠিক করলাম এবার একটু বসে জিরিয়ে নিয়ে পরের চড়াই ভেঙে উঠব। একটা বড়ো পাথরের ওপর বসে অনাবশ্যক জিনিসভর্তি ঝোলাটা খুলে একটা আপেল ছাড়িয়ে খেতে লাগলাম। নিকেলের হাতলঅলা যে পকেটছুরিটা দিয়ে খোসা ছাড়ালাম, সেটা ছিল আমার বহু বছরের মাঠঘাটের সঙ্গী। ছুরিটার ওপর আমার একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ বসে জিরিয়ে নিয়ে আবার আমি চলতে শুরু করে দিলাম। সিকি মাইলটাক সমতল পেরিয়ে আবার সেই বিরক্তিকর চড়াই ভেঙে ওঠা। হাঁপাতে হাঁপাতে সামনে দৃশ্য দেখছি। আপনমনে পকেটে হাত দিতে গিয়ে দেখি ছুরিটা নেই। ঝোলা ঝেড়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলাম ঝোলাতেও নেই। ভাবলাম আসতে আসতে রাস্তাতেই কোথাও পড়ে গেছে। খুব মন খারাপ হয়ে গেল। ইস, আমার কতদিনের বন্ধু ছুরিটা।

কিন্তু ফিরে গিয়ে যে একবার খুঁজে দেখব, তখন আর আমার সে উৎসাহ নেই। যাই হোক, কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে নতুন করে চলা শুরু করার আগে এমনিই একবার যেখানে বসে আপেলের খোসা ছাড়িয়েছিলাম সেইদিকে দূরবিনটা নিশানা করলাম। করতেই—আরে, ঐ তো আধ মাইল দূরে কয়েকশোফুট নীচে চিৎপাত হয়ে পড়ে রয়েছে আমার সাধের ছুরি। সকালের রোদ পড়ে চকচক করছে তার ধারালো ফলা। 'আমাকে উদ্ধার করো' বলে ও আমাকে যেন আলোকসঙ্কেত পাঠাচ্ছে। মনে মনে বাপান্ত করছি ছুরিটার। কিন্তু জেনেশুনেও ওটা ফেলে আসব, মনে সে জোর পেলাম না। যদিও তার মানে, হাঁড়ি মুখ ক'রে আবার ক্লান্তিকর পথ ভেঙে আবার সেই নামাওঠা। এদিকে দিনের কাজকর্মেরও এক ঘণ্টারও বেশি দেরি হয়ে যাওয়া। শেষ পর্যন্ত উদ্ধার হল সেই ছুরি। এরপর আরও তিরিশ বছর ওটা আমার কাছে ছিল। কিন্তু ওর ভবিতব্য ছিল চুরি হয়ে যাওয়া। এমনিভাবেই শেষকালে আমাদের জোড় ভাঙল।

দেরাদুনের সুপরিচিত জমিদার আর ব্যবসায়ী ছিলেন আমাদের পারিবারিক বন্ধু লালা উগ্রসেন। প্রীতম তাঁর ছেলে। স্কুল কলেজে পড়ার সময় থেকেই ওকে আমি ঘনিষ্ঠভাবে জানতাম। ও ছিল লেখাপড়ায় ভালো খুব নম্রস্বভাবের ছেলে। দেরাদুনের আশপাশে আর মুসৌরি পাহাড়ে আমার সঙ্গে থেকে পাখি দেখার ব্যাপারে ও যথেষ্ট গুণপনা অর্জন করে। তারপর উচ্চশিক্ষা লাভের জন্যে আমেরিকায় যায়। আমি তিব্বতে যাচ্ছি শুনে প্রীতম আমার যাত্রাসঙ্গী হওয়ার ব্যাপারে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে। ওর মধ্যে যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে মনে ক'রে আমিও সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যাই। প্রথম ক'টা দিন বেশ ভালোভাবেই কেটে যায়। কিন্তু ক'দিন যেতে না যেতেই ওর হাবভাবে কেমন একটা অদ্ভুত লক্ষণ নজরে পড়ল। চারদিকের পরিবেশ আর দৃশ্য দেখে আগে যেভাবে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেত, দেখেই বোঝা যায় এখন আর আগের মতো তাতে ওর টান নেই। দুচার দিনের মধ্যেই দেখলাম ওর এসব ভালো লাগছে না। কুলিদের পেছন পেছন নেহাৎ দায়সারাভাবে হাঁটতে হয় তাই হাঁটছে। ডাইনে-বাঁয় কী আছে, সেদিকে ওর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। প্রখ্যাত কবি মহাদেবী বর্মার হিন্দি কবিতার বইতে ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে। বইয়ের খোলা পৃষ্ঠা সামনে নিয়ে ট্যাঙস ট্যাঙস করে চলেছে। আমি ভাবলাম হয়তো এটা বেশি উঁচুতে ওঠার ফলে হতে পারে। কিন্তু যেখানে আমরা রয়েছি, সে তো ছ'সাত হাজার ফুটের বেশি উচ্চতা নয়। এটুকু উচ্চতায় কারো তেমন অস্বস্তি হওয়ার কথা নয়। অবস্থাটা দিন দিন ঘোরালো হচ্ছিল। ১৫,০০০ ফুট ওপরে বরখায় তাঁবু ফেলার পর সত্যিই আমি বেজার বোধ করতে লাগলাম। ক্রমেই ওর মুখ হাঁড়ি হচ্ছে। তাঁবুর মেঝেয় একটা বাক্স রেখে সেটাকেই খাওয়ার আর লেখার টেবিল করে নিয়েছি। সেখানে মুখোমুখি হয়ে বসলেও ও বড়ো একটা রা কাড়বে না। আমি পাখির চামড়া ছাড়াচ্ছি, কিংবা রোজকার নোট লিখছি বা

কোনো গাছের নমুনা সাঁটছি—ঠিক সেই সময়েই প্রীতম ওর একার জন্যে খাবার দিতে বলবে, তারপর চটপট নাকেমুখে গুঁজে নিয়েই মহাদেবীর বই হাতে নিয়ে এককোণে বসে যাবে অথবা বাইরে বেরিয়ে যাবে। আরও কিছুদিন মুখ বুঁজে এসব সহ্য করার পর একদিন বাধ্য হয়ে আমি ওকে ডেকে সাফ সাফ বললাম কাজে যখন ওর মন লাগছে না, সেক্ষেত্রে কয়েকটা চমরী নিয়ে ওর এইবেলা আলমোড়ায় ফিরে যাওয়াই ভালো। ও থাকায় আমারও মনমেজাজ ঠিক থাকছে না। ও চলে গেলে আমি একা একাই আমার পরিকল্পনার কাজ মেটাতে আর অনুশীলনপর্ব চুকিয়ে ফেলতে পারব। আমার প্রস্তাবে ও প্রবলভাবে মাথা নেড়ে আপত্তি জানাল। আমি আর কয়েকদিন ঐ অবস্থা সহ্য করার পর (তার মধ্যে কৈলাস পাহাড় পরিক্রমা শেষ করে ফেলে), আমি ঠিক করলাম—আর নয়, এখানেই আমার কর্মসূচি শিকেয় তুলে রেখে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাব। আরও উঁচুতে যেসব গিরিপথ ছিল (অন্ত-ধুরা, জয়ন্তী লা ইত্যাদি), ভেবে রেখেছিলাম তার একটা দেখে ফিরে আসব, তা আর হয়ে উঠল না। সেসব গিরিপথ তখন বরফে ঢেকে গেছে। যাওয়ার আর উপায় নেই। অগত্যা আগের পথ দিয়েই ফিরে আসতে হল। একটাই ভালো যে, মাঝের পাঁচ সপ্তাহে বরফ গলে গিয়েছে, গরমকালও প্রায় দোরগোড়ায়। এর ফলে, তাকিয়ে দেখি যেন কোনো জাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় প্রকৃতির ভোল একেবারে পাল্টে গেছে। মনে হল, যেন কোনো আনকোরা নতুন দেশে পা দিয়েছি! পূর্বেকার অভিজ্ঞতা থেকে এটা বিলক্ষণ বুঝেছি যে, বেশি উঁচুতে চড়লে সঙ্গের লোকজন উপযুক্ত হওয়া কতটা দরকার। ছোট দল, একেক জনের একেক মনমেজাজ। এক জায়গায় ঠেসেঠুসে থাকা। এক আধদিন নয়, দিনের পর দিন। কখনও বা একটানা সপ্তাহের পর সপ্তাহ। ফলে, মাথায় খুন চেপে যাওয়াটাও আশ্চর্যের নয়। যাই হোক, কোন্ উচ্চতায় কার কখন কী ভাবান্তর হবে, গণৎকার না হলে আগে থেকে তা কারো জানা সম্ভব নয়। তার ফলে, সমুদ্র সমতলে ব'সে উপযুক্ত সঙ্গী বাছাই করা খুবই কঠিন কাজ।

ফেরার সময় লিপু-লেখ গিরিপথের ভারতীয় অংশে যাত্রাপথের অর্ধেক এসে চারজন গুজরাতী যাত্রীদলের ভারি করুণ একটি দৃশ্য চোখে পড়ল। একজন পুরুষ আর তিনজন মহিলা। মোক্ষলাভের আশায় তারা চলেছে মানসসরোবরে তীর্থ করতে। তাদের পিছু পিছু চলেছে একদল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দোতিয়াল মোটবাহক। রাস্তায় লাগবে ব'লে বিস্তর লটবহর, টিফিন-কেরিয়ার, কেরোসিন, টিনভর্তি চিঁড়ে, গাঠিয়া আর রাজ্যের জিনিস কুলিদের ঘাড়ে চাপিয়ে সঙ্গে নিয়ে চলেছে। তখন জুলাইয়ের গোড়া। গরম পড়বার মুখে। আকাশে মেঘ করলে ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার অবস্থা হয়। তার ওপর সারাক্ষণ হাড়-কাপানো হিমেল হাওয়া। পুরুষটিকে দেখে মনে হয়, বোম্বাইয়ের দালাল স্ট্রীটের শেয়ারবাজারের মার্কামারা দালাল। সোজা সেখান থেকে আসছে। তার গায়ে সূতির সাদাটে শার্ট, তার ওপর হাতকাটা একটা গরম পুলওভার।

পরনের ধুতিটা একদিকে প্রায় পাছা পর্যন্ত তোলা। পায়ে নাইলনের মোজা। পায়ের ডিমের কাছে ইলাস্টিক দিয়ে আটকানো। পায়ে হলদেটে পাতলা সোলের ছুঁচোলো মুখের শেয়ারবাজারি জুতো। মহিলাদের পরনে ছিল আটপৌরে সুতির শাড়ি আর তার ওপর ফাউ হিসেবে একটা ক'রে ফুলহাতা সোয়েটার। পায়ে সুতির মোজা আর পাতলা সোলের ওপরখোলা চপ্পল। মুখোমুখি এসে যখন ওদের পেরিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন কানে এল—বিশেষ ক'রে, মেয়েদের নিষ্করুণ হাহুতাশ। ওরা সখেদে বলছিল, এত ঠাণ্ডা পড়বে আর রাস্তাও যে এত কঠিন দুর্গম হবে, আসবার আগে ওরা তা ভাবতেই পারেনি, আর কেউ সেকথা ওদের আগে থেকে বলেও দেয়নি। ভদ্রলোককে আমি পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে কথাপ্রসঙ্গে এই ব'লে কড়্কেও দিলাম যে, কেন তিনি আগে থেকে খোজখবর না ক'রে উপযুক্তভাবে তৈরি না হয়ে মেয়েদের নিয়ে বোম্বাই থেকে নির্বোধের মতন সটান চলে এলেন। সেইসঙ্গে বললাম যে, ওঁদের সঙ্গে যখন উপযুক্ত গরম জামাকাপড় আর লেপতোষক নেই, ওদের উচিত এখান থেকেই বাড়ি ফিরে যাওয়া নইলে ওঁরা সবাই নির্ঘাত মারা পড়ে যাবেন। ওঁরা ভেবেছিলেন ওদের দুর্দশা দেখে হয়তো আমি সমবেদনা জানাব। তার বদলে আমাকে সদুপদেশ দিতে দেখে নিশ্চয় ভেবে নিয়েছিলেন যে, এ লোকটা একেবারেই পাষাণ হৃদয়। পরে ওদের কী হাল হয়েছিল জানি না। বেচারা মেয়েদের অবস্থা দেখে আমার খুবই মায়া হচ্ছিল। এটা ভাবা কঠিন যে, শেয়ারবাজারের সেয়ানা গুজরাতি লোকটি কি সত্যি এতটাই উজবুক আর এতটাই ন্যাকাচৈতন্য ছিল।

অন্যান্য ক্ষেত্রে সাধারণত যেটা করিনা, তিব্বত সফরে গিয়ে আমি সেটাই করেছিলাম। পাখির ওপর ক্ষেত্রসমীক্ষার আলাদা নোট নেওয়া ছাড়াও, সেইসঙ্গে কখন কোথায় কী ঘটছে সে সম্বন্ধে বিবরণ লিখেছি। অন্যান্য অধিকাংশ অভিযানে আমার সঙ্গী, যেমন লোক ওয়ান থো, মেইনেৎস্হাগেন আর ডিলন রিপ্লে—এঁদের সফরকালীন লিপিবদ্ধ করা ঘটনাসূত্রের ওপর নির্ভর করেছি এবং এখনও করে থাকি। এঁরা প্রত্যেকেই আমার চেয়ে পিটপিটে আর পরিশ্রমী ব'লে এদের রাখা নোট অনেক বেশি কাজের হয়। তিব্বত সফরে দেখে এত কিছু মনে ধরেছে আর রোমাঞ্চিত হয়েছি যে, সে এক নতুন অভিজ্ঞতা। এ বইতে তার একটানা বিবরণ দিতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। তার মধ্যে না গিয়ে আমি বরং এলোমেলোভাবে তা থেকে কয়েকটা বিক্ষিপ্ত রেখাচিত্র তুলে ধরব। পাঠকেরা যাতে এই অবিস্মরণীয় অভিযানের একটু স্বাদ পেতে পারেন। তাৎক্ষণিক খাপছাড়া লেখা। কাজেই এখন যাতে বোধগম্য হয়, তার জন্যে সেই ডায়রির লেখায় কিছুটা জোড়াতালি দিতে হয়েছে।

> ২৭.৫.৪৫ : খেলা থেকে সোসা (গারবিয়াং যেতে) রাত কাবার করে পরদিন পৌঁছেই শ্রীনারায়ণ স্বামীর অতিথিবৎসল আশ্রমে। ৮,৩০০ ফুট উঁচুতে। আশ্রমের প্রতিষ্ঠা ১৯৩৬ সালে।...সহৃদয় অভ্যর্থনা। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাড়িটা দেখানো হল। কোথায় কী

এইসব। বাড়ি তৈরির কাজ এখনও চলেছে। সাধুসন্ন্যাসী আর কৈলাস মনাগমনকারী যাত্রী আর কম ধর্মভাবাপন্নদের জন্যে খড়ের চালের ধর্মশালা। নারায়ণস্বামী সুপুরুষ তরুণ। ৩০/৩৫ বছর কালো দাড়ি, লম্বা চুল। ইংরিজি বলেন চোস্ত।...কথা বলার ধরনে সাঁটে বুঝলাম কেরলের লোক। যেমন, 'ইয়েগ' উচ্চারণে আর যেন পরের কথা ফাঁস করে দিচ্ছেন এইরকম 'কনটিনিউয়াসলি'র বাচনভঙ্গিতে। রায়হানাকে (তৈয়বজী) ভালোরকম চেনেন মনে হল। শীত এলেই উনি টাকা তোলার জন্যে শাঁসালো মক্কেলদের ধরতে আমেদাবাদ আর অন্যান্য জায়গায় ঘুরে বেড়ান। বরোদাতেও ওঁর হিতৈষী লোকজন আছে। দেখে বুঝলাম, বর্তমানে ওঁর কেবল দুজন শাগরেদ আছে। তার মধ্যে, এক বাবাজি। তার পরনে হালকা হলুদ রঙের আঙরাখা। ঢেউখেলানো কালো চুলদাড়ি। চিম্‌সেপড়া ডাকাতের মতো চেহারা। দেখে মনে হয়েছিল হুব জাতীয় কেউ। দ্বিতীয় লোকটি পাশের গ্রামের এলেবেলে একজন অবসরপ্রাপ্ত স্কুলমাস্টার। আশ্রমের যাবতীয় বৈষয়িক কাজের ভার তার ওপর। যেমন, বাড়ি তৈরির তদারকি, রসদ সংগ্রহ (জিনিস সবসময় সেরা হবে) আর সেইসঙ্গে আশ্রমকর্মীদের মাইনেকড়ি আর মজুরদের রোজ মেটানো। চেষ্টা করেও স্বামীজীর পেট থেকে তাঁর অতীত ইতিহাস আর ভবিষ্যতের লক্ষ্যের বিষয়ে কোনো কথা বার করতে পারিনি। মনে হয়েছে, জায়গাটা স্বাস্থ্যনিবাস করার পক্ষে আদর্শ। মাথার ওপরে নাম্পা হিমবাহ পেরিয়ে চোখজুড়ানো সব অতিকায় পাহাড়। খুব একটা ব্রতকঠিন ভাব বা ভয়ভক্তি জাগানো পরিবেশ বলে মনে হয় না; স্বামীজীর কথা শুনে মনে হল না যে উনি সেরকম একজন শাস্ত্রজ্ঞ বা পণ্ডিত লোক। যদি না উনি সেদিকটা চেপে গিয়ে থাকেন। আমাদের কথাবার্তার বেশির ভাগটাই হল কৈলাসযাত্রা (উনি দাবি করলেন তেরোবার নাকি গিয়েছেন) আর খাবারদাবার প্রসঙ্গে। একটা জিনিস আমরা আবিষ্কার করলাম যে, ওঁরা সাদাসিধে খাবার খান—তবে সেরা ঘি, সেরা দুধ, সেরা মধু এবং সব কিছুই সর্বোৎকৃষ্ট। সুতরাং আশ্রমবাসে অন্তত গতর পায় যথেষ্ট বিশ্রাম আর পুষ্টিকর খাবার। মনের খোরাক কতটা কী মেলে, সে বিষয়ে বিন্দুবিসর্গও আমাদের নজরে পড়েনি। অবশ্য স্বামীজীর আলাদা এক ঘরের চিলেকোঠায় একটা কুঠুরি দেখেছি, সেটা নাকি ওঁর ধ্যান করার জায়গা।...বাগানের পরিচর্যা করে সেই প্রাক্তন দস্যুটি। পোচা-র বীজ আর গাছের তালিকার জোরে কাজটা সে ভালোই করে। 'ইনডেক্স কিউয়েন্সিস' থেকে গড় গড় করে ফুলের নাম বলে যায়। বাগান জুড়ে ফুটে আছে সুন্দর সুন্দর গোলাপ, বনফ্সা, আফিম ফল, গাঁদা, স্ন্যাপড্রাগন আর পাটল ফুল। এখন কোথাও আর তেমন বরফ নেই। আর তিন সপ্তাহের মধ্যে বাগান ফুলে ফুলে ছেয়ে যাবে। স্বামীজীর মতে, আশ্রমের মাথার দিকে পাহাড়ের খাড়াইতে ১৮ ইঞ্চি মোটা (হাত দিয়ে দেখালেন কতটা মোটা) সাপ থাকে। কপালে তারার মতো জ্বলজ্বল করে তার মণি। অন্ধকার রাত্তিরে ৪০০ গজ দূর থেকে স্বামীজী তা স্বচক্ষে দেখেছেন। পাড়ার এক ছোকরা সেই সাপ দেখে আশ্রমে ছুটতে ছুটতে এসে স্বামীজীর পায়ে লুটিয়ে পড়েছিল। ঐভাবেই তার মৃত্যু হয়। 'স্রেফ আতঙ্কে'।

৩ রা জুন, ১৯৪৫। গারবিয়ং। অনেকদিন পর চনমনে সকাল। কাজেই নাম্পা হিমবাহ সি-র দিকে রওনা হওয়া গেল। দূরত্ব এখান থেকে ৯ মাইল। আমাদের গাইড

গেলং। স্থানীয় মস্তান। দুশমনের মতো চেহারা। আসলে কিন্তু ও ভারি নম্রস্বভাবের মানুষ। মুশকিল হয়েছে পাকা গুণ্ডার মতন চেহারাটা নিয়ে। দেখে কেউ বলবে না লোকটা আসলে নরমপ্রকৃতির। নাম্পা জায়গাটা নেপালের রাজ্যসীমায়। নতুন মরশুম শুরু হলেই এখানকার গরু-ছাগল-ভেঁড়ার পাল যাবে ওখানে চরতে। ওদের মধ্যে একটা অলিখিত বোঝাপড়া থাকায় ওরা কিছু বলে না। এখনও ঠিক সময় হয়নি। বিরাট জায়গা আর চারণভূমি এখনও বরফে ঢাকা। তবু ইতিমধ্যেই বেশ কিছু ছাগল আর ভেড়া গলা বরফের তলা থেকে নবোদ্যত চারাগুলো খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। পাহাড়ের গা থেকে যে যে জায়গায় সদ্য বরফ সরে গেছে, সেখানেই আজালিয়া ফুল ঝাড়েবংশে মাথা তুলেছে। প্রায় ৪ ফুট উঁচু ঠাসবন্দি ঝোপ থেকে মুখ বাড়িয়ে আছে ফিকে গোলাপি আর ময়ূরপঙ্খী রঙের ফুল; পাতাগুলো রডোডেন্ড্রনের মতো। এছাড়াও রকম রকমের সব ফুল। তার মধ্যে আছে নীলবেগুনি আইরিস, বাটারকাপ আর একরকম লালচে ধরনের বেগ্নি ফুল বিস্তর জায়গা জুড়ে এরা ঝাঁক (?) বেঁধে থাকে। আর এক পক্ষকালের মধ্যেই ওসব জায়গায় বসে যাবে একচ্ছত্র রঙের মেলা। দূরে মহিমান্বিত হিমবাহ আর চতুর্দিকে তুষারমৌলি পাহাড়।

৪ঠা জুন, ১৯৪৫। ঠাকুর নন্দলালের কাছে গেলাম। আলোচ্য বিষয় লিপুলেখ পেরোবার চূড়ান্ত উদ্যোগ আয়োজন করা। কালকের পর থেকে আকাশ পরিষ্কার, রোদ উঠেছে, পেরোনো সম্ভব। গেলং কাল আমাদের নাম্পায় নিয়ে গিয়েছিল। ঠিক করেছি, ওকেই গাইড আর দোভাষী রাখব। লোকে বলেছে, ও যেমন বিশ্বাসী তেমনি কাজের। কুলি, তাঁবু আর যানবাহন—এসব ঠিক করা গাইডেরই কাজ। গারবিয়াং থেকে আমরা ১৫ সের ছাতু নিচ্ছি। এরপর থেকে এটা সেটা করে ঐ ছাতু দিয়েই আমরা দুপুরের লাঞ্চ সারব। প্রায় ১১টা থেকে সমানে বয়ে চলেছে বোফোর্ট সূচকের ৬ নং দমকা হাওয়া। ছ'টা নাগাদ তা প্রচণ্ড রুদ্রমূর্তি ধারণ করল। চারপাশের পাহাড়ে কেমন একটা অস্পষ্ট নীলচে ভাব দেখা গেল। সাড়ে ৬টায় প্রায় পনেরো সেকেণ্ড বেশ জোরালো ভূমিকম্পে পা টলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বাংলোর বাইরে চলে এলাম। ফলে, নানা জায়গায় ধস্ নামল আর ভাসমান হিমশিলা নেমে এল। কামানের গোলা দাগার পর যেমন হয়, সেইরকম গাঢ় ধুলোয় পাহাড়ের কিনারার গভীর খাদগুলো ঢেকে গেল; চারদিকে খটাখট শব্দে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে পাথরের চাঁই আর খসে খসে পড়ছে গণ্ডশিলা। কোনোটা আকারে দোতলা বাড়ির সমান।

৫ই জুন। সকাল ১০টায় নন্দরামের আস্তানায় গিয়ে সকলে মিলে বসে ঠিক হল, কাল সকালে আমরা টাকলাকোট (তিব্বতের প্রথম গ্রাম) রওনা হব। পথপ্রদর্শক দোভাষী আর সব কিছুর তদ্বিরতদারককারী গেলং গিয়ানিমা পর্যন্ত রোজ পাবে (খোরাকি বিনা) ৩ টাকা। টাকলাকোট অবধি মাল বইবার জন্যে ৬টা টাট্টু। প্রত্যেকে ৫০ সের মাল বইতে খরচ পড়বে প্রতি টাট্টু পিছু ১০ টাকা। তাদের সঙ্গের ২ জন লোক পাবে রোজ ৪ টাকা। টাকলাকোট থেকে সব মালপত্র উঠবে চমরীর পিঠে। এসব ব্যবস্থা গেলং করবে। মানস সরোবর আর কৈলাস থেকে ১৫ই জুলাই নাগাদ আমরা গিয়ানিমায় ফিরব। মোটামুটি এই হল প্ল্যান।

৬ই জুন। গারবিয়াং থেকে কালাপানি ১২,০০০ ফুট।...সকাল সাতটায় তাপমান ৩৯° ফা.। একেকবার প্রচণ্ড শব্দে বাজ ডাকলেই খাড়া পাহাড় থেকে হুড়মুড় করে নেমে আসে গণ্ডশিলা। কোনো জায়গায় পথ বলতে সঙ্কীর্ণ শৈলশিরা। পুরো তিন ফুটও চওড়া নয়। কয়েক শো ফুট নীচে ওপাশে খরস্রোতা পাগলাঝোরা।...প্রতি পদে মনে হয়, এই বুঝি টেনে নেয়। তাহলে তার পরিণাম খুবই খারাপ হবে। কিন্তু... 'কিন্তু করারই বা কী আছে, হে।'

৭ই জুন। শাংচিম। গেলং-এর ইচ্ছে, বরফ শক্ত থাকতে থাকতে রাত দুটোয় লিপু গিরিপথের দিকে রওনা হয়ে যাই। আশা করি, সূর্যোদয়ের আগেই ও টাট্টুগুলোকে জড়ো করে মালপত্রসব চাপিয়ে ফেলতে পারবে। আমরা যাতে সকালের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে ওপরে পৌঁছে যেতে পারি, নইলে ওদিককার রাস্তায় অন্ধকারে টাট্টুদের চলা দুষ্কর হবে। অবশেষে আমরা তাহলে পরপারের কূলে এসে ভিড়েছি!

৮ই জুন। উঠে পড়েছি রাত ৯টায়। ঘুটঘুটে অন্ধকার। একটি মোমবাতি আর একটি টর্চ সম্বল। আকাশ কালো হয়ে আছে মেঘে। তারই মধ্যে তাঁবুগুলো গুটিয়ে নিয়ে টাট্টুর পিঠে মালপত্র তোলা হল। বেরোতে বেরোতে রাত আড়াইটে। যে পথে লিপু যাব, তাকে রাস্তা বলা যায় না। গোটা জায়গা জুড়ে পাহাড় থেকে ধসে পড়া পাথরের বড়ো বড়ো চাঙড় আর শিলাখণ্ড। তাতে হোঁচট খেয়ে আর তার মাথায় উঠে নীচে গড়িয়ে পড়া। সে এক দুর্বিষহ অবস্থা। তায় মিসকালো অন্ধকার। টাট্টুঘোড়া নিয়ে ঠিক রাস্তায় পা রেখে লোকগুলো কীভাবে যে চলছিল সেটাই এক তাজ্জব ব্যাপার। শাংচিম থেকে ৩,২৫০ ফুট উঁচুতে উঠলে তবে গিরিপথের মাথায় পৌঁছনো যায়। টাটকা বরফ পড়ায় অত ভারী বোঝা নিয়ে প্যাচপ্যাচে রাস্তায় চলতে কষ্ট হচ্ছে টাট্টুগুলোর। কোথাও কোথাও রাস্তায় পেট ঠেকিয়ে বসে পড়ছিল। তখন একজন তার মাথার দিকের দড়ি, আরেকজন তার ল্যাজ টেনে ধরে প্রায় চ্যাংদোলা করে তাকে তুলছিল। বরফের যে যে জায়গায় খানাখন্দ, সেসব জায়গায় লাফ দিয়ে পার হতে হচ্ছিল। ফলে, ঘোড়াগুলো আর সেইসঙ্গে মালপত্রগুলো কখন যে সাংঘাতিক দুর্ঘটনার মুখে পড়বে, এই ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতে হচ্ছিল। বেশ কয়েকবার ঘোড়াগুলোর পিঠ থেকে মাল নামিয়ে খারাপ খারাপ জায়গায় হাতে হাতে মাল বয়ে নিয়ে যেতে হল। উঠে পড়ে লাগলেও বেশ সময় লাগছিল। ঘোড়ার সঙ্গের লোকজনদের সাহস আর উদ্যমের তারিফ করতে হয়। লিপু লেখের শীর্ষে পৌঁছুনো গেল সওয়া ছ'টায়। ২৮° ফা. তাপমান। চারদিক জুড়ে নতুন করে বরফ পড়ায় গিরিপথে যাতায়াতে বাধা পড়ল। যা অবস্থা, তাতে একমাত্র ভেড়া-ছাগলই এ পথে লাগসই বাহন। বরফে আমাদের ঘোড়াগুলোর যখন বেসামাল অবস্থা, ঠিক তখনই একপাল ভেড়া ছাগল পিঠের দুপাশে মালভর্তি বাঁশের ঝোড়া ঝুলিয়ে বলতে গেলে ধাঁই ধাঁই করে বেরিয়ে গেল। আমার অবস্থা তখন খুবই কাহিল। একে ঐ উচ্চতা, গায়ে ভেড়ার চামড়ার ভারী কোট, পিঠে জিনিসপত্রে ফাটো-ফাটো রুকস্যাক (১৮ পাউণ্ডের বেশি ওজনের) তার ওপর পর পর দুরাত্তির ঠায় জাগা। হাড়কাঁপানো হুহু করে হাওয়া বইছে। তার মধ্যে পাহাড়ে চড়া কী যে কষ্টকর বলার নয়। গিরিপথ পেরোতেই ভূখণ্ডের চেহারা আচমকা বদ্‌লে গেল।

ভারতের এপারে কালী নদীর উৎস বরাবর এসে এবার আমরা তিব্বতের উৎসস্থল বরাবর কার্নালির পাড় বেয়ে নেমে চলেছি। লিপুর এপারে তিব্বতের প্রথম গ্রাম তাকলাকোট। মরশুমের সময় বেশ বড়োসড়ো গুরুত্বপূর্ণ গঞ্জ (শীতের সময় বন্ধ থাকে)। এই গঞ্জে ভারত আর তিব্বতের মধ্যে বিনিময় প্রথায় ব্যবসাবাণিজ্য চলে। এখানে থেমে আমরা চমরী যোগাড় করব আর টাট্টুঘোড়াগুলো ফিরে যাবে শাংচিম। এখনকার গঞ্জে মোহন সিং-এর আড়ত আছে। ও ধরচুলার লোক। ওর সাহায্য নিয়ে লাপ্‌ফা নামের একটি লোককে আমরা কাজে নিলাম। খলনায়কের মতো চেহারা তার। হাঁটু অবধি ফেল্টের রঙিন বুট। কোমরে বেল্ট দিয়ে আটকানো সায়া ধরনের একটি ময়লা অধোবস্ত্র। তেল চপচপে চুল পেছনে বেণী করে বাঁধা। দুকানে মাকড়ি। ব্যবস্থা হল, প্রত্যেকে ২ মণ ক'রে মাল বইবে এমন চারটে চমরী ওর কাছ থেকে আমরা ভাড়া নেব। গিয়ানিমা যেতে চমরী পিছু ৪০ টাকা হিসেবে ৩০ দিনের জন্যে ভাড়া নেব। সেইসঙ্গে লাপ্‌ফা (বা লাফা) নিজে প্রতি মাসে ৫০ টাকা। রান্নার জন্যে জ্বালানি, কাঠকুটো, চমরীর ঘুঁটে যোগাড়—এটাও ওকেই করতে হবে।...তাকলাকোটে উঁচুতে সামনের পাহাড়চুড়ায় গুম্ফা বা মঠ। সেখানকার যিনি সর্বপ্রধান, সেই লামাকে লোকে বলে 'রাজা'। নুন আর মাখন দেওয়া চা (খেতে আদৌ খারাপ নয়) দিয়ে উনি আমাদের আপ্যায়ন করলেন। সঙ্গে ছিল মিষ্টি নকুলদানা। দেখে মনে হল না যে, রাজা খুব একটা কৃচ্ছতা করে থাকেন। চিকনচাকন চেহারা, ভালমন্দ খান। নানারকমের চাকুমচুকুম ওঁর হাতের কাছেই মজুত থাকে। আসন ছেড়ে উঠতে হয় না। হাতনুড়কুত হিসেবে একজন তরুণ ব্রহ্মচারী সব সময়েই হুজুরে হাজির থাকে। ওঁকে তেমন একজন সন্ন্যাসীবৈরাগী বা দিগ্‌গজ পণ্ডিত বলেও মনে হল না। হয়তো দুইয়েরও বেশি গুণধর। গুম্ফায় ছয়লাপ হয়ে আছে টুকিটাকি নানান 'জরি-পুরানা' জিনিস। আছে বেয়াড়া ধরনের বিচ্ছিরিরকমের পোকায় খাওয়া ধুলোপড়া ঝুলকালি মাখা হাবিজাবি জানোয়ার। হয় ভালুক, নয় চিতাবাঘ, নয় বন্য চমরী। পাশের ঘরের দেয়ালে কৃষ্ণসারের শিং আর সিলিং থেকে ঝোলানো শোম্বাগ্‌কের হরিণ। এরই মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে রকমারি প্রার্থনাচক্র আর প্রার্থনা পতাকা (সম্ভবত সৌজন্য বশত জাপানি উপহার।) সেইসঙ্গে সোনা আর গালার তৈরি এটা সেটা। এসব আমার মনে এতটুকু দাগ কাটেনি। বরং একটু দমে গিয়েছি এই ভেবে যে, আজব পুতুল আর ঝুমঝুমি—এইসবই ধর্মের নামে চালানো হচ্ছে। এমন সব জিনিসে মানুষের অন্ধ বিশ্বাস গড়ে উঠেছে, যার জোরে তারা ভাবে (কেন?) পরজন্মে তারা মোক্ষ লাভ করবে। ওরা যদি নিজেদের গায়ে আর গুম্ফার সন্নিহিত চারদিক জুড়ে একটু কম ময়লা জমাত (গুম্ফাটাকে তো ওরা পায়খানা বানিয়ে ছেড়েছে)—তাহলে ঐ জায়গায় ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রার্থনাচক্র ঘোরানোর চেয়ে তাতে ঢের বেশি কাজ হত—চাইলে চক্রটাতে বলবেয়ারিংও লাগিয়ে নেওয়া যেত।

১০.৬.৪৫।...পথে পড়েছিল উনপাঁজুরে দেখতে সাঁকো। তাই দেখে তিনটে জাহাঁবাজ চমরী গোঁ ধরল কিছুতেই সেই সাঁকো পেরোবে না। পেছন থেকে পটানো হচ্ছে, সামনে থেকে সজোরে টানা হচ্ছে। তবু এগোবে না। ওদের পা ছোঁড়ার ঠেলায় বেশ

খানিকটা বোঝা মাটিতে ছিটকে পড়ল। শেষকালে ওদের পিঠ থেকে সমস্ত মাল নামিয়ে নিয়ে সাঁকো দিয়ে হাতে হাতে বয়ে নিয়ে গিয়ে ওপারে নতুন করে আবার ওদের পিঠে চাপানো হল। চমরীগুলো ইতিমধ্যে বরফগলা জলে খরস্রোতে গা ডুবিয়ে সাঁতরে ওপারে গিয়ে উঠল।...চমরীদের চলার ভঙ্গি আমার খুব পছন্দের। দিব্যি গদাইলস্করি চালে গায়ে ফুঁ দিয়ে হাঁটবে, এদিক-ওদিক নজর করে দেখব আর ফটাফট ফটো তুলব।...এক ছোকরা একটা ভেড়া মেরে টাট্টু চেপে বেচতে নিয়ে যাচ্ছিল। তার কাছ থেকে ভেড়ার দুটো রাং কিনে নিলাম। দাম ৯ টাকা। দু পক্ষেরই লাভ হল। শুনলাম গত বছরে আস্ত একটা ভেড়ার দাম ছিল নাকি মাত্র আড়াই টাকা।...রাস্তায় কী পরে বেরোব, এটাই এক মহা সমস্যা। এই চড়চড়ে রোদ, পরক্ষণেই হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা (এই-আছে এই-নেই মেঘের খেয়ালে)।

সেকাং। ১১.৬.৪৫...বেলা তিনটেয় লাফিয়ে উঠল হাওয়া। তিব্বতের যে জন্যে বদনাম, সেটা যে কী জিনিস এই প্রথম তা হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দিল। একনাগাড়ে সাড়ে ৩ ঘন্টা ধরে ছোট্ট তাঁবুর গায়ে যেভাবে গদাম গদাম করে হাওয়া আছড়ে পড়ছে, তাতে ভয় হচ্ছে যে, গোটা তাঁবুটাই না ঝড়ের মুখে উড়িয়ে নিয়ে যায়। বরাত ভালো যে, জরুরি প্রয়োজনের জন্যে আমাদের আছে একটা বাড়তি 'দুজনের যুগি্য কুকুরশালা' গোছের বাড়তি একটা তাঁবু। আশা করি, সেটা ব্যবহার করার দুর্ভাগ্য থেকে রেহাই পাব নইলে নাড়ি ছেড়ে যাওয়ার ভয় আছে। রাত্রে ৩০ ফা.। ক্যানভাসের বড়ো বড়ো পাত্রের জল ঠাণ্ডায় জমে গেছে। পায়েরও প্রায় সেই দশা। সা-জোয়ান গেলং রোজ সকালে অনেকক্ষণ ধরে গলা ছেড়ে প্রার্থনা করে চলেছে—তাতে বরং ভয়ের ভাবটা আরও পেয়ে বসছে।...চিরশ্যামল গুল্মের ঝোপগুলো যেমন পাখিদের, তেমনি নীড়সন্ধানীদের কাছে যেন স্বর্গ। এখানে পাখির পেছনে ঘুরে একটা সপ্তাহ মহাসুখে কাটিয়ে দেওয়া যেত। তবে 'আচ্ছা আচ্ছা' সামনে আরও দেদার পাওয়া যাবে। দেখে সেটা বোঝাই যাচ্ছে। কাজেই এখানে আর দেরি করা নয়।...সঙ্গে ওয়ান থো থাকলে কী ভালো যে হত। ওর যা উৎসাহ আর উদ্যম, পাখির ছবি তুলে সবাইকে আমরা তাক লাগিয়ে দিতে পারতাম।

১৩.৬.৪৫। সেকাং থেকে নায়েজে। গিরিপথের শৃঙ্গদেশ (গুরলা, ১৬,৫০০ ফুট) এতটাই চওড়া সমতল যে, ২০০ টা চার্চিল ট্যাঙ্ক গা ঘেঁষে দাড়াবার জায়গা পেয়ে যাবে—সেখানে ধর্মপ্রাণ আর ভূত পিশাচ ভীরু লোকদের মানত করা বিস্তর পাথর জড়ো করা রয়েছে। প্রধান যে পাথরের স্তূপ, তার মাথায় মামুলি খুঁটির গা থেকে ঝুলে রয়েছে যতসব ছাইপাঁশ—ছেঁড়া ন্যাকড়া, পশমের নোংরা ডেলা, চমরীর শিং আর মাথার খুলি ইত্যাকার বস্তু। ভূতপিশাচ মানা ছোকরা লাপ্‌ফা উচ্চকণ্ঠে জয়ধ্বনি দিতে দিতে সটান সেই স্তূপে উঠে গিয়ে তার মানসিক বেঁধে দড়ির সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে এল। গেলং হিন্দু হলেও ভূতপিশাচের ভয় ওরও কম নয়। ভক্তিভরে গেলংও অং বং কীসব যেন মন্ত্র আওড়ে গেল। আশা করি অপদেবতাদের সেসব বোধগম্য হয়েছে। আমাদের ইহকাল আর পরকালের ভালোর জন্যে খেম সিং আমাদের আগে থেকে এই ব'লে সাবধান করে দিয়েছিল—গিরিপথের মাথায় উঠে কেউ যেন 'লেপ সাইডে' (বাঁদিকে)

ভুলেও যেন রাক্ষস তালের দিকে না তাকাই; সব সময়ে প্রথমেই তাকাতে হবে 'রাইট সিধে' (সোজা ডানদিকে)—যেদিকে রয়েছে মানস সরোবর। এর অন্যথা হলেই কিন্তু সর্বনাশ। দুটো সরোবরেরই সে কী আহামরি দৃশ্য। পটভূমিতে সব কিছু ছাড়িয়ে মাথা তুলে আছে কৈলাস। রাক্ষসের রামধনু রঙের অসাধারণ বর্ণচ্ছটা, আর দিনের কখন কী সময় আর আকাশের যখন যে অবস্থা, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানসের রংবদল দেখে চোখের যেন পলক পড়ে না। এই দেখছি তুষারধবল, তারপরই পীলু আর পান্নাসবুজ, আবার তারপরই গাঢ়তম লাজবর্দ নীল আর ঘন ধূমলকৃষ্ণ। এ দৃশ্য জীবনে ভোলার নয়। মানস সরোবরের পৃষ্ঠদেশের আয়তন ১৪, ৯৫০ ফুট; পরিধি ৫৪ মাইল; স্বামী প্রণবানন্দের মতে, সর্বোচ্চ গভীরতা প্রায় ৩০০ ফুট। চতুর্দিক ঘেরা পর্বতমালার শুধু চূড়াগুলিই এখন বরফে ঢাকা।

মানস সরোবরের দক্ষিণ তীরে থুগলহো মঠ। তারই কাছাকাছি এক জায়গায় স্বামী প্রণবানন্দকে আমি প্রথম দেখি। সাধুজনোচিত এই মানুষটি যেমন যুক্তিবাদী তেমনি বিজ্ঞান অভিমুখী। ঐ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে ঘুরে ঘুরে উনি তথ্যানুসন্ধান করেছেন। প্রথম দর্শনেই আমাদের মধ্যে খুব ভাব হয়ে যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা কত কী নিয়ে আলোচনা করেছি। পুরোটাই হয়েছে ভৌত বিষয়ে। সুতরাং যা আমি বুঝি, সেই ভাষায়। পরে এই অঞ্চল নিয়ে লেখা তাঁর দুটি প্রভূত তথ্যসম্বলিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়—'কৈলাস মানসরোবর' (স্বামী কৈবল্যানন্দ, ১৯৪৯), এবং 'এক্সপ্লোরেশন ইন টিবেট' (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫০)। তাঁর এই বই দুটিতে ব্যবহারের জন্যে আমি সানন্দে তাঁকে আমার 'তীর্থযাত্রাকালে' তোলা কিছু ফটো আর পক্ষিতত্ত্ববিষয়ক নোট যুগিয়েছিলাম। এরপর তাঁর সঙ্গে ঘটনাচক্রে আবার দেখা হয় একত্রিশ বছর পরে। সম্পূর্ণ পৃথক পরিবেশে। নয়াদিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে। তদানীন্তন রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে খেতাব গ্রহণ অনুষ্ঠানে সেবার আমরা দুজনেই হাজির হয়েছিলাম। প্রণবানন্দ পেয়েছিলেন 'পদ্মভূষণ' আর আমি পেয়েছিলাম তার জ্যেষ্ঠ খেতাবটি।

লাপ্‌ফাকে আমার ক্রমেই বেশি বেশি করে ভালো লাগছিল। ও সদাহাসাময় আর কথার খুব বাধ্য। কিন্তু গেলং-এর মতোই বড্ড চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে খুব বেশিক্ষণ ধরে প্রার্থনা আওড়ায়। রাত না পোয়াতেই সাততাড়াতাড়ি শুরু হয়ে যায় ওর প্রার্থনা। ভারবাহী চমরীগুলোকে যখন গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে তাড়া দেয়, তখনও ঘেঁডিয়ে ঘেঁডিয়ে সমানে কী যে মাথামুণ্ড আওড়ায়—ধর্মকথা কি! তবে হাতে তখন তার যে কাজ, তাতে বক্তব্যটা অন্য কিছুও হতে পারে।...তাঁবুর পর্দা ওঠানো, বালিশে মাথা রেখে চিৎপাত হয়ে শুয়ে। সূর্যাস্তের আলোয় ৫০ গজ দূরে ৮ জোড়া বড়িহাস আর কয়েকটা চখা নির্বিকারভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভারি সুন্দর দৃশ্য। কিন্তু পোড়া কপাল, কোথায় পয়েন্ট টু-টু, কোথায় ডাক রোস্ট—তার বদলে ভাত আর ডাল, ডাল আর ভাত। রোজ এই।

১৭.৬.৪৫ বরখা (বা পরখা)। কৈলাস পর্বতমালার নীচে সমতলভূমি। যেদিকেই

তাকাই চতুর্দিকে মাইলের পর মাইল বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে শুধু পাথরের কুচি আর সামান্য কিছু শীর্ণ ঘাস। লোকে বলছে, ধূ ধূ করা ঐ বিশাল মাঠই নাকি আর একমাসের মধ্যে হবে সবুজ তৃণময় গোচারণ। বলা যে হয়, 'দুনিয়ার ছাদ', কথাটা মিথ্যে নয়। এমন রণক্ষেত্র পেলে তৈমুরলঙ্গ আর প্রাচীন যোদ্ধারা নিশ্চয় আহ্লাদে আটখানা হত। সেকালের অনেক যুদ্ধই কারো গায়ে কেউ গা না ঠেকিয়ে যুগপৎ এখানেই স্বচ্ছন্দে হতে পারত।...একটা ল্যাজমোটা গিরগিটি মারব ব'লে তেড়ে যেতেই শাখাপ্রশাখায় বৌদ্ধ লাপ্‌ফা অমনি হাঁ হাঁ করে উঠল। ওদের ধর্মে নাকি বলে, এরকম একটা গিরগিটি মারলে একশোটা নরহত্যার পাপ হয়। সংসারের সব সুখ—পানাহার আমোদপ্রমোদ ত্যাগ করে স্বামীজী হয়ে সন্ন্যাস নিয়েছে গিরগিটি। তাই তাকে মেরে ফেলা মানে, একজন সাধুকে খুন করা, যা ১০০ জন নরমানব বধের সামিল।

এক সময়ে ইঁদুরের খুব উপদ্রব হয়। মাঠের সব ফসল খেয়ে ফেলছিল। সেইসঙ্গে মহামারী লাগে বিউবনিক প্লেগের। তখন তা ঠেকাতে এক স্বামীজী সেখানে বেড়াল নিয়ে এলেন। তার বিনিময় হার' বেঁধে দেন। তারই ফলে, বিশ্বের যেকোনো সংকট স্থায়ীভাবে সামাল দেওয়া যাচ্ছে। কিয়াংদের বিস্তর (একেক দলে ৭০টিরও বেশি) ভেড়াছাগলের পাল রাক্ষস-তালের তীর বরাবর। বেজায় হুঁশিয়ার ২০০ গজের মধ্যে যাওয়ার জো নেই। গেলেই চমকে উঠে এমন তড়বড়িয়ে ছুট দেবে যে চারপাশে ধুলোর ঝড় তুলে দেবে। একটিও এণ্ডাগণ্ডা নেই। কখন ওদের বাচ্চা পাড়াব সময়? মোট যা চোখে পড়ে তার সংখ্যা ৩ শোরও বেশি। বুনো গাধাদের শুকনো বীষ্ঠা চমরীদের ভারি পছন্দ। যেতে যেতে একবার দেখলে হয়। অমনি টক্ করে মুখে তুলে নিয়ে কচমচ করে চিবোতে থাকবে।...তারচান (বা দারচান) ১৫,৫০০, ফুট উঁচুতে। তিথিরির ভিড়ে পা দেওয়া যায় না। কৈলাশ পরিক্রমা আনুষ্ঠানিকভাবে এইখান থেকেই শুরু। সেইজন্যেই যে ভিখিরির এই সাঙঘাতিক ভিড়, তা বোঝা যায়। আগামী কাল থেকে আমাদের পুণ্যসঞ্চয় আরম্ভ হবে। পরকালের জন্যে পুণ্যের লোভে মানুষকে এমন হাঁকুপাঁকু করতে দেখে হাসিও পায় দুঃখও হয়। ভবিষ্যৎ (যার ওপর মানুষের কোনো হাত নেই) যা হবার হবে ব'লে, লোকে কেন ইহকালের এই সবেধন নীলমণি জীবনটাকেই একটু আয়ত্তে এনে পুণ্যলাভের চেষ্টা করে সুখী হতে পারে না?..(দিরাফুক যেতে) পুণ্যার্থীদের কৈলাস পরিক্রমায় আনুষ্ঠানিক পদভারে বেশ খানিকটা দেবে যাওয়া। তার পেছনে চোরাকারবারিদেরও মদত কম নয়। তারচান পেরিয়ে প্রায় মাইলটাক গিয়ে দুটি ছোকরাকে দেখে ভারি মায়া হল। পরনে উলিঝুলি ছেঁড়া ময়লা কাপড়—দেখে মনে হল তিব্বতি—দণ্ডি কাটতে কাটতে তারা চলেছে পরিক্রমায়। উঠে দাঁড়িয়ে দুটো হাত মাথার ওপর তুলে একবার করে তালি বাজাচ্ছে আর তারপরই প্রার্থনার ভঙ্গিতে উপুড় হয়ে রাস্তার ওপর সাষ্টাঙ্গে পড়ে যাচ্ছে। ওরা চায় মোক্ষলাভ করতে। হায় রে, বেচারারা, আশা করি ওদের এত কষ্টের কর্মফল ও প্রান্তে গিয়ে হাতছাড়া হয়ে যাবে না।...এই উচ্চতার (১৬,৫০০ ফুট) ওপরে উঠে জ্বালানি হিসেবে আমাদের একমাত্র নির্ভর হবে চমরীর ঘুঁটে। লাপ্‌ফা শোনদৃষ্টিতে খুঁজে তার তিব্বতি জোব্বার ভাঁজে ভাঁজে এইসব ঘুঁটে অক্লান্তভাবে সমানে জমা করেছে। এটা ভালো যে, সব সময়ই গজ্

গজ্ করার কিছু না কিছু থাকে। তবে পক্ষিতাত্ত্বিক অভিযানের দিক থেকে এবারের এই সফর সমানে আমাদের আগ্রহ জীইয়ে রেখেছে। আমার 'বার্ডস্ অব দি ইণ্ডিয়ান হিল্স্' বইটাতে শেষ পোঁচ দেবার কাজে এই অভিজ্ঞতা আমার খুবই সাহায্য করবে।...(দিরাপুখে আমরা খোলা আকাশের নীচে থাকলাম।)...কৈলাস এখন ঠিক মাথার ওপর। তবে দূর থেকে যতটা দেখতে জমকালো লাগছিল, নীচে দাঁড়িয়ে ততটা লাগে না।...(দ্বিতীয় দফার পরিক্রমা) আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলাম একটা চমরীতে চড়ে (দুর্গম দোলমা লা, ১৮,৫০০ ফুট ফাঁকি দিয়ে পরিক্রমা সারতে), কিন্তু কোথায়ও পাওয়া গেল না। অন্তত লাপ্‌ফা আর গেলং আমাকে তাই বলল। আমার এই শস্তায় পুণ্য অর্জনের চেষ্টা দেখে ওরা তো স্তম্ভিত। ইতর মনের মানুষেরাই কেবল এইরকম ছলচাতুরির কথা ভাবতে পারে। এই তীর্থপরিক্রমায় বিখ্যাত দ্রষ্টব্যের চারটির মধ্যে একটি হল এখানকার গুম্ফা। সেটি দর্শন করলাম। চারদিক যেন নরককুণ্ড হয়ে আছে। এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যতসব মাথামুণ্ডুহীন লোক-ঠকাবার আরাধ্য বস্তু। যেসব কিম্ভূত কিমাকার জিনিসকে বৌদ্ধবাদ বলে চালানো হচ্ছে, তাতে কি ধর্মের কোনো নামগন্ধ আছে?...পা ডুবে যাওয়া বরফের কাদা ভেঙে দোলমা লার মাথা উঠতে হল প্রাণ হাতে ক'রে। জিভ বেরিয়ে গেছে। এমন বেহাল অবস্থায় কেঁদে কঁকিয়ে শেষ ৫০ ধাপ উঠেছি যে, চূড়া থেকে 'চারদিকের দৃশ্য উপভোগ' করার শক্তি নেই। পিঠে মালের বোঝা, পা ডুবে গিয়ে নরম বরফ পেটে এসে ঠেকায় চমরীগুলো লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে এমন হুলুস্থুল বাঁধিয়েছে যে, মালপত্রসব এদিক ওদিক ছিটকে গেছে। নামতে হল অন্য পাশ দিয়ে। বড় বড় পাথরের চাঁই টপ্‌কে। ১:২ অনুপাতে বা তার চেয়েও খাড়াখাড়ি ঢাল নেমে গেছে। চমরীগুলোর কোনো তোয়াক্কা নেই। তাদের যেন এতে আরও মজা অসাধারণ জানোয়ার বটে! সাড়ে চারটেয় যখন পরের খোলা মাঠে রাত কাটাবার জায়গায় (জুনথুলপুক) এলাম, তখন আর শরীর বইছে না। তাঁবুর মধ্যে গা এলিয়ে দিয়ে অভিযানের বিষয়ে কেবল আকাশপাতাল ভাবছি। মাথায় পোকা না থাকলে কেউ এভাবে পিঠে বেজায়গায় পাথরকুচি ফুটিয়ে স্যাঁৎসেঁতে মাটিতে চিৎপাত হয়ে পড়ে থাকে। তার চেয়ে দিব্যি বাড়িতে ব'সে মহানন্দে আম সাঁটাতে পারত (ভারতে তখন আমের মরশুম) আর নরম আরামদায়ক বিছানায় গা ঢেলে দিতে পারত। মরেছে, অভিযানকারীদের প্রতিমার ভেতরের খড় বুঝি বেরিয়ে পড়ল।

২৫.৬.৪৫। ডিং ৎসো আনুমানিক ১৫,২০০ ফুট ছোট হ্রদ। পরিধি আনুমানিক ৬ মাইল মানস সরোবরের উঃপূঃ। স্থানীয় লোকেরা এটাকে মুণ্ড আর মানস সরোবরকে ধড় ব'লে মনে করে—অতএব আরও বেশি পবিত্র। এর পূর্বতীর পক্ষিতাত্ত্বিকের কাছে খুবই লোভনীয় বিস্তৃত এলাকা, কোথাও কোথাও সিকি মাইল প্রশস্ত, জলময় বিল অথবা তরুগুল্মহীন প্রান্তর—পরের পর সবুজ ফোঁপরা বর্তুলাকার টিলা কিংবা ঢিবি। একটির থেকে আরেকটিকে আলাদা করে রেখেছে গভীর ধরনের জলপ্রণালী—যেন ছোট আকারের এক দ্বীপপুঞ্জ। দ্বীপসদৃশ অনেক জায়গাই আসলে ভাসমান। এসব জায়গায় চলতে গেলে সব সময় হতে হবে খুব সাবধানী আর চটপটে। পরেরটাতে টক ক'রে লাফিয়ে না গেলে পা রাখার জায়গাটাই জলের মধ্যে তলিয়ে যাবে। এর ওপর

আছে চতুর্দিকে চোরাবালি। কাজেই একটু বেশি রকম সতর্কতার দরকার। নীড়বাঁধা পাখি পাওয়ার দিক থেকে এর চেয়ে ভালো জায়গা আর হয় না। হ্রদের চারপাশে ঝুঁটিঅলা বড়ো পানডুবী, গাঙচিল আর প্রায় ১৫ জোড়া কালোসারস। বোঝাই যায়, বাচ্চা দিতে এসেছে। সারসেরা যেমন হয়, নেচেকুঁদে বেড়াচ্ছে সেইসঙ্গে কিচিরমিচির আর ডাকাডাকি। শেষেরটাই বেশি জোরদার। একটা ডিম সরিয়ে ঘেঁটে নেওয়া হল সুস্বাদু—একঘেয়ে ডালভাতের হাত থেকে মনোরম রেহাই।

একটা গাঙচিলের ভাসন্ত বাসায় যেতে গিয়ে মহা ফাঁপরে পড়েছিলাম। মহা ফাঁপরে। আরেকটু হলেই চোরাবালিতে সলিল সমাধি ঘটতে যাচ্ছিল। জলার যেটা সবচেয়ে গভীর জায়গায়, সেইখানে ভাসন্ত ঢিবিতে পা রেখে হঠাৎ হুঁশ হল বরফজলে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত ডুবে গিয়ে দ্রুত তলিয়ে যাচ্ছি। আশপাশে লাফিয়ে যাবার কোনো জায়গা দেখছি না। প্রচণ্ড ভড়কে গিয়েছি। ঝট ক'রে ঘুরে মরিয়া হয়ে ঝপাং করে আগের জায়গায় দিলাম এক লাফ। ইতিমধ্যে আসা জায়গাটা আরও সরে গিয়েছিল। কপালের গুণে একচুলের জন্যে বেঁচে গেলাম। এ থেকে শিক্ষা হল এরপর থেকে গেলং-এর চেতাবনি আর উপেক্ষা করা চলবে না।

ওর চোখ দেখে বোঝা না গেলেও, গেলং কিন্তু অকালে মরতে খুবই ভয় পায়। সারা সকাল প্রাণের ভয়ে ও হাত গুটিয়ে বসে থেকেছে। ও যে জায়গায় ছিল, সেখানে বিপদ-আপদের কোনো ভয় না থাকা সত্ত্বেও অন্যদের কাজে সাহায্য করার তেমন চেষ্টা করেনি। দূরে রাস্তায় যাকেই হেঁটে যেতে দেখে, তাকে সে 'খারাব আদ্‌মি' কিংবা ডাকাত ভেবে ভয়ে কাঁপতে থাকে—কারণগুলো তা সে যত তুচ্ছই হোক। গতকাল বেশ কয়েক মাইল ঘুররাস্তা দিয়ে নিয়ে গিয়ে (আমার ধারণায়) ভুগিয়েছে। পথে যাদের ও সন্দেহ করেছিল, আমার বাকি সঙ্গীদের মতে, তারা একেবারেই নিরীহ গোবেচারি। এমনকী তাদের কাছ থেকে আমাদের বহুবাঞ্ছিত খাসির মাংসও কায়দা ক'রে পেয়ে যেতাম। গেলং কেন সবসময় ডাকাতের ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে, তার কারণটা অবশ্য পরে জানতে পারি। মানস সরোবর এলাকায় বেজায় ডাকাতের উপদ্রব। এই মাত্র কিছুদিন আগে ডাকাতের হাতে পড়ে ওর জান যেতে বসেছিল। ওরা ওকে বেদম পেটায়, টুঁটি টিপে ধরে সর্বস্ব কেড়েকুড়ে নিয়ে রাস্তার ধারে ফেলে দিয়ে চলে যায়। দিন দুয়েক পরে হঠাৎ এক পথচারী ওকে দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে।

চীনেরা তিব্বতে ঢোকার আগে, আমার সফরের সময় মানস সরোবর ভীষণভাবে ডাকাত-অধ্যুষিত এলাকা ছিল। ভারত থেকে যে অসহায় তীর্থযাত্রীরা যেত, ডাকাতের দল তাদের মারধর ক'রে সবকিছু কেড়ে নিত, কখনও কখনও মেরেও ফেলত। গেলং আমাকে পই পই করে বলত আমি এখানে সেখানে নিরস্ত্র হয়ে একা একা যেন ঘুরে না বেড়াই। আমরা ভাবতাম, ও বোধহয় আমাদের পানসে জীবনটাকে একটু মুখরোচক করার জন্যেই এসব বানিয়ে বলছে। যাই হোক, এক সকালে গেলংকে নিয়ে পাখির বাসার খোঁজে বেরিয়েছি। হল্‌দে-ফুল-ফোটা চিরহরিৎ কাঁটা লতার ঝোপে, আমার কেমন যেন মনে হল, সামনে কিছুটা দূরে কিছু একটা নড়ে উঠল। জায়গাটার

কাছাকাছি যেতেই সেই ঝোপ থেকে হঠাৎ ফট ক'রে মাথা তুলে দাঁড়াল এক কালিঝুলিমাখা বিকটাকার দুর্বৃত্ত। তার কোমরে একটা বিতিকিচ্ছিরি ছোরা। ঘাড়ে ঝোলানো একটা গাদাবন্দুক। সঙ্গে সঙ্গে হাতমুখ নেড়ে চোখ রাঙিয়ে প্রচণ্ড তর্জন গর্জন শুরু দিল। ওর কোনো কথাই আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়নি। লোকটার শাসানিতে গেলং-এর আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার অবস্থা। কোনো জ্যান্ত মানুষ যে এমন পাংশুবর্ণ হয়ে যেতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে গেছে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গেলং অস্ফুটস্বরে কেবলি বলতে লাগল, ঐ 'খারাব আদ্‌মি'টার কাছ থেকে যেন আমরা ছুটে পালাই। আমি দেখলাম পালাবার আর এখন সময় নেই। চেষ্টা করেও কোনো লাভ হবে না। ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে যেতে হবে। তিরিশ মাইলের মধ্যে আমাদের চিৎকার কারো কানে পৌঁছোবে না। কপাল ভালো ছিল, তাই হঠাৎ আমার শুটিং-স্টিকে'র (ক্রিকেটের আম্পায়ারদের যেমন ঠেকো দিয়ে বসবার আসন থাকে) কথা মনে পড়ে গেল। সেটা ছিল গেলং-এর কাঁধে। আমি চেঁচিয়ে ওকে ওটা চট ক'রে আমাকে দিতে বললাম। আমি এমন ভান করলাম যেন ওটা বন্দুক। পকেট থেকে একটা কার্তুজ বার ক'রে এমন ভাব করলাম যেন বন্দুকে গুলি ভরছি। বদমায়েশ লোকটা চকচকে ধাতব পাত লাগানো এমন আজব জিনিস আগে দেখেনি—এটা আমি ধরেই নিয়েছিলাম। আমি যেই ওটা খুলে জোরে ক্লিক ক্লিক শব্দে গুলি ভরার ভঙ্গিতে বন্দুকের ভাব ক'রে কাঁধে ধরেছি, আওয়াজটা শুনেই লোকটা ভড়কে গিয়েছিল। এবার আমার এল রণমূর্তি ধরার পালা। খুব চোটপাট শুরু করে দিলাম। (বজ্জাত লোকটা তার একবর্ণও বোঝেনি।) আমাদের কপাল ভালো, ভাঁওতাটা কাজে লেগে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কেঁচোর মতন গুটিয়ে গিয়ে চাপা রাগে মুখ কালো করে পিঠটান দিল। আমি বীরত্বের ভাব দেখিয়ে গটমট গটমট করে ক্যাম্পে ফেরার সময় কেবলি ভাবছি, এই বুঝি পেছন থেকে সাঁ ক'রে একটা বুলেট ছুটে এল। শেষ পর্যন্ত জবর বাঁচা বেঁচেছি ব'লে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলাম।

...গত তিন-চারদিন আবহাওয়া ছিল অসাধারণ ভালো। এ সফরে এত ভালো আবহাওয়া আগে কখনও পাইনি। হাওয়ায় একটা নেশা ধরানো ভাব। সারাদিন পাখির পেছনে ঘুরেও এতটুকু ক্লান্তি নেই। রাত ৯টা পর্যন্ত ফুটফুটে আলো। চনচনে রোদ, কিন্তু পরক্ষণেই একখণ্ড মেঘ এসে তাকে আড়াল করতেই সোয়েটারটা দিব্যি গা-সওয়া হয়ে ওঠে। আমাদের এ সফরের এটাই হল সন্ধিক্ষণ। কাল গিয়ামিনার দিকে ফিরে যাওয়া শুরু হবে। চারদিকে তাকিয়ে বোঝা যায়, তিব্বতে গ্রীষ্মের এই সবে সূত্রপাত।

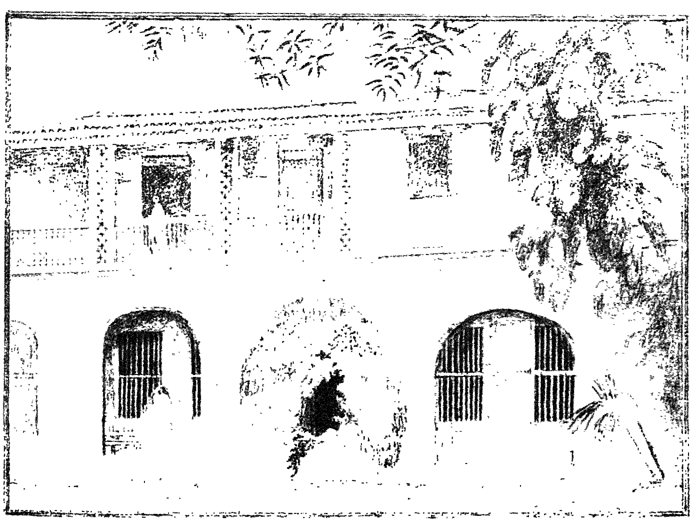
২৬.৬.৪৫। কিয়াংমা। কাল রাত্রে (দিং ৎসো) ছিল পূর্ণিমা আর চন্দ্রগ্রহণ। লাপ্‌ফা আর গেলং-এর সে কী মাতামাতি। দুজনেই যে যার সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশে এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে প্রার্থনা জানিয়েছে। তারই মধ্যে মাঝে মাঝে কেলেকিষ্টি রাহুটাকে ভয়াবহ চিৎকার ক'রে এই ব'লে শাসিয়েছে যে, চাঁদকে যেন রাহু এক্ষুনি ছেড়ে দেয়,

যেন কিছুতেই গিলে না খায়। তিন মাইল দূরে সরোবরের ওপারে পাহাড়ের ধারে যে গুম্ফা, সেখান থেকেও চাঁদের আসন্ন বিলুপ্তির ভয়ে বিচলিত লামাদের উচ্চনাদে তন্ত্রমন্ত্রের ফুৎকার আর বন্দুক থেকে গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ। সজোরে চেঁচাতে চেঁচাতে লাপ্‌ফা কালো শয়তানটাকে ছোড়া নেড়ে নেড়ে ভয় দেখাচ্ছিল। ঐ সাংঘাতিক শাসানির দরুনই চাঁদ যে ছাড়া পেয়ে যায়, তাতে সন্দেহ নেই। চাঁদ বেঁচে যাওয়াতে আমিও তোফা ঘুমোতে পেরে গেলাম।...কিয়াঙের একটি পালে গুনলাম ১১৯।...গিয়নিমায় কর্মস্থলে যাওয়ার পথে সেখানে প্রদেশপাল ধরনের পদে নিযুক্ত একজন জংপেন ঢুঁ দিয়ে গেলেন, সঙ্গে তাঁর গলগ্রহ এক পাল নচ্ছার লোক। 'প'-র স্লিপিং ব্যাগের ওপর থেবড়ে ব'সে আমাদের কোথায় কী আছে সব নেড়েচেড়ে দেখলেন—বায়ুচাপমানযন্ত্র, কম্পাস, ক্যামেরা, থার্মোমিটার, রুকস্যাক, অ্যালুমিনিয়ামের মগ, এবং অবশ্যই বাইনোকুলার—সমানে একজনের হাত থেকে নিয়ে আরেকজন নিজেদের ইচ্ছেমতো মজা করে দেখে নিচ্ছিল। জংপেনরা যে কেমন ভদ্রলোক হয়, আমি ঠিক মালুম করতে পারছিলাম না। যদি তহসিলদার গোত্রেরও হয়, তাহলেও এসব জিনিস কখনও তার না-জানা বা না-শোনার কথা নয়। কিন্তু এ-ভদ্রলোককে দেখে মনে হল, এসব উনি এই প্রথম দেখছেন। সবচেয়ে ওঁর চোখ বড়ো বড়ো হয়েছিল এটা দেখে যে, কম্পাসটা যতই এদিক-ওদিক করেন, তার কাঁটার মুখ সব সময়েই থেকে যাচ্ছিল কৈলাসের দিকে। পাজির পা ঝাড়াগুলো তাই দেখে এ ওর গায়ে হেসে গড়িয়ে পড়ছিল।...তুষারমণ্ডলের ফিঞ্চ দেখলাম দু-ধরনের লালটুটি আর তিব্বতি। ইঁদুরদের সঙ্গে ভাব করে নিয়ে ওরা একই গর্তে থাকে, মূষিক-শশকদের অংশীদার হয়ে। দেখলাম একটা ইঁদুর আর একটা ফিঞ্চ একই গর্তে ঢুকছে।...

কিয়াংদের বড়ো বড়ো দঙ্গল (একেক দলে ১০০টিরও বেশি)। যেসব জায়গায় তারা ঘোরাঘুরি করে, কখনও কখনও (সাধারণত) বালির ওপর হেঁচড়ে হেঁচড়ে যাওয়ার দাগ রেখে যায়। সাপ চলে গেলে যেমন দাগ পড়ে! গলায় কাষ্ঠখণ্ড বাঁধা গরু (যাতে না পালায়) তিড়িং বিড়িং ক'রে যেমন বালিতে পায়ের ছাপ রেখে যায়। এই দাগটা হয় ২ থেকে ২½ ইঞ্চি চওড়া আর লম্বায় অনেক সময় ৩০ ফুট (একটি তো ৯০ ফুটেরও বেশি)। সটান সিধে দাগ নয়, ঢেউখেলানো ধরনের একটু আঁকাবাঁকা। স্থানীয় লোকেরা বলে, গাধারা এক খুরে টেনে টেনে চলে, এ হল সেই দাগ। কিন্তু গাধারাই বা কেন এমন গর্দভ হবে! আমি ভেবে অবাক হই যে, এই দাগ আগে কি কেউ খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেনি? এর কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি?...বরখার সীমাহীন সমতল প্রান্তরের অনাবিল আবহাওয়ায় সবকিছুই মনে হয়, ঐ তো ঐখানে। কিন্তু কী দূরের রাস্তা। মাইলের পর মাইল, মাইলের পর মাইল কেবল হেঁটেই চলেছি। রাস্তা কিছুতেই আর ফুরোয় না। পায়ের সুতো ছেঁড়ার দশা হয়।...গুড় দিয়ে ছাতু মেখে নিলে চায়ের সঙ্গে একরকম বিস্কুটের মতো খেতে হবে। আমারই প্রস্তাব ছিল। ফল দাঁড়াল ঠাসা কংক্রিট ধরনের জলনিরোধক এমন এক বজ্রকঠিন বস্তু, টফির লাইনে যার কথা আজ পর্যন্ত কেউ শোনেনি। দোষটা একশো বার খেম সিংয়ের। মেশাতে গিয়ে অনুপাতে ভুল করেছে। এক টুকরো নিয়ে সুপুরির মতো আধ ঘণ্টা ধরে চেবানোর চেষ্টা করে শেষে হাল ছেড়ে



পাঁচের মধ্যে মাত্র দু'জন। 'আরো চারজনের আমার কথা', ১৯০২। সেলিম আলি বসে আছেন ঘোড়ায়, ডানদিকে। ছবি : শামসুদ্দিন লুকমানজী



আমির মঞ্জিল। মুম্বাইয়ের খেতওয়াড়িতে পারিবারিক গৃহ, ১৯১২। ডানদিকের উঁচুতে 'প্রসূতিগৃহের' জানালা। এখানেই আমাদের লম্বা মিছিলের, পাঁচ ভাই আর চার বোনের, জন্ম। ১৮৭৬ থেকে ১৮৯৬ সালের মধ্যে



ভাই হামিদ আর দিদি কামুর সঙ্গে,
আনুমানিক ১৯০৫



তহ্‌মিনা আর তার দাদা, লণ্ডনে
ছবি : ডব্লু হোয়াইট লিমিটেড



আমিবুদ্দিন তৈয়বজী (বাবা/কাকা), অগাস্ট, ১৯১০। ছবি : শামসুদ্দিন লুকমানজী



সেলিম আলি, আনুমানিক ১৯১০। হায়দ্রাবাদের হাশুভাটে



তহ্‌মিনা, জবির, কামু, সেলিম আলি, সাআদ, সফিয়া, তাভয়, ১৯২০



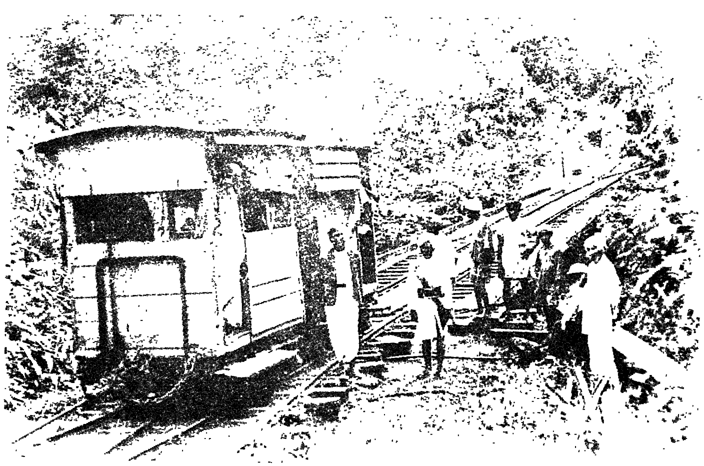
চিরতরুণ বি. রিবেনট্রপ, তাভয়,
১৯২২



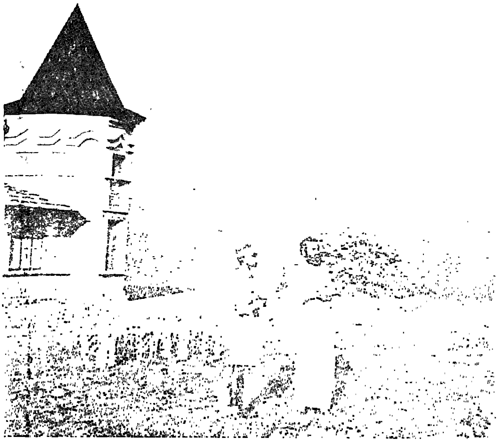
তহ্‌মিনা এবং 'জেন'। সঙ্গে একটি মৃত হরিণ। সোলাপুর, ১৯২৮



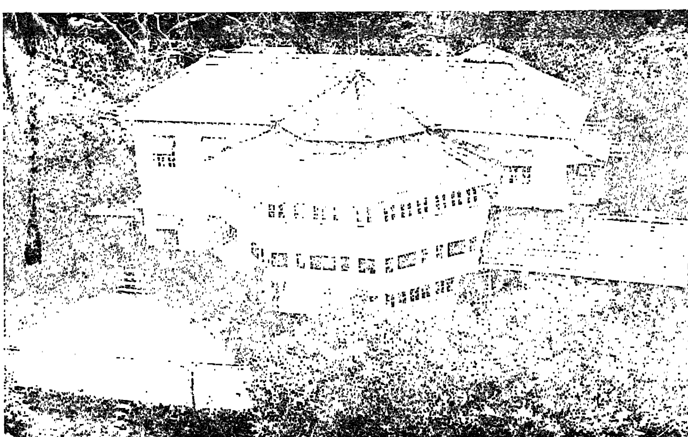
আমার গুরু—অধ্যাপক স্ট্রেসমান। হেলিগোল্যাণ্ড, অক্টোবর, ১৯২৯



কোচিন ফরেস্ট ট্রামওয়ের ভি.আই.পি. কোচ, ১৯৩৩



নারায়ণস্বামীর আশ্রমে।
সোসা, আলমোড়া, ১৯৪৫



৪৬ নং পালি হিলে হাসান আলির বাড়ি। চল্লিশ বছর এটাই ছিল আমার ভাগাভাগির বাসস্থান।
ছবি : শহীদ আলি



ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পদ্মভূষণ
খেতাব। প্রদান ৩ এপ্রিল, ১৯৭৬



পদ্মভূষণ পাবার পর
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে।
ছবি : অনন্ত এস. দেশাই

দিলাম। গুলতি দিয়ে ছোঁড়ার দিক থেকে একেবারে আদর্শ।...চমরীরা (শীতের সময় রাখে লম্বা লম্বা লোম আর গরমে সেটা ছোট হয়ে যায়) গোছা গোছা ক'রে আঁশ তোলার মতো ক'রে গায়ের লোম ঝরায় গোড়ায় ঘাড় আর পিঠ, সবশেষে আবহাওয়া গরম হয়ে উঠলে পেট আর পা থেকে। পেটের লোম ঝরে পড়ে না ব'লে কেটে ফেলতে হয়। চমরীওয়ালারা আঁশগুলো টেনে ছিঁড়ে তা থেকে তকলিতে ক'রে সুতো কাটে। চমরীদের ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে নিয়ে চলার সময়ও সমানে ওদের হাত চলে। পশমের এই সুতো দিয়ে তারা তাঁবু আর কম্বল বানায়। ময়লা হলে বোঝা যায় না ব'লে ওরা সাদার চেয়ে কালো রং বেশি পছন্দ করে। সাদার চেয়ে কালোর দাম দ্বিগুণ হয়। চমরী পিছু পশম উৎপাদন হয় ১ কেজির ওপর। পোষা বলদ আর চমরী গাই মিলে যে সেরা শংকর জাত তৈরি হয়, তাকে বলে 'ঝিব্বু'। বিশুদ্ধ জাতের চমরীর চেয়ে দোআঁশলা ঝিব্বু ডবল দামে বিকোয়। এখন এর দাম ৭০ থেকে ১৪০ টাকা। সাধারণভাবে সবাই ঝিব্বু পছন্দ করে; কারণ, এরা যেমন কষ্টসহিষ্ণু, তেমনি কথার বাধ্য এবং হারালে সহজে খুঁজে পাওয়া যায়। তাছাড়া এদের দিয়ে হালও বওয়ানো যায়। এত গুণ থাকা সত্ত্বেও ঝিব্বু করার ওরা পক্ষপাতী নয়। মনে করে, এটা অস্বাভাবিক আর অনৈতিক। আখেরে কপাল পোড়ে। তাহলে বেয়াড়া লোকেদেরই পোয়াবারো। চমরীর নানা হুজ্জত। যেমন সাঁকো পেরোতে, তেমনি গোয়াল বাথানে ঢুকতেও সমান নারাজ। বছরে মাত্র একটাই বাচ্চা দেবে। গর্ভধারণের মেয়াদ ৯ মাস : বাচ্চা পাড়ে বসন্তকালে। স্বাভাবিক আয়ু ১৮-২১ বছর। ৪ বছরের হলে কর্মক্ষম হয়।...প্রত্যেক গিরিপথের গোড়ায় ডাঁই করা থাকে পাথর। সেখানে এসেই চমরীওয়ালারা তিড়িং বিড়িং ক'রে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে গৎবাঁধা সুরে 'সো...সো...সো' ব'লে ডাক ছাড়তে থাকে। বোঝা যায়, 'সো' হল কোনো ঠাকুরদেবতা। ছোটখাটো গিরিপথে এসে কেন ঐ ধরনের ডাক ছাড়ে তা জিজ্ঞেস করায়, লাপ্‌ফা বলেছিল—ওসব খুচরো দেবতাদের ও পরোয়া করে না, ওদের সঙ্গে কমবেশি সমানে সমান হয়েই তর্কবিতর্ক বা ঝগড়া করা যায়। একমাত্র প্রধান প্রধান দেবতাদেরই ও মান্য করে আর সমীহ করে চলে। (স্বপ্নরাজ্যে বাস ওর, স্বপ্ন ওর সফল হয়?) এখানকার লোকজনেরা ধর্মকে যথাযথ মর্যাদা দেয়, না কি রসিকতা হিসেবে নেয়—এটা আমি বুঝে উঠতে পারিনি। কুসংস্কার, ডাকিনিবিদ্যা এবং তরবেতর প্রেতপিশাচ নিশ্চয় তাদের ভয়াচ্ছন্ন করে রাখে, কিন্তু তা বাদে?...গঞ্জের দোকানগুলোতে (তাকলাকোট, গিয়ামিনা, ধরচুলা ইস্তক সর্বত্র) অসাধারণ সব রকমারি সওদা কাপড়চোপড়, ফেলে-দেওয়া যাবতীয় ধরনের গরম পোশাক, ইলেকট্রিক টর্চ, নতুন আর পুরনো আর্মিবুট, হালকা সোলের ক্যানভাসের আর কাপড়ের জুতো, লাসা আর বেরিনাগের চা, চিনি (মিছরি), হারিকেন লণ্ঠন, সেফটি পিন এবং সম্ভব অসম্ভব ধরনের যাবতীয় জিনিস। বেচাকেনা ছাড়াও, দোকানগুলোতে বিনিময় প্রথাতেও লেনদেন হয়। পশম, সলোম চর্ম, সোহাগা—এসব দিয়েও জিনিস পাওয়া যায়। দু তিনটে তুষারবাসী সিয়াগোশের চামড়া দেখাল। কাঁচা-কাঁচা ভাব থাকলেও পুরোপুরি অক্ষত। বিনিময় করে পাওয়া গেল। ধরচুলার জমন সিং পেশোয়ারের এক মহাজনকে এসব জিনিস আনুমানিক ১৩০ টাকায় বিক্রি করে। □

১৩

লোক-ওয়ান-থো

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অস্থায়ী সামরিক বাহিনীর জন্যে বোম্বাই থেকে 'ভিক্‌ট্রি' নামে একটি পত্রিকা বার হত। ১৯৪২ সালে তাতে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। তার শিরোনাম ছিল, 'যে দাঁড়কাক তার মেজাজ হারিয়েছিল।' একজন তরুণ পক্ষি-অলোকচিত্রশিল্পী পেমব্রোকশায়ার উপকূলে খাড়া পাহাড়ে উঠে একটি বকের বাসার ফটো তোলার চেষ্টা করছিল। তার কাছেই ছিল একজোড়া দাঁড়কাকের বাসা। লেখার বিষয় ছিল এই নিয়ে। এই ফটোগ্রাফার পরে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করে। নিবন্ধকারের নাম ছিল ওয়ান থো লোক। দেরাদুনের দুন স্কুলের একজন শিক্ষক জে. টি. এম. গিবসন মিলিটারিতে স্বেচ্ছায় যোগ দিয়ে তখন রয়াল ইণ্ডিয়ান নেভি-র লেফটেনান্ট কমাণ্ডার সাময়িকভাবে বোম্বাইতে কর্মরত। কাগজে নামটা দেখে তিনি ভাবতে লাগলেন—এ কি সেই 'লোক' যে বালকবয়সে কয়েক বছর আগে তাঁর কাছে সুইজারল্যাণ্ডে ইংরিজি স্কুলে পড়েছে। কাগজে লিখে তিনি লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পারলেন তাঁর অনুমান সঠিক। কেম্ব্রিজ আর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো শেষ ক'রে তার প্রয়াত বাবার বিরাট ফলাও ব্যবসার ভার নিতে সিঙ্গাপুরে তার দেশে ফিরেছিল। লোক যখন নাবালক এবং লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত, সেই সময় তার বাবার অবর্তমানে তার বিচক্ষণ আর করিতকর্মা মা-ই বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে খুব সফলভাবে ঐ বিশাল কারবার চালিয়ে গেছেন। লোক যখন দেশে ফেরে, কুড়ির কোঠার মাঝামাঝি তার বয়স। জাপান যখন বন্যার তোড়ে মালয়কে গ্রাস ক'রে 'সিঙ্গাপুরকে বদ্‌লে 'শোনান' করে ফেলে, এটা তার কিছুকাল আগের ঘটনা। এমন হবে, সেটা বুঝতে পেরে তার আগেই লোক আর তার মা, তার ছোটবোন পেং বাধ্য হয়ে সিঙ্গাপুর ছেড়ে ভারতের বোম্বাইতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ওরা পালাচ্ছিল সম্ভবত কোনো ওলন্দাজ জাহাজে। পথে দুর্ভোগের অন্ত ছিল না। নেহাত কপালের জোর ছিল তাই বেঁচেছে। জাপানিরা বোমা মেরে ওদের জাহাজ ডুবিয়ে দেয়। বোমার আগুনে বিশ্রীভাবে পুড়ে যায় ও। অন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার একটা জাহাজ তাকে জল থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে জাকার্তার এক হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। সেখানে কয়েক

সপ্তাহ থেকে তার দুটো চোখেই আবার দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসে। গিবসনের সঙ্গে লোকের দেখা হলে তিনি জানতে চান প্রবাসে সে কিভাবে সময় কাটাবে, কী বিষয়ে তার বিশেষ আগ্রহ। জানতে পারলে ওকে উনি বুদ্ধিপরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে পারেন। ইংরিজি সাহিত্য আর লেখালিখি ছাড়াও, ওর পক্ষিনিরীক্ষণ আর পাখির ফটো তোলায় প্রবল সাধ। এটা শুনে তখনই গিবসন ওকে কথা দিলেন যে, ওঁর এক পক্ষিনিরীক্ষক—বন্ধু, অর্থাৎ, আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন। কয়েকদিন পর গিবসনের নৌসেনা কোয়ার্টারে নৈশভোজে দুই অতিথির দৈবগুণে এই সাক্ষাৎকার দুজনের পক্ষেই যে খুব কাজের হয়েছিল, কিছুদিন পর তা প্রমাণ হয়ে গেল। এমন এক অসাধারণ চরিত্রের মানুষের সঙ্গে ভাগ্যক্রমে আলাপ হল, যাকে ভালো না বেসে পারা যায় না। আমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের এটাই ছিল সূচনাপর্ব। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আর আগ্রহের নিবিড় একাত্মতায় দুজনের ভাবভালবাসা আর বোঝাপড়া ক্রমশ গভীর হয়েছে। ১৯৬৪ সালে এক শোচনীয় বিমান দুর্ঘটনায় লোক মারা না যাওয়া পর্যন্ত সে বন্ধন ছিন্ন হয়নি। আমার সঙ্গে দেখা হওয়াটা আর তার ফলে সোসাইটির সান্নিধ্যে আসা ওয়ান-থোর পক্ষেও আশীর্বাদস্বরূপ হয়েছিল। ভারতে ওর বাধ্যতামূলক অবকাশের দিনগুলোকে সে সার্থকভাবে আর সানন্দে কাজে লাগানোর উপায় খুঁজে পেয়েছিল। নইলে একঘেয়েমির ভেতর দিনের পর দিন থেকে তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠত। এই যোগাযোগের ফলে, নানা সুযোগে সে তার প্রতিভাকে খুব ভালোভাবে কাজে লাগাতে পেরেছিল। তারই গুণে সে হতে পেরেছিল অতি উঁচুদরের একজন পক্ষিতাত্ত্বিক এবং আন্তর্জাতিক গুণমানের একজন পক্ষিবিষয়ক আলোকচিত্রশিল্পী। যতদিন সে বেঁচে ছিল সোসাইটি আর আমি ওর কাছ থেকে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সমানে মুক্তহস্তের দাক্ষিণ্য লাভ করেছি। ওর মৃত্যুর পরও সেই ধারা সমানে বজায় রেখেছিলেন ওর করুণাময়ী মা আর ওর অন্তরঙ্গ প্রিয়দর্শিনী বোন (লেডি. ওয়াই. পি. ম্যাকনিস্)। আমাদের বাইশ বছরের বন্ধুত্বকালের মধ্যে সব পক্ষিতাত্ত্বিক অভিযানে, আন্তর্জাতিক পক্ষিতাত্ত্বিক সম্মেলনে অথবা ছুটিতে পাখির ছবি তুলতে যাওয়ায় ওয়ান-থো আমার সঙ্গী হয়েছে, অভিযান অর্থসাহায্য করেছে। পরের দিকে, ব্যক্তিগতভাবে যোগ দিতে না পারার আপসোস এইভাবে টাকা দিয়ে পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। ব্যবসার কাজের চাপে পক্ষিতাত্ত্বিক অভিযানে যখন নিজে যাওয়ার সময়ই পেত না, তখন এছাড়া সে করবেই বা কী।

পাখপাখালির বিষয়ে আর পাখির ফটো তোলার ব্যাপারে ওয়ান-থোর গভীর আগ্রহ লক্ষ্য ক'রে একদিন এমনি এমনিই ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কচ্ছে পাখির খোঁজ নেওয়ার এক অভিযানে ও আমার সঙ্গে যেতে পারে কিনা। কচ্ছে যাওয়ার জন্যে তখন আমি তোড়জোড় করছিলাম। শোনামাত্র সে সঙ্গে সঙ্গে রাজি। পরের চার মাস কচ্ছে থাকার সময় কতটা ওর কৃচ্ছ্রতাসাধন করে থাকার ক্ষমতা আছে, সেটা

পরখ করার অনেক সুযোগ পেয়েছি। আমাদের অভিযানের পেছনে অর্থবল খুবই কম। কাজেই যত কষ্টই হোক, হাসিমুখে মেনে নিতে হয়। যেখানে কতটুকু যা পাওয়া যায়, সেটা ভরসা করেই দিন গুজরান করতে হয়। ছারপোকা-ভর্তি ধর্মশালায় তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে একঘরে থাকা। তারা সারাক্ষণ উচ্চকণ্ঠে গলা ঝাড়বে। কিংবা বাস করতে হবে প'ড়ো গোয়ালঘরে। এইসব অভিযানে এবেলা ডালভাত আর ওবেলা ভাতডাল—রোজ খেয়ে যেতে হবে। আলো বলতে ধোঁয়াওঠা হারিকেন লণ্ঠন। এইরকম নানা অভাব অনটন। হিটলারের যুদ্ধ সে কষ্ট আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি অবশ্য তখনও ওর দেশ সিঙ্গপুরে ওদের সামাজিক অবস্থা বা জীবনযাত্রা কীরকম কী—কিছুই জানতাম না। ও যে ওভাবে থাকতে অভ্যস্ত নয়, সেটা বুঝেছিলাম। এটা ওর খুবই গুণ বলতে হবে যে, ঐ অবস্থাতেও সব সময় ও খোশমেজাজে থেকেছে, রসবোধও সমানে বজায় রেখেছে। কচ্ছের পরেও মাঠেঘাটে ঐ একই ভাবের জীবন দুতিন বছর বাদে বাদেই আমাদের কাটাতে হয়েছে। সে সময়ে শত অসুবিধে সত্ত্বেও একদিনের জন্যেও ওকে গজ গজ করতে বা খুঁত খুঁত করতে দেখিনি। জাপানিরা ওদের দেশছাড়া না করা পর্যন্ত ও যে রীতিমতো রাজার হালে থেকেছে, সেটা ঘুণাক্ষরেও কাউকে টের পেতে দেয়নি। ওকে দেখে মনে হত যেন আজন্ম এইসব অভাবের মধ্যেই ও মানুষ হয়েছে। ও না বললেও বুঝতাম একটা জিনিস ওকে খুব ভোগাচ্ছে। সেটা হল ওর লাগাতার আমাশা। রাতবিরেতে উঠে মাঠে ছুটে গিয়ে ঝোপের আড়াল খুঁজতে কারো ভালো লাগে?

কচ্ছে ওয়ান-থোর ছিল একটা বড়োরকমের পরীক্ষা। তাতে সে ড্যাং ড্যাং করে উৎরে গিয়েছিল। সহকর্মী হিসেবে ওর মধ্যে সত্যিকার আপনভাব আর কাজের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ঢেলে দেওয়ার ঝোঁক আমাকে মুগ্ধ করেছিল। যেকোনো অবস্থাতেই হোক, নিজেকে নিংড়ে দেওয়ার জন্যে তৈরি থাকত। ওর ছিল তীক্ষ্ণ রসবোধ, নিটোল শিষ্টাচার, নম্র ব্যবহার, অমায়িক স্বভাব, সর্বস্তরে মেশবার ক্ষমতা সেইসঙ্গে এমন এক নেতার অধীনে থেকেও বিচলিত না হওয়া, যাকে মোটেই কেউ নরম মেজাজের মানুষ বলবে না—একাধারে এতগুলো গুণ থাকায় ফিল্ড ক্যাম্পে ওয়ান-থো ছিল এক আদর্শ সঙ্গী। দৃষ্টিভঙ্গি আর আগ্রহ দুজনের প্রায় অভিন্ন ছিল ব'লে পরেকার বন্ধুদের চেয়েও ও আমার ঢের কাছের মানুষ হতে পেরেছিল। জাপানি যুদ্ধের সময়টা বাধ্য হয়ে ওকে ভারতে প্রবাসজীবন যাপন করতে হয়। ওর পক্ষে এটা শাপে বর হয়েছিল। দেশ জুড়ে আঞ্চলিক পক্ষিসমীক্ষার কাজের সুবাদে প্রকৃতিবিজ্ঞানের চর্চা আর বাইরে ঘোরার তীব্র বাসনা চরিতার্থ করার সুযোগ পেয়েছিল। পুরো সময়টাই পক্ষিবিজ্ঞান আর পাখিদের ফটো তোলার কাজে লাগাতে পেরেছিল। শেষের কাজটাতে ও তো ওস্তাদের কোঠায় উঠে গিয়েছিল।

ওয়ান-থো ছিল ইংরিজি সাহিত্যের মহা ভক্ত। গুণগ্রাহিতা আর সমালোচনা,

দুটোতেই ছিল কৃতবিদ্য। দিনের কাজের হিসেবনিকেশ চুকিয়ে রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর গোটাদুয়েক হারিকেনের টিমটিমে আলোয় আমরা বই নিয়ে বসতাম। ওর এই সাহিত্যানুরাগের জন্যে ক্যাম্পে ওর মনোরম সাহচর্যে বেশ চনমনে হয়ে উঠতাম। মাঝে মাঝেই ভালো লাগা অংশগুলো চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে শোনাতে শুরু করে দিত। কখনও মুখ টিপে টিপে হাসত, কখনও জিভটা ঠোঁটের ওপর বুলিয়ে নিত। ওর নিজের লেখাও হত খুব সাবলীল আর প্রাঞ্জল। তাতে থাকত রসালো ভাব। আমরা যখনই যেখানে পক্ষিসংগ্রহের অভিযানে গিয়েছি, রোজকার ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ নোট রেখেছে ওর ডায়রিতে। সেই ডায়রি প'ড়ে দীর্ঘবিস্মৃত কত ঘটনা পরে আমার মনে পড়ে গিয়েছে। কেননা, আমার নিজস্ব নোটে শুধু তো পাখি আর তার বসতির শুকনো ফিরিস্তি।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে যখনই আমাদের ক্যাম্প বদল করতে হয়েছে, হায়দ্রাবাদের মতো, আমাদের নিতে হয়েছে বেসরকারি যানবাহন। এমন সব মামুলি গাড়ি, মালিকেরা যাকে বাসের চেহারা দিয়েছে। বেশির ভাগ গাড়িই পুরনো ঝরঝরে, মাল বওয়ার ক্ষমতাও কম। যুদ্ধের সময় ব'লে পেট্রোল দুষ্প্রাপ্য, তায় পেট্রোলে রেশনের কড়াকড়ি। তাই এ ধরনের বেশির ভাগ লজ্ঝড়ে গাড়িই কাঠকয়লার গ্যাসে চালানোর উপযোগী করে নেওয়া হয়েছে। একটু গড়ানে জায়গা বেশি ঢালু হলে ইঞ্জিনের আর তখন নিজের শক্তিতে কুলোয় না। সক্ষম সব সওয়ারিকে তখন নেমে পড়ে গাড়ি ঠেলতে হয়। সে সময়ে ওয়ান-থো মহা উৎসাহে নেমে পড়ে সমানে গাড়ি ঠেলে নিয়ে গেছে। একদিন হল কী, সেদিন ছিল কাঠগরম আর ঠিকদুপুর। গাড়ি ঠেলতে খুবই বেগ পেতে হয়েছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে বাসে উঠে প'ড়ে কথাচ্ছলে ওয়ান-থো বলেছিল, 'দেখ সেলিম, এ ধরনের কাজে তোমাদের নিজস্ব একটা স্টেশন-ওয়াগন থাকা খুবই জরুরি।' ওর যুক্তিতে কোনো ফাঁক ছিল না। আমি সম্পূর্ণভাবে ওর সঙ্গে একমত হলাম। কিন্তু আর্থিক আর অন্যান্য দিক থেকে আমাদের সে সামর্থ্য ছিল না। কাজেই আমি আর ও নিয়ে মাথা ঘামাইনি। মাসকয়েক পরে সেদিনের সেই কথাটা মনে পড়ে গিয়ে কী যে আনন্দ হল বলার নয়।

জাপান পরাস্ত হল যুদ্ধে; 'শোনান' বদ্‌লে আবার সেই আগের 'সিঙ্গাপুর' হল। যে দেশছাড়া মানুষেরা চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়েছিল, ব্রিটিশ সরকার তাদের জড়ো করে দ্রুত সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। ওরা চাইছিল বিপর্যস্ত ব্যবসাবাণিজ্যকে নতুন করে সুস্থিত করতে। প্রথম যে ব্যবসায়ীর দলকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যে বেছে নেওয়া হল, তার মধ্যে ছিল ওয়ান-থো। ওর খুব ভয় ছিল, এতদিনে নিশ্চয় ওর ব্যবসার দফারফা হয়ে গেছে। ওকে আবার সেই কেঁচে গণ্ডুষ করতে হবে। তার বদলে ও তো দেখে অবাক যে, ওদের চীনে ম্যানেজারের বিচক্ষণতা আর বুদ্ধিমত্তায় জাপানি আমলে ওদের ব্যবসা আরও রমরমা হয়েছে। সিঙ্গাপুরে আবারও সে হয়েছে

ধনকুবেরদের একজন। ফিরে গিয়ে ওর প্রথম চিঠিতেই সানন্দে এসব জানানোর পর কথাপ্রসঙ্গে আমাকে সে মধ্যপ্রদেশের খাড়াপাহাড়ের দীর্ঘ পথে বাস ঠেলার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। সেইসঙ্গে 'দার্শনিকতা' করে সেই অবস্থায় আমার মাঠেঘাটে ঘোরার জন্যে আমাকে একটা স্টেশন ওয়াগনের কথা যে বলেছিল, তাও মনে করিয়ে দিয়েছে। চিঠিতে আরও লিখেছে 'আমি একটা চেক পাঠালাম তুমি একটা যুতসই স্টেশন ওয়াগন কিনে নেবে। এতে যদি না কুলোয় মনে রেখো যে, এটা যেখান থেকে এসেছে সেখানে আরও টাকা আছে।'

ওর রক্তে প্রবহমান ছিল ওর চৈনিক পূর্বপুরুষের ধারা। ওর চোখ ছিল সৌন্দর্যকে দেখার। সুন্দর পাহাড় আর সুন্দর দৃশ্য, সুন্দর ফুল আর পাখি, সুন্দর ছবি, সুন্দর সুন্দর চিনেমাটির বাসন, সুন্দর সব কিছু। তা থেকে সুন্দরী রমণীরাও বাদ নয়। ও ছিল তাদের বড়োরকমের সমজদার। যেখানে যাদেরই সান্নিধ্যে এসেছে, তাদের কথা ওর ডায়রিতে স্থান পেয়েছে। ওর প্রথমা স্ত্রী ক্রিস্টিনা দেখতে খুব সুন্দরী ছিল। দুঃখের বিষয়, সে ব্যাপারে নিজেই সে ভালোমতো অবহিত ছিল। ওর রূপ নিয়ে যত আদিখ্যেতা করা যেত, ততই ও খুশিতে ডগমগ হত। আমার ঐরকম স্তাবকতা আসত না ব'লে আমি কখনই গায়ে প'ড়ে ওর রূপের গুণকীর্তনে গলা মেলাতে পারিনি। ফলে, ক্রিস্টিনা আমাকে তেমন পছন্দ করত না। আমার সন্দেহ, ওয়ান-থো যে আমার প্রতি এতটা অনুরক্ত, কখনও কখনও আমাদের এই একাত্মতাও ওর সহ্য হত না। আমরা তিনজন যখন একসঙ্গে কোনো আন্তর্জাতিক পক্ষিবিজ্ঞানীদের সম্মেলনে যেতাম, ইউরোপ বা আর কোথাও ছুটিতে গাড়িতে ক'রে বেড়াতে কিংবা ফটো তুলতে যেতাম, অথবা ওয়ান-থোর আমন্ত্রণে প্রায়ই সিঙ্গাপুরে ওদের অতিথি হয়ে থাকতাম—বিশেষ ক'রে, সেই সময়গুলোতে এটা বেশি ঘটত। ভেবে পাই না কেন যে অনর্থক ক্রিস তার চটক আর সৌন্দর্যকেই অত বড়ো করে দেখত। ওর তো আরও অনেক গুণ ছিল যা বাহারচালির মতন ঠুনকো নয়। তার জোরেই তো একেশ্বরী হতে পারত। ও যে ইচ্ছে করলেই দল থেকে সকলের কিংবা গৃহকর্ত্রী হিসেবে অতিথি-অভ্যাগতদের মন জয় করতে পারত, তাও তো দেখেছি। কিন্তু জীবনের প্রধান প্রধান বিষয়গুলোতেই লক্ষ্য করেছি, ওদের দুজনের মনোভাব আর দৃষ্টিভঙ্গির ঘোর অমিল। ১৯৫০ সালে ওদের বিয়ের ঠিক পরে পরেই ছুটিতে আমরা মাস দুই একসঙ্গে কাশ্মীরে ছিলাম। তখনই দেখেছি—একজন চুপচাপ ধরনের পড়ুয়া মানুষ; অন্যজন ফুর্তিবাজ আর আড়ম্বরপ্রিয়। আমার ভয় হয়েছিল যে, ওদের এই জোড় হয়তো টিকবে না। বছর দশেক 'কখনও তুমুল ঝড়, কখনও অন্তর্ঘাতী নিস্তব্ধতা'। তারপরই কিস্সা খতম। খোরপোষ বাবদ ওয়ান-থোকে দিতে হল ৯৩,০০০ পাউণ্ড (নাকি সংখ্যাটা ৯৭)। সে যাই হোক, ওয়ান-থো হাঁপ ছেড়ে বাঁচার ভঙ্গিতে বলেছিল, 'জলের দরেই রেহাই পেলাম।'

ওয়ান-থোদের সঙ্গে ১৯৫১ সালের বসন্তে আর গ্রীষ্মে ফটো তোলা সফরের পর বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী আবাসে ফিল্ম সহযোগে বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ পাই। সেখানে বছর ৩৫ বয়সের এক সাংবাদিক তরুণীর সঙ্গে দেখা হয়। তহমিনার মৃত্যুর পর এমন গুরুতরভাবে মাধুর্য আর বুদ্ধিমত্তা দিয়ে আর কেউ আমাকে মাত করে দিতে পারেনি। কামু আর হাসান যখন জাপানে ছুটি কাটাতে যায়, তখন সপ্তাহান্তে বার দুই মেয়েটি ৪৬ পালি হিলে এসে থেকেছিল। আমাকে আবার সংসারে জড়াবার জন্যে কামু সমেত আমার সব বোন আর ভাইঝিবোনঝিরা নানা রকম প্যাঁচপয়জার করছিল। কাজেই কানাকানির সূত্রে সেই খববরটা পেয়ে কামু নেচে উঠেছিল। মহারাজার আমন্ত্রণে এক সপ্তাহের জন্যে আমি আর ওয়ান-থো পাখি দেখে বেড়াবার জন্যে ভরতপুরে যাই। 'এ-কে' (এই নামেই এখন থেকে মেয়েটির উল্লেখ করব) এই সফরে আমাদের সঙ্গী হয়। সেই সময় আমাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়। পরে দিল্লি আর বোম্বাইতে আমাদের দুজনের আরও কয়েকবার দেখা হয়। আজও তার কথা মনে পড়ে গেলে কেমন যেন হয়ে যাই। কিন্তু আমাদের পরস্পরের ভালো লাগাটা স্বল্পায়ু হয়ে খুব বেঁচে গিয়েছি। মেয়েটি বেঁচেছে আরও বেশি। কিন্তু বাজিয়ে দেখেছি ব'লেই একথা বলতে পারি যে, আখেরে এর ফল ভালো হত না। আর্থিক সম্বলহীন ঠিকে কাজ করা একজন পক্ষিবিজ্ঞানী আমি। না-খেয়ে-দেয়ে আজ এখানে কাল সেখানে করে বেড়াতে হয়। এমন পুরুষকে বেশিদিন ভালো লাগবার মতন মেয়ে ব'লে তাকে আমার মনে হয়নি। ১৯৫২-র পর সেই ছায়ামূর্তি চিরতরে অদৃশ্য হয়ে যায়। তার সম্পর্কে কোনো খবরও আর পাইনি। ওয়ান-থোর ডায়রিতে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লেখা হত। আমাদের একত্রে ভরতপুর ভ্রমণের অবিস্মরণীয় সপ্তাহটি তার অনুভূতিসমেত ওর 'প্রিয় ডায়রি'তে এইভাবে সে লিখে রেখেছে :

> অক্টোবর ১৯। শ্রীমতী এ. কে. আজ দিল্লি থেকে এলেন। শ্রীমতীর শ্যামলা রং, কৃশতনু এবং দীঘল মুখের ডৌল। জীবনে কিছু একটা করে যাবেন ভাব। রেশন বরাদ্দ রসবোধ। শাকাহারী, শিল্পী শিল্পী হাবভাব। বয়স আনুমানিক ৩৫। লম্বায় ৫'৩" ওজন নেই বললেই হয়। কমিউনিস্ট দরদী।...
>
> অক্টোবর ২২। মহারাজার অতিথিনিবাসে অনেক রাত অবধি ব'সে (সাড়ে ১১টা) ব'সে ভারতীয় গানবাজনা আর নাচ প্রসঙ্গে কথা হল। গোড়ায় যা ভেবেছিলাম, তা নয়। 'এ'-র সঙ্গে কথা ব'লে মজা পাওয়া যায় আর বেশ বুদ্ধিমতী।...সেলিমের জীবনে শেষবেলায় রোমান্সের পুনঃপ্রবেশ ঘটছে। আশা করি, ঘা খাবে না। আমার কিন্তু ওর জন্যে ভাবনা হচ্ছে।

ভাবনার কারণ নেই, দুদিন পরেই ঘাড় থেকে ভূত নেমে গেছে। যেমন এসেছিল, তেমনি চলে গেছে।

কচ্ছের পক্ষিসংগ্রহের অভিযান আর দখলমুক্ত সিঙ্গাপুরে ওর ফিরে যাওয়া—এই

মাঝের সময়টাতে কোনো বড়োরকমের বিধিবদ্ধ আঞ্চলিক সমীক্ষার কাজে দুজনে একসঙ্গে যাওয়ার আর সুযোগ হয়নি। তবে দু-দশদিনের জন্যে খুচখাচ প্রায়ই আমরা পাখিসংগ্রহে আর শিকারে দেশের যত্রতত্র চলে গিয়েছি। ১৯৪৫ সালে অনেক আশা নিয়ে আর আঁটঘাট বেঁধে আমরা দুজনে পশ্চিম তিব্বতে 'তীর্থযাত্রা'র পরিকল্পনা নিয়েছিলাম। কিন্তু ছোটখাটো একটা অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনে প্রস্তুতিপর্বের শেষ মুহূর্তে ওয়ান-থোর যাওয়ায় বাধা পড়ে। তার জন্যে আমাদের দুজনেরই খুব মন খারাপ হয়েছিল। মুক্ত সিঙ্গাপুরে পাকাপাকিভাবে ওর ফিরে যাওয়ার পর প্রধানত ভরতপুর, কাশ্মীর আর সিকিম—এইরকমের মাত্র কয়েকটা জায়গাতেই পাখিসংগ্রহ আর পাখির ফটো তোলার কাজে কিছুটা দীর্ঘ মেয়াদে একসঙ্গে থেকেছি। এসব জায়গায় থাকা খাওয়া ঘোরাঘুরি সব কিছুরই বিশেষ ব্যবস্থা থাকায় আগের চেয়ে ঢের বেশি আরামে থেকেছি। রোজকার জীবনের সঙ্গে খুব একটা পার্থক্য আছে ব'লে মনে হয়নি। যদিও বৈজ্ঞানিক গুরুত্বের দিক থেকে সে কাজের মূল্য ষোলআনা বজায় থেকেছে।

'বার্ড্‌স্ অব সিকিম' বইটি আমি লিখি দুতিন মাস মেয়াদের এইরকম দুটি অভিযানে যাওয়ার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। দুটিরই খরচ বহন করেছিল ওয়ান-থো। এর একটিতে ও স্বয়ং আমার সঙ্গী হয়। সেইসময়কার যেসব কথা আমি ভুলে গিয়েছি, সেসব অনেক কথা ওর রাখা তৎকালীন ডায়রিতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ আছে। ওর ডায়রি পড়লে সেইসব টুকরো টুকরো স্মৃতি মনে পড়ে যায়। সেটা ১৯৫৫ সালের কাছাকাছি একটা সময়। গণতন্ত্র আর সীমান্ত পথ সংস্থা সিকিমকে দখল ক'রে নিয়ে সেখানে এক অনিশ্চিত পরিণাম আধুনিকতা প্রবর্তন করার আগে। তখন গ্যাংটক পেরিয়ে জীপ যাওয়ার মতো কোনো রাস্তা ছিল না। রাজধানীর বাইরে খচ্চর কিংবা কুলির পিঠে মালপত্র বোঝাই ক'রে গয়ংগচ্ছভাবে সফর করাই ছিল রেওয়াজ।

কিউজিং-পেমিওঞ্জ যাত্রাপথ সম্পর্কে ওর ডায়রিতে লেখা হয়েছে—

> কোথাও পৌঁছে যাওয়ার চেয়ে কেবল চলতে থাকাই ঢের ভালো'—যে ব্যক্তি একথা লিখেছিলেন, হিমালয়ের ক্রোশভর রাস্তায় কদাচ তিনি হেঁটে দেখেননি। আমি বরং সর্বদাই 'পৌঁছুতে' পারলেই বাঁচি। (পথের ডাকবাংলোগুলো সম্বন্ধে বলা হয়েছে) : এই বিশ্রামাগারগুলোতে বাসনকোসন, ছুরি-কাঁটা, বিছানা, গদি এবং যাবতীয় দরকারের জিনিস পাওয়া যায়। ফলে, এসব জায়গায় থেকে আরাম আছে। রেস্টহাউসের (টোম) বারান্দায় আমি বসে আছি। গাছে গাছে পূর্ণপ্রস্ফুটিত গোলাপ। দূরে নীল নীল কুয়াশাঢাকা পাহাড়। এইসব দেখতে দেখতে নোট লিখছি। চুটিয়ে স্নান করেছি। তারপর পাজামা গলিয়ে নিয়েছি। যদিও মাত্র পৌনে ৬টা বাজে। গা এলিয়ে উপভোগ করছি ক্লান্তির অবসাদ। মনে তৃপ্তির ভাব। বাইরে চেয়ে রয়েছি। নিজেকে যৎপরোনাস্তি সুখী মনে হচ্ছে। এক দঙ্গল সাদা ঝুঁটি হাসকুটে দামা পাখি সহর্ষে ক্যাঁ ক্যাঁ করতে করতে ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল। একটু পরেই রাতের খাবার দেবে। সাড়ে ৮টা নাগাদ

আমরা যে যার বিছানায় চলে যাব। এ এক খাসা জীবন। সিঙ্গাপুরে যেভাবে দিন কাটে, তার একেবারে বিপরীত। কতদিন হয়ে গেল খবরের কাগজ চোখেই দেখিনি।...সকাল ৫টার পর আমরা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ি। ১১টায় দুপুরের খাওয়া। ৬টা সাড়ে ৬টায় রাতের খাওয়া শেষ ক'রে ৯টার মধ্যেই বিছানায় শুয়ে পড়া। (শিংটামের পথে) পথে ভারি সুন্দর দেখতে একদল মেয়েকেও দেখলাম। ওরা হাটে যাচ্ছিল। ওদের কাছ থেকে ফটো তোলার অনুমতি চেয়ে নিলাম।

আমরা থাকার সময়ই গ্যাংটক রেসিডেন্সিতে আতিথ্য নিয়েছিলেন একজন কেন্দ্রীয় পূর্ত দপ্তরের সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার। কলকাতা থেকে সিকিম আর আসাম—এই গোটা এলাকার ভার তাঁর ওপর। ওয়ান-থোর মর্মবেদী ডায়রি এমন একটা অমূল্য বিষয়কে হাতছাড়া করবে তা তো হয় না। অতএব—

এক বিটকেল লোক বটে। টেবিলের আদবকায়দা বলতে আমরা যা বুঝি, লোকটা তার ধারকাছ দিয়েও যায় না। ছুরি মুখে তুলে নেবে, হাপুস হুপুস শব্দ ক'রে স্যুপ খাবে, টেবিলে রাখা ন্যাপকিনেই নাক ঝাড়বে। কথা বলে অদ্ভুতভাবে। তাতে খুব একটা রুচির পরিচয় মেলে না। সিকিমের যা জলহাওয়া, তাতে নাকি কংক্রিট আদৌ উপযোগী নয়। 'রাস্তায় ফাটল ধরে, নীচে বসে যায়। পাথরের মতো আকাট শক্ত হয়। কংক্রিট করার কী মনে হয়? খরচেরও বাপান্ত।' বলছিলেন ইংরিজিতে। সেও আবার তেমনি ইংরিজি। 'ক্র্যাক্'কে বলেন 'ক্র্যাগ', 'সিঙ্ক'কে বলেন 'সিং'। একেবারেই অশিক্ষিত ইংরিজি। আসামের তেল তোলার প্রসঙ্গে বললেন 'এতে আমাদের খরচাও বেশি পড়ে। শুকনো মাটি তো। বুঝলেন তো কী বলতে চাইছি?'...অন্যদিকে, ছোগিয়াল সরকারের মুখ্য সচিব রায় বাহাদুর দেনসাপলা ঘটে রীতিমতো বুদ্ধি রাখেন। হাসির মধ্যেও একটু দুষ্টুমি বেঁধানো থাকে। যখন তিনি শুনলেন যে, উত্তর সিকিমের ইনার লাইনের ওপাশে যাওয়ার সময় আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে একজন তহশিলদার থাকবে 'আমার ওপর নজরদারির জন্যে' (সেলিমের ভাষায় 'পাখির নজরদারের ওপর নজর রাখতে একজন নজরদার')—একথা শুনে রায়বাহাদুর বললেন, আপনি ওকে দিয়ে আপনার কাজ করিয়ে নিন। ও হল জেলার কর্তা। ও একবার চোখ টিপলেই ফুসমন্তরে সব কাজ হয়ে যাবে। কেউটে সাপের বিষ বার ক'রে নিয়ে তাই দিয়ে যেমন ওষুধ বানানো হয়, ওর বেলাতেও আপনি তাই করুন। ও অবশ্য কেউটে সাপের চেয়ে ঢের ভালো লোক।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, তহশিলদার সঙ্গে থাকায় আমাদের পক্ষে কার্যত শাপে বর হয়েছিল। আমাদের থাকা খাওয়া ঘোরার এবং কীভাবে এগোব—এ সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যার বেশির ভাগের সমাধানের ভার সে নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছিল।

আনুমানিক ৪,০০০ মিটার উচ্চতায় থঙ্গুর কাছে ইয়াক থাঙে কঙ্কনহারিকা পাখির বাসার ফটো তোলার প্রসঙ্গে ডায়রিতে (১৮ই এপ্রিল ১৯৫৫) লেখা হয়েছে 'গা ঢাকা দেবার ব্যবস্থাটা রাতভর ও জায়গায় ফেলে রাখার ফলে, পাখিটা ছিল অসম্ভব শান্তশিষ্ট। ঢাকার ভেতরে ব'সে সেলিম যথেচ্ছ আওয়াজ করা সত্ত্বেও পাখিটা আদৌ ভয় পায়নি।

ব'সে ব'সে ডিমে তা দিচ্ছিল। তা দেওয়া ওর আর শেষ হয় না। অপেক্ষা করতে করতে শেষে ক্লান্ত হয়ে শুধু আড়ালটুকু বজায় রেখে আর যত রকমে পারে শব্দ ক'রে পাখিটাকে ঠাইনাড়া করার পরিত্রাহি চেষ্টা করছিল। এমনকী গলা ছেড়ে 'গড সেভ দি কিং' পর্যন্ত গেয়েছে। তাতেও কাজ হয়নি।' অবশ্যই আমি আশা করেছিলাম যে কমসেকম ঐ গান শুনে কঙ্কনহারিকা তড়াক ক'রে দাঁড়িয়ে উঠবে!

থঙ্গু অঞ্চল সম্বন্ধে ডায়রিতে আছে 'যেদিকে তাকাও, চোখে পড়বে কেবল প্রার্থনার ধ্বজা। পতাকার গায়ে কাঠের ব্লকে ছাপা প্রার্থনার বয়ান। এইসব কাঠের ব্লক মঠগুলোতে পাওয়া যায়। আমরা যারা বিজ্ঞানে আস্থা রাখি, এসব কি আমরা বিশ্বাস করি? না, টলস্টয়ের ভাষায় বলি, 'বিজ্ঞান, যা নির্বিকল্প সত্যের কল্পিত রূপ', অথবা গা বাঁচিয়ে সেই বিজ্ঞানীর গলায় গলা মেলাই, যে বলে—'হে প্রভু, যদি তুমি থাকো তো আমার আত্মাকে রক্ষা ক'রো, যদি আত্মা থাকে।'

'বার্ড্‌স্ অব সিকিমে'র কথা ওঠায় ছোগিয়ালের রাজ্যে পক্ষিসমীক্ষায় গিয়ে ১৯৫৫ সাল নাগাদ আমি একবার কীরকম ফাঁপরে পড়েছিলাম, সেটা মনে পড়ে গেল। তখন আমরা লাচেনে ক্যাম্প করে আছি। সেবার বড়োরকমের ভূমিকম্পের ফলে চারপাশের পাহাড়ে ব্যাপকভাবে ধস নামে। লাচেন আর চুমথাঙের মধ্যে খাড়াইতে সমোচ্চ রেখা বরাবর ছিল খচ্চরদের চলাচলের রাস্তা। ভূমিকম্পের ফলে সেই রাস্তার একটা বড়ো অংশ প্রায় খাড়া কয়েক শো ফুট নীচে প্রবল বেগে ধাবমান নদীতে গিয়ে পড়ে। নিশ্চিহ্ন সেই আগের রাস্তার খানিকটা নীচে নড়বড়ে ধ্বংসস্তূপের ওপর দিয়ে কুলি আর ভারবাহী জানোয়াররা এক ভয়ঙ্কর সরু পথ করে নিয়েছিল। সেটা যে কী বিভীষিকাময় পথ—দিনকয়েক পর সে পথে চলতে গিয়ে তবেই আমি হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। রোজকার মতো সেদিনও আমি কুলিদের ঢের আগে আগেই রুকস্যাক আর বাইনোকুলার ঘাড়ে ক'রে একা বেরিয়ে পড়েছিলাম। ইচ্ছে ছিল নিরিবিলিতে কোথায় কী পাখি আছে দেখব। সেই ভয়াবহ তাকের ওপর দিয়ে পা টিপে টিপে কষ্টেসৃষ্টে যে জায়গাটার কাছে এসে পৌঁছোলাম, যেখানে পাহাড়ের গা থেকে খসে খসে পড়া কুচো কুচো পাথর জমে সরু রাস্তাটাকে আট্‌কে দিয়েছে। তাতে নুড়িপাথরের এমন একটা ডাঁই তৈরি হয়েছে যার স্খলন বন্ধ না হওয়ায় যেকোনো মুহূর্তে বিপদ ঘটাতে পারে। মাত্র মিটার দুয়েক চওড়া হলেও তাতে পা না ফেলে জায়গাটা পার হওয়া যাবে না। যদি ওখানে পা রাখি, তো হুড়মুড় ক'রে সটান নীচে নদীতে পড়ে যাওয়ার সমূহ ভয়। দেখে আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার দশা। কেমন যেন গায়ের ভেতর পাক দিয়ে উঠছে। ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা। না পারি এগোতে, না পিছোতে। অগত্যা ধপ ক'রে বসে পড়লাম। যতক্ষণে কুলির দল না আসে আমাকে এইভাবে ব'সেই থাকতে হবে। তা সে যতক্ষণই লাগুক। আধ ঘণ্টাখানেক এইভাবে অপেক্ষা করতে গিয়ে যখন দেখছি গুঁড়ো গুঁড়ো ধুলোমাটি উপলস্তূপ বেয়ে পাহাড়ের ধারে গিয়ে খাদের সর্বনেশে

গহ্বরে ঝুর ঝুর ক'রে তলিয়ে যাচ্ছে, তখন মনে হচ্ছে কেউ যেন আমাকে সম্মোহিত করে রেখেছে। ইচ্ছেশক্তি হারিয়ে ফেলে নিজের ওপর আর নিজের কোনো ভরসা নেই। এমন সময় ভারী মালপত্র ঘাড়ে করা প্রথম কুলিটিকে দেখে আমার যেন ধড়ে প্রাণ এল। ছায়াহীন একটা অজায়গায় আমাকে বসে থাকতে দেখে কুলিটাও একটু অবাক হয়েছিল। আমি নিঃশব্দে কুচোপাথরের স্তূপটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখালাম। দেখে তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটা সে বুঝে ফেলল। যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে লোকটা এক হাতে আমাকে তুলে নিয়ে পাথরের স্তূপে আলটপকা পা ফেলে সট ক'রে আমাকে টেনে পার করে দিল। দিয়ে ও আর দাঁড়াল না। তারপর এমন সহজভাবে চলতে থাকল, যেন এটা কিছুই নয়। ওদের নিত্যকার কাজেরই অঙ্গ। ওর পেছনে যে কুলির দল আসছিল তাদের চলা দেখে বোঝাই গেল না যে, ও রাস্তায় কোনো গণ্ডগোল আছে। তাদের পা ফেলে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার ভঙ্গি দেখে মনে হল ও জায়গায় পাথরের স্তূপটারই কোনো অস্তিত্ব নেই। পেছনের দিকে আজ তাকিয়ে মনে হয়, এ অভিজ্ঞতাটা এমন নয় যা নিয়ে আমি বড়াই করতে পারি। বরং আমার অহংবোধের ফানুসটি এতে ফুটো হয়ে চুপসে গিয়েছে।

আর মাত্র একটিবার ঘটেছিল এমনতর ঘটনা। সেবারও একইভাবে হাতপা অবশ হয়ে গিয়ে আমি সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়েছিলাম। না পারছিলাম এগোতে, না পারছিলাম পিছিয়ে যেতে। আমাকে আগে থেকে বারণ করা সত্ত্বেও আমি শুনিনি। অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই হুট ক'রে আমি নিজেকে ফাঁসিয়ে ফেলেছিলাম। ঘটনাটা ঘটেছিল এইরকম ১৯৪৮ থেকে ডেভিড লাক আর তাঁর ডাকাবুকো স্ত্রী এলিজাবেথ তালচোঁচ পাখির ওপর কাজ ক'রে যাচ্ছিলেন। এই বিষয়ে ল্যাকের লেখা চিরায়ত শ্রেণীর একটি অনবদ্য বই 'সুইফ্‌ট্‌স্ ইন এ টাওয়ার' ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স মিউজিয়ামের ১০০ ফুট মতন উঁচু একটা টাওয়ার ছিল। তার ঘুলঘুলিতে বাসা বেঁধেছিল তালচোঁচ পাখি। আমার মাথায় খেয়াল চাপল সেই টাওয়ার বেয়ে উঠে আমি সেই বাসা দেখব। খানিকটা বাহাদুরি দেখাবার ভাবও ছিল তাতে। বাড়ির ওপরতলা থেকে টাওয়ারের যেখানে যোগসূত্র, সেটা টাওয়ারের ভিৎ থেকে প্রায় ৬০ ফুট উঁচুতে। সেখান থেকে একটা ঘোরানো খাড়া সরু সিঁড়ি বেয়ে টাওয়ারের মেঝেয় পৌঁছুতে হয়। সিঁড়ির একটা অংশে আলো নেই। এরপর প্রথম পাটাতন হয়ে লম্বালম্বি খাড়া উঠে গেছে রেলিংহীন এক মারাত্মক মই। এরপর আরও ৩০ ফুট উঠে তবেই সেই দ্বিতীয় পাটাতনে পৌঁছুনো যাবে, যেখান থেকে সহজেই কাঁচলাগানো সেই বাক্সের নাগাল মিলবে যার ভেতরে আছে তালচোঁচের বাসা। এ জায়গার মইটা কিছুটা কম ভয়ঙ্কর হলেও, বিলক্ষণ ভয় পাওয়ার মতোই। টাওয়ারের মটকায় উঠে ঐ রেলিংবিহীন সাংঘাতিক মইয়ের মাথা থেকে নীচের দিকে তাকাতেই কেন আমি হাল ছেড়ে দেবার কথা ভেবেছিলাম, সেটা বোঝাতেই আমাকে

এত সাত কাহন ক'রে বলতে হল। হাল আমি ছেড়েই দিতাম, কিন্তু নীচে দাঁড়িয়ে উক্টর ল্যাক যে কী হয় কী হয় ভাব নিয়ে ঊর্ধ্বনয়নে তাকিয়ে ছিলেন। উনি গোড়াতেই যখন নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, তখন বোকার মতো ওঁর কথা শুনিনি। সেক্ষেত্রে এখন যে করেই হোক দাঁতে দাঁত চেপে ওপরে আমাকে উঠতেই হবে। তাতে আমার যে পরিণামই হোক না কেন। বলছি বটে, কিন্তু একটা পর্যায়ে ভয়ে আমার এমন নাড়ি ছেড়ে গিয়েছিল যে, হাতপা অবশ হয়ে মনে হয়েছিল এবার আমি অজ্ঞান হয়ে ধপ্ ক'রে পড়েই যাব।

□

১৪

ধানঠুটির পাটন

দেশীয় রাজা-রাজাড়াদের মধ্যে যে ক'জনকে কিছুটা ঘনিষ্ঠভাবে আমার জানার সুযোগ হয়েছে—প্রধানত, প্রকৃতিবিজ্ঞানী হিসেবে—তাঁদের একজন হলেন কচ্ছের মহারাও বিজয়রাজজী। উনি যখন গদিতে বসেন, তখন ওঁর বয়স ষাটের ওপর। ওঁর বাবা মহারাও খেঙ্গরজী স্বাস্থ্যবান বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। দুই প্রজন্মের অনুগত প্রজাদের কাছে তিনি ছিলেন কচ্ছের প্রাচীন অক্ষয়বটস্বরূপ। যুবরাজ হয়ে চল্লিশ বছরেরও বেশি বিজয়রাজজীকে ধৈর্য ধ'রে অপেক্ষা করতে হয়েছে। তার যৌবরাজ্য কিছুতেই যেন শেষ আর হয় না। পিতাপুত্র দুজনেরই ছিল খুব শিকারের ঝোঁক। গাছপালা পশুপাখি সম্বন্ধেও ভালোমতো জ্ঞান ছিল। প্রথমোক্তের শখ ছিল বড়ো বড়ো জানোয়ার শিকারের। শেষোক্ত জন বিশেষ ভাবে ছিলেন পাখিতে উৎসাহী। শিকার ছাড়াও এমনিই সাধারণভাবে বন্দুক আর রাইফেল ছোঁড়ায় তিনি ছিলেন ওস্তাদ। টেনিস খেলাতেও বয়সকালে তার নামডাক ছিল। সে সময়ে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় প্রায়ই তিনি যোগ দিতেন এবং জিততেনও। তার কারণ, তৎকালীন বহু নামী খেলোয়াড় ডবল্‌স্‌-এ তাঁর জুটি হতে পারলে বর্তে যেতেন।

আমার সঙ্গে বিজয়রাজজীর প্রথম আলাপ হয় ১৯৪২ সালে। বহু অপেক্ষার পর সবে তখন তিনি গদিতে বসেছেন। ততদিনে যৌবন চলে গিয়ে শরীরে আগের সে শক্তিসামর্থ্য নেই। একটা হাঁটু জখম হওয়ায় বাধ্য হয়ে খেলাধুলো ছাড়তে হয়েছে। ফলে, মেদ জমে চেহারাটাও একটু বেঢপ হয়েছে। শারীরিক পরিশ্রম আর ছুটোছুটি করা আর পোষায় না ব'লে বাঘভালুক শিকার ছাড়তে হয়েছে। সে জায়গায় তিনি ছোট প্রাণী শিকারে তখনও সমান দড়। পাখি দেখে বেড়ানোর সাবেক টান বজায় আছে। অবশ্য নিজের রাজ্যের মধ্যে। আমার 'বুক অব ইণ্ডিয়ান বার্ড্‌স্‌' বইটা ওঁর খুব পছন্দ হয়েছিল। ওঁর খুব ইচ্ছে কচ্ছের পাখি নিয়েও ওঁর জন্যে ঐরকম একটা সচিত্র বই লিখে আমি বার করি। ফলে, ওঁর আমন্ত্রণে আর উদার আনুকূল্যে ওঁদের মনোমুগ্ধকর রাজ্যে পাখির ওপর ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজ হাতে নিই। সেটা ১৯৪৩ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখনও পুরোদমে চলেছে। ভারতে পেট্রোলের বরাদ্দ সাঙ্ঘাতিক কম হওয়ায়

বেসরকারি যানবাহন চলছে না বললেই হয়। গদিনশিন দেশীয় রাজাদের মন রাখার জন্যে তাদের পেট্রোলের কোটা আরও কিছুটা বাড়ানো হয়েছিল। কচ্ছের ভাগেও তা জুটে যাওয়ায় আমরা অবাধে পক্ষিসমীক্ষার কাজ করে বেড়াতে পেরেছি, এমনকী দূরদূরান্তরেও চলে যেতে পেরেছি। অন্যভাবে যা সম্ভব হত না।

ক্যাম্পে যাতায়াতের ফাঁকে শরীরটাকে ঝরঝরে করে নিতে দিন দুয়েকের জন্যে সাধারণত ভুজে গিয়ে থাকতাম। আমি গেলেই মহারাও আমাকে ডেকে পাঠাতেন। তারপর সন্ধ্যের দিকে 'হাওয়া খাওয়ার জন্যে' শহরের আশপাশে কোথাও সুন্দর নৈসর্গিক পরিবেশে গাড়িতে ক'রে নিয়ে যেতেন। সাধারণত সঙ্গে একজন সশস্ত্র তল্পিবাহক নিয়ে একাই যেতেন। মহামান্য যাতে মনের আনন্দে সময় কাটাতে পারেন, তার জন্যে লোকটার ঝোলায় থাকত কয়েকটা থার্মোফ্লাস্ক, পেগভর্তি একটি বোতল, পেস্তাবাদাম আর মহারাওয়ের পছন্দের টুকিটাকি আরও এটা-সেটা। সেখানে আয়েস করে ব'সে উনি আমার জরিপের কাজ কতটা কী এগোল, সে বিষয়ে শুনতেন এবং আলোচনা করতেন। সে সময়ে একটা জিনিস আমার কাছে খুব বিসদৃশ মনে হয়েছে। এমনিতে যে মানুষটি এত শিষ্ট আর ভদ্র—বেড়াতে বেরিয়ে সেই মানুষটি নিজে জরদগবের মতো কচর মচর ক'রে একা খেয়ে গিয়েছেন। ওঁর জীহুজুর লোকটি হাতের কাছে থেকে একটা শেষ হলেই আরেকটা যুগিয়ে যাচ্ছে। অথচ আমাকে তিনি একটি বারও কিছু নিতে বলছেন না। যতবার গিয়েছি ওঁর সঙ্গে, একবারও বলেননি। একবারও যে ওঁর দেবার কথা মনে হয়নি, এটা আমার কাছে অদ্ভুত আর অভাবনীয় ব'লে মনে হয়। অথচ আগাগোড়া এটাই ঘটেছে।

আমার ডায়রি ওল্টাতে ওল্টাতে পুরনো একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। এ থেকে বোঝা যাবে যে, কালাতিক্রমদুষ্ট হয়ে সামন্ততন্ত্র তখনও কীরকম অশালীনভাবে তখনও কচ্ছে বিরাজ করছিল। একবার কোনো একটা আলোচনার জন্যে মহারাও তাঁর প্রাসাদে আমাকে যাওয়ার অনুরোধ জানান। পরে যখন আমি আবিস্কার করি যে, কোনো দেশীয় লোক মোটরগাড়িতে বা ঘোড়ারগাড়িতে করে গেলে তাকে প্রাসাদের প্রধান ফটকে এসে নামতেই হবে এবং বাকি পঞ্চাশ গজ মতো পথ তাকে পায়ে হেঁটে প্রাসাদের প্রবেশদ্বারে যেতে হবে। এটা একটু দেরিতে আমার হুঁশ হয়। এই ফতোয়া একমাত্র ভারতীয়দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—স্থানীয় বা বহিরাগত, সরকারি বা বেসরকারি—যে গোত্রেরই তিনি হোন। এই ফতোয়া এমনই ব্যাপক যে, সে রাজ্যের ভারতীয় দেওয়ান (মহামাত্য) মহামান্য বাহাদুরের কাছে সরকারি কাজে এলেও, এ থেকে রেহাই নেই। তাঁকেও এইভাবে 'দণ্ডি খেটে' যেতে হবে। অথচ কোনো ইউরোপীয় বা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যদি হয়, তা সে যত হেঁজিপেঁজিই হোক, গাড়ি নিয়ে সে সোজা অবাধে ভেতরে চলে যেতে পারবে। শুধু তাই নয়, গেটের শান্ত্রীরা তাকে সেলাম ক'রে স্বাগত জানাবে। আমি থাকাকালে একজন বয়স্ক সিভিলিয়ান ছিলেন সে

রাজ্যের গণ্যমান্য দেওয়ান। তাঁকে এই অসম্মানজনক প্রথা মেনে চলতে হত। অথচ একজন অধস্তন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান শুল্ক পরীক্ষক গাড়ি নিয়ে সোজা ভেতরে ঢুকে যেত। আমাকে যখন গেটে গাড়ি থেকে নামতে বলা হয়, আমি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে একশা করি। পরে খোদ মহারাওকে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাই। আমার মনে হয়, তাতে হয়তো কিছুটা কাজ হয়েছিল। কিন্তু এরপর আর কোনোদিনই রাজবাড়িতে দ্বিতীয়বার পা দেবার আমার সুযোগ হয়নি।

মহারাও, মহারাজা, নবাব—বর্তমানে বিলুপ্ত এই জীবদের নিজেদের মধ্যে এবং পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে একটা জিনিস দেখে আমি খুব মজা পেয়েছি। পাখি জরিপের সূত্রে নানা দেশীয় রাজ্যে আমি ঘুরেছি। তখন দেখেছি এইসব রাজারাজড়ার দল, একে অন্যের পুরনো দোস্ত বা সমবয়সী হলেও নিজেদের মধ্যে গালগপ্প করার সময়েও পরস্পরকে মহামান্য বাহাদুর ব'লে সম্বোধন করেছে। যারা স্বশ্রেণীর 'ছোট জাতে'র রাজার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে অনর্থক একটা তথ্য গুঁজে দিয়ে জানাত 'ও হল, বুঝলে কিনা, ১৩ তোপ, আর আমি হচ্ছি ১৭।' এরপর আর যা বলার বলত।

কচ্ছ হল বরাবরের খরাপ্রবণ এলাকা। পর পর কয়েক মরশুম বৃষ্টি না হলে ধানঠুটি পাখিদের বাচ্চা দেওয়া বন্ধ হয়ে যেত। ওদের ডিম পাড়ার জায়গায় প্রায় হাঁটু ডোবার মতন অনধিক ছ' থেকে আট ইঞ্চি জল না হলে ওদের মাটির ঢিবি গড়ার কাজ শুরু হয় না। বর্ষা যেবার না হয়, কিংবা বৃষ্টি কম হয়, নীড়ক্ষেত্রে অতটা জল দাঁড়ায় না। এমন হলে, সেপ্টেম্বর অক্টোবরেই মাঠ থেকে জল শুকিয়ে যায়। অথচ ওটাই হল তাদের ডিম পাড়া শুরু হওয়ার স্বাভাবিক সময়। যদি অতিবর্ষণ হয়, তাহলে মাঠের অতিরিক্ত জল মরে গিয়ে ব্যবহারোপযোগী হতে বিস্তর সময় নেয়। সেপ্টেম্বর অক্টোবর থেকে পিছোতে পিছোতে হয়তো মার্চ/এপ্রিল হয়ে যাবে। কিংবা সেবার একেবারেই পাখিরা ডিম দেবে না। এশিয়া আর ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকার মতন কচ্ছে ধানঠুটিদের বাচ্চা দেবার বাঁধা সময় নেই। ওদের পালাপরবের তাই সময়ের হেরফের হয়। ওদের 'পাটন' বছরের বাকি সময়টা খাঁ খাঁ করে। কেননা বাচ্চা হওয়ার পর ছানাপোনাদের নিয়ে ঝাঁক বেঁধে তারা এখানে সেখানে উড়ান দেয়। ছোটবড়ো যেসব জায়গায় খাবার মিলবে। ওরা চলে যায় সমুদ্রের উপকূলবর্তী লেগুনে আর জল শুকিয়ে নুন করার জায়গায়—যেমন পয়েণ্ট কালমিরে। আর সৌরাষ্ট্রে শ্রীলঙ্কায়। যখন ডিম পাড়ার মরশুম নয়, তখন তারা রাজস্থানের সম্ভরে বা উড়িষ্যার চিল্কার নোনতা জলের হ্রদগুলোতেও চলে যায়।

কচ্ছের ধানঠুটি পাখিদের সম্বন্ধে আমার আগ্রহের কথা এবং আগে আগে ওদের নীড়ক্ষেত্র দেখতে গিয়ে হতাশ হয়ে কয়েকবার ফিরে এসেছি—মহারাও তা জানতেন। তাই গ্রেট রান অঞ্চলে ধানঠুটিদের চলাচল সম্পর্কিত খবর নেবার উনি বিশেষ ব্যবস্থা

রেখেছিলেন। যখন আমি বোম্বাইতে থেকে পরের মাসে কৈলাস মানস সরোবরে 'তীর্থযাত্রা'র জন্যে পুরোদমে তোড়জোড় করছি, সেই সময় ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে একদিন দুম ক'রে মহারাওয়ের কাছ থেকে এক এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম এসে হাজির। পাখিদের বাসা বাঁধার ক্ষেত্র—'ধানঠুটি পাটন'—নাকি তখন পাখিতে পাখিতে ছেয়ে গেছে। আমি যেন অবিলম্বে সেখানে চ'লে যাই। এর জন্যে আমি যে কতদিন থেকে আশায় আশায় ছিলাম। খবরটা এমন একটা বেয়াড়া সময়ে এলেও, ভেবে দেখলাম এ সুযোগ ছাড়া ঠিক হবে না। দুদিন পরই বিমানযোগে আমি ভূজে পৌঁছে গেলাম। সে সময়ে বিমানভ্রমণে কোনোই সুখসুবিধে ছিল না। তাছাড়া যুদ্ধের বছরগুলোতে বেজায় খামখেয়ালে চলত। অন্যদিকে, গয়ংগচ্ছ ভাবের জন্যে ট্রেনে যেতে প্রচুর সময় লাগত। বিরামগাঁও আর অন্যান্য জায়গায় গাড়ি বদ্‌লে মিটার গেজে উঠে কাথিয়াবাড়ের ছোট ছোট নানা রাজ্য ঘুরে যেতে হত। প্রতিটি রাজ্যেরই রক্ষণাবেক্ষণে ছিল মাইল কয়েকের অতি জঘন্য রেলরাস্তা। নিজেদের নিছক একটু জাতে তোলার বাসনায়। প্রতিবেশী দেশীয় রাজ্যগুলোতে স্বাধীন ব'লে কল্কে পাওয়ার জন্যে নিজেদের ইচ্ছেমতো সময়ে ট্রেন চালাত। অন্য রাজ্যের ট্রেনের সময়ের সঙ্গে কোনোরকম সঙ্গতি রাখত না। রাজ্যগুলো যেহেতু সময়ানুবর্তিতার কোনো বালাই রাখত না, তার ফলে পরের ট্রেন ধরাটা ছিল ভাগ্যের ব্যাপার। শেষমেষ জামনগরের নওলখিতে পৌঁছে ভিড়ে ভিড়াকার খোলা প্ল্যাটফর্মে রাত কাটানো। বিনাপয়সায় এক ধরনের খোলা আকাশের নীচে সর্বজনীন শয়নমন্দির। কেননা সকালে উঠেই লঞ্চ ধ'রে নদী পেরিয়ে কচ্ছের কান্দলায় পৌঁছুতে হবে। সেখান থেকে ছোট রেলে চড়ে চার ঘণ্টা টিকুস টিকুস ক'রে অবশেষে ভুজে পৌঁছুনো। বোম্বাই থেকে মোট চল্লিশ ঘণ্টার মতো সময় লেগে যাবে।

সুখের বিষয়, ভুজে গিয়ে সার পিটার ক্লাটারবাকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। উনি ছিলেন ভারতের বনবিভাগের একদা মহাপরিদর্শক। অবসর নেওয়ার পর কিছুদিন কাশ্মীর রাজ্যে মুখ্য বনপাল হিসেবে কাজ করেছেন। এখন মহারাও বিজয়রাজজীর আমন্ত্রণে কচ্ছে এসেছেন এ রাজ্যের বনবিভাগকে পুনর্গঠন করার ভার নিয়ে। যতদিন ভারত সরকারে কাজ করেছেন, ফরেস্ট অফিসার হিসেবে সার পিটার অসাধারণ কাজের লোক ব'লে নাম কিনেছেন। প্রকৃতিবিদ্যা আর বনসংরক্ষণের কাজে নিজেকে তিনি সঁপে দিয়েছিলেন। আমি যখন তাঁকে দেখি, তখন তাঁর ঢের বয়স হয়েছে। তখন প্রচণ্ড গরম এবং সফরে শারীরিক ধকলও কম নয়। এ সত্ত্বেও সার পিটার আমার সঙ্গে 'ধানঠুটি পাটনে'র সফরে যেতে চান ব'লে মহারাওয়ের কাছে ইচ্ছে প্রকাশ করেন।

ভুজ থেকে খাওড়া হয়ে কিছুটা গাড়িতে আর কিছুটা উটের পিঠে চড়ে (প্রায় সত্তর মাইল) যেখানে পৌঁছে আমাদের রাত কাটাবার ব্যবস্থা হয়, তার নাম নির।

কচ্ছের রাজদরবার থেকে তাঁবু খাটিয়ে থাকার যে ব্যবস্থা হয়েছিল, সেখানে ভোগবিলাসের ছিল ঢালাও বন্দোবস্ত। রাত্রে ডিনারে ব'সে দেখি এলাহি ব্যাপার—দামি রেশমের নকশা করা টেবিলঢাকা, রূপোর বাসনকোসন, তকমা-পরা চোপদার। মনে আছে, কথাপ্রসঙ্গে রাজনীতি এসে যেতেই দুজনের তুলকালাম বেধে গেল। মহাত্মা গান্ধী আর সত্যাগ্রহ আন্দোলন, এইসব নিয়ে বিশ্বযুদ্ধ আর আগের প্রায় এক দশক জুড়ে ভারতীয়দের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্ক সাংঘাতিক খারাপ হয়ে পড়েছিল। ভারতে ছোটবড়ো পদের যত চাকুরে ইংরেজ ছিল, আর তাদের পোঁ ধরা বক্সওয়ালার দল—মেইনেৎস্হাগেন যাঁকে বলতেন 'রাজদ্রোহী ত্যাঁদোড় ঐ গান্ধী লোকটা'—সেই তাঁর 'অন্তর্ঘাতী' প্রচার আর শয়তানিতে ক্ষেপে গিয়ে তারা যা মুখে আসে তাই বলতে শুরু করেছিল। আর হ্যারো কেম্ব্রিজে সৎশিক্ষা পেয়েও তাঁর দেশদ্রোহাত্মক ল্যাংবোট নেহরু—তাঁকেও তারা ছেড়ে কথা বলেনি। এর আগে সন্ধ্যের দিকে সার পিটার নিজে যেচেই এ প্রসঙ্গে চাপা রাগ প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। এরপর তিনি বিনা প্ররোচনাতেই ভেতরের বিষ ওগরাতে আর তোপ দাগতে শুরু করলেন। আগেই এক জায়গায় আমি কবুল করেছি যে, এ কথা কেউই বলে না যে আমি খুব ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ। কিংবা আমার মুখ খুব মিষ্টি। প্ররোচনা মাত্রা ছাড়ানোয় আমি আর তখন নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। আমার মুখে কোনো আগল ছিল না। যতটা দরকার ছিল, আমি বোধহয় তার চেয়েও বেশি খারাপ খারাপ কথা মুখে এনেছি। সে যাই হোক, এর ফলটা কিন্তু ভালো হয়েছিল। দুজনের মধ্যেকার জমে ওঠা বাষ্প এর ফলে বেরিয়ে যেতে পেরেছিল। তারপর থেকেই সার পিটারের সঙ্গে শেষ অবধি আমার খুব ভালো সম্পর্ক দাঁড়িয়ে যায়। আমি তাঁকে সাফ সাফ বলি—ওঁর যা বদ্ধমূল বিশ্বাস তা থেকে সরিয়ে ওঁকে আমার স্বমতে আনার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে বা বাসনা আমার নেই; তেমনি ওঁরও আমার মত বদলাবার চেষ্টা করে কোনো লাভ হবে না—এর ওপর আর কথা নেই। আমাদের দুজনেরই নাড়ির টান পাখি আর বন্য প্রাণীতে; সুতরাং, ঐ বিষয়ের মধ্যেই নিজেদের বেঁধে রেখে রাজনীতিটা রাজনীতিকদের জন্যেই কেন আমরা ছেড়ে দিই না? আমাদের সেই প্রথম দুর্ভাগ্যজনক, কিন্তু চূড়ান্ত সংঘাতের পর সার পিটারকে মানুষ হিসেবে আমার খুব ভালো লেগে গিয়েছিল। ওঁর কাছে থেকে খুব আনন্দ পেতাম। ধানঠুটির সেই সফরে গিয়ে আমাদের মধ্যে যে ভাবভালবাসা আর পারস্পরিক শ্রদ্ধার সূত্রপাত হয়েছিল, ইংলণ্ডে ১৯৫৮ সাল নাগাদ তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তা অবিচ্ছিন্ন ছিল। তার মাস কয়েক আগে আমি ইংলণ্ডে গেলে ওঁর সঙ্গে দেখা ক'রে কী ভালো যে লেগেছিল এছাড়া আমাদের এই মৈত্রীবন্ধনের মধ্যে অংশত যোগসূত্রের কাজ করেছে তাঁর বয়ঃপ্রবীণ পুত্র ব্রিগেডিয়ার জে. ঈ. (জ্যাক) ক্লাটার বাক, আর. ঈ.। ভারতে জি. আই. পি. রেলওয়েতে চীফ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বহু বছর কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করার পর ইংলণ্ডে ফিরে সামারসেটে একটা

খামার পত্তন ক'রে নতুন জীবন শুরু করে। জ্যাক আর আমি ছিলাম সমপ্রকৃতির মানুষ। মানুষটা এমন যে ওকে ভালো না বেসে পারা যায় না। ভারতের বনজঙ্গল বলতে পাগল। সেইসব বনজঙ্গলে মাঝে মাঝেই আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি। তাঁবু ফেলে একসঙ্গে থেকেছি, শিকার করেছি, ঘুরে বেড়িয়েছি আর স্থানীয় লোকজনদের সঙ্গে তাদের মতো হয়ে থেকেছি। জ্যাক ছিল আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ, সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ইংরেজ বন্ধু।

চিরাচরিত 'ধানঠুটি পাটন' সম্পর্কে প্রথম খবর মেলে ১৮৯৬ সালে। অন্তত তারপর থেকে প্রতি বছরই পাখিরা ওখানে বাচ্চা দিতে আসে। জায়গাটা হল নির থেকে ১০ কিলোমিটারের মতো উত্তর-পূর্বে (পচ্ছম দ্বীপের ডগায়), যেখানে আস্কেপিঠের মতন চ্যাটালো ছিরিছাঁদহীন রান অঞ্চল। অনেক কষ্ট ক'রে সেখানে পৌঁছোতে হয়। অল্পাধিক ঘন লোনা জল। কোথাও গোড়ালি, কোথায় উরুঅবধি ডুবে যায়। থকথকে আর পিছল। কোথাও তার ওপর এমন একটা আস্তর, যেখানে ভুল ক'রে পা দিলে বিপদ আছে। কোথাও বা ভাঙা কাঁচের মতো লবণের ক্ষুরধার দানা। মরুভূমির চাঁদিফাটা রোদ সদ্য-পড়া বরফে পড়লে হয়—একেবারে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ওপরের মচমচে স্তর ভেঙে টাট্টুঘোড়াদের পায়ের খুর ডুবে গিয়ে লোমশ গ্রন্থিগুলো বিচ্ছিরিভাবে কেটে ছিঁড়ে যায়। তাপমানযন্ত্রে ৪০° ডিগ্রির ওপরে হলেও এপ্রিলের তাপ গায়ে তেমন লাগছে না। তার কারণ, সৌভাগ্যক্রমে সারাদিন একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে চলেছে। রাত্রে যখন খোলা আকাশের নীচে শুই, তখন এমনকী একটা সুতির চাদরও গায়ে জড়াতে হয়। পাখিদের বাচ্চা দেওয়ার মরশুমের যখন রমরমা, সেই সময় ধানঠুটি-পাটনের পাখির সংখ্যা সরজমিন মোটামুটি সঠিকভাবে গণনা করা গিয়েছিল—আজ পর্যন্ত সেই একবারই। সে সময়ে ঝকঝকে চাঁদিনী রাত আর আকাশ পরিস্কার থাকায় সর্বাধিক অনুকূল অবস্থার দরুন সেইসঙ্গে আমরা পাখিদের নৈশ চলাচল আর স্বভাবের হদিশও কিছুটা পেয়ে গিয়েছিলাম। অবশ্য সে জায়গায় টাটকা জল পাওয়ার উপায় ছিল না। উনুনের জ্বালানি, সঙ্গের বাহন আর ভারবাহী পশুদের কোনো রকম খাদ্য—সবই ছিল অমিল। ফলে, 'অকুস্থলে' দু রাত্রির বেশি থাকার সময় আমরা হাতে পাইনি। তার জন্যে দরকার ছিল আগে থেকে ভেবেচিন্তে বিস্তারিতভাবে সব কিছুর বন্দোবস্ত করার। জমিতে পাখিদের বসতির মোট আয়তন মেপে নেওয়ার পর যদৃচ্ছভাবে একেকটি ৯০ মিটার × ৯০ মিটার মাপের প্লট আমরা নমুনাস্বরূপ 'তৈরি' করে নিই। নীড়গুচ্ছের মাঝের ফাঁকা (বাদ দেওয়া) জায়গাগুলো হিসেবের বাইরে রাখি। আমি গুনে দেখতে পাই যে, 'পাটন'টিতে দখল করা পাখির বাসার মোট সংখ্যা হল ১,০৪,৭৫৮। প্রতি তিনটি বাসায় দুটি পূর্ণবয়স্ক আর দুটি শাবক ধ'রে, সেইসঙ্গে বসতির আশপাশের যারা প্রজননের কাজে লিপ্ত নয় এমন পূর্ণবয়স্ক আর অপ্রাপ্তবয়স্কদের এর সঙ্গে জুড়লে—মোট পাখির সংখ্যা সম্ভবত পাঁচ

লক্ষের মতো হবে। সেক্ষেত্রে গোটা এশিয়া মুলুকে ধানঠুটিদের যত প্রজননক্ষেত্র আছে, তার মধ্যে ধানঠুটি পাটনই নিঃসন্দেহে বৃহত্তম। অন্তত বিশ্বের বৃহত্তম ক্ষেত্রগুলির অন্যতম তো বটেই। আমি বরাবরই এটা মনে করে এসেছি যে, কচ্ছের বৃহৎ রান অঞ্চল এক অতি সম্ভাবনাময় এলাকা। এখানে জীবতাত্ত্বিক দিক থেকে অনেক চমকপ্রদ তথ্যের হদিশ মিলবে। তার জন্যে দরকার একটি পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক অভিযানের। আমি নিজে আরও সুচারুভাবে, আরও বিস্তৃতভাবে সেখানে সমীক্ষার কাজ করে উঠতে পারিনি, তার জন্যে আমার মনে দুঃখ থেকে গেছে। ধানঠুটি পাটনে পরে একবার গিয়ে তার উপকণ্ঠে কাদাখোঁচা ধরনের অ্যাভোসেট (রিকার্ভিরোস্ট্রা ভাভোসেট্টা) পাখিদের নীড় বাঁধার উপনিবেশ আবিস্কার করি। এ উপমহাদেশে সেই সর্বপ্রথম তা নথিবদ্ধ করা হয়। ক'বছর পর আবার যখন যাই, তখন এরই ধারেকাছে ধানঠুটিদের জরাজীর্ণ পরিত্যক্ত বাসায় গগনভেরী বা রোজি পেলিক্যান (পেলেকানুস অনোক্রোটালুস) পাখি—এও সেই প্রথম—আবিস্কার করি।

মহারাও বিজয়রাজজী যে ক্যামেরাটা আমাকে ধার দিয়েছিলেন (আমারটা শেষ মুহূর্তে গড়বড় করায়), সেটা যাতে এসে উচিতমতো চলে, তা দেখার জন্যে সুবিবেচনার সঙ্গে ভুজ থেকে রাজফটোগ্রাফার আলি মহম্মদকে তিনি আমার সঙ্গী করে পাঠিয়েছিলেন। আলির সঙ্গে আনুষঙ্গিক সাজসরঞ্জাম ছাড়াও ছিল একজন বিশেষ সাগরেদ। তার কী প্রয়োজন তা সেই মুহূর্তে বুঝিনি। দুজন ফটোগ্রাফার আর তাদের সাজসরঞ্জাম বইতে আলাদা দু দুটো উট বরাদ্দ করা হয়েছিল। পোক্ত সেগুনকাঠের বিশাল আকারের জবরজং একটি সাবেককালের ফুল-প্লেট স্টুডিও ক্যামেরা—দেখে মনে হয়, উইলিয়াম দি কঙ্কারারের বা তারই কাছাকাছি কোনো আমলে তৈরি এক প্রাচীন আসবাব। তাতে যন্ত্রচালিত শাটার নেই। ফটোগ্রাফারকেই হাত দিয়ে তার লেন্সের ওপর একটা টুপি পরাতে আর খুলতে হয়। সটান রোদের মধ্যে, যন্ত্রচালকের তড়িৎগতির হাতসাফাই, অপেক্ষাকৃত মন্থর প্লেট এবং ডায়াফ্রাম সূচ্যগ্র বিন্দুতে বেঁধে দেওয়া সত্ত্বেও—নেগেটিভে কিছুটা বেশি আলো ঢুকে পড়া অনিবার্য ছিল। ১৮৯৬ সালে মহারাজ সোসাইটির জার্নালে রান অঞ্চলে ধানঠুটি পাখিদের প্রজনন ক্ষেত্রের যে সুনিশ্চিত প্রামাণ্যচিত্র ছাপিয়েছিলেন, সেই মূল ছবি এই ক্যামেরাতেই যে তোলা হয়েছিল, তাতে অবিশ্বাস করার কিছু নেই। সে হিসেবে এই ক্যামেরা অবশ্যই ঐতিহাসিক। এর ঢাউস কাঠের ট্রাইপডে ক্যামেরা বসানো ছাড়াও, এর জটিল সমন্বয়মূলক কাজ করতে হলে দুজন তাকতঅলা লোকের দরকার। জাহাজ চালানোর কায়দায় এই যন্ত্র ব্যবহার করতে হত। সেইজন্যেই এর সঙ্গে একজন কুশলী সহকারী থাকা অপরিহার্য ছিল। মুখ্য আলোকচিত্রশিল্পী (ক্যাপ্টেন সাহেব) বেশ কয়েক গজ কালো কাপড় মাথায় জড়াবেন আর তাঁর চোখ ফোকাসের পর্দায় এঁটে থাকবে। এই 'পাটাতনে' দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন 'ইঞ্জিন রুমে' ইশারায় নির্দেশ পাঠাবেন। এখানে 'ইঞ্জিন

রুম' বলতে, তাঁর সামনে দাঁড়ানো সহকারী। ঠিকমতো ফোকাস করার জন্যে তাকে তিনি ক্যামেরার মুণ্ডুটাকে একটু এদিক একটু ওদিক করার নির্দেশ দেবেন। ফোকাস করার মুণ্ডুটা ক্যাপ্টেনের নাগালের বাইরে। তাই বিশেষ রকমের ট্রেনিং-থাকা একজন সহকারী। সঙ্গে না থাকলে চলে না। নীড়ক্ষেত্রে সটান 'লোকেশনে' বসানো ক্যামেরাটাকে দূর থেকে বড়োসড়ো একটা বাড়ির মতন দেখতে লাগে। যখন হাওয়া ওঠে, তখন ক্যাপ্টেনের কালো চাপকান পত্ পত্ শব্দে নড়তে থাকে। আমার মনে হয়েছিল, এ অবস্থায় পাখিদের ফটো ওঠার বিন্দুমাত্র আশা নেই। এই নিয়ে ক্যাপ্টেনের দোষ ধ'রে অনেক ঠাট্টাবিদ্রূপ করেছি। আশ্চর্যের বিষয়, উনি তা গায়ে না মেখে হাসিমুখে সব সহ্য করেছেন। এরপর আমরা ভুজে ফিরেছি। যখন উনি ডার্করম থেকে সব ছবি নিয়ে বেরোলেন, দেখে আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। আমি ভাবতেই পারিনি এত ভালো ছবি উঠবে। আমি বুঝলাম আমিই হয়ে গেছি উল্টে হাসির পাত্র। তখন আমার আক্কেল হল যে, ভালো ক্যামেরা হলেই যে ভালো ফটো উঠবে, তা ঠিক নয়। তার চেয়েও বড়ো কিছুর দরকার হয়।

যুদ্ধকালীন প্রচুর বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ১৯৪৫ সালে কচ্ছ সরকারের পক্ষ থেকে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস 'দি বার্ডস্ অব কচ্ছ' বইটি প্রকাশ করে। প্রথম সংস্করণ ১,০০০ কপি ছাপা হয়। তাতে ছিল ডি. ভি. কাউয়েন-এর তোলা কুড়িটি রঙিন ছবি। কচ্ছ রাজদরবারের পুরো অর্থানুকূল্যে বইটি প্রকাশিত হয়। স্বদেশে আর বিদেশে সমালোচকেরা বইটির প্রশংসা করেন। মহারাও পাঁচ শো কপি বই রেখে দেন রাজঅতিথিদের দেবার জন্যে। দুঃখের বিষয়, বইগুলো হেলাফেলা ক'রে স্যাঁতসেঁতে তয়খানায় গুদামজাত করে রাখায় অধিকাংশ বই উঁইতে খেয়ে ফেলে। বইটির দাম ধার্য হয়েছিল ২০ টাকা। কিছুদিনের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যায়। এরপর পুরনো বইয়ের দোকানে এর সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড কপি ১০০ ডলারে পর্যন্ত বিক্রি হয়।

রাজ্যের একেবারে পূর্বপ্রান্তে ছোট রান অঞ্চলের সীমান্তঘেঁষা একটি গ্রাম রাপার। গ্রাম বলতে কয়েকটিমাত্র ভাঙাচোরা কুঁড়েঘর। কচ্ছে পক্ষিসমীক্ষার সুবাদে রাপারে আমরা একটি ক্যাম্প করেছিলাম। মাটির পাঁচিল ঘেরা এই 'দুর্গ'টিতে অপেক্ষাকৃত মজবুত বাড়ি বলতে একটি শুধু পুলিশ থানা। সেখানে দুজনমাত্র পুলিশ আর তাদের টহল দেবার জন্যে উট। সেইসঙ্গে সবেধন নীলমণি এক 'পাগ্‌গি'; তার প্রধান কাজ হল, উদয়াস্ত একবার ক'রে পায়ে হেঁটে চক্কর দিয়ে আসা। মাটিতে চোখ রেখে তাকে দেখতে হবে নতুন কোনো উট্‌কো লোক অথবা উটের গমনাগমনে পায়ের চিহ্ন পড়েছে কিনা। ওপরতলার নির্দেশে পুলিশের ফাঁড়িটি আমাদের জন্যে খালি করে দেওয়া হয়। এই পাগ্‌গিদের রাপার ছাড়া আর কোথাও দেখার আমাদের সুযোগ হয়নি ('পাগ্‌গি' এসেছে 'পাগ' থেকে; পাগ্ বলতে পা বা পদচিহ্ন)। এরা এক সাধারণ উপজাতি সম্প্রদায়। পুরুষাণুক্রমে এদের কাজ চৌকিদারি করা। গ্রামবাসীদের মুখের

সঙ্গে তাদের পায়ের ছাপ এতই এদের চেনা যে, বিশেষ কোনো পায়ের ছাপ দেখে চোখ বুঁজে বলে দিতে পারে মানুষ বা উটের পায়ের সেই ছাপ গ্রামেরই কারো, না বাইরের কারো। মরুভূমি অঞ্চলে উট চুরি করাটা বিলাসব্যসনের সামিল। সেদিক থেকে এদের এই ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে হারানো বা চুরি হওয়া উটের খোঁজ তো পেতই, সেইসঙ্গে উটচোর আর অন্যান্য অপরাধীদেরও ধরে ফেলতে পারত। দূরবর্তী প্রত্যেকটি পুলিশ ফাঁড়িতে তাই দু-একজন ক'রে পাগ্‌গিকে সাধারণত নিযুক্ত করা হত। এই পেশাদার নজরদারদের পুরুষানুক্রমে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ক্ষমতা একাধারে যেমন অদ্ভুত, তেমনি কম বিস্ময়কর নয়।

আমরা যখন সমীক্ষার কাজ করছি, তখন কচ্ছের পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল ছিলেন খান বাহাদুর ম্যালকম কোঠাওয়ালা। রাজপুতানার বিভিন্ন মরুভূমি রাজ্যে পাগ্‌গিদের বিষয়ে তাঁর মতন ওয়াকিবহাল লোক দ্বিতীয় কেউ ছিল না। রাপারের মতন সীমান্ত এলাকায় একটি গ্রামে একবার একটা উট চুরি যায়। কাহিনীটি তাঁর মুখ থেকেই আমার শোনা। সেই উটের সামনের বাঁ পায়ে একটু খুঁত ছিল। ফলে, তার পায়ের ছাপের মধ্যে একটা বিশেষত্ব ছিল। একমাত্র স্থানীয় পাগ্‌গিরাই সেটা ধরতে পারত। একদিন রাত্রে একজন বহিরাগত লোকের সঙ্গে উটটি উধাও হয়ে যায়। জমিতে দাগ পরীক্ষা করে ধরা যায় যে, লোকটা তার একদিন আগে গ্রামে এসে ঢুকেছিল। ঐ গাঁয়ের পাগ্‌গি সেই লোকটির নিয়ে যাওয়া উটের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে গ্রাম ছাড়িয়ে মাইল কয়েক যাওয়ার পর যেখানে পৌঁছোয়, সেখানকার মাটি ছিল খটখটে আর পাথুরে। ফলে, সেখানে সে পায়ের ছাপের খেই হারিয়ে ফেলে। দু বছর পরে সেই পাগ্‌গি মাইল কয়েক দূরে তার গ্রামে যাওয়ার জন্যে ছুটি নেয়। এক সময়ে যেদিকে সে উটের পিছু নিয়েছিল, তার গ্রাম সেই রাস্তাতেই। বারোমেসে কাজের মতোই ছুটির মধ্যে গ্রামের আশপাশে ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে সে একটি উটের পায়ের ছাপ দেখতে পায়। দেখে সে নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারে যে, দুবছর আগে যে উটের সে খোঁজ করছিল, এটা সেই উটেরই পায়ের ছাপ। কিন্তু যে লোকটি সেবার উট নিয়ে পালাচ্ছিল, এখানে তার বদলে অন্য অন্য লোকের পায়ের ছাপ। যাই হোক, পায়ের দাগ দেখে দেখে সে পদচিহ্নের অধিকারীর বাড়িতে পৌঁছে যায়। লোকটাকে প্রশ্ন ক'রে সে জানতে পারে যে সে মাসকয়েক আগে ঐ উটের মালিকের কাছ থেকে উটটি কেনে। যে লোকটা ঐ উট বেচেছিল, তাকে সে খুঁজে বার করে। তার পায়ের ছাপ দেখে এটাও সে নিঃসন্দেহে ধরে ফেলে যে, পূর্বেকার গ্রাম থেকে যে লোক উট চুরি করে পালিয়েছিল, এ হল সেই লোকটারই পায়ের ছাপ। স্বাভাবিক কায়দায় মৃদু কম্বল-ধোলাইয়ের ফলে, চোর তার অপরাধ স্বীকার করে। সেই চোর, আর যে তার কাছ থেকে চুরি যাওয়া উট কিনেছিল—দুজনকেই তাদের পাপের ফল ভোগ করতে হয়। উটটাকে তার ন্যায্য মালিকের কাছে তার স্বগ্রামে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এইসব

সরল অশিক্ষিত মানুষেরা কত পুরুষ ধ'রে যে বাপ্‌কা বেটা হয়ে এই ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে, তার ঠিকঠিকানা নেই। খানবাহাদুরের ঝুলিতে ছিল তাদের এই পশ্চাদনুসরণের সূত্রে অসাধ্যসাধনের আরও অনেক কাহিনী। দুঃখের বিষয় এই যে, অপরাধ খোঁজতল্লাশির ক্ষেত্রে রীতিপদ্ধতির ক্রমবর্ধমান জটাজাল দিনকে দিন ফুলে ফেঁপে উঠছে। আর এই ডামাডোলে পাগ্‌গিদের যুগ যুগ ধ'রে সঞ্চিত ক্ষমতা আর দক্ষতা তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছে। সেইসঙ্গে তারা হারাচ্ছে তাদের পেশা আর রুজিরোজগার।

১৯৪৫ সালে আর. আই. পোলক যখন ব্রিটিশ ভারতের প্রাণীবর্গের সিরিজে তাঁর স্তন্যপায়ী বিষয়ক বইগুলি ঘষামাজা করছিলেন, তখন সোসাইটিকে এই মর্মে চিঠি লেখেন যে, যেহেতু কচ্ছের বন্য গর্দভ সম্পর্কে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে (প্রকৃতিবিদ্যা) যথেষ্ট মালমশলার অভাব রয়েছে—সেইজন্যে তিনি জানতে চান যে সোসাইটি কিছু নতুন নিদর্শন যুগিয়ে এ বিষয়ে বিচারমূলক লেখা দিয়ে সাহায্য করতে পারে কিনা। মহারাও বিজয়রাজজী তাঁর স্বভাবোচিত উদারতা প্রকাশ ক'রে বলেন যে, সোসাইটি চাইলে ছোট রান অঞ্চলে যদি অভিযানের কোনো দল পাঠায় তাহলে তার সব রকম সুযোগসুবিধে তিনি করে দেবেন। ছোট্ট রান অঞ্চলই হল গর্দভদের আসল ঘাঁটি। ঐ সময় (মার্চ ১৯৪৬) আমি গুজরাতে পক্ষিসমীক্ষা চালাচ্ছিলাম. বন্য গর্দভদের বাস্তুভূমি আর জীবতত্ত্ব সম্পর্কে লোকে খুব কম জানত। তাই কাছ থেকে এই বিরল আর চিত্তাকর্ষক প্রাণীদের ভালো ক'রে জানার এমন সুযোগ আমি হাতছাড়া করতে চাইনি। তাছাড়া আরও একটা কারণ ছিল। কচ্ছে পাখি জরিপের সময় ছোট রান অঞ্চলের পাখিদের সম্পর্কে খোঁজখবর করার আমার সুযোগ হয়নি। অথচ অনেকদিন থেকেই আঁচ করা হচ্ছিল যে, ভারতীয় এলাকায় একমাত্র এখানেই ছোট ধানঠুটি পাখিদের (ফিনিকোনাইয়াস মাইনর) প্রজনন ক্ষেত্র রয়েছে।

বন্য গর্দভদের বিষয়ে এই অভিযানের বৃত্তান্ত আর বন্য গর্দভদের হাবভাব, খাদ্যাখাদ্য ইত্যাদি বিষয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষার নোট সোসাইটির জার্নালে ছাপা হয় ৪৬:৪৭২-৭৭ (১৯৪৬)। সেইসঙ্গে ছিল সংগৃহীত ঐ প্রজাতির পাঁচটি নিদর্শনের মাপজোক আর অন্যান্য যাবতীয় খুঁটিনাটি। মাঠের মধ্যেই তাদের ওজন নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কাজ চলার মতো ক'রে গাছের ডালে একটা কড়িকাঠ ঝুলিয়ে একদিকের প্রান্তে থাকত একটি বন্য গর্দভ, অন্য প্রান্তে থাকত তিন চারটি গৃহপালিত প্রাণী (অর্থাৎ, আমারই অনুচরবৃন্দ!) শেষোক্তদের জনে জনে পরে প্রচলিত দাঁড়িপাল্লায় মেপে নেওয়া হত। তা থেকে বন্য গর্দভদের একটা মোটামুটি নির্ভুল ওজন পাওয়া যেত। পক্ষিতাত্ত্বিক দিক থেকেও এই সফর খুবই কাজের হয়েছিল। বানস নদী যেখানে বেরিয়ে রান অঞ্চলে এসে পড়েছে, সেখানে লোনাজলের দূরবিস্তৃত একটি জলা অদৃষ্টক্রমে আমাদের নজরে আসে। একসঙ্গে এক জায়গায় পরিযায়ী পাতিহাঁস, বক ধরনের দীর্ঘপাদ আর অন্যান্য পাখি, আগে কেন, এর পরেও আর কোথাও দেখিনি। লক্ষ লক্ষ পাখির ভিড়ে

মাইলের পর মাইল জলার জল কালো হয়ে আছে। দূরের পাখিরা কোন প্রজাতির তা বোঝা যায়নি। এই পাখির জমায়েতের বেশির ভাগই পাতারি হাঁস (আনুস ক্রেক্কাস), তার মাঝখানে ইতস্তত পান্তামুখী (স্প্যাটুলা ক্লাইপিটা)। আর তাছাড়া একগাদা অন্যান্য পাখি। আর দেখেছিলাম আশিটি গগনভেরী, তিরিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ ছোট ধানঠুটি (বড়ো একটিও নয়), অসংখ্য বালুবাটান, গাংতিতই, রক্তপাদ বাটান, গোত্রা আর অন্যান্য। ছিল হাজার হাজার সারস আর করকরা। সবাই যে বাইরে কোথাও উড়ে যাবে ব'লে একত্র হয়েছে, দেখে তা বোঝা যায়। আমার দুর্ভাগ্য যে, যথাযথ সময়ে ও জায়গায় আমি আর গিয়ে উঠতে পারিনি।

□

ভরতপুর

মহারাজার দল আর গণ্যমান্য রাজঅতিথিদের জনো একান্তভাবে সংরক্ষিত হাঁস শিকারের রমরমা জায়গা ভরতপুরের 'ঘানা'। ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত কেবল এটাই লোকমুখে শুনে এসেছি। আমার কথায় সোসাইটির সে সময়কার কিউরেটর আমার বন্ধু প্রেটার সেই বছর সার রিচার্ড টটেনহ্যাম, আই. সি. এস.-কে বিখ্যাত কেওলাদেও ঘানা ঝিলে বন্যকুক্কুটদের পায়ে রিং পরানোব একটা পরীক্ষামূলক কেন্দ্র খোলার অভিপ্রায় প্রকাশ ক'রে জানতে চান যে, সরকার এ বাবদ কতটা কী সুযোগসুবিধে করে দিতে পারে। মহারাজা ব্রিজেন্দ্র সিং তখন নাবালক হওয়ায় রাজ্যের প্রশাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন সার রিচার্ড। বিরাট হোমরাচোমরা লোক তিনি। তাঁর কথাই হল আইন। তাছাড়া, তিনি প্রকৃতিবিদ আর শিকারী হিসেবে সোসাইটির উৎসাহী সদস্য ছিলেন। এই সুবিশাল জলাভূমির সঙ্গে এইভাবেই আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। তারপর থেকে কতবার যে সেখানে আমার পদার্পণ ঘটেছে, তার সীমাসংখ্যা নেই। সেই প্রক্রিয়ায় ভারতে পক্ষিপরিযাণ সংক্রান্ত সোসাইটির প্রধান অনুশীলনকেন্দ্র এখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগে গোটা উপমহাদেশে রিং পরাবার এমনতর ব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল না। একবার অবশ্য ১৯২৬ সালে পরীক্ষামূলকভাবে এ ব্যাপারে অগ্রদূতের ভূমিকা নিয়েছিলেন। ধার রাজ্যের (এখন মধ্য প্রদেশে) উদ্যমী শাসক সার উদয় সিং পুয়ার। 'মহারাজা ধারকে জানান'—এই মর্মে খোদাই করা (সাবেক রোল্‌স্ রয়েস-এর সুবিদিত ঢঙে লেখা) কারিগরের বানানো অ্যালুমিনিয়ামের রিং সোসাইটিকে দিয়ে তিনি তৈরি করিয়ে নেন। ধাতুর পাত থেকে লম্বা সরু ফালি মাপসই ক'রে কেটে নিয়ে তার ধারগুলো উখো দিয়ে ঘষে ঘষে পালিশ করার পর ইস্পাতের মোহর দিয়ে প্রতিটি অক্ষর ধ'রে ধ'রে বার্তাটি লেখা আর তাতে ক্রমিক নম্বর মারা। সবটাই হাতে করতে হত। ফলে, প্রচুর সময় আর মেহনত লাগত। এতে বেশি সংখ্যায় রিং বানানো সম্ভব হত না। এ সত্ত্বেও সোভিয়েট ইউনিয়নের তুর্কিস্তান, সাইবেরিয়ার মতো বহু প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে রিং-এর প্রাপ্তিসংবাদ এসেছিল। এটা জেনে আমি উঠে প'ড়ে লেগেছিলাম সোসাইটি যেন অর্থসংস্থান আর সুযোগসুবিধা পেলে এটাকে তার অনাতম প্রধান ক্ষেত্রগত কাজ

হিসেবে গ্রহণ করে। সিন্ধুর প্রশাসন তখন বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত। ধার রাজ্যের সাফল্যের নজির দেখিয়ে সিন্ধুর প্রশাসনে কর্মরত কয়েকজন সিভিল সার্ভিসের সদস্যকে রাজি করিয়ে, তাঁদের দিয়ে প্রভাব খাটানোর ফলে, মুষ্টিমেয় একদল শিকারপ্রিয় ধনী জমিদার পরিযায়ী হাঁসদের রিং পরানোর কাজটা হাতে নিতে সম্মত হন। এ ক্ষেত্রও রিঙের যোগান নিয়ে সমস্যায় পড়তে হল। ইংরিজিতে সংক্ষিপ্তাকারে খোদাই-করা 'বোম্বাই ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটিকে জানান'—এই বার্তা লেখা সেই রিং হাতেই বানাতে হচ্ছিল ব'লে যথেষ্ট সংখ্যায় ব্যবহার করা যাচ্ছিল না। সিন্ধু প্রদেশে রিং পরানোর কাজটা ছোট আকারে হলেও ঐ রিং-এর আশাতীত রকমের প্রাপ্তিসংবাদ আসছিল।

অনেক দিন অপেক্ষা করে থাকার পর হঠাৎ অযাচিতভাবে একটা 'সম্ভাবনা' এসে গেল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হাত ঘুরে। ১৯৫৭ সাল নাগাদ আপাতদৃষ্টে নতুন এক ধরনের এন্‌সেফালাইটিস রোগের প্রাদুর্ভাব কর্নাটকের (দক্ষিণ ভারত) কিয়াসানুর বনাঞ্চলে গ্রামবাসী মানুষ আর বানরদের মধ্যে দেখা দেয়। এই রোগে কিছু ক্ষেত্রে মৃত্যুও হয়। পুণার ভাইরাস রিসার্চ সেন্টারের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, এই এনসেফালাইটিস ('বাঁদুরে রোগ' বা কে এফ ডি নামে পরিচিত) রোগের এঁটুলিবাহিত জীবাণুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হল ওম্‌স্ক হেমারেজিক ফিভার আর রাশিয়ার স্প্রিং-সামার এনসেফালাইটিস (আর এস্ এস্) কম্‌প্লেক্‌স্। রোগ ছড়ানোর অন্তর্মহাদেশীয় রূপ দেখে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সোভিয়েট থেকে ভারতে আসা পরিযায়ী পাখির গায়ের এঁটুলি মারফত সম্ভবত এই রোগের সংক্রমণ ঘটেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা খুবই গুরুত্ব দিয়ে এই সমস্যাব প্রতি নজর দেয়। 'গ্রন্থিপদী বাহিত রোগ জীবাণু ছড়ানো পক্ষিকূল সংক্রান্ত গবেষণা বিষয়ক বৈজ্ঞানিক গ্রুপ' শীর্ষক একটি আলোচনা সভা ১৯৫৯-এর মার্চে জেনেভায় অনুষ্ঠিত হয়। আমাকে এই সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাদের অনুরোধে কচ্ছ রাজ্যে আর উত্তর পশ্চিম ভারতের পক্ষিপরিযাণ সম্পর্কে একটি প্রকল্পের প্রস্তাব সেখানে আমি পেশ করি। সবাই সোৎসাহে তা অনুমোদন করেন। এইভাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আর্থিক আনুকূল্যে উপমহাদেশে এই সর্বপ্রথম পাখিদের রিং-পরানো আর পক্ষিপরিযাণ বিষয়ে সংগঠিতভাবে অনুশীলনের সূচনা হয়। এটাই হল আমাদের সোসাইটির পক্ষিপরিযাণ প্রকল্প প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত। ১৯২৯ সালে হেলিগোল্যাণ্ডের পক্ষিতাত্ত্বিক মানমন্দির পরিদর্শনের সময় এই প্রকল্পের বীজ আমার মনে অঙ্কুরিত হয়।

মধ্য ষাটের দশক পর্যন্ত 'হু' (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা) তার সুবিস্তৃত জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মকাণ্ডের জন্যে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছ থেকে বেশ ভালোমতন অর্থ পেয়ে আসছিল। বিশেষ ক'রে, অনুন্নত দেশগুলোতে কাজের জন্যে। তিন চার বছর পরে সোসাইটিকে অর্থ দেওয়া তারা বন্ধ করে দেয়। কারণ, এই সময় কোরীয় যুদ্ধে বিরাটভাবে জড়িয়ে

প'ড়ে খরচের বোঝা বেড়ে যাওয়ায় গবেষণা সংক্রান্ত অনুদান ব্যাপক পরিমাণে ছাঁটাই করতে যুক্তরাষ্ট্র বাধ্য হয়। প্রকারান্তরে সোসাইটির ঘাড়েও তার কোপ এসে পড়ে। এতে সোসাইটির পক্ষ থেকে পাখিদের রিং পরানোর যে প্রকল্প চলছিল, তা খুবই বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই প্রকল্প একেবারেই ধ্বসে পড়ত, যদি না ওয়াশিংটনের স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশন সেই পর্বে সাহায্য করতে এগিয়ে আসত। অন্তর্বর্তী অনিশ্চিত কালটুকুর জন্যে তারা অর্থ যোগাতে রাজি হয়। আর ঠিক এর পরে পরেই এমন একটি সূত্র থেকে পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার মতো সাহায্য মিলে গেল, যা ছিল আমাদের কাছে একেবারেই অভাবিতপূর্ব।

দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় চুক্তি সংস্থা (সিয়াটো)-র অন্তর্ভুক্ত মার্কিন সেনাবাহিনীর মেডিক্যাল রিসার্চ ল্যাবোরেটারির সদরদপ্তর তখন ছিল ব্যাঙ্ককে। তারা জাপান, ফিলিপিন, থাইল্যাণ্ড, মালয়, ইন্দোনেশিয়া আর তাইওয়ান—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এইসব দেশগুলোতে 'ম্যাপ্‌স্‌' (পরিযায়ী প্রাণীদের রোগবিদ্যা জরিপ) নামের একটি কর্মসূচি অনুযায়ী পাখিদের ব্যাপকভাবে রিং পরানোর একটা প্রকল্প চালু করেছিল। তাদের ইচ্ছে, ভারতেও এ কাজ ছড়িয়ে পড়ুক। পাখিদের পরিযাণ সংক্রান্ত সোসাইটির কাজের প্রশংসা ক'রে 'হু' আর স্মিথসোনিয়ান দু তরফ থেকেই তাদের কাছে সুপারিশ যায়। ম্যাপ্‌স্‌-এর কর্মকাণ্ড পরিচালনা আর কর্মসমন্বয়ের সামগ্রিক ভার ছিল করিতকর্মা আর প্রাণবন্ত মার্কিন পক্ষিতত্ত্ববিদ ড. এইচ. এলিয়ট ম্যাক্লিয়র-এর ওপর। এই প্রাণখোলা মানুষটির সঙ্গে কাজ ক'রে যেমন আনন্দ, তেমনি শিক্ষাও পেয়েছি। সমিতির টাকা খরচের ক্ষেত্রে আমি বরাবরই খুব মিতব্যয়ী। পরে যখন ম্যাক্লিয়র আমাকে তারিফ করে জানালেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যেসব দেশকে তাঁরা টাকা যুগিয়েছেন তাদের তুলনায় পাখিদের রিং পরানোর পেছনে ডলার অনুপাতে সোসাইটির খরচ দেখে তিনি নাকি খুবই অবাক হয়েছেন। শুনে আমার কী ভালো যে লেগেছিল বলার নয়।

ম্যাপ্‌স্‌-প্রকল্পের তহবিলের বেশ বড়ো অংশ এসেছিল জাপানস্থ মার্কিন সেনাবাহিনীর গবেষণা ও উন্নয়ন গ্রুপ (দূর প্রাচ্য) থেকে। ইতিপূর্বে রিং পরানোর ক্ষেত্রে সোসাইটির কাজ সাগ্রহে আর সপ্রশংসভাবে তারা লক্ষ্য করছিল। সেই কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার কথা জানতে পেরে অবিলম্বে তারা এই শর্তে অর্থ যোগাতে রাজি হয় যে, তাদের নিজস্ব তথ্য পূর্ণাঙ্গ করার জন্যে আমরা কতটা কী পেলাম সেটা তাদের জানাতে হবে। আমরা সেটাকে ন্যায্য দাবি বলেই মনে করেছিলাম। সে সময়ে আমি তো ভাবতেই পারিনি যে, এ রকম একটা কার্যকর বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার দরুন সোসাইটিকে এবং প্রধান অনুসন্ধায়ী হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে এতটা অপ্রীতিকর অবস্থা আর বিরুদ্ধ প্রচারের শিকার হতে হবে।

ঘটনাটা ঘটে এইরকম। উত্তরভারতের কোনো সংবাদপত্রের সাংবাদিক 'যে নিজেকে বিজ্ঞান বিষয়ক সংবাদদাতা' ব'লে জাহির করে—সে নাকি টের পেয়ে যায়

যে, ম্যাপ্‌স্‌-র সঙ্গে রিংঘটিত ব্যাপারে সোসাইটির একটা যোগসাজশ আছে। এই নিয়ে সে এক বেজায় আতঙ্কজনক বানানো গল্প ফেঁদে বসে। পরিযায়ী পাখিদের ব্যবহার ক'রে যুক্তরাষ্ট্র চাইছে তার শত্রু দেশগুলোতে মারাত্মক সব রোগজীবাণু ছড়িয়ে জীবাণু যুদ্ধ চালাতে। এ কাজে সোসাইটি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের শরিক। তখন ঠাণ্ডাযুদ্ধের আবহাওয়া তেতে উঠেছে। এদিকে আমাদের পরিযায়ী পাখিগুলো আসে একদিকে সোভিয়েট দেশ আর অন্যদিকে সম্ভবত চীন থেকে। কাজেই অভিযোগের মধ্যে কিছুটা বিশ্বাসযোগ্যতা ছিল। ফলে, দিল্লির রাজনৈতিক মহলে হৈ চৈ পড়ে গেল। রেগেমেগে চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন আমাদের লোকসভার কমিউনিস্ট-সমর্থক আর মার্কিনবিদ্বেষী 'দেশভক্তে'রা। এই শোরগোলের ফলে পর পর দুটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। দুটি কমিটিই অপরাধমূলক এবং অন্তর্ঘাত-জাতীয় অভিযোগ থেকে সোসাইটি আর প্রকল্পের পরিচালক সেলিম আলিকে সর্বতোভাবে বেকসুর ব'লে রায় দেয়। কিন্তু সাংসদেরা তাতেও সন্দেহমুক্ত হলেন না। সুতরাং শোরগোল বন্ধ করতে এবং ঝুলে থাকা দ্বিধাসংশয় সমূলে নিরসন করার জন্যে তথাকথিত 'উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন' তৃতীয় আরেকটি কমিটি গঠিত হল। তাতে থাকলেন তিনজন শীর্ষস্থানীয় বৈজ্ঞানিক। পুণার ভাইরাস রিসার্চ সেন্টার (ভি আর সি), বোম্বাইয়ের টাটা ইনস্টিটিউট অব ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ (টি আই এফ্ আর) আর কলকাতার জুওলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া (জেড্ এস্ আই)—এই প্রত্যেকটি সংস্থা থেকে একজন ক'রে নিয়ে তিন সদস্যের কমিটি গড়া হল। এরা নতুন ক'রে সব কিছু যাচাই করে দেখবেন। যতদিন না এই কমিটি পূর্বতন বিচারকদের সিদ্ধান্ত অনুমোদন ক'রে রায় দেন। ততদিন পর্যন্ত আমাদের সন্দেহভাজন হয়েই থেকে যেতে হল। বছর দুই ধ'রে এই গোলমাল চলার ফলে অর্থাভাবে আমাদের পরিযাণ সংক্রান্ত অনুসন্ধান পর্ব কার্যত শিকেয় উঠেছিল। ইতিমধ্যে ম্যাপ্‌স্‌-এর প্রকল্পও বন্ধ হয়ে যায়। এ ধরনের বিশ্রী ঘটনা যাতে আর না ঘটে, সেইজন্যে সরকার ঠিক করে যে, এরপর থেকে মার্কিন সহযোগী সংস্থার অনুরোধক্রমে সহযোগিতার বিষয়ে সরকার অনুমোদিত সমস্ত প্রকল্পের অর্থসংস্থানের ভার সরকার স্বয়ং হাতে নেবে। ভারতে জমে থাকা পি-এল ৪৮০ স্কীম-এর প্রতিরূপ তহবিলের টাকায় এই খরচ মেটানো হবে।

তহবিলের উৎসের এই পুনর্ব্যবস্থার ফলে, সোসাইটির রিং-পরানোর কর্মসূচি পুনর্জীবন লাভ করে। বসবাসকারী আর পরিযায়ী—এই উভয়বিধ খেচর প্রাণীর বাস্তুভূমি আর চলাচলের ক্ষেত্রে সোসাইটির কর্মসূচির সম্প্রসারণ ঘটানো হয়। আমাদের পক্ষিপরিযাণ গবেষণা আর হাতেকলমে ক্ষেত্রগত কাজকর্মের সঙ্গে প্রচুর তরুণ স্নাতকোত্তর জীববীদ্ যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়ে যায়। সোসাইটির নির্দেশনায় ক্ষেত্রগত পক্ষিবিদ্যায় গবেষণারত থেকে তারা কেউ কেউ প্রাণিতত্ত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করে। সোসাইটির সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত থেকে আমার এই বহুবাঞ্ছিত সাধ

আমি মেটাতে পেরেছি। এ পর্যন্ত (১৯৮৩) আমরা এই কাজে এবং মার্কিন অন্তঃরাষ্ট্রীয় দপ্তরের মৎস্য আর বন্যপ্রাণী সার্ভিসের সহযোগে চলতি আরও দুটি পঞ্চবার্ষিক প্রকল্পে আমাদের তৈরি করা বিদ্যার্থীদের নিযুক্ত করতে পেরেছি। ভারতীয় বিমানবন্দরগুলিতে বিমানে পাখির ধাক্কা লাগার ঝামেলার বিষয়ে বসতিবিদ্যা সংক্রান্ত অনুশীলনের কাজ চলছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এরোনটিক্স্ গবেষণা ও উন্নয়ন দপ্তর মারফত এ কাজে উদ্যোগ নিয়েছে এবং সমস্ত খরচ যোগাচ্ছে ভারত সরকার। পক্ষিপরিযাণ প্রকল্প তার তিন দশকের কাজের সুবাদে যে তথ্য সংগ্রহ করেছে, তাতে ভারতে পক্ষিপরিযাণের ক্ষেত্রে অনুমাননির্ভরতার বদলে এখন বৈজ্ঞানিক মহামূল্যবান তথ্যের ভিত্তিতে দৃঢ় জমির ওপর শক্ত পায়ে দাঁড়ানো সম্ভব হয়েছে।

'হু'-র কাছ থেকে টাকা পাওয়ার পর সোসাইটির পক্ষিপরিযাণ সংক্রান্ত কাজকর্ম নিয়মিতভাবে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। তার আগে পর্যন্ত আমি এমন একটা সময়ে প্রতি বছর ভরতপুরে যেতাম, যখন বক, সারস, বগলা, পানকৌড়ি, কাস্তেচরা, খুন্তেবক আর অন্যান্য স্থানীয় জলচর পাখিদের বাসা বাঁধার মরশুম। ঘানাতে তারা বকালয়গুলোতে ঠাসবন্দি হয়ে মিশে গিয়ে বাচ্চা দেয়। দেশের মধ্যে তাদের প্রায় পুরোটাই আমাদের অজ্ঞাত। এরা কেউ কেউ দেশের সীমার বাইরেও চলে যায়। মহারাজার বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতায় এবং তাঁর শিকারি আর শিকারক্ষেত্রের প্রহরীদের সাহায্যে প্রতি বছরই আমি কয়েক শো ক'রে পক্ষিশাবকের পায়ে রিং পরাতে সমর্থ হই। রিংগুলো সবই ছিল হাতে তৈরি। প্রাপ্তিসংবাদ খুবই কম জায়গা থেকে পাওয়া গিয়েছিল। কিছু কিছু আবার আশাতীতভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে। কিছু ছিল গালগল্প আর বাকিটা উঁচুদরের কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য। স্বভাবতই তালিকাটি তেমন মনে ধরার মতো হয়নি। সুইডেনের অভিজ্ঞ সরবরাহকারীদের কাছ থেকে মুফ্‌ত তরবেতর মাপের রিং আর জাপান থেকে মিস্ট্-নেট পাওয়ার পর থেকে অনেক ব্যাপক আকারে রিং পরানোর কাজ আমরা শুরু করতে পেরেছিলাম। প্রথমদিকে বছর পাঁচেক আমরা বেশির ভাগ মনঃসংযোগ করেছিলাম ডাঙার পাখিদের ব্যাপারে—প্রধানত কুক্কুটাদি এবং দণ্ডবাসীবর্গের পক্ষিকূলের ওপর। বিশেষ ক'রে, জমি থেকে যারা ঠুকরে ঠুকরে খায়। এরা হল এঁটুলিপোকার সম্ভাব্য বাহক। হাঁসদের পায়ে রিং পরানোর কাজে অনেক দেরিতে হাত দেওয়া হয়। কারণ, ভরতপুর আর আমাদের কাজের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোতে স্থানীয় বাসিন্দারা তেমন বড়ো আকারে হাঁস এবং অন্যান্য জলকুক্কুট ধরার কাজে দুরস্ত ছিল না। এরপর যখন আমরা সাহ্নি আর মিরশিকার উপজাতির দস্তুরমতো পেশাদার বিহারী বাগুরিকদের পেয়ে গেলাম, তারপর আর পাখি ধরার সমস্যা রইল না। দেখা গেল, তাদের পাখি ধরার কৌশল ভয়ঙ্কর রকমের সফল। তার ফলে, বড়ো-আকারে জলচর পাখিদের পায়ে রিং পরাতে পারলাম।

গোড়ায় হয় জলচরদের পাখিরালয়, পরে হয় জাতীয় অভয়ারণ্য। এসব হওয়ার

আগে কেওলাদেও ঘানা ছিল ভরতপুরের রাজাদের ব্যক্তিগতভাবে সংরক্ষিত দারুণ এক পাখি শিকারের জায়গা। যতদিন পর্যন্ত বর্তমান মহারাজা ক্ষমতায় ছিলেন, ততদিন তাঁর শিকারের অধিকার ত্যাগ ক'রে এটাকে অভয়ারণ্যে পরিণত করার কোনো চিন্তাভাবনাকে আমল দেননি। শিকারে আনন্দ আর খাওয়ার মাংস পাওয়ার জন্যে তিনি অবরে সবরে সেখানে যেতেন। প্রথাগতভাবে প্রতি মরশুমে তিন থেকে চারবার মহা সমারোহে শিকারের আয়োজন করতেন। বড়লাট, ছোট লাট, অসামরিক আর সামরিক হোমরাচোমরা কর্তারা আর তার ভাইব্রাদার অন্যান্য রাজ্যের শাসকবৃন্দ ইত্যাকার ছোটবড়ো তিনি তাবৎ কেষ্টবিষ্টুদের শিকারের আমন্ত্রণ জানাতেন। যেসব লাগসই জায়গা থেকে গুলি ছোঁড়া হবে, সেখানে নম্বর দেওয়া থাকত। গোটা লেক জুড়ে থাকত এই ব্যবস্থা। গোটা শিকারপর্বটি পরিচালিত হত আগাগোড়া যুদ্ধাভিযানের কায়দায়। সব কিছু যন্ত্রের মতো নিখুঁতভাবে হত। রাজদরবারে রক্ষীবাহিনীর লোকদের জঙ্গলখেদা হিসেবে তালিম দিয়ে রাখা হত। পাখিদের স্থির হয়ে বসতে না দিয়ে তাড়িয়ে আনা হত বন্দুকের নিশানা বরাবর। এইসব রাক্ষুসে বধযজ্ঞে বিপুল পরিমাণে জীবহত্যা 'সাধন' করা হত। এমনও হয়েছে যে, একদিনেই সাবাড় হয়েছে দুতিন হাজার পাখি। হিসেবে আছে, তিনবার এই সংখ্যাটা চার হাজার ছাড়িয়ে যায়। ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে কেওলাদেও ঘানায় পক্ষিমেধযজ্ঞে নাটের গুরু ছিলেন তখনকার বড়লাট লর্ড লিনলিথগো। পাখি হত্যার সর্বকালের সর্বোচ্চ রেকর্ড হয় সেবারেই। মারা পড়েছিল সাকুল্যে ৪,২৭৩ টি হাঁস আর রাজহাঁস। বড়লাট সাহেবের নিজের যে তাতে খুব অবদান ছিল, তা নয়। তবে একদিক থেকে সেদিন তিনি বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন। নিজের কাঁধের বন্দুক থেকে তিনি ১,৯০০ রাউণ্ড ১২-বোরের গুলি ছুঁড়েছিলেন। একটা সকাল সামান্য কাদাখোঁচা মারতে শ' খানেক গুলি ছুঁড়তে গিয়েই ঘাড়ে যার কালশিটে পড়ে যায়, তার কাছে এই কৃতিত্বটা অমানুষিক ব'লে মনে না হয়ে পারে না। অবশ্য সেইসঙ্গে সাহেবের ওজন আর পেল্লায় বপুটার কথাও মনে রাখতে হবে।

ঘানার অনন্য বৈশিষ্ট্য শুধু এই নয় যে, যথোচিত মরশুমে এখানে বিপুল সংখ্যায় বিচিত্র প্রজাতির আবাসিক আর পরিযায়ী জলচর পাখিদের জমায়েত ঘটে। সেইসঙ্গে এটাও এক অসাধারণ ব্যাপার যে, বছরের অর্ধেক এবং তার চেয়েও বেশিদিন ধ'রে এখানে পাখি দেখে বেড়ানো যায়। স্বাভাবিক ধরনের বর্ষার মরশুমে আবাসিক বক, বগলা, পানকৌড়ির দল আগস্ট মাসে বাচ্চা দিতে শুরু করে। বক দম্পতিরা ছানাপোনা নিয়ে তাদের বাসা ছেড়ে চলে যাওয়ার আগেই নভেম্বর নাগাদ পরিযায়ী হাঁস আর রাজহাঁসেরা এসে যেতে শুরু করে। নভেম্বরের শেষাশেষি গোটা এলাকাটি তাদের দখলে চলে যায়। একটানা এতদিন ধ'রে পাখি দেখার এমন সুযোগ বোধহয় পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না। নিসর্গপ্রেমিক পর্যটক আর যাঁরা পাখির ফটো তুলে

বেড়ান, তাঁদের পক্ষে তাই আদর্শ জায়গা হল কেওলাদেও ন্যাশনাল পার্ক। সংরক্ষণের দিক থেকে ভাবলে এটা বোধহয় খুব একটা সুবিধের ব্যাপার নয়!

১৯৩৬ সাল বা তার কাছাকাছি কোনো সময়ে আমার ভাই হামিদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর অনুরাগী উৎসাহী তরুণ কে. পি. এস. মেনন ভরতপুর রাজ্যে সার রিচার্ড টটেনহামের জায়গায় প্রশাসক হয়ে আসেন তখন আমি লগি ঠেলে ঝিলে গিয়ে পাখির বাসা থেকে বক আর বগলাদের ছানাদের নিয়ে একটা নড়বড়ে লোহার টবে নাড়াচাড়া করতাম আর রিং পরাতাম, উনি আর ওঁর বছর বারোর যমজ দুই মেয়ে আমার সঙ্গী হতেন। সেসব দেখে ওঁরা খুশিতে উপচে পড়তেন।

আরেকটি কারণে কেওলাদেও ঘানা পৃথিবীবিখ্যাত। উত্তর প্রদেশ আর ভারত গাঙ্গেয় সমতলে আরও অজস্র আপাতদৃষ্টে সদৃশ জলাভূমি থাকলেও, উপমহাদেশে এটাই একমাত্র জলা যেখানে স্বল্প সংখ্যায় অপূর্বসুন্দর সাইবেরিয়ার তুষারশুভ্র সারসেরা শীত কাটাতে আসে। বিশেষ কোনো খাদ্যবস্তু অন্য ঝিলে পায় না ব'লে নাকি অন্য কোন কারণে তারা এখানে আসে সঠিকভাবে তা জানা যায় না। এই প্রজাতিটি বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৭২-এর ১ নং ধারার (পুরোপুরি সংরক্ষিত) অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এদের পাকস্থলীর খাদ্য পরীক্ষা ক'রে দেখাও আর সম্ভব নয়। সুতরাং এর কারণ চিরদিন অজানা থেকে যাবে। মেইনেৎস্‌হাগেনের বিশেষ চর্চার বিষয় ছিল ম্যালোফ্যাগা (পালকের উকুনে পোকা)। ওঁর সঙ্গে উকুনে পোকা সংগ্রহের জন্যে ১৯৩৭ সালে যখন আমি কেওলাদেওতে আসি, সেইবারই আমি প্রথম সাইবেরিয়ার সারস দেখি। এগারোটি পাখির একটি ঝাঁক সেবার এসেছিল। তার একটিকে আমি শিকার করি। তার পালকে দুর্ভাগ্যবশত কোনো পোকা মেলেনি। কিন্তু ওর উদরস্থ খাদ্যবস্তু আমরা রেখে দিই। দেখা যায়, সেই খাদ্যের প্রায় সবটাই হল মুথাঘাসের কন্দ—নানা প্রজাতির ঐ ঘাস জলাভূমিটিতে জন্মায় বিশেষভাবে। কিউতে ঐ খাদ্যবস্তুটি শনাক্ত করার কথা ছিল। কিন্তু কোনোপ্রকারে এই শনাক্তকরণ কখনই করা হয়নি। ফলে, শুধু খাদ্যের কারণেই তারা এই জলাভূমিটিকে পছন্দ করে কিনা তা আর জানা সম্ভব নয়। শিকারি শ্রেণীর পাখিদের গা থেকেও একই সময়ে আমরা উকুনে পোকা সংগ্রহ করছিলাম। মেইনেৎস্‌হাগেনের ডায়রিতে লেখা নোট থেকে দেখতে পাচ্ছি যে, ইতিমধ্যে এইসব শিকারি পাখির সংখ্যা কীরকম হু হু ক'রে কমে গিয়েছে। ডায়রিতে তালিকা দেওয়া হয়েছে 'ভরতপুর, ২.৩.১৯৩৭। প্রাতরাশের পর গুলি করে মারলাম ২টি ছিটছিটে, ২টি ইম্পিরিয়াল, ১টি কটা, ১টি তিলে বাজ, ১টি সাপমারী। ইচ্ছে করলে প্রতি ধরনের একেক ডজন মারতে পারতাম।' অবাক কাণ্ড, মারেননি কেন!

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর্বে কেন্দ্রে ক্ষমতা হস্তান্তরের দলিলে ভরতপুরের মহারাজা জোর ক'রে একটি শর্ত জুড়ে দেন। তাতে বলা হয় যে, ঘানায় তাঁর আর তাঁর বন্ধুদের শিকার করায় তাঁরই থাকবে একার অধিকার। অন্যান্য গুরুতর বিষয় জড়িত ছিল

ব'লে সরকার পত্রপাঠ তাঁর এই প্রার্থনাপূরণে রাজি হয়ে যায়। সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত ক'রে মহারাজার একাই শিকারের এই সুবিধে ভোগ করার নীতিতে রাজ্যের মহারাজাবিরোধী দলের লোকেরা বেজায় বিক্ষুব্ধ হয়। অতীতের কুকর্ম আর অন্যায়অবিচারের জন্যে মহারাজাকে দণ্ডিত করার জন্যে তাঁরা চরম ব্যবস্থা নিতে চাইলেন। এই ব'লে তাঁরা এই অভিযোগে জোর আন্দোলন শুরু করে দিলেন যে, রাজা তাঁর নিজের ভোগের জন্যে আর দিল্লির দরবারে তাঁর প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী বন্ধুদের মনোরঞ্জনের জন্যে ঘানার অধিকার আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইছেন। এইভাবে তিনি নিজের স্বার্থে চাষযোগ্য ভালো জমি আটক ক'রে চাষের জমি আর জলের হাহাকারে যে গরিবেরা মরে যাচ্ছে, তাদের স্বার্থকে তিনি বলি দিতে চাইছেন। কুটিল রাজনীতিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় সরজমিনে ঘানার দফা রফা করার চক্রান্ত যখন রীতিমতো পেকে উঠেছে, সেই সময় দৈবাৎ আমি তা টের পেয়ে যাই। তখন আমি দুজন পক্ষিবিদ বন্ধুর সঙ্গে ভরতপুরে রয়েছি। দুই বন্ধুর একজন হলেন প্রখ্যাত কোয়েকার (বান্ধব সমিতিভুক্ত) হোরেস আলেকজাণ্ডার এবং অন্য জন ছিলেন ভারতীয় সেনা বাহিনীর তদানীন্তন চিফ ইঞ্জিনিয়ার জেনারেল সার হ্যারল্ড উইলিয়াম্‌স্। আমরা তিন জনই প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে ভালোমতন চিনতাম। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর গভীর প্রকৃতিপ্রেমের কথাও আমাদের জানা ছিল। কী ঘটতে চলেছে সে বিষয়ে আমরা তাঁকে অবিলম্বে জানাই এবং নাশকতা বন্ধ করার জন্যে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে বলি। জওহরলাল আমাদের কথায় সাড়া দিয়ে তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে, ঘানার প্রায় যায় যায় অবস্থার বড়োরকমের ফাঁড়া কেটে গেল। রফি আহ্‌মদ কিদোয়াই ছিলেন কৃষি ও সেচমন্ত্রী। খুব কর্মঠ আর দরদী মানুষ। জওহরলাল তাঁকে দিয়ে জমি আর জল বিষয়ে অভিযোগ খতিয়ে দেখে তাঁর মন্ত্রিসভার কুশলীদের দিয়ে এমন একটা সামঞ্জস্য করে নিলেন, যাতে ঐ সমস্যায় জড়িত সকলেই তাতে সন্তুষ্ট হল। এবং কালক্রমে গোঁ ধরা মহারাজাকে এমনভাবে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে আর তাঁর বিবেকের কাছে আবেদন ক'রে, শেষ পর্যন্ত এমন হল যে, তিনি তাঁর শিকারের একান্ত অধিকার ছাড়তে বাধ্য হলেন। এইভাবে ঘানা সেদিন ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল। সেই ঘানা এখন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বিরাট জলকুক্কুটনিবাস।

□

১৬

বাস্তার ১৯৪৯

১৯৪৯ সালে আমার পক্ষিসমীক্ষায় যাওয়ার আগে পর্যন্ত—বাস্তার আর কাঙ্কের—ব্রিটিশ রাজ আমলে ঈস্টার্ন এজেন্সির এই দুই উপজাতীয় রাজ্য যেখানে ছিল, সেখানকার জীবকুল সম্পর্কে প্রায় কোনো কিছুই কারো জানা ছিল না। কাজেই মাঠেঘাটে কাজ করে বেড়ানো প্রকৃতিবিজ্ঞানীর দিক থেকে এইফাঁক পূরণ করার ইচ্ছেটা আমাকে পেয়ে বসেছিল। ভারতের স্বাধীনতার তখন দু বছর হয়ে গেছে। রাজারা তখনও বহাল থাকলেও ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তায় তাদের গদি টলমল করছে। তখনও এ সবই ছিল জংলি জায়গা। 'সভ্যতা'র আর 'অগ্রগতি'র নাগালের খানিকটা বাইরে। আদিবাসীর স্বাভাবিক জীবনধারা তখনও অব্যাহত। কৃত্রিম শালীনতাবোধ মেয়েদের অনাবৃত ঊর্ধ্বাঙ্গের বিরুদ্ধে তখনও রক্তচক্ষু হতে পারেনি। বাস্তার ছিল তখন একেবারে অন্য রকম। তার সেই স্বভাবসুন্দর রূপ পরে আর থাকেনি। বিশেষ ক'রে, বাইলাডিলার ভূগর্ভে জাপানীরা বিপুল পরিমাণ লৌহ আকরের গন্ধ পেয়ে যাওয়ার পর। বারোমাস মোটরগাড়ি চলে, এমন রাস্তা ছিল ক্বচিৎ কোথাও। বাকি সবই ধুলোভর্তি পিচহীন। চতুর্দিকে তার অজস্র ফ্যাকড়া। যানবাহন বলতে দুচারটে প্রাইভেট বাস। তাও অনিয়মিত। নইলে অগতির গতি গরুর গাড়ি। বনজঙ্গলের পথঘাট আর গাড়ির চাকায় ক্ষতবিক্ষত অন্তর্দেশীয়, আদতে কাঁচা রাস্তা। বর্ষায় অগম্য। জঙ্গলের সুঁতির ওপর খড় আর বাঁশ দিয়ে জোড়াতালি দেওয়া সাঁকোগুলো বর্ষায় জলের তোড়ে ভেসে চলে যেত। সামরিক বিভাগের বেচে দেওয়া পুরনো ঝরঝরে কিছু জীপ ছাড়া চারচাকার আর কোনো গাড়ি যোগাড় করা অসম্ভব ছিল। সোঁতায় জল কমে গেলে দুপাশের ঝুরঝুরে বালিতে অথবা মাঝপথে পাঁকে বসে যাওয়া 'লোক'-মার্কা স্টেশন ওয়াগনের পাদানি অবধি জলে ডুবে যেত। তখন কাছে পিঠে লোক পাওয়া গেলে ঠেলাঠেলি ক'রে কোনোমতে সেই গাড়ি টেনে তোলা হত। এসব ক্ষেত্রে কাঠের কারবারের গাড়োয়ানদেরই বেশিরকম দুর্ভোগে পড়তে হত। বেশ কয়েকবার ঠেকে শেখার তিক্ত অভিজ্ঞতার পর ওয়াগন নিয়ে বেরোলেই আমি দুটো জিনিস সব সময় সঙ্গে রাখতাম। দুটো ক'রে কোদাল; আর সেইসঙ্গে একপ্রস্থ মুরগির খাঁচার

জাল—বালিতে পেতে দিয়ে যাতে এই জাল আঁক্‌ড়ে গাড়ির চাকা পেরিয়ে যেতে পারে। এর ফলে, রাস্তায় আট্‌কা প'ড়ে বিরসবদনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে লোক খোঁজার ঝঞ্ঝাট থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছিলাম। আরেক রকমের বিশ্রী অভিজ্ঞতার ঠেকে শেখার পর গাড়ির চালে বিশেষ রকমের ব্র্যাকেট লাগিয়ে সব সময় একটা সাইকেল রাখার ব্যবস্থা করে নিই।

একবার হয়েছিল কী, বেশ বড়োগোছের একটি গ্রাম গীদাম থেকে বিকেলে গাড়ি ক'রে আমরা বাস্তার রাজ্যের রাজধানী জগদলপুর যাচ্ছিলাম। গন্তব্যে পৌঁছুতে তখনও তিরিশ কিলোমিটার বাকি। হঠাৎ অ্যাক্সেল ভেঙে গিয়ে পেছনের একটা চাকা এমনভাবে ছিটকে গেল যে, গাড়ি কাত হয়ে পাশের নালায় পড়ার উপক্রম হল। স্থানীয় এক মালিকের একটাই বাস ঐ রাস্তায় একদিন অন্তর যাতায়াত করত। সেদিন সকালে সেই বাসটাকে এর আগে উল্টোমুখে আমরা যেতে দেখেছিলাম। হিসেব অনুযায়ী পরদিন সকালে এই পথ দিয়ে ঐ বাসটির ফেরার কথা। তখন সন্ধ্যে হয়ে আসছে। কাজেই গাড়ি থেকে মালপত্র খালাস ক'রে কাছাকাছি একটা খোলা মাঠে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা ক'রে পরদিন সকালের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই। রাত পোহানোর পর প্রাতরাশ সেরে বিছানাপত্র, ক্যাম্পখাট, রান্নাবান্নার তৈজসপাতি, বালতি, লণ্ঠন—আবার সর্বস্ব ঝটপট বাঁধাছাঁদা ক'রে সারা সকাল বাসের জন্যে হাপিত্যেশে বসে আছি। কিন্তু সূর্য অস্ত যাওয়ার পরেও আসা বা যাওয়ার কোনো বাসেরই টিকি দেখা গেল না। আমরা বুঝলাম কোথাও নিশ্চয় কিছু গড়বড় হয়েছে। সুতরাং আবার সব মালপত্র খোলাখুলি করে আরও এক রাত্তির দুশ্চিন্তার সঙ্গে কায়ক্লেশে কাটাতে হল।

শোনা গেল, এক মানুষ খেকো বাঘ দেখা দেওয়ায় এমনকী গোশকটের যাতায়াতও এক হপ্তার ওপর বন্ধ হয়ে যায়। আবার সেই পালা ক'রে সন্ধ্যায় মালপত্র খোলাখুলি আর সকালে সব বেঁধেছেঁদে বাসের জন্যে অধীর হয়ে অপেক্ষা করা। দিনের আলো চলে গেলেও, কোনোদিকে বাস আসাযাওয়ার কোনো চিহ্ন নেই। জগদলপুরে জরুরি বার্তা পাঠানোরও কোনো উপায় নেই। পরের দিন সকালের জন্যে আবার সেই হাঁ ক'রে বসে থাকা। আমি তখন ঠিক করলাম যে, আমাদের বেদের টোল দেখাশুনোর ভার গ্যাব্রিয়েল আর বাবুর্চির ঘাড়ে চাপিয়ে মাঝরাতের পর গরমের তাপ কমে গেলে আমি টুকুস টুকুস ক'রে পায়ে হেঁটে জগদলপুর যাব। সেই অনুযায়ী রাত দুটোয় উঠে চাঁদনি রাতের ঝকঝকে আলোর সুযোগ নিয়ে কাঁধে গুলিভর্তি মাউসার ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমার যাত্রাসঙ্গী হল অ্যান্টনি ডিসুজা (পূর্ব আফ্রিকা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা গোয়ার লোক; খুব শক্তপোক্ত ছোকরা)। বাঁশগাছ আর শালগাছ মেশানো ঘন বনের ভেতর দিয়ে রাস্তা। মাত্র দিন দশেক আগে শেষ যে মানুষটাকে বাঘে খেয়েছে, সে এরই আশপাশে কোথাও থাকত। বাঘটা এখন এখানেই আস্তানা গেড়েছে। এখন

উপলব্ধি করি যে, ঐভাবে হুট ক'রে বেরিয়ে পড়াটা আমার উচিত হয়নি। হঠাৎ কিছু ঘটলে রাইফেলের বাপের সাধ্যি ছিল না ঠেকায়। সব সময় একটা গা ছমছমে ভাব। ঐ বুঝি একটা ছায়া নড়ে উঠল, ঐ বুঝি ওৎ পেতে রয়েছে বাঘ। কিন্তু কীইবা করা যাবে—কবে কিছু একটা যানবাহন মিলবে, তার আশায় কতদিন আর বসে থাকা যায়। তাছাড়া, এই চড়া রোদে দিনের বেলায় অতটা পথ হেঁটে যাওয়ার কথাও ভাবা যাচ্ছিল না। বেচারা অ্যান্টনি ডিসুজার জন্যে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। ওর জুতো এমন এঁটে বসেছে যে, ওর কাঁটাছেঁড়া পা থেকে রক্ত সমানে গড়াচ্ছে। তখনও মাইলের পর মাইল হাঁটলে তবে আমরা গন্তব্যে পৌঁছুব। যেখানে ক্ষুধার্ত বাঘ থানা গেড়েছে, সেখানে ওকে একা ফেলে রেখেই বা যাই কী ক'রে। কাজেই ওর ঐ যন্ত্রণাকর অবস্থাতেও তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আমার উপায় ছিল না। জগদলপুর গিয়ে পৌঁছোলাম সকাল আটটা নাগাদ। একটুও না থেমে ঐ দূরত্ব পাড়ি দিতে আমাদের মোট ছ' ঘণ্টার মতো সময় লেগেছিল। পেছনে মানুষ-খেকো বাঘের ভয় তাড়া করাতেই এটা সম্ভব হয়েছিল। বাস কোম্পানির অমায়িক ম্যানেজার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণস্বামী (নাকি কৃষ্ণমূর্তি?) আমাদের প্রাতরাশে বাড়িতে তৈরি ইডলি খেতে দিলেন। সে অবস্থায় তার স্বাদ যেন ঐশ্বরিক ব'লে মনে হয়েছিল। তার সঙ্গে ছিল একেবারে সোনায় সোহাগার মতো খাঁটি মাদ্রাজী কফি। তার কিছুক্ষণর মধ্যেই আমাদের উদ্ধারকল্পে তিনি একটি গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন। সঙ্গে দিলেন কারখানার একজন তুখোড় মিস্ত্রি। আমাদের সেই লজ্ঝর স্টেশন ওয়াগনকে সে টেনে আনার ব্যবস্থা করবে। দিন দুই লাগল স্টেশন-ওয়াগনটাকে ঝালাই-পেটাই করে ঠিকঠাক করতে। তারপর আবার আমরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম।

সে সময়ে আজকের মতো বনজঙ্গলের এতটা কচুকাটা অবস্থা হয়নি। তবু তখনই যে বন্যপ্রাণিভাণ্ডার তলানিতে এসে ঠেকেছিল, ও অঞ্চলে মানুষখেকো বাঘের উৎপাত বেড়ে যাওয়া থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। উপজাতীয় ভীলসম্প্রদায় ব্যক্তিনির্বিশেষে সকলেই ছিল জাতশিকারি। স্থানীয়ভাবে তৈরি গাদাবন্দুক আর তীরধনুক নিয়ে বারোমাস তারা শিকার করে বেড়ায়। তার ওপর আছে বীজ বোনার আগে বচ্ছরকার বন ঝাড়া পরব। এই সময়ে আশপাশের মাইলের পর মাইল জুড়ে গ্রামগ্রামান্তরের জোয়ানমরদেরা বিরাট জঙ্গল টুঁড়ে শিকার করতে বেরোয়। ছোটবড়ো নির্বিশেষে সচল যা কিছু সামনে পায়—স্তন্যপায়ী জন্তু হোক, পাখপাখালি হোক, সাপগোসাপ হোক—সব কিছুই মেরে শেষ করে। বনের দেবদেবীদের তুষ্ট করতে আর ভালো ফসল হওয়ার মানসেই তাদের এই শিকার। বন আইনে নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও এসব ধ্বংসাত্মক প্রথা আজও অবাধে চালু আছে। বাস্তারে পক্ষিসমীক্ষার সময় জঙ্গলে পথ দেখাবার জন্যে আমি একজন আদিবাসী লোক রেখেছিলাম। ভীলরা যে কত বড়ো ওস্তাদ শিকারি, সে একবার তার নমুনা দেখিয়েছিল। তখন পর্যন্ত জানা ছিল

যে, জমকালো দেখতে বড়োসড়ো কালোপিঠ কাঠঠোকরা (ড্রায়োকোপাস জ্যাভেন্সিস) পাখিদের একমাত্র পাওয়া যায় বেলগাঁওয়ের উত্তরে পশ্চিমঘাট পর্বতমালায়। সে সময়কার আদর্শ নির্দেশক গ্রন্থ স্টুয়ার্ট বেকারের 'নিউ ফনা'তে এদের বাসস্থল বলা আছে 'দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থ ত্রিবাঙ্কুর থেকে বেলগাঁও'। অবশ্য এই গ্রন্থ প্রকাশের পরে গুজরাতে পক্ষিসমীক্ষা করে জানা গেছে যে, পশ্চিমঘাট থেকে উত্তর বরাবর সুরাটের ডাং অঞ্চলেও (খান্দেশ সংলগ্ন) এদের দেখতে পাওয়া যায়। সে যাই হোক, মধ্য ভারতের প্রত্যন্ত প্রান্তে এক আগাছার জঙ্গলে একটি বড়ো আকারের কালোপিঠ কাঠঠোকরা দেখে আমার অবাক লাগে। ব্যাপারটা জানার জন্যে আমি কৌতূহলী হই। আমার খুব আগ্রহ হয় ওটা ঠিক কী পাখি সেটা বার করার প্রয়োজনে তার একটা নমুনা সংগ্রহ করার। পাখিটা ছিল বেজায় মুখচোরা আর সজাগ। কেবলি সে দূরে সরতে থাকে। এক গাছ থেকে আরেক গাছে। বন্দুকের নাগালের অনেক বাইরে সে থেকে যাচ্ছিল। আধঘণ্টা ধ'রে চেষ্টা করেও কিছুতেই তাকে বাগে না পেয়ে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে শেষে আদিবাসি কাজের লোকটাকে বখশিসের লোভ দেখিয়ে বললাম—ওটা এনে দিতে পারলে ওকে আমি পাঁচ টাকা দেব। পাঁচ টাকাটাই ওর কাছে বিশাল অঙ্ক। আমার তখন চিন্তা, নমুনাটা না হাতছাড়া হয়। লোকটা আমার হাত থেকে বন্দুকটা টেনে নিয়ে সুট্ ক'রে ঘন কাঁটাঝোপের ভেতরে ঢুকে পড়ল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই একটা গুলির আওয়াজ কানে এল। তার দু মিনিট পরেই নমুনাটি সটান আমার হাতের মুঠোয়। লোকটা হলফ করে বলল যে, এ অঞ্চলে ও-পাখি হরহামেশা পাওয়া যায়। ওখানে এ পাখির নাম ভইসা-খিদ্‌রি। এই পাখি আর তার ছানার মাংস নাকি খুবই সুস্বাদু। লোকে তাই যখন তখন ওদের গর্তের বাসায় হানা দেয়। এটা শুনে বোঝা গেল, কেন ঐ পাখিদের সাংঘাতিক এত লোকভীতি। একই কারণে, ধনেশ আর অন্যান্য গর্তে থাকা পাখিও ক্রমশ বিরল হয়ে যাচ্ছে। কালোপিঠ কাঠঠোকরা এবং আর কিছু পাখিকে প্রধানত পশ্চিমঘাট ধাঁচের ব'লে মনে করা হত, তাদের বিস্তৃতি যে উপমহাদেশীয় ভারত ছাড়িয়ে পূর্বঘাট পর্যন্ত—বাস্তার কাঙ্কের পক্ষিসমীক্ষার এটা একটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ উদঘাটন। কেরল আর আর্দ্র দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে মালয়ী সাদৃশ্যযুক্ত প্রজাতিবর্গে এটি এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন, যার সঙ্গে সুস্পষ্ট প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে ইতিপূর্বে উল্লিখিত হোরা-র 'সাতপুরা হাইপথেসিস'-এর।

আমার আঞ্চলিক পাখি জরিপের পরম্পরায় এবার এল ঈস্টার্ন স্টেট এজেন্সির অন্তর্গত পাশাপাশি কয়েকটি 'দেশীয়' রাজ্য—ময়ূরভঞ্জ, বাদরামা, হামরা, কোরিয়া, কেওঞ্ঝার, নীলগিরি, ঢেঙ্কানল এবং আরও কয়েকটি। অন্তর্ভুক্তিকরণ আর রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে, এই সবক'টি সংলগ্ন রাজ্যই ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র আর উড়িষ্যার সঙ্গে মিশে যায়। গাছের ইজারাদার আর জঙ্গলের মুনাফালোলুপ ঠিকাদারের দল—বিশেষ ক'রে, ছোট ছোট রাজ্যগুলোতে—লুটেপুটে নিয়ে বনগুলো

ভূষ্টিনাশ করেছিল, তা সত্ত্বেও বনগুলো ভালোভাবেই বজায় ছিল। প্রধানত শালগাছের জঙ্গল। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলে উপজাতীয়দের মধ্যে পুরুষানুক্রমে প্রচলিত ঠাইনাড়া প্রথায় (জুমচাষ) বড়ো বড়ো এলাকা জুড়ে জমির খুবই অপকর্ষ ঘটেছিল। এজেন্সিভুক্ত রাজ্যগুলোর মধ্যে ময়ূরভঞ্জই বোধহয় সবচেয়ে বৃহৎ আর সুসংগঠিত রাজ্য ছিল। এই রাজ্যে বন্যপ্রাণিতে ঠাসা কয়েকটি ভালো ভালো জঙ্গল থেকে গিয়েছিল। মহারাজাদের অন্যতম সেরা শিকারক্ষেত্র সিমলিপাল এখন এমন একটি অভয়ারণ্য, যেখানে সর্বোচ্চ সংখ্যক বাঘ থাকে।

সরগুজা-র দীর্ঘজীবী মহারাজা তাঁর প্রজাপালক হিসেবে জন্মের মধ্যে একটি কর্মই আজীবন করে গেছেন, তা হল ব্যাঘ্রনিধন। নিজের রাজ্যে তো বটেই, খবর পেলে আশপাশে যত্রতত্র। সত্তর দশকের কোনো একটা সময়ে তিনি দেহরক্ষা করেন। তারই মধ্যে লজ্জার মাথা খেয়ে সর্বকালের রেকর্ড হিসেবে তিনি ১,১৭০-এরও বেশি বাঘ মেরে গেছেন। আমার মনে পড়ে, অভয়ারণ্য হওয়ার আগে আমি একবার কান্হা-র বন্যপ্রাণী সংরক্ষিত এলাকায় গিয়েছিলাম। ষাটের দশকের কোনো একটা বছরে। পাশেই একটি শিকারস্থলে তিনি ঘাঁটি গেড়ে বসেছিলেন। একদিন বিকেলে গাড়ি করে এলেন আমার সঙ্গে খেজুরে আলাপ করতে। সেইসময় মুখে কান এঁটো করা হাসি ফুটিয়ে আমাকে সহর্ষে জানিয়েছিলেন যে, সেদিন ছিল তাঁর জীবনের সেরা আনন্দের দিন—কেননা সেদিন প্রাতঃকালেই তিনি বাঘ মারার একাদশ শততম সংখ্যা পূর্ণ করেছেন। ঝড়ের মুখে পাতার মতন তাঁর কাঁপা কাঁপা হাত দেখে মনে হল, ভদ্রলোক কোনো রকমের পক্ষাঘাত রোগে ভুগছেন। আমি তাঁর কৃতিত্বের জন্যে অভিনন্দন জানিয়ে জিজ্ঞেস করলাম যে, এ অবস্থায় উনি বন্দুকে লক্ষ্য স্থির রাখেন কী ক'রে। মাচানের রেলিঙে হাতিয়ারাই ঠেকো দিয়ে রেখে মহামান্য রাজা বাহাদুর হয়তো বাঘ মারার আমেজ পান। কার যে কিসে রুচি হয় কে জানে। এর মাস কয়েক পরে এক অনুরাগী অভ্যাগত তাঁর কাছ জানতে চেয়েছিল জীবনে তিনি মোট কত বাঘ মেরেছেন। মহামান্য রাজা বাহাদুর তার উত্তরে জাঁক ক'রে বলেছিলেন 'মাত্র ১,১৪০'—বলার সময় 'মাত্র' কথাটার ওপর উনি জোর দিয়েছিলেন।

একই গোষ্ঠীভুক্ত তাঁরই আরেক 'মাসতুতো ভাই' কোরিয়া-র (পূর্ব মধ্যপ্রদেশ) মহামান্য রাজা বাহাদুর এক বিশেষ কীর্তির জন্যে অণীর্বণীয় অমরতা লাভ করেছেন। সেই বিশেষ কীর্তিটি হল এই যে একটি জীপে চড়ে চোখ ধাঁধাঁনো আলোর সাহায্যে হারাধনের দশটি ছেলের শেষ তিনটি চিতাও এক রাত্রের মধ্যে গুলি ক'রে মেরে সাফ করেন। ফলে, ভারতের মাটি থেকে এই প্রজাতিটি চিরতরে লোপ পেয়ে গেল।

১৭

ভটভটিতে বিলেত চষা

তাভোইতে তখন আমি সবে গিয়েছি। ১৯১৪-র শেষাশেষি। সেই প্রথম আমি আমার এক জেরবাদি বন্ধু এল. এম. মাদারের ৩.৫ অশ্বশক্তির এন. এস. ইউ চড়ি। তারপর থেকেই মোটরসাইকেলে আমার নেশা লেগে যায়। মোটরসাইকেল রাখা আর তাতে চড়ে বেড়ানোর বাতিক দিনের পর দিন বেড়েছে বৈ কমেনি। বোম্বাইয়ের রাস্তায় ক্রমবর্ধমান ভিড়ে কতবার যে মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছি, তার ঠিক নেই। এইসব কারণে আমাকে অনেক অনেক ক'রে বোঝানোর পর শেষপর্যন্ত ১৯৬৪ সালে আটষট্টি বছর বয়সে আমাকে মোটরসাইকেল চড়া ছাড়তে হয়। আমার সর্বশেষ বাহন ছিল ১৯৬৪ মডেলের শ্যাফ্ট্-চালিত ৫০০ সি-সির জোড়া সিলিণ্ডারের 'সানবিম'। সেটা ছাড়তে আমার বুক ফেটে গিয়েছিল। এর পরেও যখনই কোনো বি এম ডব্লু ভটভট করতে করতে পাশ দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেছে, তার দৃশ্য আর ধ্বনিমাধুর্যে সব সময়ই আমি রোমাঞ্চিত হয়েছি। হায়, স্বাধীনতার পর বিদেশে তৈরি মোটরগাড়ি আর মোটরসাইকেল আমদানিতে নানান বিধিনিষেধ আরোপ হওয়ার পর ভারতের রাস্তাঘাটে মান্ধাতা আমলের দু একটি ছাড়া তেমন সুজাতের সেইসব কুলীন যানবাহন এখন প্রায় চোখেই পড়ে না। অপেক্ষাকৃত হীন কুলের রাজদূত, জাওয়াস, এমনকী এনফিল্ড ঘরানার তস্য দাদাভাইদের দেখেও মনে তেমন নাড়া লাগে না। সুতরাং, কালেভদ্রে যখন বিদেশভ্রমণে যাই, একমাত্র তখনই আকাঙ্ক্ষা পূরণের মওকা মেলে। সেই সময় যেখানেই মোটরসাইকেলের কেনো প্রদর্শনী হয়, আমি গিয়ে দেখতে ছাড়ি না। বর্মায় আমার কাঁচা বয়সের দিনগুলোতে আমি পড়বার মধ্যে শুধু পড়তাম—মোটরসাইকেল সংক্রান্ত জার্নাল, পক্ষিবিষয়ক বই আর পত্রপত্রিকা, সাধারণ প্রকৃতিবিজ্ঞান। আর সেইসঙ্গে বড়ো বড়ো জানোয়ার শিকারের বই—বিশেষ ক'রে, যাতে ভারতের কথা থাকত।

১৯১৫ সালে অংশত হলেও কার্যত যে মোটরসাইকেলটি আমার অধিকারে আসে, তা ছিল তাভোইতে আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান জে. এ. আলি ব্রাদার্স অ্যাণ্ড কোম্পানির সম্পত্তি। সেটা ছিল ৩.৫ অশ্বশক্তির জোড়া সিলিণ্ডারের 'জেনিথ'। তার

ছিল বেল্ট-চালিত মেশিন কিন্তু গিয়ারবক্স ছিল না। তার বদলে লাগানো ছিল গ্র্যাজুয়া গিয়ার। বিজ্ঞাপনে তার বিশেষণ হিসেবে লেখা হত, 'অজেয়, সর্বজিৎ'। এই কৌশলটির লক্ষ্য ছিল ইঞ্জিনের সঞ্চালক কপিকলের ব্যাস কমিয়ে আনা, যার ফলে উচ্চ আর নিম্ন গতিবেগের মধ্য গিয়ারের হেরফের ক'রে আরও বেশি মাত্রার ব্যবস্থা করা যায়। পেট্রোল ট্যাঙ্কের ওপরদিকে আড়াআড়িভাবে বসানো থাকে একটা নব লাগানো ধরুনি—ট্রামগাড়ির ব্রেক কষার হাতলের মতো সেটা সরাতে নড়াতে হয়। এর পর পর্যায়ক্রমে হার্লে ডেভিডসন (বিভিন্ন অশ্বশক্তির তিনটি মডেল), ডগলাস, স্কট (জোড়া সিলিণ্ডারের জল দিয়ে ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থাযুক্ত দুই স্ট্রোকের), নিউ হাডসন। আর মাঝে মধ্যে স্বল্প মেয়াদে অন্যান্য মেক। সর্বশেষ ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় 'সানবিম'। বাস, ঐখানেই আমার মোটরসাইকেল চড়ার ইতি। শুধু একটা খেদ রয়ে গেল, একটা বি এম্ ডব্লু জোটাতে পারলে মনের সুখে মরতে পারতাম। বছর বছর মোটরসাইকেলের ইঞ্জিনের নকশায় কোথায় কী রদবদল ক'রে কী রকম কী উন্নতি ঘটানো হচ্ছে, এইসব নিয়ে আমি বুঁদ হয়ে থাকতাম। বিভিন্ন জার্নাল ঘেঁটে আর প্রস্তুতকারকদের ক্যাটালগে নির্দিষ্ট বিবরণ আর রোড টেস্টের ফলাফল সাগ্রহে লক্ষ্য ক'রে যেতাম। গোড়ার দিকে আমাকে যেন সুখে থাকতে ভূতে কিলোত। যন্ত্রটাকে জুড়ে তুড়ে ঠিকঠাক করার কাজে মেতে উঠতাম। যেমন আছে তেমনি থাকতে না দিয়ে ইঞ্জিনের ওপর কেরদানি ফলাতাম। ছুটির দিনে প্রায়ই আগাপাস্তলা খুলে ফেলে নতুন ক'রে আবার সব জোড়া লাগাতে বসতাম। এই করতে গিয়ে সর্বাঙ্গে তেলময়লা আর কালিঝুলি মেখে একসা হতাম। এসব হয়ে যাবার পর হাতে থেকে যেত বাড়তি একমুঠো বল্টু আর ইস্কুরূপ আর গুঁজি আর ওয়াশার। সেইসব দেখে অবাক হয়ে ভাবতাম—এসব যদি কাজে নাই লাগবে, তাহলে কোম্পানি অত বদান্যতা ক'রে আদৌ কেন এগুলো লাগাতে গেল। মেশিনের ভেতর বাইরে পুরোটাই আমি সযত্নে চকচকে ঝকঝকে করে রাখি। সপ্তাহান্তে কলকব্জাগুলো মেজেঘ'ষে আর রং বুলিয়ে মনটাকে হালকা করার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার বেশ আরামে কেটে যেত। যাদের এই শুচিবাই ছিল না, তারা যখন ঈর্ষার চোখে তাকাত, তখন আমি আহ্লাদে আটখানা হতাম। আমার চেয়েও হয়তো সেই মোটরসাইকেলওয়ালারা ঘটে ঢের বেশি বুদ্ধি রাখত।

স্বাধীনতার পর প্রেটার আর ম্যাক্যান যে যার দেশে ফিরে গেল। প্রেটার গেল যুক্তরাজ্যে আর ম্যাক্যান নিউজিল্যাণ্ডে। আমি ওদের জায়গায় সোসাইটির কিউরেটর আর যাবতীয় প্রকাশনার সম্পাদক হলাম। ১৯৫০ সালে ঠিক হয়, সেবার সুইডেনের উপ্সালায় আন্তর্জাতিক পক্ষিতাত্ত্বিক কংগ্রেস হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়ার পর পক্ষিবিদদের আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। লড়াই শেষ হওয়ার পর এটাই ছিল প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন। তাই পুনর্মিলিত হওয়ার আনন্দলাভের জন্যে সবাই এই সম্মেলনের জন্যে উন্মুখ হয়ে ছিল। আমাকে এই সম্মেলনে ভারতের

বেসরকারি প্রতিনিধি ক'রে পাঠানোর জন্যে সদস্যদের কাছ থেকে টাকা তুলে সোসাইটি একটি তহবিল গঠন করে।

মুষ্টিমেয় যে কয়েকটি ইউরোপীয় দেশে যুদ্ধের আদৌ তেমন আঁচড় লাগেনি, তার একটি হল সুইডেন। তাই সম্মেলনস্থল হিসেবে সুইডেনকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। আধুনিক জীববিদ্যায় নামনির্ঘণ্টর জনক কার্ল লিনেয়াসের জন্মস্থান উপ্সালা একটি ভারি মনোরম বিশ্ববিদ্যালয় নগর। জুন মাসে এই সম্মেলন হওয়ার কথা। ১৯৫০-এর ৪ঠা মে আমি বোম্বাই থেকে সঙ্গে 'সানবিম' নিয়ে পি. অ্যাণ্ড ও.-র এস্ এস্ স্ট্র্যাথেডেন জাহাজে উঠি। ইংলণ্ড আর বিলেত যাতে চষে বেড়াতে পারি, সেইজন্যেই ঐ মোটরসাইকেলটি সঙ্গে নিয়েছিলাম। ভারতবর্ষ থেকে চাকুরিতে অবসর নেওয়া আমার বন্ধুরা এ মুলুক সে মুলুকে ছড়িয়ে আছে। তাছাড়া নিসর্গ সংরক্ষণ আর জীবপ্রকৃতির সুরক্ষায় প্রকৃতিবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো দেখতে হবে—বিশেষ ক'রে, যার সঙ্গে পক্ষিকুল যুক্ত। শুভার্থীদের অযাচিত উপদেশ আর সাবধানীদের কুডাক অগ্রাহ্য ক'রে আমি স্বেচ্ছায় মোটরসাইকেল সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাই। সেটা যে খুবই উচিত কাজ হয়েছিল, পরে তা প্রমাণ হয়। সবদিক থেকেই এটা একটা কাজের কাজ হয়েছিল। আর আমি তা আগাগোড়া উপভোগ করেছি। এতে আমার খরচ ঢের কম পড়েছে। স্বচ্ছন্দে স্বইচ্ছায় ঘুরে বেড়াতে পেরেছি। অন্য কোনো উপায়েই তা সম্ভব হত না। যুদ্ধান্তে এমনিতেই তখন জনপরিবহণের ছন্নছাড়া অবস্থা। কোথাও যেতে চাইলে হোটেল বুক করা, ট্রেন ধরা, বাস ধরা—সব ঘড়ি ধ'রে করতে হবে। শেষ মুহূর্তে তার কোনোরকম নড়চড় করা শুধু কঠিন নয়, একেবারে অসম্ভব। মোটরসাইকেল থাকায় আমার ওসবের কোনো বালাই ছিল না। সময়ের কঠিন নিগড় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। টিলবেরি ডক থেকে ট্রেনে লিভারপুল স্ট্রীট স্টেশনে নেমে আমার তো চক্ষু চড়কগাছ। প্ল্যাটফর্মে অথই জনসমুদ্র। সবাই এসেছে নিজেদের লোকদের নিতে। লণ্ডনে আমি যাঁর অতিথি হব, সেই আমার পক্ষিতাত্ত্বিক বন্ধু মেইনেৎস্হাগেনের আমাকে নিতে আসার কথা। এ যেন জনমানবের খড়ের গাদায় দুই সূচের পরস্পরকে তত্ত্বতালাশ। দু তরফেরই চিন্তা কেউ কাউকে খুঁজে পাবে কিনা।

চিত্রবিচিত্র সেই জনারণ্যে দিশেহারা হয়ে ঠেলাঠেলি আর গুঁতোগুঁতি ক'রে এগোতে এগোতে দূরে হঠাৎ দেখি জনজটলার মাথা ছাড়িয়ে সেই একহারা ঢ্যাঙা মানুষটি পতাকাদণ্ডের মতন খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁর মাথায় কত রকমের যে বুদ্ধি খেলে। আর সবটাই ওঁর নিজস্ব। কারো কাছ থেকে একটা প্যাকিং বাক্স ভাড়া ক'রে এনে উনি দিব্যি তার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে আছেন। অতঃপর দুজনে দুজনকে খুঁজে পাওয়া গেল। মেইনের্ৎস্হাগেন থাকতেন এক সময়কার অভিজাত পল্লী কেনসিংটন পার্ক গার্ডেন্সের কাছঘেঁষা একটি স্বতন্ত্রপ্রায় ভিক্টোরীয় ভবনে। অর্ধশতাধিক বছর ধ'রে বস্তুত দুনিয়ার হেন জায়গা নেই যেখানে তিনি পাখির সন্ধানে যাননি। সেইসব

বিস্ময়কর সংগ্রহ তাঁর বাড়িতে রাখা আছে। সেইসব পক্ষিচর্মের সংখ্যা বেশ কয়েক হাজার। অসাধারণ নিপুণতার সঙ্গে নিজে হাতে নিখুঁতভাবে এসব তিনি করেছেন। তারপর ধরে ধরে প্রত্যেকটিতে লেবেল এঁটে তাদের তালিকাভুক্ত করেছেন। সেসব নিদর্শন নেড়েচেড়ে দেখেও আনন্দ হয়। মেইনের্ৎস্‌হাগেনের স্ত্রী অ্যানি জ্যাকসনও ছিলেন একজন বিশিষ্ট পক্ষিবিদ। ১৯২৮ সালের কাছাকাছি কোনো সময়ে রিভলভারঘটিত একটি দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান। (কু'লোকে এটাকে বানানো গল্প ব'লেও ধরে নেয়।) আমি যখন যাই তখন তাঁর বাড়িতে ছিলেন তাঁর বছর তিরিশেকের মনোরমা ভাগ্নী টেরেসা ক্লে। দক্ষিণ কেনসিংটন মিউজিয়ামে সে কীটপতঙ্গবিদের কাজ করত। টেরেসা ক্লে উকুনেপোকা বিষয়ক কীটতত্ত্বে বিশ্বের একজন প্রামাণিক ব্যক্তি হয়ে ওঠেন।

উনিশ শতকের শেষার্ধে লণ্ডনে ব্যারক ধরনের স্থাপত্যের অনুসরণে বাড়ি করার চল হয়েছিল। ১৭ নং কেনসিংটন পার্ক গার্ডেন্সের বাড়িটা ছিল সেইরকম সারি সারি লাগোয়া গৃহমালার একটি অংশ। এর থামওয়ালা সম্মুখভাগের সদর দরজা ছিল রাস্তার দিকে। খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে উঠোনের মতন একটা এজমালি বাগান পড়ে। এক-সারের তিনদিকের বাসিন্দারাও এর অংশীদার। সেটা ছিল জুন মাসের গোড়ার দিক। বিখ্যাত ডার্বির বার্ষিক ঘোড়দৌড় তখন আসন্ন। ডার্বির দিনে এপ্‌সমে অন্তরঙ্গ বন্ধুদের ডেকে নিয়ে গিয়ে দুপুরে পানভোজন ক'রে ফূর্তি করা—এটা ছিল মেইনের্ৎস্‌হাগেনের বরাবরের রীতি। সেই সময় লণ্ডনে থাকায় আমিও সেই দলে ঢুকে যেতে পেরেছিলাম। একটা আলাদা প্রমোদযান ভাড়া ক'রে আমরা জনা বিশ-তিরিশ তরুণ আর অতরুণ নারীপুরুষ মিলে এপ্‌সম ডাউন্‌স্‌-এ সারাটা দিন জমিয়ে খেয়েদেয়ে ফুর্তিফার্তা করে কাটাই। গাড়ির চালে উঠে আমরা রেস দেখি। অন্যান্য দর্শকেরাও আমাদেরই মতো কেউ উঠেছিল বাসের ছাদে কিংবা অন্য কোনো যুতসই জায়গায়। রেস দেখতে দেখতে অন্য হাজার হাজার লোকের সঙ্গে আমরাও গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছি আর জয়জয়কার দিচ্ছি। গাড়ি পার্ক করার জায়গাটাতে ঠাসবন্দি হয়ে আছে যেন গাড়ির অরণ্য। পাশেই রয়েছে একটা প্রমোদকানন। সেখানে জুয়ো আর 'কেরামতি' দেখানো নানা রকমের ভাগ্য পরীক্ষার খেলা। আমি ভাবতেই পারিনি মেইনেৎস্‌হাগেন এতটা হালকা মেজাজের আমুদে মানুষ হতে পারেন। যেখানেই যা মজার ব্যাপার, উনি হবেন তার পালের গোদা। ঘোড়ার নাগরদোলায় চড়ছেন, হো হো ক'রে হেসে গড়িয়ে পড়ছেন। দেখেই বোঝা যায়, তাঁর আনন্দ যেন ধরছে না।

এই ডার্বির প্রমোদবিহারে গিয়ে আমার মনে একটি জিনিস বিচ্ছিরিভাবে দাগ কেটে বসেছে। আমার আক্কেলগুড়ুম হয়ে গেছে সেখানকার টয়লেট দেখে। আজকের দিনে টয়লেটের এমন হতকুচ্ছিত ব্যবস্থা যে হতে পারে, আমি তা ভাবতেই পারিনি। একে খোলা জায়গা। তায় দিন বুঝে ঠাণ্ডাও পড়েছিল জবর। সেইসঙ্গে হাওয়া।

সুতরাং ঐ বিশেষ জায়গাটার চাহিদাও ছিল বেশি। শামিয়ানা ধরনের নকশাদার একটা তাঁবু খাটানো হয়েছিল। তাতে পার্টিশানের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ভেতরে ঢুকতে ৬ পেনি প্রণামী। ভেতরে ঢুকলে দেখা যাবে বিশ জনেরও বেশি লোক বোতাম খুলে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে। কোনো রকম আড়াল আবডাল নেই। একটা অগভীর সরু নালা ঘেষে আরও বিস্তর লোক লাইন দিয়েছে পয়সা দিয়ে হালকা হবে ব'লে। পসার জমে ওঠার ফলে সরু নালাটা উপ্‌চে দুপুর নাগাদ এমন অবস্থা হল যে, নরমূত্রের বদ্ধজলায় ছপ ছপ ক'রে এগিয়ে যার যার কাজ সারা ছাড়া উপায় রইল না। পশ্চাদ্‌পদ সভ্যতাতেও লোকে এটাকে নির্ঘৃণ্য বর্বরতা ব'লে গণ্য করবে। যে ইংরেজ সাহেব ভারতে 'নেটিভ'দের অস্বাস্থ্যকর বদভ্যেস দেখে এত নাক সিঁটকোয়, সেই সাহেবদের খাসমুলুকে এই কাণ্ড দেখে সেদিন আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। নাঃ, এ ব্যাপারে ভারতও ওদের টেক্কা দিতে পারবে না।

মেইনের্ৎস্‌হাগেনের বাড়ির লাইব্রেরিটা সত্যি তাকিয়ে দেখার মতো। সেখানে কী নেই। পাখির বিস্ময়কর সংগ্রহ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রকৃতিবিজ্ঞান আর বড়ো বড়ো জানোয়ার শিকারের বই—সব আছে। অনেক বইয়েরই প্রথম সংস্করণ। পুরনো বইয়ের সংগ্রাহকেরা পেলে লুফে নেবে এমন সব বই। আমি বিশেষভাবে অভিভূত হই ওঁর সযত্নে রাখা ডায়রি দেখে। ১৮৯০ বা তার কাছাকাছি কোনো সময় থেকে এই ডায়রি লেখার শুরু। ইটালিক ছাঁদে সমানভাবে টাইপ করা। চমৎকারভাবে চামড়ায় বাঁধানো বছরওয়ারি একেকটি খণ্ড। আফ্রিকায় ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোতে রাজকর্মচারী হিসেবে কাজ করার সময়কার নিজের নানা অভিজ্ঞতা আর বিচিত্র ঘটনাবলী ছাড়াও, তাতে সরকারি বেসরকারি সমসাময়িক লোকজনদের কাকে কেমন মনে হয়েছে, সে সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বৃত্তান্ত আছে। তা থেকে সে আমলের রাজনৈতিক আর সামাজিক হালচাল কেমন ছিল জানা যাবে। আর আছে নানা মানুষ আর ঘটনা সম্পর্কে স্পষ্টভাষী অভিমত আর মন্তব্য—প্রায়শ কটুকাটব্য, যা সব সময় উদার মনের বা নিরপেক্ষতার পরিচায়ক হয়নি। উনি বহুদিন মিলিটারিতে ছিলেন; তাছাড়া বহু বৈজ্ঞানিক আর শিকার অভিযানের সূত্রে আফ্রিকা আর অন্যান্য দেশে ঘুরেছেন। ঘোরাঘুরির সুবাদে বিপুল পরিমাণ যে বৈজ্ঞানিক তথ্যসামগ্রী ডায়রিতে লিপিবদ্ধ করেছেন, তার গুরুত্ব অপরিসীম। সবই তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিতে নিজের চোখে দেখা। তার দেখার চোখও ছিল অসাধারণ ধারালো।

তার 'এ কেনিয়া ডায়রি' এবং আরও বেশ কিছু অসামান্য বই এইসব ডায়রি ভিত্তি করেই লেখা। তাঁর জীবনীকাররাও এইসব ডায়রি দেদার ব্যবহার করেছেন। যেমন, জন লর্ড তাঁর 'ডিউটি, অনার, এম্পায়ার' (নিউ ইর্য়ক, র‍্যাণ্ডম হাউস, ১৯৭০) বইতে। আফ্রিকায় তাঁর রকমারি অভিযান আর শৌর্যবীর্যের কাহিনীর জন্যে খ্যাতির সঙ্গে তাঁর অখ্যাতিও জুটেছিল। গ্যাভিন ম্যাক্সওয়েলের লেখা একটা বই পড়লে

বোঝা যায় 'ওপারে'র লোকেরা তাঁকে কীরকম ভয়ভীতির চোখে দেখত। ম্যাক্সওয়েল তাঁর মাতুল লর্ড উইলিয়াম পার্সির কথা লিখেছেন। পার্সি নিজেও ছিলেন একজন পক্ষিবিদ। পার্সিকে স্মরণ করে তাতে লেখা হয়েছে 'তিনি (লর্ড উইলিয়াম) কর্নেল ডিক্ মেইনেৎস্‌হাগেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কেনিয়ায় নানা ডাকাবুকো কাজকর্মের জন্যে ডিকের কথা সবাই জানে। আমার কাছে তিনি ছিলেন রূপ কথার কোনো নায়ক। আমার একটা আলটপকা মন্তব্যের জবাবে পার্সি যা বলেছিলেন, তাতে তাঁর সেই দৈত্যকায় ভাবমূর্তিটাই আরও প্রকট হয়ে ওঠে। পার্সি বলেছিলেন 'শোনো গ্যাভিন, আগামী হপ্তায় ডিক মেইনেৎস্‌হাগেন থাকবেন। আমি হলে অমন কথা ওঁর সামনে ভুলেও মুখে আনব না—স্রেফ খালি হাত দিয়েই উনি মানুষ খুন করেছেন।"

'ইহুদিদের চাই আলাদা বাসভূমি'—এই মতের প্রবক্তা ড: ওয়াইজম্যান ছিলেন ডিকের অন্তরঙ্গ বন্ধু আর অনুরাগী। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ডিক যখন কিছুদিন প্যালেস্টাইনের সামরিক গভর্নর ছিলেন, তখন তাঁরা দুজনে মিলে বালফুর ঘোষণাপত্রটিকে বাস্তবে পরিণত করার পরিকল্পনায় সক্রিয় হন। ইস্রাইল যখন বাস্তবে রূপ পেল, তারপর বারবারই তিনি ওদেশে গিয়েছেন। প্রতিশ্রুতি ভূমিতে থাকার জন্যে চতুর্দিক থেকে চলে আসা ইহুদিদের তিনি ছিলেন একজন জোরালো সমর্থক। এটা সত্যি যে, তাদের একাগ্রতা, পরিশ্রম আর 'দেশপ্রেমে'র তিনি পঞ্চমুখে প্রশংসা করতেন। এর বিপরীতে তিনি মুসলিম আরবদের মধ্যে ভালো কিছুই দেখতে পেতেন না। তাদের সম্পর্কে তাঁর বিতৃষ্ণা খোলাখুলিভাবেই তিনি প্রকাশ করতেন। দেশ হাতে পাওয়ার পর অল্প সময়ের মধ্যে ইস্রায়েলিরা যেভাবে বৈষয়িক উন্নতি ঘটিয়েছে, তাতে অবাক না হয়ে পারা যায় না। ধূ ধূ মরুভূমিকে শস্যশ্যামলা ক'রে কৃষিতে তারা স্বয়ম্ভর হয়ে উঠেছে। একের পর এক কারখানা খুলে দ্রুত শিল্পায়ন সম্ভব করেছে। ওঁর এইরকমের একটি গুণগানে সাড়া দিয়ে একবার আমি ইস্রাইলে যাওয়ার ইচ্ছের কথা জানিয়ে, সেইসঙ্গে এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম যে, মুসলমান নামের দরুন হয়তো ওরা চাইবে না আমি যাই। ১৯৫৩-র মে মাসে একবার ইস্রাইল ঘুরে এসে মেইনেৎস্‌হাগেন আমাকে লেখেন :

> আকাবা উপসাগরে মরুসাগরের ওপর দিয়ে জর্ডান উপত্যকা পর্যন্ত দেশান্তরী হওয়া বাজ, সারস আর শঙ্খচিল দেখে দেখে ক'দিন তোফা সময় কাটিয়ে এলাম। ইস্রায়েল যাওয়ার ব্যাপারে তোমার মন খুঁতখুঁত করার কোনো কারণ নেই। ওদেশে শ্রেণিবৈষম্য, ধর্মীয় উৎপীড়ন, রাজনৈতিক নির্যাতন—এসবের কোনো বালাই নেই। সেখানে তুমি পাবে একনায়কত্বের আপত্তিকর উপসর্গবিহীন সবচেয়ে নির্ভেজাল সাম্যবাদ। কমিউনিস্ট হোক বা দক্ষিণপন্থী রক্ষণশীলই হোক, সেদেশের প্রত্যেকটি লোক ইস্রায়েলি সরকারের অনুগত। ছ'টি মুসলিম আরব রাষ্ট্র তাকে ঘিরে রেখেছে—এই প্রতিকূল অবস্থাতেও কোনো দেশ যে এতটা এগিয়ে যেতে পারে, এ আমি আর কোথাও দেখিনি। দেশময় উৎসাহ উদ্দীপনা, অগ্রগতি আর দেশপ্রেমের হাওয়া। কোথাও আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ

কিংবা আত্মাভিমানের লেশমাত্র চিহ্ন নেই। যে মানবিক গুণ আজ বিরল, সেই বিনয়—বলতে কী, সেই বিনয়নম্র ভাব তুমি সবার মধ্যে পাবে। আমার বিশ্বাস, মধ্য প্রাচ্যে একমাত্র ইস্রায়েলই কালজয়ী হবে। তুমি যাও, নিজের চোখে দেখে এসো।...দুনিয়ার কোথায় জগাখিচুড়ির একশেষ হয়ে আছে কোন্ দেশ? কোনো ভজকট নেই, এমন দেশ দুনিয়ায় আছে কি? আফ্রিকা আর এশিয়া—দুই মহাদেশই এখন জেগে উঠছে; হাই তোলার পর্ব শেষ ক'রে এখন তারা নিজের পায়ে ভর ক'রে উঠে দাঁড়াচ্ছে। তবে এ নিয়ে ওরা অত গলাবাজি না করলেই ভালো হত।

হপ্তাখানেক ইংলণ্ডে কাটালাম। ইংলণ্ডে বসন্ত সত্যিই ঋতুরাজ। চারদিকে চোখজুড়ানো দৃশ্য। পরিচিত বন্ধুরা সবাই নানা প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। মোটরসাইকেল চালিয়ে তাদের বেশ কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করেছি। তারপর সুইডেনের একটা ট্যুরিস্ট জাহাজ ধ'রে সোজা গোটেনবার্গ। বন্ধুদের পরিচয়ে তাদের বন্ধুদের সঙ্গে এক রাত কাটালাম শিল্পশহর ওরেব্রোতে। পরদিন বিকেলে উপ্সালায় যথাসময়ে পৌঁছেছি সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনের ঠিক আগে। সোজা ভারতবর্ষ থেকে ভটভটিতে ক'রে একেবারে ঠিকসময়ে সম্মেলনে পৌঁচেছি, কম কথা। এই নিয়ে প্রতিনিধিদের মধ্যে আর আমার বন্ধুমহলে মৃদু উচ্ছ্বাস দেখা গেল। আমার ভটভটিতে দু দুটো ঢাউস বাস্কেটব্যাগ, তাতে আমার যাবতীয় সাজপোশাক ঠাসা। এমনকী অনুষ্ঠান বিশেষে পরার কালো শেরোয়ানিও ছিল তার মধ্যে। পরে বুঝেছিলাম যে, অতসব হাবিজাবি সঙ্গে ক'রে বয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনো দরকারই ছিল না। ব্যাগগুলো খুলে রাত্রিবাসের হোটেলের ঘরে বয়ে নিয়ে যাওয়া যেত। মালপত্র নেওয়ার পক্ষে উপযোগী হলেও, এত ভারী যে তাতে রাস্তার ঝাঁকুনিতে টাল সামলানো দায় হয়। ছোটখাটো ইউরোপীয় শহরে আর গ্রামাঞ্চলে পিছল খোয়া রাস্তায় গাড়ি জোরে চালালে পদে পদে বিপদে পড়ার ভয় থাকে। এর ফলে বেশ কয়েকবার আমি রাস্তায় আচমকা ছিট্‌কে পড়েছি। মনে আছে জার্মানির যুদ্ধবিধ্বস্ত মুনস্টার শহরে ঢোকার মুখে একবার তো যাচ্ছেতাই ব্যাপার হয়েছিল। স্কিড্ ক'রে পুরো পাক খেয়ে আমি একেবারে মাঝরাস্তায় ছিটকে পড়ি। অল্পের ওপর দিয়ে গিয়েছিল ব'লে ঠেলে উঠে ফের যাত্রা শুরু করতে পেরেছিলাম। খুব একটা চোট পাইনি। কিন্তু বরাতজোর সেদিন গাড়িচাপা পড়ার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলাম। ঠিক সেই সময়টা ঐ রাস্তায় কোনো গাড়িঘোড়া ছিল না। এমনিতে ওখান দিয়ে এক ডজনের বেশি মোটরগাড়ি ঘাড়ে নিয়ে বিশালাকার সব ট্রাক যাতায়াত করে। আনকোরা নতুন সব গাড়ি, কারখানা থেকে যায় গাড়িবিক্রেতাদের আড়তে। ট্রাকগুলো বজ্রনির্ঘোষে পাশ দিয়ে গেলেই আমার বুক কেঁপে ওঠে। আমার ছিট্‌কে পড়ার মুহূর্তে তার পুনরাবৃত্তি জীবনযাত্রার পালা ওখানেই সাঙ্গ হয়ে যেত।

ফরাসি মোটরচালকদের সম্বন্ধে আর তাদের জোরে চালানোর বাতিকের বিষয়ে

আগে থেকেই আমাকে টিপে দেওয়া হয়েছিল। বিশেষ ক'রে সাবধান হতে বলা হয়েছিল ফরাসি ট্রাকচালকদের সম্বন্ধে। প্যারিসের রাস্তায় কয়েকবার একচুলের জন্যে বেঁচে গিয়ে হাতে হাতে তার প্রমাণ পেয়েছি। ফরাসি চরিত্রের আরও কয়েকটা দিক যা দেখেছি, আমার কাছে রুচিকর ব'লে মনে হয়নি। অন্তত রাজধানীর ফরাসিদের। প্যারিস ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বহুবার এর দরুন আমাকে দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে। এটা কেবল কোনো ব্যক্তিবিশেষের সদ্ভাব আর সৌজন্যের অভাব ব'লে আমি মনে করি না। নিজেদের ভাষা নিয়ে ফরাসিরা বড়ো বেশি জাঁক করে। এটা হয়তো তারই উৎকট প্রকাশ আর ইচ্ছাকৃত হামবড়াই। প্যারিসে আমি নতুন। রোজ বেরোবার আগে শহরের রাস্তাঘাটের ম্যাপ খুঁটিয়ে দেখে নিই। কি হলে কী হবে, হঠাৎ কোথাও মেরামতির জন্যে রাস্তা বন্ধ থাকলেই চিত্তির। রাস্তা আর বুলেভার্ডের গোলোকধাঁধায় ঘুরে যাওয়ার আর উপায় থাকে না। দুঃখের বিষয়, ফরাসি বলতে পারি না। যখনই দাঁড়িয়ে প'ড়ে রাস্তার কোনো লোককে জানা ইংরিজিতে নম্রবচনে রাস্তা জিজ্ঞেস করি, আমার দিকে একবার তাকিয়েই ঘাড় ঘুরিয়ে হাঁটা দেয়। তার হাবভাবে দুঃখপ্রকাশের এমনকী ভানটুকুও ফুটে ওঠে না।

ধানঠুটিদের বিস্ময়কর প্রজননক্ষেত্র আমি প্রথম দেখি ১৯৪৪ সালে কচ্ছের বৃহৎ রান এলাকায়। সেই থেকে এই পাখির ওপর আমার বিশেষ টান। উপ্সালার সম্মেলনে কয়েকজন মার্কিন আর ইউরোপীয় পক্ষিবিদের সঙ্গে দেখা হয়; তারা সকলেই ধানঠুটির অনুরাগী। এ নিয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ও হয়। রান এলাকায় আমার অনুসন্ধান বিষয়ক লেখা তাঁদের পড়া ছিল। স্বভাবতই কামার্গেতে (দক্ষিণ ফ্রান্স) আর স্পেনের গোয়াদালকুইভার বদ্বীপে গিয়ে ইউরোপীয় নীড়ক্ষেত্রের বাস্তুগত তুলনামুলক বিচার করার আমার খুব আগ্রহ ছিল। 'মুজি দ্' ইস্তেয়ার নাচুরেল-এর সঙ্গে যুক্ত ফরাসিদের পক্ষিবিদ প্রবীণ পণ্ডিত অধ্যাপক জে. বার্লিওজ আমার জন্যে অনুগ্রহ ক'রে কামার্গের ধানঠুটি ক্ষেত্রের ওয়ার্ডেনের কাছে একটি পরিচয়পত্র লিখে দেন।

ড. লুক হফম্যান তখন সুইজারল্যাণ্ডের একজন তরুণ পক্ষিবিদ। পরে তিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এর পরে তিনি নিজের একটি জীবতত্ত্ববিষয়ক গবেষণাকেন্দ্র গড়ে তোলেন। 'স্টেশন বায়োলজিক দু লা ভালাৎ' নামে দেশেবিদেশে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। সেখান থেকে ঐ অঞ্চলে পাখি সংক্রান্ত কাজ করার সবরকম সুবিধে পাওয়া যেত। যেবার উপ্সালায় যাই, সেবার হফম্যান একদিন দুপুরে খেতে বলেন। রাত্রে আমি যেখানে ছিলাম, সেখান থেকে তাঁর বাড়ি শ'খানেক কিলোমিটার দূরে। ১টা নাগাদ পৌঁছে যাব, এইভাবে সময় আন্দাজ করে আমি রওনা হই। ফরাসি ট্রাক-ড্রাইভারদের গণনার মধ্যে না আনায়, কার্যত আমার গন্তব্যে পৌঁছতে সাড়ে ৪টে বেজে যায়। কপাল চিরে গভীর ক্ষত, হেডলাইট ভেঙে চুরমার, মেশিনের নানা জায়গা দোমড়ানো মোচড়ানো। তবু ভালো যে, এ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সশরীরে

পৌঁছুতে পেরেছি। আমি যখন এক জায়গায় বাঁক নিচ্ছিলাম, সেই সময় বোঝাই মালপত্রসমেত একটা ট্রাক মোড়ের মাথায় 'ফরাসিসুলভ গতিবেগে' এসে প্রায় মুখোমুখি বিশ্রীভাবে ধাক্কা মেরে আমায় ছিট্‌কে ফেলে। আমাকে চিৎপটাং হয়ে পড়ে যেতে দেখে তারা মাতৃভাষায় কিছু একটা উগ্‌রে দিয়ে (নিশ্চয় কুবাক্যই হবে) যেন অমন হয়েই থাকে এমনি ভাব করে নির্বিকারভাবে চলে গেল। পেছনেই আসছিলেন এক সদাশয় ব্যক্তি। তিনি করুণা ক'রে আমাকে তাঁর গাড়িতে তুলে নেন। আমার জামাকাপড় রক্তে ভিজে গেছে। আর্লে শহরের কয়েক মাইল দূরে খ্রিস্টান নান্‌দের পরিচালিত একটা ছোট হাসপাতালে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেন। সদয় সন্ন্যাসিনীরা কেউই ইংরিজি জানতেন না। আমাকে অতি কষ্টে স্রেফ মূকাভিনয় ক'রে (মনে পড়লে এখন হাসি পায়) কোন্ অবস্থাগতিকে এমনটা ঘটেছে তা বোঝাতে হল। অ্যান্টি টিটেনাস ইঞ্জেকশান আগে নিয়েছি কিনা, এ ব্যাপারে তারা বিশেষ চিন্তিত ছিলেন। আমি হাতমুখ নেড়ে ইশারায় বুঝিয়ে দিলাম যে নেওয়া আছে। দয়াবতী সিস্টাররা আমার ক্ষতস্থান সেলাই করে দিলেন। জামাকাপড়ের রক্ত ধুয়ে মুছে দিলেন। তারপর হাসপাতালের রুগি হয়ে রাত্তিরে থেকে যাওয়ার জন্যে নাছোড়বান্দা হলেন। মুখে কথা না ব'লে কেবল ইশারায় জেদাজেদি ক'রে শেষ পর্যন্ত রেহাই পেলাম। তারপর হাতমুখ নেড়ে কৃতজ্ঞতা জানানো, সেও আবার আরেক পর্ব। হফম্যানের টেলিফোন নম্বর না থাকায় তাঁকে খবর দেবার জন্যে ওদের অনুরোধ জানানা সম্ভব হল না। সানবিম তখনও যেখানকার সেখানেই কাত হয়ে পড়ে ছিল। জায়গাটাতে পৌঁছুবার জন্যে ওঁরা একটা ট্যাক্সি ডেকে দিলেন। অন্যের সাহায্য নিয়ে তোবড়ানো জায়গাগুলোতে ঘা মেরে সোজা ক'রে কোনোরকমে জুড়েতুড়ে নিয়ে তাতে উঠে ব'সে গাড়িতে দিব্যি স্টার্ট দিলাম। রাস্তায় আর কোনোরকম বেগ পেতে হল না। এদিকে আমি 'বেপাত্তা' দেখে, গৃহকর্তা ঘাবড়ে গিয়ে কিছু একটা ব্যবস্থা নেওয়ার কথা যখন ভাবছেন, ঠিক সেই সময় মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় সেখানে গিয়ে প'ড়ে আমার ভোগান্তির কথা বলি।

আমার দুর্ভাগ্য যে, কামার্গে জুলাই মাসটা আদৌ ধানঠুটিদের বাচ্চা দেওয়ার সময় নয়। তবু তাদের বাসস্থল আর তৎকালে অব্যবহৃত বাসাগুলো দেখে কৌতূহল মেটাতে পেরেছিলাম। দেখলাম কচ্ছের রানের সেই ধানঠুটি-পাটনের চেয়ে এ-জায়গায় সহজেই পাখির বাসাগুলোর নাগাল মেলে। ভালো মরশুমে দেখা গেছে, কামার্গে প্রায় ৭,০০০ জোড়া পাখি বাসায় এসে থাকে। অধিকৃত নীড়ের ভিত্তিতে ১৯৪৫ সালে এ পর্যন্ত চলনসই গোছের নির্ভরযোগ্য হিসেবে দেখা গেছে, কচিকাঁচা সমেত স্ত্রীপুরুষ ধ'রে ধানঠুটি-পাটনে কচ্ছে পাখির মোট সংখ্যা দাঁড়ায় আনুমানিক পাঁচ লক্ষ। তাওয়ানো হচ্ছে, তখনও ফোটেনি—এমন ডিম এই হিসেবে ধরা হয়নি। লম্বা লিপ্তপাদ ধানঠুটিদের (ফিনিকোপটেরাস রুবের) কচ্ছের উপনিবেশই হল এশিয়ার

সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ। আর কোথাও এত বড়ো বসতি আছে ব'লেও মনে হয় না। আমার কাছে ১৯৪৫ সালের ধানঠুটি-পাটনের স্মৃতি বিশেষত এই কারণে মনের মধ্যে রয়ে গিয়েছে যে, এর আগে বা পরে যতবার দেখতে গিয়েছি—সেবারের মতো বাচ্চা দেওয়ার এমন চূড়ান্ত মরশুম আর দেখতে পাইনি। আমার ভাগ্য ভালো ছিল বলতে হবে।

সম্মেলন শেষ হওয়ার পর উপ্‌সালা থেকে আমি দুটি মনোমত সফর বেছে নিই। একটি সুইডিশে ল্যাপল্যাণ্ডে আবিস্কো আর অন্যটি সুইডেন নরওয়ে সীমান্তে রিক্‌স্‌গ্রন্‌সেন। পথে কী অপূর্ব দৃশ্য কী বলব, সে যেন এক রূপকথার জগৎ। তুষারাবৃত পর্বতশিখর, খরস্রোতা নদীনির্ঝরিনী আর আংশিক বরফে জমাট ঝিল আর বিল। জুনের মাঝামাঝি। পাখিদের নীড় বাঁধার মরশুম তখন তুঙ্গে। বিশেষ ক'রে আমার মন টেনেছিল আমাদের শীতকালীন ভারতীয় সখাসখিরা—কাষ্ঠচূড়া, ছোট গুলিন্দা, রক্তকণ্ঠ সদামাথা বাটান, ঠোঁটচওড়া বালুবাটান, দুটি জৌরালি আর দুটি ছোট্ট গাংতিতই—উত্তরমেরুর খাসমোকামে গ্রীষ্মে তাদের রূপের কী বাহার।

আবিস্কোতে ভ্রমণার্থীদের জন্যে কাঠের কুঁদোয় তৈরি লগ-কেবিনে আমাদের তোলা হয়েছিল। তারই একটাতে ভাগ করে ছিলাম আমি, ওয়াইল্ডফাউল ট্রাস্টের পিটার স্কট আর ফিন্নুর গুডমুণ্ডসন। আইসল্যাণ্ডের গুডমুণ্ডসন এক দৈত্যকায় পুরুষ—এমন বিশালাকার দশাশই চেহারা আমি জন্মেও দেখিনি। একটি জিনিস আমার কখনই ধাঁতে সয় না। একটা কেবিনে কিংবা উঁচু পাহাড়ে একই তাঁবুতে কারো সঙ্গে আছি, ঘুমোলে যার নাক ডাকে—একথা ভাবলেই আমার গায়ে জ্বর আসে। গুডমুন্ডসনের সঙ্গে আলাপ ছিল না। এই প্রথম দেখছি। ওর জীবনবিষয়ক কোনো খবরই আমার জানা নেই। এও জানি না যে, ওর নাক-ডাকার দৌড় ঠিক কতটা। কাজেই প্রথমেই যখন দেখলাম আমাদের ছোট্ট ঠাঁই ওর দানবীয় বিশাল বপুতে ঢেকে গেছে, আমার বুক হিম হয়ে গিয়েছিল। কী ক'রে রাত কাটাব, এই ভেবে আমার তখন আতঙ্ক। হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলাম, যখন দেখা গেল ভয়টা ছিল অমূলক। ফিন্নুরের মতন অমন দৈত্যকায় এত আক্কেলমন্ত হয় যে, ঘুমোলে তার নাক ডাকে না—এটা বিশ্বাসই করতে পারিনি। দেখা গেল, লোকটা যেমন নিরীহ গোবেচারা, তেমনি বন্ধুভাবাপন্ন। পক্ষিবিদ্যায় ওর যথেষ্ট এলেম। ওর মনোমুগ্ধকর দেশ আর তার পক্ষিজীবন সম্পর্কে ওর কাছ থেকে আমি অনেক কিছু জেনেছি।

দেখতে পাচ্ছি, পরের দিকে সোসাইটির ঘটনাবলীর সঙ্গে আমি যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছিলাম। ১৯২৪ সালে বোম্বাই থেকে ফিরে এবং বিশেষ ক'রে, স্বাধীনতার পর সোসাইটির সঙ্গে আমি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম। ব্যক্তিগতভাবে সেটা ছিল আমার জ্ঞানপিপাসা মেটানোর পক্ষে ভারি সুসময়। সেইসঙ্গে এটাও অনুভব ক'রে আনন্দ পাই যে, ঐ সময়ে সোসাইটির লক্ষণীয় উন্নতি ঘটে; দেশেবিদেশে যথোচিতভাবে

তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। স্বাধীনতার পর পরই, যখন আমি সচিব হয়েছি এবং সেইসঙ্গে আপাতভাবে কিউরেটর হিসেবেও কাজ চালাচ্ছি, সেই সময় গ্রেটার আর চার্লস্ ম্যাকান দেশে ফিরে যায়। স্বাভাবিক সময় হলে গ্রেটারের শূন্যস্থান পূরণ করত ম্যাকান। কিন্তু দুজনেই চলে যাওয়ায় সোসাইটির মাথায় হাত। গ্রেটারের জায়গায় সুযোগ্য লোক পাওয়া এক সমস্যার ব্যাপার। ওদের গুণমানের সঙ্গে তুলনীয় কাউকে পাওয়া সহজ কথা নয়। সুতরাং, অনেকরকম পরীক্ষানিরীক্ষা ক'রে শিক্ষানবিশদের ভেতর থেকে ঝাড়াই-বাছাই ক'রে শেষ পর্যন্ত এমন লোক নেওয়া হল, যারা অভিজ্ঞতায় কাঁচা হলেও ভবিষ্যতে দাঁড়িয়ে যাবে।

এই প্রসঙ্গে একটা অভাবিত রকমের যোগাযোগ হওয়ার ঘটনা মনে পড়ে গেল। এ গল্প আগেও আমি এখানে সেখানে বলেছি। আরেকবার বললে কোনো ক্ষতি নেই। নির্বাচিত প্রার্থীদের মধ্যে ছিল প্রাণিতত্ত্বে এম এস সি পাশ কেরলের এক ছোকরা। ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজে দীর্ঘ মেয়াদের শারীরিক ধকল থাকে ব'লে সাধারণত বেশির ভাগেই মধ্যেই থাকে পারতপক্ষে তা এড়িয়ে যাওয়ার ঝোঁক। অথচ দেখে অবাক হলাম—এই ছেলেটির এ কাজে শুধু আগ্রহ নয়, মাঠেঘাটে ঘোরার জন্যে সর্বক্ষণ সে উদ্‌গ্রীব। ছেলেটির এমন আলাদা ধরনের হওয়ার পেছনে কী কারণ রয়েছে, আমি তা জানার চেষ্টা করি। কথায় কথায় আমি ওকে জিজ্ঞেস করি যে, কেরলের জীবনায়কমের নাম ও কখনও শুনেছে কিনা। ১৯৩০-এর বছরগুলোতে রাজদরবারের সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারি স্কুলে অনাচারের যে অভিযোগ উঠেছিল, সে বিষয়ে তদন্তের জন্যে শিক্ষাজীবীদের নিয়ে একটি ভ্রাম্যমাণ কমিটি (স্ট্র্যাথাম কমিটি) গঠন করা হয়। জীবনায়কম ছিলেন তার সদস্য সচিব। ১৯৩২ সালে পাখি জরিপের সুবাদে ঐ রাজ্যে আমাকে ঘুরতে হচ্ছিল। তখন একই জায়গায় ওঠার ফলে বিভিন্ন ডাকবাংলোয় কিংবা পটমণ্ডপে প্রায়ই আমাদের দেখা হয়ে যাচ্ছিল। যখনই ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, আমি ওঁর অমায়িক অন্তরঙ্গ ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছি। পাখি সংক্রান্ত আমাদের কাজের বিষয়েও ওঁর খুব আগ্রহ দেখেছি। এরপর আর জীবনায়কমের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়নি। ছেলেটা যখন কেরলের লোক, জীবনায়কমের হদিশ ও হয়তো জানলেও জানতে পারে। ওকে তাই হাতের কাছে পেয়ে জিজ্ঞেস করা। মোটে বিশ বছর আগে ত্রিবাঙ্কুরে যাঁর সঙ্গে আমার আলাপ, একই দেশের লোক হিসেবে ড্যানিয়েল তাঁকে জানে কিনা—কৌতূহলেই আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। এর যা ফল দাঁড়াল, তা কোটিতে গোটিক মেলে। নিজের কানকেই আমি যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না জীবনায়কম অন্য কেউ নন, ড্যানিয়েলের খোদ পিতৃদেব। দক্ষিণ-ভারতীয় প্রথা অনুযায়ী জে. সি. ড্যানিয়েলের 'জে' হল 'জীবনায়কমে'র আদ্যাক্ষর। আমি এমনই তালভোলা যে, সেটা আমার মাথায়ই আসেনি।

এবার ফিরে আসি ১৯২৯ সালে আমার দুর্ভাগ্যের কথায়। ভবিষ্যতের কথা

ভেবে আমি বিশেষজ্ঞের তালিম নিতে ভারতে তখন এমন কোনো উপযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বা বিদ্বৎপ্রতিষ্ঠান খুঁজে পাইনি, যেখানে সেইরকমের শিক্ষা আমি পেতে পারি। যখন আমরা এই ঘাটতি দূর করার মতন প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা আর এলেম অর্জন করেছি, তখন বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়কে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করাতে পারলাম যে, সোসাইটিকে তারা সেই স্বীকৃতি দেবে যার জোরে ক্ষেত্রগত পক্ষিবিদ্যায় সোসাইটি স্নাতকোত্তর গবেষণার পরিচালক হতে পারবে এবং তার ফলে, প্রাণিতত্ত্বে তার মাস্টার আর ডক্টর ডিগ্রি দেবারও অধিকার থাকবে। এম-এস-সিতে আমার প্রথম ছাত্র ছিল পুণার বিজয়কুমার আম্বেদকর। তার গবেষণাপত্রের বিষয় ছিল "তালবাবুইয়ের (প্রসিয়াস ফিলিপিনাস) বাস্তুসংস্থান আর প্রজনন জীবতত্ত্ব'। বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে তার ক্ষেত্রে একজন বহির্দেশীয় পরীক্ষক হিসেবে ড. ডেভিড ল্যাক এফ-আর-এস-কে (অক্সফোর্ডের এডওয়ার্ড গ্রে ইনস্টিটিউট অব ফিল্ড অর্নিথোলজি-র পরিচালক)। নিয়োগ করতে আমি ব'লে ক'য়ে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজি করাই। ড. ল্যাক ঐ গবেষণাপত্রের যে মূল্যায়ন করেন তা আমাদের মনে ভরসা যোগায়। দু একটি গৌণ বিষয়ে ত্রুটি উল্লেখ করার পর তিনি বলেছিলেন :

> বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এস-সি-র মান ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রায় সমতুল্য ধরে নিয়ে আমার অভিমত এই যে, উপস্থিত গবেষণাপত্রটি ডিগ্রি পাওয়ার যোগ্য এবং যথোচিত মানোপযোগী।...গবেষণাপত্রটি খুবই আগ্রহোদ্দীপক, স্পষ্টভাষায় বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক যাবতীয় তথ্য আয়ত্তে এনে তার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে মৌলিক গবেষণা। সুতরাং, আমার বিচারে এই গবেষণাপত্র সর্বতোভাবে উপাধিলাভের যোগ্য।

সোসাইটির পরিচালনাধীনে আমি নিজে প্রাথমিক অর্থদান ক'রে একটি তহবিল গড়ে তুলি। তার নাম দেওয়া হয় 'সেলিম আলি লোক পক্ষিতাত্ত্বিক গবেষণা ভাণ্ডার, (ইংরিজি আদ্যাক্ষরে সংক্ষেপে 'সালোর')। সোসাইটির সদস্যবৃন্দ আর শুভাকাঙ্ক্ষীরা প্রায় ৩,০০,০০০ টাকা দিয়ে এই তহবিলটি খাড়া করেন। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং পক্ষিবিদ্যায় আমার সহকর্মী লোক-ওয়ান-থো ১৯৬৪ সালে তাইওয়ানে এক বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে এই তহবিলের টাকা মুখ্যত আসে লোক-এর সিঙ্গাপুরস্থ পরিবার পরিজনের কাছ থেকে। মোট তহবিলের সুদের টাকায় একযোগে দুজন স্নাতকোত্তর ফেলোর প্রত্যেককে দুতিন বছর ধ'রে সহায়তা করা হয়। পরের দিকে সার দোরাবজী টাটা ট্রাস্টের মোটারকমের অর্থ এসে যাওয়ায় সোসাইটি অতিরিক্ত আরও একজন ফেলোকে তার অধ্যয়নপর্বে সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা করে। এতদিন ভারতে ক্ষেত্রকর্মে যথোচিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপযুক্ত গুণমানের পক্ষিতাত্ত্বিক পাওয়া দুষ্কর ছিল। সোসাইটি সেই অভাব দূর করতে পারায় আমার যে কী আনন্দ হয়েছে তা বলার নয়। □

১৮

হামিদ আলি

বছর কয়েক আগে ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত 'অ্যাপ্রেন্টিস টু পাওয়ার' নামের একটি বই হঠাৎ আমার হাতে এসে যায়। একসময়কার নামকরা আই-সি-এস সার ম্যালকম ডার্লিং এ বইয়ের লেখক। বছর ষাট আগে এদেশে কাজে নতুন যোগ দিয়ে প্রথম সাড়ে তিন বছর ইংলণ্ডে মা আর বন্ধুবান্ধবদের কাছে লেখা চিঠি আর নিজের ব্যক্তিগত ডায়রি—প্রধানত এরই ভিত্তিতে বইটি লেখা। ভূমিকায় তিনি ব'লে নিয়েছেন 'যখন সেখানে যাই, তার আগে আমার আর ভারতের সম্পর্ক বলতে ছিল : এই ইতিহাস একটু আধটু জানা ছিল; ব্যস, ঐ পর্যন্ত। সেখানকার মানুষজনদের সম্পর্কে কিছুই জানতাম না।' বইটির গোড়ার অধ্যায় প্রথম অনুচ্ছেদেই আছে তাঁর ভারতে পৌঁছুনোর বিবরণ। তাতে চোখ পড়তেই আচমকা গর্বে আমার মন ভরে উঠল। লিখছেন :

> রবিবার, ২৭শে নভেম্বর, ১৯০৪। 'সিটি অব ভিয়েনা' জাহাজ বোম্বাই বন্দরে এসে ভিড়ল। ডেকে আমি তখন ঘুমোচ্ছিলাম। জেগে উঠে দেখি সামনে নোঙর করার পরিপাটি জায়গাটা ছাড়িয়ে দূরে পাহাড়ের অন্তরাল থেকে রক্তিম আভা ছড়িয়ে সূর্যের উদয় হচ্ছে। হাওয়া তখনই তেতে উঠেছে। নাকে এসে লাগছে একটা পরদেশি গন্ধ। প্রথম পোর্ট সৈয়দেই এর পরিচয় পেয়েছি। পোর্ট সৈয়দে 'প্রাচ্যের যা একখানা নমুনা পেলাম—গা জ্বালা করেছে আমার সেখানকার লোকগুলোকে দেখে।' সুখের বিষয়, জাহাজে একজন ভারতীয়কে পেয়েছিলাম। তিনি কিন্তু একেবারেই আলাদা ধরনের মানুষ। হামিদ আবদুল আলি নাম। বোম্বাইতে থাকেন। উনিও আমারই মতন ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে নবাগত। ফরাসি, জার্মান, ইংরিজি ওঁর ভালোরকম পড়া আছে। যা যা পড়েছেন, সে সম্বন্ধে ওঁর নিজস্ব ভাবনাচিন্তা আছে। সেইসঙ্গে আছে জোরালো রসবোধ। 'জাহাজে ওঁকেই আমার সবচেয়ে বেশি মনে ধরেছে। গায়ের রং সাদা হওয়ার বদলে দৈবক্রমে কালো ব'লে জাহাজে অন্যদের সংসর্গ থেকে নিজেকে উনি দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। আমার বেলায় সেটা ঘটেনি।' প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের মধ্যে সে সময়ে যে বিরাট সামাজিক ব্যবধান ছিল, সেদিনই আমি তার প্রথম আঁচ পাই।

হামিদ আমার প্রিয় ভাই। ভাইবোনদের মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে পেয়ারের। ভাবতে ভালো লাগে যে, আমিও হয়তো ছিলাম স্বভাবে, আগ্রহ উদ্দীপনায়,

দৃষ্টিভঙ্গিতে, পছন্দ অপছন্দে—তুলনায় ছোট হলেও, ওর সবচেয়ে কাছের মানুষ। প্রকৃতিবিদ হিসেবে আমার প্রথম পাঠ নেওয়া আর গড়ে ওঠার পেছনে ওর যতটা হাত আর উৎসাহ ছিল, পরিবারের আর কারো কাছ থেকেই ততটা পাইনি। আমার এগারো কি বারো বছরের জন্মদিনে হামিদভাই আমাকে রোনাল্ড ওয়ার্ডের একটি ডিম সংগ্রহের সরঞ্জাম উপহার দিয়েছিল। সেই থেকে পক্ষিবিদ্যাচর্চায় কখন কতটা এগোচ্ছি, সহমর্মিতার সঙ্গে সাগ্রহে তার খবর রেখেছে। ওর মতামত আর পরামর্শ আরও বড়ো কাজে নিজেকে ঢেলে দেওয়ায় বাড়তি উৎসাহ যুগিয়েছে। খুশির জোয়ারে আমি ভেসে গিয়েছিলাম, ত্রিবাঙ্কুর পক্ষিসমীক্ষার রিপোর্ট প'ড়ে ও যখন আমাকে লেখে (সাতারা, ২০.৬.৩৫) 'বি.এন.এইচ. এস-জার্নালে এবার (খণ্ড ৩৭,সংখ্যা ৪) ত্রিবাঙ্কুর সমীক্ষার ওপর তোমার লেখাটি দিনকয়েক আগে আমি পড়লাম। যেভাবে বিষয়টি তুমি অনুধাবন করেছ, তার জন্যে তোমাকে সাবাশ জানাতেই এই ছোট্ট চিঠি। আমার মনে হয়েছে, এটাই তোমার সবচেয়ে পরিণত আর স্থিতবুদ্ধির লেখা। যেমন প্রকাশভঙ্গিতে, তেমনি বক্তব্য আর বিষয়বস্তুতে। প'ড়ে এত আনন্দ হল যে, ঠিক করলাম চিঠি লিখে তোমাকে জানাতে হবে।' শীতের স্কুলের ছুটির সময়টাতে হামিদভাই সিন্ধুপ্রদেশে আপিসের কাজে ঘুরেছে, আমি ওঁর সঙ্গে থেকে অনেক কিছু জেনেছি শিখেছি। মনে রাখার মতো সে অভিজ্ঞতা। তাতে প্রকৃতিবিজ্ঞান আর পাখির প্রতি আমার ভালবাসা বেড়েছে। সেইসঙ্গে এও বুঝেছি, যাদের দেখাশোনা করার ভার তাঁর ওপর, গ্রামের সেই মানুষজনেরা কী কারণে হামিদভাইয়ের প্রতি এত শ্রদ্ধা ভালবাসা। এই জনপ্রিয়তা আর শ্রদ্ধা ভালবাসা এতই আন্তরিক আর গভীর ছিল যে, এর বিশ বছরেরও বেশিদিন পরে, আমি যখন পাখি সংক্রান্ত কাজে একদা তাঁর এলাকাধীন জেলা জায়গাগুলোতে গিয়েছি, যেই বলেছি, আমি হামিদ আলির ভাই—যারা তাঁকে চিনত, সেকালের সাদাদাড়িঅলা মানুষেরা অমনি ছুটে এসে আমাকে দুহাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিয়েছে। বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে দেদার আদর-আপ্যায়ন করেছে। তাদের কাছ থেকে সবরকমের সাহায্য পেয়েছি।

আশ্চর্য রকমের ভাষাবিদ ছিল হামিদভাই। ইউরোপীয় ইংরিজি, জার্মান আর ফরাসিতে সে ছিল সুপণ্ডিত। উর্দু, হিন্দি, সিন্ধি, গুজরাতি, মারাঠি, পুশতু, আরবি আর ফারসি অবাধে লিখতে পড়তে পারত। সেইসঙ্গে ছিল এর বেশির ভাগ ভাষায় অনর্গল কথা বলার ক্ষমতা।

হামিদের শ্বশুর আমার মাতুল আব্বাস তৈয়বজীর ব্যাপারটা ছিল একটু আলাদা। সে সময়কার রাজনৈতিক ডামাডোলের কথা মনে রাখলে, সেটা এমন কিছু অভাবনীয় নয়। ১৮৯৩ সাল নাগাদ ব্যারিস্টার হয়ে ইংলণ্ড থেকে ফিরে বরোদার গায়কোয়াড়ের অধীনে বিচারবিভাগের চাকরিতে তিনি যোগ দেন। জেলা জজ হিসেবে কয়েক বছর কাজ করার পর পদোন্নতি হয়ে বরোদা হাইকোর্টের তিনি বিচারপতি হন। শেষপর্যন্ত

১৯১৩ সালে সেখান থেকে অবসর নেন। আব্বাস ছিলেন আমার মায়ের বড়ো এবং একমাত্র সহোদর ভাই। ১৮৯৭ সালে নাগাদ আমার মা বিধবা হলে আমাদের ভাইবোনদের অভিভাবকত্ব আব্বাসের ঘাড়ে এসে পড়ে। অবশ্য নামেই উনি ছিলেন আমাদের অভিভাবক। কিছুদিনের মধ্যেই আবার ভেসে যাওয়ায়, আমাদের পরিবারের প্রকৃত ভার নিঃস্বার্থভাবে সেধে নিজের কাঁধে তুলে নেন আমাদের দূর সম্পর্কের এক মামা আমিরুদ্দিন আর তাঁর নিঃসন্তান স্ত্রী হামিদা বেগম। তাঁদের কথা আমি আগে বলেছি। বলতে দুঃখ হয়, ১৯৩০ সালে জার্মানি থেকে ফিরে আমার বেকারত্বের দিনগুলো থেকে আব্বাস আমৃত্যু (মারা যান ১৯৩৫-৩৬ সালে) পক্ষিবিদ্যা চর্চার জন্যে সমানে আমাকে কথা শুনিয়েছেন। এ কাজ আমি করি, এটা তিনি আদৌ পছন্দ করেননি। তাঁর ধারণা, আসলে আমি নিছক ফাঁকিবাজ, নিজের ভবিষ্যৎ মাটি করছি। 'সৎভাবে রোজগারে'র রাস্তায় যাচ্ছি না স্রেফ গেঁতোমি আর কুড়েমি ক'রে। সেটা ঢাকার জন্যে পক্ষিতত্ত্ব বাহানা মাত্র। কুড়েমি যে সোনার ডিম পাড়ে, হায়, এটা তিনি দেখে যেতে পারলেন না।

থাক সেসব অবান্তর কথা। ইংলণ্ডে লেখাপড়া করা থেকে শুরু ক'রে জজিয়তি থেকে অবসর নেওয়া—এই গোটা সময় জুড়ে আব্বাস ছিলেন একেবারে কট্টর রাজভক্ত। অন্তরের অন্তস্থলে নরমপন্থী জাতীয়তাবাদী হয়েও, ব্রিটিশ মানুষজনের সম্বন্ধে কোনো বিরূপ মন্তব্য তিনি সহ্য করতে পারতেন না। সম্রাট কিংবা রাজপরিবার সম্পর্কে কেউ খোঁটা দিলে অমন কথা শোনাটাও তার কাছে ছিল পাপ। এ বিষয়ে তিনি এতটাই গোঁড়া ছিলেন যে, কোনো আলোচনায় গিয়ে প'ড়ে যদি দেখতেন সেখানে কেউ কোনোরকম রাজবিদ্বেষী বা 'রাজদ্রোহাত্মক' কথা বলছে, উনি সঙ্গে সঙ্গে আসর ছেড়ে গটগট ক'রে বেরিয়ে চলে যেতেন। তাঁর মনে তেমন জোরালো স্বদেশি ভাব যদি থেকেও থাকে, কথাবার্তায় বা হাবভাবে কদাচ তা প্রকাশ পেত না। তাঁর পোশাকআশাক সবই বিলিতি কাপড়ে তৈরি হত। বাড়িঘর আর জীবনযাত্রার ধরন সবসময় বুঝিয়ে দিত যে, তিনি অভিজাত শ্রেণীর মানুষ। একেবারে সাহেবি কায়দা। সেখানে পান থেকে চুন খসার উপায় ছিল না। এরকম অবস্থায় যা হওয়ার তাই হয়েছিল। স্বভাবতই, গান্ধীজীর মতের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। ভারতে ব্রিটিশ রাজের সঙ্গে তার অসহযোগের সাধন প্রণালী (যতই অহিংস হোক) এবং বিদেশি কাপড় পোড়ানোর মতো জঙ্গী স্বদেশিয়ানায় আব্বাসের একেবারেই সায় ছিল না। অন্যান্য ক্ষেত্রে, আব্বাস তাঁর নরমপ্রকৃতির জাতীয়তাবাদী উত্তাপ এবং বিচারক হিসেবে তাঁর পরিপূর্ণ সততা আর ন্যায়নীতির জন্যে তিনি ব্যাপক স্বীকৃতি আর প্রশংসা পেয়েছিলেন। এমন কী বামপন্থী কংগ্রেস কর্মী, ব্রিটিশবিরোধী চরমপন্থীরাও এ ব্যাপারে তাঁর গুণগ্রাহী ছিলেন।

এইভাবে, ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর যখন কংগ্রেস

একটি স্বতন্ত্র তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করে, তখন তার সভাপতি আহ্বায়ক পদে আব্বাস তৈয়বজীর প্রস্তাবিত নাম বলিষ্ঠ সমর্থন পায়। জেনারেল ও'ডায়ারের কাজকর্ম ব্রিটিশ রাজের স্তাবককুল আর ইংরেজ রক্ষণশীলদের প্রশংসা পাওয়ায় তৈয়বজীর মনে গোঁড়ায় কিছুটা অবিশ্বাসের ভাব ছিল। কিন্তু শত শত প্রত্যক্ষদর্শী আর নিগৃহীতদের জবানবন্দি আর সওয়ালজবাবে যখন ডায়ারের নৃশংসতা একে একে প্রকাশ পেতে লাগল, তখন ঘৃণায় আর বিতৃষ্ণায় তাঁর মন ভরে উঠল। এরই ধাক্কায় মোহভঙ্গের ফলে তিনি হয়ে গেলেন অন্য মানুষ। রাতারাতি যেন তাঁর রাজনীতির খোলনলচে বদলে গিয়ে তিনি হয়ে পড়লেন গান্ধীজীর পরম অনুরাগী সহকর্মী। পাশ্চাত্য আভিজাত্য সম্পূর্ণ বর্জন ক'রে সাগ্রহে তিনি অঙ্গে ধারণ করলেন হাতে-কাটা সূতোর খদ্দর। চিরদিনের অভ্যেস ছেড়ে তিনি হয়ে গেলেন রেলের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। যেখানে যান, থাকেন ছারপোকাভর্তি অস্বস্তিকর ধর্মশালায় কিংবা আশ্রমে। শক্ত মেঝেয় শুয়ে রাত কাটান। গ্রীষ্মের দাবদাহে মাইলের পর মাইল হেঁটে হেঁটে ব্রিটিশের ঔপনিবেশিক 'শয়তান' ভারত সরকারের বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগের ব্রত প্রচার করেন। যখন তিনি তেড়েফুঁড়ে এসব কাজকর্ম আর কৃচ্ছতা শুরু করেন, রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে মোট বেশ কয়েক বছর কারাবাস করেন—তখন তিনি সত্তর পেরিয়ে গেছেন।

১৯১৭ সালে। হামিদ ভাই তখন গুজরাতের পাঁচমহল জেলার অ্যাসিস্টেন্ট কালেক্টর এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। বর্মা থেকে একবার 'তালিমি ছুটি'তে আমি হামিদভাইয়ের কাছে এসে কয়েকদিন ছিলাম। শীতের সময় ওঁকে মফস্বলে ঘোরাঘুরি করতে হত। ক্যাম্পে থাকতেন। তখন আমি ওঁর সঙ্গী হই। তার বছর দুয়েক আগে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরেছেন। গুজরাতে তার 'সংক্রমণ' ব্যাপকভাবে দ্রুত ছড়িয়ে প'ড়ে 'রাজদ্রোহ', 'রাষ্ট্রদ্রোহ' বা ঐ ধরনের কোনো রাজনৈতিক অপরাধের আকার নিচ্ছিল। সেবার গ্রামের এক প্যাটেলের বিরুদ্ধে এইরকমের একটি নালিশ রুজু করা হয়েছিল। হামিদের ওপর তার বিচারের ভার পড়ে। এই সময় গান্ধীজী সেখানে এসেছিলেন প্যাটেলের পক্ষে সাক্ষী হয়ে। দীর্ঘ শুনানির পর শেষপর্যন্ত প্যাটেল বেকসুর খালাস পায়। পুরনো এক সুদৃশ্য আমবাগানে যে তাঁবুতে আদালত বসত, তার কাছাকাছি এক পটাবাসে আমরা থাকতাম। এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে, বিচারপর্ব শেষ হওয়ার পর চা-পানের জন্যে হামিদভাই গান্ধীজীকে নিয়ে যাচ্ছেন ভোজন-শিবিরে। 'চা-পান' বলতে আসলে তাঁর জন্যে আগে থেকেই রাখা ছিল ছাগলের দুধ আর চিনেবাদাম ভাজা (অথবা চিড়ে)। তখনও পর্যন্ত ভারতের মাটিতে তাঁর পূর্ণজ্যোতি ফুটে ওঠেনি। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আর মানবসেবার জন্যে যাঁর জগৎ জুড়ে খ্যাতি—এমন একজন মানুষকে চোখের সামনে দেখে আমি সেদিন অসম্ভব রোমাঞ্চ বোধ করেছিলাম। সবচেয়ে বেশি ক'রে

আমার মন কেড়েছিল তাঁর অকপট স্বচ্ছতা আর নিরভিমান সারল্য, সেইসঙ্গে তাঁর শিষ্ট রসবোধ। এমনিতেই কোনো আকারের আর কোনো ধরনের জাঁকজমক দেখলে আমার গা জ্বলে যায়; আমি বিশ্বাস করি, মানুষের বড়ো বাঁচোয় হল রসবোধ। তাঁকেই আমি সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করি, যাঁর মধ্যে হামবড়া ভাব নেই, যিনি নিজেকে নিয়েও পরিহাস করতে পারেন। গান্ধীজী স্পষ্টতই ছিলেন এই বিরল গুণের অধিকারী। আমার খুব সৌভাগ্য যে, এইরকমের এক পারিবারিক খোলামেলা আবহাওয়ায় দৈবক্রমে আমি গান্ধীজীকে মুখোমুখি পেয়ে গিয়েছিলাম। পরে যতবারই তাঁকে দেখেছি, সে দেখা হয়েছে আত্মসম্পর্কহীন—বারোয়ারিভাবে কমবেশি একরকমের 'দর্শন'।

হামিদভাই তখনকার বোম্বাই প্রেসিডেন্সির নানা জেলায় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধীজী ফিরে আসার পর থেকেই যে রাজনৈতিক আলোড়ন শুরু হয়ে যায়, তার পুরো ঝড়ঝাপ্টা তাঁকে সামলাতে হয়েছে। ১৯৩৫ সালে জাতীয় আন্দোলন যখন গনগনে হয়ে উঠেছে, তখন ছেড়ে-দে-মা-কেঁদে-বাঁচি ব'লে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে ছাড়ান পান। এই পর্বে আগাগোড়া তাঁকে সাপের ছুঁচো গেলা অবস্থায় কাটাতে হয়েছে। মনেপ্রাণে জাতীয়তাবাদী হয়েও তিনি আবার একজন উচ্চতম সিভিলিয়ানও বটে। জেলা প্রশাসনের মাথায়। সুতরাং, নিরপেক্ষভাবে আইনকানুন অক্ষরে অক্ষরে তাঁকে মেনে চলতেই হবে এবং বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের সম্পর্কে ব্যবস্থা নিতে হবে। তাঁর স্বদেশি মনোভাব আর সেইসঙ্গে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের কাছে আর সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা তখনকার শাসকদের চোখে স্পষ্টতই তাঁকে সন্দেহভাজন করে তুলেছিল। কুশলতার সঙ্গে নিঃশব্দে কাজ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর কর্মজীবনে কালেক্টর আর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হওয়া—বাস্, তার বেশি যে উঠতে পারেননি, তার একটাই কারণ। তিনি কখনই তাঁর জাতীয়তাবাদী ঝোঁক আড়াল করে রাখতে চেষ্টা করেননি। সরকারেরপক্ষের আর বিপক্ষের সব স্তরের মানুষেরই মন তিনি জয় করেছিলেন।

আব্বাসের কন্যা ছিলেন তাঁর স্ত্রী। নিজের স্বদেশি মনোভাব সম্পর্কে শরিফার কোনো ঢাকঢাক গুড়গুড় ছিল না। কাউকেই তোয়াক্কা করতেন না। এতে হামিদকে আরও বেশ মুস্কিলে পড়তে হত। শরিফা ছিলে কড়া ধাচের মানুষ। সমাজসেবায় নিবেদিতপ্রাণ। মেয়েদের ভেতর শিক্ষার বিস্তার আর গ্রামবাসিনীদের সামাজিক উন্নয়ন—এই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। স্বদেশি আন্দোলনের ওপর তখন লাগানো ছিল রাজনীতির চড়া রং। কোনো রাখঢাক না করেই শরিফা ছিলেন সেই আন্দোলনের জবরদস্ত সমর্থক। হামিদভাইয়ের দোরগোড়ায় রয়েছেন শ্বশুরমশাই, যিনি আইনঅমান্য আর অসহযোগের পক্ষে দুরন্ত সরবে প্রচার করে চলেছেন, আর অন্দরমহলে বিরাজ করছে তাঁর স্পষ্টবক্তা স্ত্রী—এই নিয়ে বেজায় অস্বস্তিতে পড়তে হচ্ছিল হামিদকে।

আব্বাসকে হামিদ জোড়হাত করে বললেন—আব্বাস যেন তাঁর জেলায় পা না দেন, কেননা তাঁর এলাকার মধ্যে ঢুকে যদি রাজবিরোধী বক্তৃতা দিতে থাকেন, তাহলে তখন তাঁকে গ্রেপ্তার করা ছাড়া আর উপায় থাকবে না। আব্বাস মামা যথেষ্ট ভালো ছিলেন, তাই হামিদের বিপন্নতা বুঝতে পেরে তিনি সে সময়ে আর ওদিক মাড়াননি।

গ্রামাঞ্চলে যেখানেই আইন অমান্যের সংকট দেখা দিত, সেখানে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে পুলিশ বাহিনী পাঠানোর সময় হামিদভাই পই পই করে তাদের বলে দিতেন—প্ররোচনা সত্ত্বেও এবং দৈহিক বলপ্রয়োগের হুমকি দিলেও, সবাই যেন মাথা ঠাণ্ডা রাখে এবং সেরকম দেখলে ন্যূনতম শক্তি প্রয়োগ করে। ওর একটি জেলায় পুলিশ সুপার ছিল সাম্রাজ্য গড়নেওয়ালা এক ব্রিটিশ পুঙ্গব। সেখানে আদিবাসীদের জঙ্গল সত্যাগ্রহ গুরুতর আকার ধারণ করার ফলে রক্তারক্তি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। ডি-এস-পি একদল সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থলের দিকে রওনা হওয়ার পথে যখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে শেষ পরামর্শ নেওয়ার জন্যে হাজির হয়, শুনলাম হামিদভাই তাদের বলছেন সত্যাগ্রহীদের ওপর যেন যথাসম্ভব কম বলপ্রয়োগ করা হয় —তাও নেহাত নিরুপায় হলে। ওঁর শেষ কথা ছিল—'কোনো অবস্থাতেই যেন গুলি চালানো না হয়।' এক পর্যায়ে অবস্থা সঙ্গিন হয়ে উঠলেও শেষ পর্যন্ত বলপ্রয়োগ এড়ানো গিয়েছিল। তাতে হামিদভাই হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন।

১৯৩৪ সাল নাগাদ চাকরি থেকে অবসর নেবার পর স্ত্রী শরিফাকে নিয়ে মুসৌরিতে গিয়ে স্থিতু হয়। সেখানে 'সাউথউড' নামের একটি চমৎকার পুরনো বাংলোতে ওঁরা থাকতেন। সরকারি কর্মচারীদের বিশ্রামাবাস হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে পরে এই বাংলোটি তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে দান করেন। হামিদের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে শুনেছি মাঝে মাঝে ওঁর মাথায় কীরকম দুষ্টুবুদ্ধি খেলত, তার গল্প। শরিফার সঙ্গে ওঁর সুখী দাম্পত্যজীবনের সুবর্ণজয়ন্তীর পর, যখন ওঁর বয়স পঁচাত্তরের ওপর, এটা সেই সময়ের ঘটনা। হঠাৎ এক সকালে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো বন্ধুদের কাছে এক নিমন্ত্রণ পত্র এসে হাজির। চিঠি প'ড়ে সবার মাথায় হাত। এও কি সম্ভব? কাঠখোট্টাভাবে তাতে লেখা অমুক দিন হামিদের বিয়ে, তারা যেন বিবাহবাসরে হাজির থাকে। শৈলশহরটিতে হামিদ দম্পতি লোকসমাজে পরোপকারী হিসেবে সবার পরিচিত। জ্ঞানীগুণী বন্ধু আর অনুরাগীর সংখ্যা বিস্তর। সকলের কাছে ওঁরা ছিলেন দাম্পত্য প্রেমের এক আদর্শ যুগল। বন্ধুরা বিশ্বাসই করতে পারছে না যে, সে আবার নতুন বউ ঘরে আনবে—তাও যখন তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। তারা ধরেই নিল যে, বুড়োটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। পরে যখন সব কিছু খোলসা হল, তখন ঘাম দিয়ে সকলের গায়ের জ্বর ছাড়ল। শরীয়ত আইনে, একজন মুসলমান জীবৎকালে তার সম্পত্তি অংশত বা পুরোটাই যে কাউকে দান করে যেতে পারে। কিন্তু কোনোরকম উইল করা থাকলেও, মৃত্যুর পর তার যথাসর্বস্ব পাবে তার বৈধ ওয়ারিশ—তা সে

যত দূর-সম্পর্কের বা যত পরোক্ষার্থ হোক। শরীয়ত অনুযায়ী এটাই চূড়ান্ত বিধান। হামিদ একে মুসলমান, তায় নিঃসন্তান। সে যদি তার বাঞ্ছিত কাউকে তার বিষয়সম্পত্তি দিয়ে যেতে চায়, তাহলে তার একমাত্র উপায় হল, সিভিল ম্যারেজ আইনানুসারে তার বিবাহ নথিভুক্ত করে নিয়ে সেইমতো উইল লেখার কাজ সম্পন্ন করা। শুধু এইটুকু করার জন্যেই এত ধুন্ধুমার কাণ্ড।

বোম্বাইতে বেলা তিনটে নাগাদ আমার লেখার টেবিলে ঝাড়াহাতপা হয়ে বসে আছি। পরেনে শুধু ছোট ইজের আর গায়ে হাতকাটা গেঞ্জি। বাইরের কেউ অমন অসময়ে যে এসে পড়বে, তার জন্যে তৈরি ছিলাম না। সাধারণত, বাড়িতে কুকুর থাকায় উটকো লোক সহজে ঢুকতে পারে না। কীভাবে সেসব এড়িয়ে—চেনা নেই শোনা নেই একটা লোক সটান আমার পড়ার ঘরে এসে হাজির। বছর পঁয়ষট্টির বেশ শক্তপোক্ত চেহারা, পরনে সাহেবি পোশাক, গলায় নেকটাই। এমন একটা বেখাপ্পা সময়ে আগে থেকে না ব'লে ক'য়ে ওর এই হুট ক'রে ঢুকে পড়ায় স্বভাবতই মনে মনে আমি খুব চটে গিয়েছি। ফলে, বেশ খানিকটা চড়া গলায় রূঢ়ভাবে জিজ্ঞেস করেছি—কে তিনি? কী চান কী? এমন একটা অসময়েই বা কেন? সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক মাপ চেয়ে নিয়ে বললেন যে, তিনি গুজরাত থেকে আসছেন। বিশেষভাবে একটি ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতেই তাঁর বোম্বাইতে আসা। এটা তাঁর কাছে খুবই একটা জরুরি কাজ। কোনোরকমে তিনি আমার ঠিকানা জোগাড় করতে পারলেও ৪৬নং পালি হিলের বাড়ি খুঁজে বার করতে গিয়ে বিস্তর ঘুরতে হয়েছে। তারই ফলে, ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারেননি। বললেন, আমার কাছে উনি কিছু চাইতে আসেননি। বরং, বহুদিনের পুরনো একটা ঋণ শোধ করবার জন্যেই তার এখানে আসা। এরপর নিজের পরিচয় দিলেন এই ব'লে তাঁর নাম ক্ষীরসাগর; গুজরাতের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার পদ থেকে সম্প্রতি তিনি অবসর নিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে বললেন যে, তাঁর বাবা বহু বছর আগে ছিলেন সাতারার এক স্কুলশিক্ষক এবং একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজসেবী। এই দ্বিবিধ কাজের সূত্রে তিনি আমার ভাই হামিদ আলি আই-সি-এসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন। হামিদ আলি তখন ছিলেন সাতারারা কালেক্টর। কিছুকাল আগে ওঁর বাবার মৃত্যুর পর দশম (নাকি চল্লিশতম) দিনে তাঁর আত্মার তর্পণের জন্যে কাকদের উদ্দেশে পিণ্ডদান করা হয়। সেই ভাত তাদের ধরে দেওয়া হলে কাকের দল গোল হয়ে তার চারদিকে এসে বসলেও উৎসর্গীকৃত সেই অন্ন কেউ মুখে তোলেনি। এটা লক্ষ্য ক'রে প্রবীণ প্রাজ্ঞজনেরা এই অভিমত দিলেন যে, নিশ্চয় তাঁর ছেলে ওঁর কোনো অপূর্ণ সাধ মেটাতে অসমর্থ হয়েছে; অথবা তাঁর কোনো আর্থিক ঋণ এখনও রয়ে গেছে, যা শোধ করা হয়নি। এমন কোনো ত্রুটিবিচ্যুতির কথা তখনতখনই তাঁর ছেলের মনে পড়েনি। শেষে একসময়ে হঠাৎ সেকালের একটা ঘটনার কথা ছেলের মনে পড়ে যায়। হামিদভাই রিটায়ার ক'রে মুসৌরিতে বাস করার বহু বছর পর,

ক্ষীরসাগর পড়াশুনো করতে আমেরিকা যাবে, শেষ মুহূর্তে টাকায় টান পড়ায় ওঁর বাবা হামিদভাইয়ের কাছে টাকা চেয়ে একটা জরুরি তার পাঠান। সে কথা মনে পড়ায়, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীরসাগর সমাগত সবার সামনে শপথ করেন যে, তিনি যে করেই হোক, সেই ঋণ শোধ করবেন। এটা বলামাত্র দেখা গেল, একটি কাক টুক টুক ক'রে এসে ভাত ঠুকরে খেতে শুরু করল। তারপর অন্য কাকেরাও তার দেখাদেখি খেতে বসে গেল। মানুষের আত্মার ত্রাণে কাকেদের এই মধ্যস্থ হওয়ার ব্যাপারে বিদেশি শিক্ষাজাত যেটুকুওবা দ্বিধাসংশয় ছিল, এরপর আর তার ছিটেফোঁটাও রইল না। ক্ষীরসাগরের মনে 'অন্ধ বিশ্বাস' বরাবরের মতো কায়েম হয়ে বসল। যাইহোক ওঁকে বলিহারি দিতে হয় যে, মনে না করিয়ে দেওয়া আর না চাওয়া সত্ত্বেও পঞ্চাশ বছর পরেও উনি পুরনো ঋণের কথা মনে করে রেখেছেন ব'লে। এর পেছনে একটা গূঢ় বিনিময়ের মনোভাব থাকা সত্ত্বেও। এ রকম মানুষ পৃথিবীতে আরও বেশি এবং আরও ঘন ঘন জন্মালে ভালোই হত।

সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করার ব্রত নিয়েই শ্রী ক্ষীরসাগর বোম্বাই এসেছেন। হামিদভাইয়ের উইলের নির্বাহকদের মধ্যে আমি একজন। কিন্তু আনুষঙ্গিক ঘেঁটে ঐ ধরনের কোনো ঋণ দেওয়ার কোনো উল্লেখ কোথাও আমি খুঁজে পেলাম না। সুতরাং, আমি ঐ টাকা নেওয়ায় আমার অসম্মতি জানিয়ে দিলাম। অথচ প্রতিজ্ঞা পালনের ব্যাপারে ওঁর পরিত্রাহি ভাব দেখে আমি ওঁকে মি. আর মিসেস হামিদ আলির বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক এস.এফ.বি. তৈয়বজী অ্যাণ্ড কোম্পানীর উকিলদের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু তাঁরাও বৈষয়িক কাগজপত্রে তার কোনো হদিশ না পেয়ে সে টাকা গ্রহণ করতে পারলেন না। ক্ষীরসাগর তখন মরিয়া হয়ে পকেট হাতড়ে পুরনো দিনের একটা জীর্ণ পোস্টকার্ড বার করলেন। ১৯৩৪ (অথবা '৩৫) সালে মুসৌরির 'সাউথউড' থেকে হামিদভাইয়ের স্বহস্তে লেখা সেই চিঠি। ক্ষীরসাগরের পিতৃদেব তাঁকে একটি বার্তায় ওঁর ছেলে যাতে যথাসময়ে বিদেশযাত্রা করতে পারে তার জন্যে ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট যোগে অবিলম্বে টাকা পাঠাতে বলেছেন। হামিদভাইয়ের লেখা পোস্টকার্ডে ঐ বার্তার প্রাপ্তিস্বীকার করা হয়েছে। আমরা আবিস্কার করলাম যে, ঐ টাকার পরিমাণ ছিল ১,০০০। সে সময়ের কথা ধরলে, তার মূল্য বড়ো কম ছিল না। তখন বাজারে এক টাকায় ৮/১০ সের চাল গম মিলত আর ৪,০০০ টাকারও কমে পাওয়া যেত একেবারে নতুন ঝকঝকে একটা ফোর্ডগাড়ি। নিজের ছেলেপুলে না থাকায় হামিদের কোনো দায়দায়িত্ব ছিল না। তাঁর উদারতা আর মানবিকতায় লোকদেখানো ভাব থাকত না। গোটা চাকরিজীবনে দানধ্যানও করেছেন অকাতরে। তাঁর মাস মাইনের বেশির ভাগটাই চলে যেত একদিকে অভাবী বয়োবৃদ্ধ আত্মীয়পরিজনদের সাহায্য করতে আর অন্যদিকে যত সব গরিব ছেলেমেয়েদের পড়ার খরচ যোগাতে এবং অন্যান্য পরহিতব্রতে। সব কিছুই করতেন লোকচোখের আড়ালে। মাঝেমধ্যে এসব

আমরা জানতে পেরেছি একেবারেই আকস্মিকভাবে—সাহায্যপ্রাপ্ত কিছু লোকের মুখ থেকে, কিংবা পরোক্ষ কোনো সূত্রে।

অন্ধ বিশ্বাস আর কুসংস্কারের ব্যাপারে বলতে বাধা নেই যে, আধ্যাত্মিকতা, তন্ত্রমন্ত্র, জ্যোতিষবিচার এবং অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার 'জাদু'তে আমার বরাবরের অবিশ্বাসের ভিত, সাময়িক কালের জন্যে হলেও, একবার প্রচণ্ডভাবে নাড়া খেয়েছিল। ঘটনাটা ঘটে আমার এক ভাই আমিরকে কেন্দ্র করে। ১৯১৯ সাল। বর্মায় আমির সবে তাভোইতে এসে আমাদের কাজে যোগ দিয়েছে। পুরো দু মাসও হয়নি। শহরের বেশ কয়েক মাইল বাইরে একটি বৌদ্ধ মঠের সুন্দর তরুবীথিঘেরা চত্বরে ছিল বেশ বড়োসড়ো একটি শানবাঁধানো পুকুর। সেখানে কিলবিল করছে রুইমাছ। তার মধ্যে অনেক মাছেরই বয়স নাকি কয়েকশো বছর। সেইসব মাছকে খুবই পূতপবিত্র ব'লে মনে করা হত। ভক্ত তীর্থযাত্রী আর পিকনিক করতে আসা মানুষজনেরা টুকটাক যেসব খাবার দিত, তাতে মাছগুলো রীতিমতো তাগড়াই আর খুব 'লোভনীয়' হয়ে উঠত। এ সত্ত্বেও, মাছগুলোর কোনো ক্ষয়ক্ষতি হত না। কেননা লুকিয়ে চুরিয়ে সে মাছ ধরবার কারো সাহস হত না। এরকমের একটি ধারণা সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল যে, কেউ যদি মাছ ধরতে বা মাছের ক্ষতি করতে চেষ্টা করে, তাহলে তার সমূহ বিপদ ঘটবে। আমির ছিল আমারই মতন। কোনোরকম কুসংস্কারে বা মন্ত্রতন্ত্রে তারও বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিল না। একদিন নিছক দুষ্টুমি ক'রে এবং ভাগ্যকে সে থোড়াই কেয়ার করে, এটা দেখাতে গিয়ে—যখন আশপাশে কেউ কোথাও নেই—সেই সময়ে ইচ্ছে ক'রে এমনি এমনি এক টুকরো ইঁট মাছের ঝাঁকে ছুঁড়ে মারে। সেদিন খুব ভোরেবেলায় ঐ সুন্দর জায়গাটাতে পিকনিক করতে চলে গিয়েছিলাম। তহমিনা সাইডকারে, আমির বসেছিল আমার মোটরবাইকের পেছনে। যখন আমরা রওনা হই, আমির ছিল দিব্যি সুস্থসবল তাজা। লাঞ্চের সময় যখন আমরা ফিরে আসি, তখন আমির জানাল যে, ওর গাঁটগুলো কেমন যেন শক্ত হয়ে গেছে। চাকার দাগে ক্ষতবিক্ষত কাঁচা রাস্তায় পিলিয়নে ব'সে লম্বা রাস্তা পাড়ি দিলে এমনটা হয়েই থাকে। গাঁটে গাঁটে ব্যথাটা ক্রমেই বাড়তে থাকে। পরের দুদিন ধুম জ্বর। পরীক্ষায় ধরা পড়ল, সাংঘাতিক ধরনের রিউম্যাটিক ফিভারে ও আক্রান্ত হয়েছে। ঐটুকু ছোট শহরে ডাক্তারবদ্যির যথাসাধ্য সাহায্য নিয়েও ওকে বাঁচানো গেল না। ন' দিনের দিন আমির আমাদের ছেড়ে চলে গেল। ২২শে এপ্রিল, ১৯১৯। এটাকে কাকতলীয় বলতেই পারেন। কিন্তু সেদিনকার সেই ঘটনা আমার সব যুক্তিবিচারের গোড়া ধরে নাড়া দিয়েছিল।

□

১৯

আরও পাঁচজন মানুষ

সিডনি ডিলন রিপ্‌লে

১৯৪৪ সাল। আমাদের বোম্বাইয়ের প্রকৃতিবিজ্ঞান সোসাইটি তখন সাময়িকভাবে প্রিন্স অব ওয়েলস মিউজিয়ামে ঠাঁই নিয়েছে। সোসাইটির ঘরে ব'সে পাখি সংগ্রহের ওপর কাজ করছি। যুদ্ধের সময় প্রায়ই তখন মার্কিন সেনাবাহিনীর লোকেরা বোম্বাই হয়ে যাতায়াত করত। সেই সময় এক আমেরিকান ছোকরা এসে হাজির। সিডনি ডিলন রিপ্‌লে ব'লে নিজের পরিচয় দিল। ইয়েল বিশ্ববিদালয়ে সে জীববিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর ছাত্র। ওর পক্ষিতত্ত্ব সংক্রান্ত প্রকাশিত কিছু কিছু লেখা আমার ভালো লেগেছিল। ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় আমি খুশি হয়েছিলাম। অচিরে দুজনের খুব ভাব হয়ে গেল। ও তখন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মার্কিন সেনাবাহিনীর গুপ্তবার্তা আধিকারিক হিসেবে সিংহলে মোতায়েন ছিল। এই কাজের সূত্রে জয়েণ্ট কম্যাণ্ডের সদর দপ্তরে ওকে ঘন ঘন আসাযাওয়া করতে হত। ওর সঙ্গে আমার এই প্রথম আলাপ। পরে আমরা চিরকালের বন্ধু হয়ে যাই। দুজনে পাশাপাশি থেকে পাখির বিষয়ে ভালো ভালো কাজ করেছি, একসঙ্গে পাখির খোঁজে ঘুরে বেড়িয়েছি এবং দুজনে যুক্তভাবে বৈজ্ঞানিক বইপত্র লিখেছি। সিংহল থেকে দিল্লি যাওয়ার পথে যখনই ও বোম্বাই এসেছে, তখনই আমরা পাখি নিয়ে ভারতবর্ষে যুক্তভাবে ক্ষেত্রসমীক্ষা আর নমুনা সংগ্রহের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করেছি। দুজনে মিলে যুক্তি এঁটেছি—যুদ্ধটা শেষ হওয়ার পর দেশের মধ্যে যখন অবাধে চলাচল করার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে, আমরা আজ এখানে কাল সেখানে দল বেঁধে অভিযানে যাব। বিশেষ ক'রে, আমাদের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে। সবটাই জল্পনা কল্পনা। আমরা ঠিক করি, প্রথমেই আমরা যাব উত্তর-পূর্ব অসমের শেষ প্রান্ত মিশ্‌মি পাহাড়ে। ঐ অঞ্চলের পাখিদের নিয়ে তখন পর্যন্ত ভালোভাবে কোনো কাজই হয়নি। কিন্তু লড়াই মিটে যাওয়ার পরেও এ ধরনের কাজ করার পক্ষে অনুকূল অবস্থা ফিরে আসতে যথেষ্ট সময় লাগল। ১৯৪৬-এর শেষাশেষির আগে কাজে আমরা হাত দিতেই পারলাম না। যুদ্ধের সময়কার আমদানি নীতির কড়াকড়ির ফলে, না পাওয়া যায় পেট্রোল, না

পাওয়া যায় গাড়ি। যুদ্ধের পরেও কিছুকাল এই অবস্থা চলে। ফলে, রাস্তাঘাটে যানবাহন পাওয়া মহা সমস্যা। বিশেষ ক'রে প্রত্যন্ত প্রদেশে ঘুরতে হলে। মিশ্‌মির ক্ষেত্রে অবশ্য সমস্যা অতটা গুরুতর নয়। কারণ, পাহাড় এলাকায় চলাচলের কাজটা বেশির ভাগই হয় মোটবাহী খচ্চর আর কুলিদের সাহায্যে। মিশ্‌মিতে আমাদের যুক্ত অভিযান হলেও এর খরচ জুটেছিল দুটি ভিন্ন সূত্র থেকে। আমার দিকের খরচ—যেমন আগেও বহুবার হয়েছে—পুরোটাই মিলেছে লোক ওয়ান থোর সৌজন্যে। অন্যদিকে সঙ্গে একজন সংগ্রাহক চর্মসংরক্ষক যুগিয়ে এবং দরকারমতো মিউজিয়াম সংক্রান্ত সুযোগসুবিধে দিয়ে সাহায্য করেছিল আমাদের সোসাইটি।

ভারতে এই প্রথম ব্যবহার করা হল ইতালি আর জাপানের তৈরি পাখি ধরার 'কুয়াশা'-জাল। যেসব জায়গা ঘন ঝোপঝাড় আর আগাছায় ভর্তি, সেসব জায়গায় এই জাল—বিশেষ ক'রে সহজ সরল জাপানি ধরনের—যে কতটা কাজের হয়, সেটা আমরা স্বচক্ষে দেখতে পেলাম। মিশ্‌মির পূর্ব হিমালয় অঞ্চলটাতেও ছিল এইরকমের সব ঝোপঝাড়। সেখানকার পাখিরা আড়ালে আবডালে থাকে, কিছুতেই সামনে আসতে চায় না। সেসব জায়গায় তাদের উপস্থিতি টের পাওয়া আর নমুনা সংগ্রহ করার এটাই একমাত্র পন্থা। বিশ বছর আগে প্রকাশিত স্টুয়ার্ট বেকারের 'ফনা অব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া'র অন্তর্ভুক্ত পক্ষিবিষয়ক খণ্ডগুলি সম্পর্কে নানা কারণে পক্ষিতাত্ত্বিক মহলে বেশ কিছুটা খুঁতখুঁতুনির ভাব ছিল। তখন আমাদের দুজনের মাথায় ঢুকল যে, বেকারের লেখার ত্রুটিগুলো সংশোধন ক'রে তাতে আমরা হালফিলের তথ্য জুড়ব। এটাও আমরা মনে করলাম যে, নতূন সংস্করণে শুধু যে সর্বাধুনিক তথ্য থাকবে, তাই নয়—এ বই একদিকে যেমন পেশাদার মিউজিয়াম সংশ্লিষ্ট পক্ষিবিদেরা পড়বেন, তেমনি শখের পক্ষিপর্যবেক্ষকেরাও এর পাঠক হবেন। তার জন্যে বইটি হবে ভালোরকম চিত্রসম্বলিত। পাখিদের জীবনবৃত্তান্ত লেখা হবে সহজসরল ভঙ্গিতে। অনেকটা উইদারবির 'হ্যাণ্ডবুক অব ব্রিটিশ বার্ডস্'-এর মতো ক'রে। গ্রন্থকার হিসেবে দুভাগে দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া হবে। এক অংশে চর্মসংরক্ষণবিদ্যা, অন্য অংশে বসতিবিদ্যা। প্রথমোক্তটির প্রধান ভার থাকবে রিপ্‌লের ওপর, দ্বিতীয়টির প্রধান ভার আমার। যেখানে মিলিয়ে মিশিয়ে সব কিছু বলা হবে, তার তথ্যসূত্র হবে আমার পঞ্চাশ বছর ধ'রে রাখা ক্ষেত্রসমীক্ষার যাবতীয় নথিপত্র। তাতে যোগ করা হবে উত্তর-পশ্চিম ভারতে বেশ কয়েক বছর রিপ্‌লের কর্মরত অবস্থায় খুটিয়েখুটিয়ে দেখা পাখপাখালি সম্পর্কিত নোট এবং ভারতে তার বিভিন্ন সংগ্রহ অভিযানের বয়ান। এর ওপর থাকবে গত ১৫০ বছর ধ'রে ভারতীয় পাখি সংক্রান্ত সমস্ত মূল্যবান প্রকাশনা থেকে সুনির্বাচিত উদ্ধৃতি। প্রভাবিত 'হ্যাণ্ডবুক অব দি বার্ডস্ অব ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড পাকিস্তান' বইটির চর্মসংরক্ষণবিদ্যা বিষয়ক অংশের ভিত্তি হবে একটি প্রামাণ্য, সামগ্রিক এবং হালনাগাদ নজর তালিকা। রিপ্‌লে এটি প্রণয়ন করবে। এটি প্রকাশের ভার নেবে

বোম্বাই প্রকৃতিবিজ্ঞান সোসাইটি। কোন কোন প্রজাতি বিষয়ে এযাবৎ লিপিবদ্ধ করা সমূহ তথ্য, কোন কোন দিক এখনও যথোচিতভাবে আগে জানা যায়নি এবং প্রকৃতিপাঠের আরও প্রয়োজন রয়েছে—এই হ্যাণ্ডবুকে এই ধরনের যাবতীয় প্রামাণ্য তথ্যও সন্নিবেশিত হবে, এটাই আমরা চেয়েছিলাম।

গ্রন্থাগারে বই ঘেঁটে গবেষণার কাজ আর উদ্ধৃতি সংগ্রহ করা—এর জন্যে ভারত সরকার, ইউ-এস এডুকেশন ফাউণ্ডেশন আর ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান একাডেমির কাছ থেকে অনুদান পাওয়া গিয়েছিল। চার বছর লেগেছিল এই কাজ শেষ করতে। তার মধ্যে ছ' মাস আমাকে আমেরিকায় থাকতে হয়েছে। রিপ্লে তখন ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী প্রোফেসার। অধিকাংশ সময় আমার সেখানেই কেটেছে। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল যে, রিপ্লে লিখবে আমেরিকায় ব'সে আর আমি লিখব বোম্বাইতে থেকে। বইয়ের আয়তন আর লেখার কোন্ বিকল্প ব্যবস্থায় রিপ্লের চর্মসংরক্ষণবিদ্যা আর আমার পক্ষিজীবনবৃত্তান্ত—এ দুইয়ের সমন্বয় ঘটানো যায়, আমেরিকায় থাকার ফলে, এ নিয়ে দুজনে আলোচনা করার সুযোগ পাওয়া গেল। আমার আমেরিকায় থাকার খরচ মিটিয়েছিলাম ইয়েল ইউনিভার্সিটির দেওয়া সেসেল জুওলজিক্যাল ফেলোশিপের টাকায়। ডিলন রিপ্লের চেষ্টাতেই এটা জুটে গিয়েছিল। স্মিথ-মুণ্ডট্ ট্র্যাভ্‌ল্ গ্র্যান্টের টাকায় রাউণ্ড এয়ার ট্রিপ টিকিট। মাত্র ১৯৬৪ সাল থেকে আমরা পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজে তেড়েফুঁড়ে লাগতে পেরেছিলাম। এর মধ্যে ডিলন রিপ্লে স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশনের সেক্রেটারি হয়ে চলে গিয়েছে ওয়াশিংটনে। হ্যাণ্ডবুক-এর প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে। এরপর অল্পসময়ের ব্যবধানে বাকি দশটি খণ্ড বার হয়। গোটা সিরিজটি সম্পূর্ণ হয় ১৯৭৪ সালে। আমার আটাত্তর বছরের জন্মদিনের চারদিন পর ১৯৭৪-এর ১৬ই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্তা ইন্দিরা গান্ধী আনুষ্ঠানিকভাবে এই বইয়ের শেষখণ্ডটির উদ্বোধন করেন।

আমাদের সোসাইটির সংস্পর্শে আসার গোড়ার দিন থেকেই ও ছিল এর অনুরাগী সমর্থক। বিশেষত, স্মিথ-সোনিয়ান সংস্থার সচিব হওয়ার পর ওর টান আরও বেড়ে যায়। এই যোগাযোগে সোসাইটি আর ঐ সংস্থা—দুই প্রতিষ্ঠানই নানা দিক দিয়ে লাভবান হয়েছে। আমাদের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত বরাবর হিমালয়ের পূর্বাঞ্চলে ব্যাপকভাবে পক্ষিসমীক্ষার একাধিক অভিযান চালিয়ে যে গবেষণালব্ধ ফল পাওয়া গিয়েছে, তাতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানভাণ্ডার বিস্তর সমৃদ্ধ হয়েছে। রাজনৈতিক দিক থেকে স্পর্শকাতর এই অঞ্চলে সমীক্ষার কাজ আগে কখনও হয়নি। সোসাইটির সহযোগিতা না পেলে এ কাজ করা কখনই সম্ভব হত না। এ কাজে সোৎসাহে আমাদের সঙ্গী হয়েছিল ডিলন রিপ্লের স্ত্রী মেরী। মেরী যেমন অমায়িক প্রকৃতির, তেমনি ওর অনেক গুণ। যতটা দেখায়, ও কিন্তু মোটেই ততটা পলকা নয়। সঙ্গে মেরী থাকায় ক্যাম্পে আমরা বেশ রসেবশে থাকতে পেরেছি। সদ্যবিবাহিত মেরীকে আমি প্রথম দেখি যেবার আন্তর্জাতিক

পক্ষিবিদদের সম্মেলন উপলক্ষে আমি উপ্সালায় যাই। সেখানকার সভ্য সামাজিক পরিবেশে ওর সাজগোজে একটা বেশ ঝরঝরে ভাব চোখে পড়েছিল। তখন ছিল আরও বেশি রোগাপটকা। এর ঠিক পরে পরেই নাগা পাহাড়ের গহন জঙ্গলে পাখির সন্ধানে অভিযাত্রী দলে রিপ্লে সস্ত্রীক যাচ্ছে শুনে আমার মনে হয়েছিল এ দলে মেরীকে রাখাটা ঠিক হচ্ছে না। কেননা এ সফরে গেলে ওকে নাকের জলে চোখের জলে হতে হবে। যাই হোক, পরে ডিলন রিপ্লেদের সঙ্গে আরও কয়েকটা কষ্টসাধ্য অভিযানে যাবার পর বুঝতে পারলাম, মেরীর সম্পর্কে আমার ধারণা ডাহা ভুল ছিল। ওয়াশিংটনের সাজানো বৈঠকখানার মেরী রিপ্লে আর বৃষ্টিবাদ্লার মধ্যে জোঁকে ভর্তি জঙ্গলের ক্যাম্পে সাফারি পোশাকের মেরী রিপ্লে—এ দুজন এক নয়। মেলবন্ধনহীন দুই পৃথক 'অবতার'।

১৯৭১ সালের ১২ই নভেম্বর ছিল আমার পঁচাত্তরতম জন্মদিন। বোম্বাইয়ের সোসাইটি ঠিক করে, এই উপলক্ষে তারা জার্নালের একটি সংখ্যা অভিনন্দন গ্রন্থ হিসেবে বার করবে। ডিলন রিপ্লে হাসিমুখে এর সম্পাদনার ভার নিতে রাজি হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের পারস্পরিক চেনাজানা যোগ্য পক্ষিতাত্ত্বিক সহযোগী আর সতীর্থ মহল থেকে লেখা যোগাড় করবার কথাও সে দেয়। এই অভিনন্দন সংখ্যাটি পরে ১৯৭৮ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে 'এ বাণ্ডল্ অব ফেদার্স' নাম দিয়ে বই আকারে বার হয় আর দিলদরাজ এক মুখবন্ধ লিখে তার সঙ্গে বইতে লঘু চালের একটি স্বলিখিত 'পদ্য' সে জুড়ে দেয়। পদ্যটি যাতে অমরত্ব থেকে বঞ্চিত না হয়, এখানে সেটা তুলে দিলাম :

সেলিমের সাতাত্তর বছরের জন্মদিনের যশোগীত

(সাং ২ রা নভেম্বর, ১৯৭৩। রচনাস্থলঃ ক্যাম্প, ভূটান)

রান্ কালিমের ক্যাণ্ডি বাখান
যাও যেখানেই, পাতলে কান
বর্ষাবাদল রোদে খরায়
ডাকবাংলোয় নদীর চড়ায়
পাখির গলায় শুনবে গান
    সেলিম আমাদের গুরুগোসাঁই
    মস্ত আলেম, দানেশমন্ত
    বুলবুলির যম, বাবুইয়ের সহায়
    সেলিমের নেই গুণের অন্ত
হই রে হই, গজালঠুঁটি
বনমোরগের মাথায় ঝুঁটি

বউ-কথা-কও, হই রে হই
নাচব গাইব বাদ্যি কই
হুতুমথুমোর গলায় ছিপি
জলপিপিরা করছে পিঁ পিঁ
বনেবাদাড়ে জলের সোঁতায়
হাট্টিমাটিম, পালক কোথায়
        সেলিম আমাদের গুরুগোসাঁই
        মস্ত আলেম, দানেশমন্ত
        বুলবুলির যম, বাবুইয়ের সহায়
        সেলিমের নেই গুণের অন্ত
ওর চেরাগে চিরদিনই
সন্ধানীদের মিলবে পথ
আমরা রইব চিরঋণী
জানায় সেলাম পাখির জগৎ
হামবড়াদের ধোঁকার টাটি
দেখায় সেলিম কোথায় ফাঁকি
দূর নয় আর আকাশ মাটি
পর নয় আর মানুষ পাখি
        সেলিম একজন মানুষ বটে
        জগতে তাই সবাই খুশি
        জন্মদিনে পাখির ঠোঁটে
        ফুটছে বুলিঃ কদমবুসি।

(এই অনুবাদ ছায়াভাস মাত্র। কৌতূহলী পাঠকেরা মূল ইংরিজিতে পড়লে মজা পাবেন!)

শেষপর্যন্ত ছাপাখানার জন্যে জার্নালটি খণ্ড ৭১(৩৬)-বেরোতে বেরোতে হয়ে যায় মার্চ, ১৯৭৬। ডিলন রিপ্‌লেদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যখন আমি ভূটানে পাখি সংগ্রহের কাজে যাই, তখন ফেরার আগে আমার সাতাত্তর বছরের জন্মদিন উপলক্ষে ফুণ্টসোলিঙের ক্যাম্পে চুপি চুপি ওরা একটা ডিনারের আয়োজন করে। সেখানেই ডিলন ওর লেখা 'যশোগীত'টি উপহার দেয়।

জন বার্ডন স্যাণ্ডারসন হল্ডেন

অধ্যাপক জে. বি. এস. হল্ডেনের মতন চমৎকার মানুষ জীবনে আমি খুব কম দেখেছি। যেমন চেহারা, তেমনি মেধা—দুইই দশাসই। উনি যখন অল্প কয়েক বছর এদেশে

এসে কর্মব্রতী ছিলেন, সেইসময় ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। ভারতীয় পাখিদের বাস্তুতত্ত্ব সম্পর্কে আমার গোড়ার দিকের লেখাগুলো এদেশে আসার আগেই উনি পড়েছিলেন। প'ড়ে বিশেষ তারিফ করেছিলেন। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সভাসম্মেলনে অনেক সময় প্রসঙ্গের বাইরে গিয়েই আমার কাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে বলেছেন যে, শ্রম আর নিষ্ঠা থাকলে, দামি যন্ত্রপাতির অভাবে কেবল একজোড়া দূরবিনের কাঁচের সাহায্যেই যে কত কিছু করা যায় এ হল তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। বিলেতফেরত (বিশেষ ক'রে, আমেরিকা ফেরত) যে বিজ্ঞানীরা এদেশে গবেষক আর ল্যাবোরেটরিগুলোর নেহাত মাঝারি ধরনের কাজেই সাফাই গেয়ে বলত যে, হালফ্যাশানের যন্ত্রপাতি না থাকাই এর কারণ; হল্ডেন কখনই তাদের ধুড়ধুড়ি নেড়ে দিতে ছাড়তেন না। যখনই সুযোগ পেতেন, তিনি জোর দিয়ে বলতেন—জীবতত্ত্বের ক্ষেত্রে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের ঘর থেকে এক পা বেরোলেই সামনে পড়ে রয়েছে ঢালাও সুযোগ। পাশ্চাত্যের জীববিদরা এমন সুযোগ পেলে বর্তে যেত।

জে বি এসের ছিল অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, সেইসঙ্গে অনধাবন আর মনঃসংযোগের ক্ষমতা। তাঁর জ্ঞানের পরিধি আর গভীরতাও বিস্ময়কর। পদার্থবিদ্যা, রসায়ণ, আয়ুষ্কালমিতি, সুপ্রজননবিদ্যা ইত্যাদি বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে বিধিবদ্ধ জ্ঞান তো ছিলই, সেইসঙ্গে জ্যোতির্বিদ্যা, নৃতত্ত্ব, দর্শন (বিশেষ ক'রে হিন্দু দর্শন) আর জ্যোতির্বিদ্যায় ছিল তাঁর বিলক্ষণ দখল। তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ বিদ্যাকল্পদ্রুম। আকাশের কোথায় কোন্ জ্যোতিষ্ক, কোন্ নামকরা নক্ষত্রপুঞ্জ—সব ছিল তাঁর নখদর্পণে। কার কী সংস্কৃত নাম, তাও জানতেন। আমার সবচেয়ে অবাক লাগত, যখন দেখতাম এত দিকে মাথা দিয়েও সমানে তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাচ্ছেন আর সমানে লিখে যাচ্ছেন। আবার একই সঙ্গে বিজ্ঞান আর মানববিদ্যার নানা শাখাপ্রশাখায় নতুন কী আবিষ্কার, তত্ত্ব আর উদ্ভাবনা হল, তিনি তার হালফিল খবর রাখতেন। সেসব বিষয় নিয়ে সুসমঞ্জস্যভাবে তিনি স্বচ্ছন্দে বিশদ আলোচনা আর ব্যাখ্যা করতে পারতেন। তাঁর এক বিশিষ্ট সহকর্মী অধ্যাপক সার পিটার মেডাওয়ার ছিলেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিতত্ত্ব বিভাগের প্রধান। 'জে.বি.এস.' নামে রোনাল্ড ক্লার্ক-এর লেখা হল্ডেনের জীবনীর (১৯৬৮) মুখবন্ধে তিনি লিখেছেন 'গণিতজ্ঞ, প্রাচীন ভাষায় সুপণ্ডিত, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, পত্রকার অথবা সৃজনশীল সাহিত্যিক—এইরকমের আধ ডজন বৃত্তির যেকোনো একটিতে তিনি কীর্তিমান হতে পারতেন। সামান্য ঊনিশবিশ হলেও এর প্রত্যেকটিতেই প্রতিভার ছাপ রেখেছেন। বেঁচে থেকে এটাও তিনি প্রমাণ করে গেছেন যে, কী তিনি হতে চেয়েও হতে পারেননি—রাজনীতিক, প্রশাসক (রক্ষে করুন), ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ, অথবা, আমার মতে, সমালোচক হিসেবেও আদৌ পাতে দেবার মতো নন। ফলপরিণামে তিনি হন, তাঁর সময়কার তিন কী চারজন সবচেয়ে জাঁদরেল জীববিদদের অন্যতম।'

মোটা ভুরু, প্রকাণ্ড মাথা, বাইরেকার কাঠখোট্টা ভাব—যারা তাঁকে চিনত না,

তারা প্রথম দর্শনে ঘাবড়ে যেত। আহাম্মক আর বিট্‌কেলদের তিনি আদৌ বরদাস্ত করতে পারতেন না, সেটা সচরাচর বুঝিয়ে দিতেও ছাড়তেন না। কিন্তু শেখবার সত্যিকার আগ্রহ নিয়ে যদি কোনো কমবয়সী তাঁর কাছে আসত, তখন দেখা যেত তাঁর অন্য চেহারা। তখন মনে হত, এমন ধীরস্থির, বুঝদার আর নরম মনের মানুষ আর হয় না। তাদের হাত ধরে এগিয়ে দিতে তখন যেকোনো কষ্ট স্বীকার করতেই তাঁর বাধবে না। যখন তিনি কলকাতার স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে অধ্যাপনা করতেন, তখন এইভাবে বেশ কিছু সম্ভাবনাময় মেধাবী ছাত্র বেছে নিয়ে তাদের বিজ্ঞানের মৌলিক কাজের তালিম দিয়েছিলেন। সুচিন্তিতভাবে গবেষণা চালিয়ে যেতে তিনি তাদের উৎসাহ দিতেন। সেটা যদি পণ্ডশ্রম হয়, তা হলেও। হল্ডেন একে বলতেন 'বুদ্ধু পরীক্ষা'। কিন্তু এইভাবে কিছু কিছু কাজ করার ফলে কখনও কখনও অভাবিতভাবে রহস্যের খেই আর বরমাল্য আখেরে মিলে যেতে পারে।

১৯৬১ সালে রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের ভারত দর্শনে আসার কথা প্রথম ভাবা হয়, তখন হল্ডেনের কাছে জানতে চাওয়া হয় যে, ভারতের কোন্ কোন্ দ্রষ্টব্য স্থানে তাঁর যাওয়া উচিত। উত্তরে তিনি জানান 'আমাদের সেরা প্রকৃতিবিজ্ঞানী মি. সেলিম আলির সঙ্গে পরামর্শক্রমে রাণীকে যদি তাঁর নিজস্ব সফরসূচী তৈরি করতে দেওয়া হয়, হয়ত তিনি যাবেন চিলকা হ্রদ (ওড়িষ্যা), কাজিরাঙ্গা (অসম) আর সম্ভর লেক (রাজস্থান)—ওসব জায়গায় জীবহত্যা না করাই ভালো। তাহলে দশ কোটির মতন জীবজন্তুপ্রেমী ভারতবাসীর কাছে তৎক্ষণাৎ তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারবেন, যেমন পেরেছিলেন জাহাঙ্গীর।'

১৯৬১ সালে ইতালিতে একটি মানব সুপ্রজননতত্ত্বের বিষয়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন থেকে ফিরে আসার অব্যবহিত পরেই আমাকে তিনি একটি চিঠি লিখে জানান 'ইটালিয়ান অ্যাকাডেমিয়া ডেই লিন্‌সেই, থেকে আমি এবার প্রায় ১,৬০,০০০ টাকার পুরস্কার পেয়েছি। হয়তো এটা আমার চেয়ে তোমারই পাওয়া উচিত ছিল। জীববিদ হওয়ার জন্যে তোমাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। আর আমার পক্ষে না হওয়াটাই ছিল কঠিন। আমার বাবাই আমাকে পথ দেখিয়েছেন।...তোমার হাতে যদি জীবতত্ত্ব বিষয়ক কোনো প্রকল্প থাকে, আমি তোমাকে সে বাবদ স্বচ্ছন্দে কয়েক হাজার টাকা দিতে পারি।'

১৯৫৮ সালে ডারউইন আর ওয়ালেসের শতবার্ষিকী আর লিনেয়াস-এর সিস্তেমা ন্যাচুরা-র দশম সংস্করণ প্রকাশের দ্বিশততম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে মালয় বিশ্ববিদ্যালয় সিঙ্গাপুরে একটি মহাসম্মেলন ডাকে। তাতে সভাপতিত্ব করার জন্যে হল্ডেনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে একটি নিবন্ধ ('দি ব্রিডিং বায়োলজি অব সাম ইণ্ডিয়ান উইভার বার্ডস্) পড়ার জন্যে হল্ডেন আমাকে অনুরোধ করেন। সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে তাঁর অভিভাষণের বিষয় ছিল—'অন দি থিওরি অব ন্যাচারাল সিলেকশন

টুডে।' শ্রোতাদের একাংশ ছিল সুটবুট পরা আপাদমস্তক কুলীন বিলিতি সাহেবের দল। মুখে তাদের বিদ্রূপের হাসি। কেননা সভাপতির আসনে বসা হল্ডেনের অঙ্গে ধারণ করা ভারতীয় পরিচ্ছদ। (কিছুটা দলানো মলানো) স্রেফ সাদা সূতির কুর্তা আর ঢলঢলে পাজামা আর মোজাহীন পায়ে কাবুলি চপ্পল। এতক্ষণ লুকিয়ে চুরিয়ে যারা হাসাহাসি করছিল, হল্ডেন তাঁর ভাষণ শুরু করতেই দেখি, তাদের মুখে সব কুলুপ পড়ে গিয়েছে। কিন্তু তাঁর আসল ওস্তাদের মার দেখা গেল বায়োমেট্রি বিভাগের আলোচনার আসরে। বৈঠকে তিনি সভাপতি। একজন প্রচুর সংখ্যাতত্ত্ব আর অঙ্কে ভারাক্রান্ত একটি নিবন্ধ পড়বেন। বক্তার সঙ্গে শ্রোতাদের পরিচয় করাবার পর শোনবার জন্যে মঞ্চ থেকে নেমে প্রথম সারির হাই বেঞ্চে শ্রোতাদের পাশে এসে বসে পড়লেন। কনুইয়ের ওপর হেঁড়ে মাথাটা ভর দেওয়া। চোখ বন্ধ ক'রে স্থির হয়ে ব'সে। দশ মিনিটের ওপর বক্তৃতা চলেছে। কেবল সংখ্যাতত্ত্বের পর সংখ্যাতত্ত্ব। আমাদের মনে হচ্ছে বক্তৃতা নয়, যেন ঘুমপাড়ানি গান। শ্রোতাদের অনেকেই ভাবছে বক্তৃতা শুনে হল্ডেন নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে এ ওর গা টিপছে। হঠাৎ দেখা গেল, পুরুষসিংহটি ফট ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে মন্তব্য করলেন যে, বক্তা বোধহয়, হিসেবে একটু ভুল করে ফেলেছেন। এটা যদি অত হয়, আর এটা হয় এত—তাহলে যা হিসেব হয়, সেটা ওঁর গণনার সঙ্গে কিন্তু মেলে না। শুনে সেই বক্তা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে লজ্জায় পড়ে গেলেন। তারপর সংখ্যাগুলো ভালো ক'রে খতিয়ে দেখে নিয়ে কাঁচুমাচু হয়ে কবুল করলেন যে, হল্ডেনের কথাই সঠিক। এদিকে অন্যান্য শ্রোতারা সভাপতিকে যখন নিদ্রামগ্ন ভেবে মজা পাচ্ছিল, তখন কিন্তু হল্ডেন আসলে বক্তৃতা শুনতে শুনতে সংখ্যাতত্ত্বের হিসেব মনে মনে কষছিলেন। যারা তাঁকে এযাবৎ হতচ্ছেদ্দা ভাব দেখিয়ে আসছিল, হল্ডেনের মনঃসংযোগের অসাধারণ ক্ষমতা দেখে তাদের তখন পিলে চমকে গেছে।

সরকারের আঠারো মাসে বছর আর বিজ্ঞানবিষয়ে গড়িমসি ভাব—হল্ডেনের কাছে এটা ছিল একটা বড়ো অভিশাপ। একটি পক্ষিতাত্ত্বিক প্রকল্পে দুজন মেধাবী তরুণ বৈজ্ঞানিককে কাজে লাগাবার জন্যে সি এস আই আর-এর কাছে সামান্য অনুদান চেয়ে আমি একটি আবেদন করেছিলাম। কিন্তু বার বার তাগাদা দিয়েও কোনো ফল হচ্ছিল না। এ কথা জানতে পেরে স্বভাবসুলভ দরাজভাবে আমাকে তিনি লেখেন 'ব্যারাকপুর, ২রা মে, আশাব্যঞ্জক কোনো তরুণকে তুমি যদি হাজার তিনেক টাকা দিয়ে দাঁড় করাতে চাও, আমার কাছে আর্জি জানাও না কেন? আমি যদি 'না'ও বলি, সি এস্ আই আর-এর চেয়ে ঢের তাড়াতাড়ি আমি সেটা জানিয়ে দেব।'

রিচার্ড ওয়াটকিন্‌স্ বার্টন

লেফটেনান্ট কর্নেল আর.ডব্লু. বার্টনরা ছিলেন ছ' ভাই। মজার ব্যাপার, তাঁরা ছ'জনই

ছিলেন মিলিটারিতে। পিতা জেনারেল ঈ.এফ. বার্টনের পদাঙ্ক অুসরণ ক'রে তাঁদের চারজন (নাকি, পাঁচজন?) ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীতে। ঈ.এফ. বার্টন নিজেও ছিলেন বাঘ মারতে ওস্তাদ। নিতান্ত কম বয়সে অধস্তন পদে থাকার সময়ই রিচার্ড ১৮১১ সালে বোম্বাইয়ের প্রকৃতিবিজ্ঞান সমিতিতে যোগ দেন। তখন থেকেই শিকারে তাঁর বেজায় উৎসাহ। অভিজ্ঞতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বড়ো জন্তু শিকারে মন দেন। হিংস্র জন্তু শিকারে তাঁর কোনো ভয়ডর ছিল না। চোট লাগা বা মানুষখেকো বাঘ আর চিতা বাঘের সঙ্গে কতবার যে তাঁকে মুখোমুখি লড়তে হয়েছে তার সীমাসংখ্যা নেই। একবার তো তিনি আহত ভাল্লুকের পাল্লায় পড়ে সাংঘাতিক রকমের জখম হয়ে মরতে বসেছিলেন। ঝানু শিকারিদের ক্ষেত্রে পরে যা হয়ে থাকে, ওঁরও তাই হয়েছিল। এক সময়ে যে উৎসাহ নিয়ে শিকারে যেতেন, পরবর্তীকালে ঠিক একই উৎসাহ নিয়ে তিনি শিকার ছেড়ে মেতে গিয়েছিলেন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কাজে। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর একদিকে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণ শিথিল হল, অন্যদিকে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার কাজেও নানা রকমের ঢিলেমি দেখা গেল। বনবিভাগে আর প্রশাসনে যেসব সংরক্ষণসচেতন ইংরেজ অফিসাররা দায়িত্বে ছিলেন, তাঁরা প্রায় সবাই দেশের ছেলে দেশে ফিরে গেলেন। এর ফলে, বন্য প্রাণীদের কপাল পুড়ল। বনের প্রশাসনে যুক্ত থাকা যে অফিসাররা এতদিন বন্যপ্রাণীদের বিধিসম্মতভাবে দেখভাল করার দায়িত্ব পালন করে এসেছিলেন, তাঁদের সংখ্যা কমে যাওয়ায় সে কাজ করতে পারে, এমন উৎসাহী বিশেষজ্ঞ লোকের অভাব দেখা দেয়। যাঁরা তখন দায়িত্বে এলেন, তাঁরা মনে করলেন যে, বনসম্পদ থেকে সরকারের ঘরে কত রাজস্ব আসছে, সেটা দেখাই তাঁদের মুখ্য কাজ। বন্যপ্রাণিদের ব্যাপারটা একেবারেই গৌণ। কেউ কেউ এটাকে তাঁদের ঘাড়ে পড়ে যাওয়া বাড়তি ঝঞ্ঝাট বলেও মনে করলেন। এর ফলে, বনজঙ্গলের ভেতরে বাইরে ভয়াবহ হারে বন্যপ্রাণী বেপাত্তা হয়ে যেতে লাগল। তখনই প্রায় বিলুপ্ত হওয়ার দশা হল বহু প্রজাতির।

এই রকমের একটা অবস্থায় আমাদের সোসাইটি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বিষয়টাকে সরকার আর সর্বসাধারণের নজরে বড়ো করে তুলে ধরবার চেষ্টা করছিল। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে বার্টন তখন বাঙ্গালোরে এসে ডেরা বেঁধেছেন। সোসাইটির উপদেষ্টা কমিটিতে যোগ দিয়ে (অনিচ্ছা সত্ত্বেও সোসাইটির সাম্মানিক সম্পাদকের পদ সেই সময় আমাকে গ্রহণ করতে হয়) সোসাইটির বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আর উৎকণ্ঠা সোসাইটির কাজে বড়ো রকমের শক্তি যোগাল। স্থানীয় কাগজগুলোতে একনাগাড়ে তথ্যভিত্তিক প্রবন্ধ বার করা, শিক্ষামূলক পুস্তিকা প্রকাশ করা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আর মন্ত্রকগুলোর কাছে আর্জি জানানো—এরই ওপর আমরা জোর দিয়েছিলাম। গোটা দেশ জুড়ে বন্যপ্রাণী নিধনের যে তাণ্ডব চলেছে, সে বিষয়ে নিঃস্পৃহ দেশবাসী আর সরকারকে নাড়া দিতে। একদিকে

সোসাইটি, অন্যদিকে, সংরক্ষণমনস্ক এম. ডি. চতুর্বেদী (স্বাধীন ভারতের বনদপ্তরের প্রথম মহাপরিদর্শক) আর সুন্দরলাল হোরা-র (অধিকর্তা, জুওলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া) মতন সরকারি আমলা, সেইসঙ্গে কয়েকজন প্রকৃতিবিদ আর ক্রীড়াবিদ, আর বিশেষ ক'রে, এদেশে থেকে যাওয়া কর্নেল বার্টন, আর. সি. মরিস্ আর ঈ. পি. গী-র মতন কয়েকজন মস্ত ইংরেজ শিকারি; এবং এই সব কিছুর ওপরে ছিল প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর বলিষ্ঠ সমর্থন—তারই ফলে, তৈরি হতে পেরেছিল ভারতীয় বন্যপ্রাণী পর্ষদ। এতে বন্যপ্রাণীদের ভাগ্য ফেরার পথ কিছুটা প্রশস্ত হল।

১৯৩৩ সালে সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে 'ভারতের বন্যপ্রাণিকুল আর তাদের বাঁচিয়ে রাখার সমস্যা' নিয়ে সোসাইটির কিউরেটার মি. প্রেটার এক জবরদস্ত ভাষণ দেন। তার ফলে, বন্যপ্রাণীদের সম্পর্কে লোকের আগ্রহ আর সেইসঙ্গে সংরক্ষণের ব্যাপারে দায়িত্ববোধ আর চিন্তাভাবনা দেখা দেয়। তারই জের টেনে ১৯৩৫ সালে দিল্লিতে ভারত সরকারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় উচ্চস্তরের আন্তঃপ্রাদেশিক সম্মেলন। বন এলাকার ভেতরে আর বাইরে উভয়ত বন্যপ্রাণীদের সংরক্ষনের উন্নততর ব্যবস্থা নেবার জন্যে বেশকয়েকটি কার্যকর পন্থার সুপারিশ করা হয়। কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ বহুদিন শুধু ফাইলচাপা হয়ে পড়ে থাকে। স্বাধীনতার পরেও এ ব্যাপারে কাজের কাজ বিশেষ হয়নি। ১৯৫৩ সালে ভারতীয় বন্যপ্রাণী পর্ষদ গঠন করা হয়। এদেশের বন্যপ্রাণীদের নিরাপত্তা আর সংরক্ষণের ব্যাপারে নীতিপদ্ধতিগত পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশাবলী তৈরি ক'রে পর্ষদকে তা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের জন্যে পাঠাতে বলা হয়। এতদিনের অচলব্যবস্থা এবার কাটতে শুরু করল। এই সময় 'ওয়াইল্ডলাইফ প্রিজার্ভেশন ইন ইণ্ডিয়া—ইণ্ডিয়াজ ভ্যানিশিং অ্যাসেট' শিরোনামে বার্টনের লেখা একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। তাতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন পাশ এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ যে খুব জরুরি, বিশেষ জোর দিয়ে তা বলা হয়। লেখাটি ছিল অতি সুচিন্তিত। ব্যাপকভাবে বইটি বিলি করা হয়। এ ছাড়াও আরও নানাভাবে তিনি তাঁর অভীষ্ট আদর্শ পালন করেন। এইভাবে যথাসময়ে বীজাকারে তাঁর ফলপ্রসূ ভাবনা সকলের কাছে পৌঁছে দেন।

এডোয়ার্ড প্রিচার্ড গী

অসমে লম্বা মেয়াদের চা-করের জীবন। তারপর অবসর নিয়ে স্থিতু হয়ে বসলেন শিলঙে। ঈ. পি. গী। এক 'নেই-আঁকড়া' চিরকুমার। সেখানে বনজঙ্গল ঢুঁড়ে গড়ে তুললেন নিজস্ব এক চমকপ্রদ অর্কিডের সংগ্রহশালা। তার বেশির ভাগটাই বনজঙ্গল ঢুঁড়ে নিজে সংগ্রহ করা। তরুণ বয়সে যখন চা-বাগান করতে আসেন, তখন ছিল বনে বনে ঘোরা আর শিকার করার দুরন্ত নেশা। সেইসঙ্গে হামেহাল মাছ ধরা। আজীবন একরকমই তিনি থেকে গিয়েছিলেন। ১৯৪৮ সাল নাগাদ অসমের গভর্নর (সার

আকবর হায়দারি, জুনিয়ার)-এর আমন্ত্রণে সোসাইটির পক্ষ থেকে গণ্ডার সুমারির খোঁজখবর নিতে আমি কাজিরাঙা অভয়ারণ্যে যাই। তখনই গী-র সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। গী তখন শিকারের পাট তুলে দিয়ে বন্যপ্রাণীর ফটো তোলাকেই ধ্যানজ্ঞান করেছেন। শখের ফটোগ্রাফিতেও তিনি পাকা হাতের পরিচয় দেন। কর্নেল বর্টন আর আর. সি. মরিস—এঁরা পরমোৎসাহে তখন সংরক্ষণের কাজে ব্রতী। গী-ও এঁদের সঙ্গে যোগ দেন। ১৯৫৭ সালে গী-র সঙ্গে ভরতপুরে লোক্-এর দেখা হয়। ওর ডায়রিতে গী-র বর্ণনা আছে:

> বেশ তাগড়াই চেহারা। মাথায় টাক পড়ে আসছে। চোখে টর্টয়েজ শেলের চশমা। ব্রাউনিংয়ের বস্তুরা পাখির মতন ওঁর একই কথা দুবার বলার স্বভাব। প্রথমটি বলার পরই তার গায়ে এসে পড়বে দ্বিতীয় শব্দগুচ্ছ। পিনেকা পানি হ্যায়, পিনেকা পানি; জ্বালাতন পোড়াতন হয়ে, জ্বালাতন পোড়াতন হয়ে শেষে নিজেই নিজের মাথার খুলি উড়িয়ে দিল, শেষে নিজেই নিজের মাথার খুলি উড়িয়ে দিল। গী কানে একটু খাটো। হয়তো তাই তার এই পুনরাক্তির মুদ্রাদোষ। সেলিমও বেশ একটু কালা। সেলিম আর গী নিজেদের মধ্যে যখন কথা বলে, একজন খানখেনে আর একজন মৃদু ঘ্যানঘেনে গলায়—কান খাড়া না করেও দুনিয়ার লোক শুনতে পায় কে কী বলছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গী স্বেচ্ছায় মিলিটারিতে যোগ দেন। বিরাট সংখ্যক বাগিচা-শ্রমিকদের হ্যাপা সামলানোর ওর অভিজ্ঞতা থাকায় ওঁকে পায়োনিয়ার করে ঠেলে দেওয়া হয়। বিখ্যাত বর্মা রোডের নির্মীয়মান একাংশের তদারকির ভার ওঁর ওপর পড়ে। আর ঠিক একই সময়ে আরও কয়েক মাইল এগিয়ে ঐ রাস্তারই আরেক অংশেও কাজ হচ্ছিল। সেখানে যে কাজ দেখছিল, তার নামও ছিল ঈ. পি. গী। একেবারেই কাকতলীয় ব্যাপার। কিন্তু দুজনের কেউই তা জানত না। এদিকে ওপরতলার অফিসাররা উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে ফেলে কেবলি ফাঁপড়ে পড়ে যাচ্ছে। তখন এই নামবিভ্রাট থেকে বাঁচার জন্যে 'গী'-র নামকরণ করল 'চ্যাটার-গী' কারণ, গী একটু বেশি কথা বলতেন!

১৯৬৯ সাল সোসাইটির পরিযায়ী পাখি সমীক্ষার জন্যে হিমালয়ের পূর্বাঞ্চলে আমি গিয়েছিলাম পাখিদের রিং পরানোর পক্ষে জুতসই জায়গার খোঁজে। বছর দুই আগে এন. ডি. জয়াল যখন সিয়াং সীমান্ত বিভাগের সহকারী পলিটিকাল অফিসার হিসেবে টিউটিঙে ছিলেন, তখন তিনি একটি খবর দেন। খবরে বলা হয় যে, জ্বালামুখ সদৃশ এই দীর্ঘায়ত উপত্যকাটি পরিযায়ী পাখিদের নিয়ে কাজ করার একটা ভালো জায়গা। মরশুমের সময় এখানে শুধু মধ্য এশিয়া নয়, তারও ওপারে দূর দূর জায়গা থেকে পরিযায়ী পাখিরা এসে ভিড় করে। আগে ভাগে গিয়ে দেখে আসার যখন কথা হয়, তখন গী সানন্দে আমাকে সঙ্গ দিতে রাজি হন। পি. এস্ এস. (সরন্ধ্র ইস্পাতের পাত) বিছিয়ে বিমান ওঠানামার ব্যবস্থা হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রাকযুদ্ধ আমলে রাজনৈতিক

সদর পাসিঘাট থেকে টিউটিং যেতে হত। ঘন জঙ্গলাকীর্ণ খাড়া পাহাড়ের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে হাঁটাপথে যেতে চোদ্দ দিন সময় লাগত। একটি নিরাবরণ নিরান্তরণ প্লেন। আমরা বসেছি চাল ডাল আটার বস্তার ওপর। সহযাত্রী বলতে আশপাশে কেরোসিন, পেট্রোল আর তেলের ড্রাম। তার সঙ্গে ফাউ হিসেবে কিছু জ্যান্ত ছাগল—পরিণামে মাংস হওয়ার অপেক্ষায়। ডাকোটা বিমানটির, বলতে নেই, বয়েস হয়েছে। তার দম বেরিয়ে যাওয়ার অবস্থা। চতুর্দিক হাঁ হাঁ করছে। খোলা দরজা দিয়ে হু হু করে হাওয়া ঢুকছে। হাজার হাজার ফুট নীচে অন্তহীন পাহাড়ের চূড়া, শৈলশিরা আর গিরিখাত। চোখ পড়লেই গা শিউরে ওঠে। দুপাশে তুষারবৃত দৈত্যাকায় পর্বতমালা। মধ্যে সরু গলিপথ। যেতে যেতে মনে হয়, এই বুঝি পাহাড়ের গায়ে প্লেনের পাখা ঠেকে গেল। সে এক রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা। নভেম্বরের তখন শেষাশেষি। পরিযায়ী পাখিদের শরৎকালীন উড়ানের সময় তখন পার হয়ে গিয়েছে। যত যাই হোক, দেখলাম জায়গাটার দূরত্ব বেশি আর সব কিছুরই এত খামতি যে, টিউটিঙে রিং পরানোর প্রকল্প সোসাইটির দিক থেকে হাতে নেওয়া নেহাৎ অবাস্তব হবে। আমরাও ফিরে এসেছি, আর তার কয়েক হপ্তা পরেই প্রথম সীমান্ত যুদ্ধে চীনের ড্রাগন গোটা তল্লাটটাই গ্রাস করে নিল।

ঐ একই সময়ে, পরিযায়ী পাখিদের রিং পরানোর ব্যাপারে কতটা কী সুযোগসুবিধে আছে দেখার জন্যে জাতিঙ্গায় যাই। যদিও এখানেও ছিল একই সমস্যা। নভেম্বরের শেষ আদৌ উপযুক্ত সময় নয়। উত্তর কাছাড়ের পার্বত্য এলাকায় জাতিঙ্গা একটা ক্ষুদ্র গ্রাম। এখানে পাখিদের 'গণ আত্মহত্যা' নিয়ে খবরের কল্পনাপ্রবণ রিপোর্টাররা বিস্তর গল্প ছড়িয়েছিল। বলেছিল, বছরের কয়েকটা সময়ে এটা নাকি ঘটে থাকে। ফলে, জাতিঙ্গা নামটা ইদানিং লোকের বেশ জানা হয়ে যায়। মিথ্যে রটনায় জাতিঙ্গার কম অখ্যাতি হয়নি। স্থানীয় সূত্র থেকে আমরা যা জানতে পারি, তা এই যখন মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখী, আকাশ কালো মেঘে ঢাকা, অন্ধকার রাতে ঝিরঝির ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে, মাটির ওপরটা ঘন কুয়াশায় মোড়া, উপত্যকায় উত্তর-দক্ষিণে হাওয়া বইছে—অর্থাৎ, পরিযায়ী পাখিদের শরৎকালীন উড়ানপথ যখন বিঘ্নসঙ্কুল, তখন সেই বিশেষ আবহাওয়ায় গ্রামের লোকেরা জোরালো আলো জ্বালিয়ে রাখে। আলোর টানে রকমারি পাখিরা বড়ো বড়ো ঝাঁক বেঁধে নেমে এলে লুকিয়ে থাকা শিকারির দল মাংসের লোভে একধার থেকে তাদের নিকেশ করে। সন্ধ্যে সাতটা থেকে ন'টা আর মাঝরাতে দুটো থেকে চারটে—এই ওদের শিকারের শুভলগ্ন। অন্ধকার মেঘলা রাত্তিরে যখন আকাশের তারা দেখা যায় না, পরিযায়ী পাখিরা তখন জোরালো আলো দেখে আকৃষ্ট হয়। এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। ওদের উড়ানপথের লাইটহাউসগুলোতে এ জিনিস আকছার ঘটে। আমার কাছে জাতিঙ্গার আসল রহস্য ঠেকেছে অন্য জায়গায়। উড়ে আসা এই পাখিদের দলে এমন সব

দিবাচর প্রজাতি পাওয়া গেছে, যাদের আবাসিক আর অপরিযায়ী বলে মনে করা হয়। দিবাচর পাখিরা অনর্থক রাত্রে উড়তে যাবে কেন? রাজ ঘুঘু (চালকোহ্যাপ্স্), সান বাটান (আরবোরোফিলা), মাছরাঙা (হ্যালসিয়ন স্মিরনেনসিস) এবং অন্যরা এই দলে পড়ে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে আর সোভিয়েট ইউনিয়নে রিং-পরানো যে পাখিদের ভারতবর্ষে পাওয়া গেছে, যার ফলে তাদের আচার-আচরণ হয় খাঁটি দূর পাল্লার পরিযায়ীদেরই মতন। এলাকার আবাসিক পাখিদের ব্যাপক হারে রিং পরাতে পারলে এই ধাঁধার অনেকখানি উত্তর মিলবে।

দেখা গেছে, পরের দিকের বাগানীদের অনেকেই বেশ সংস্কৃতিবান আর লেখাপড়াজানা। এডোয়ার্ড পি. গী (অন্যথায় ঈর্পিজি) ছিলেন তাঁদেরই একজন। যেদিন তিনি বন্দুক ফেলে দিয়ে ক্যামেরা হাতে নিলেন, তখন থেকেই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ব্রতসাধনে ক্রমেই নিজেকে সঁপে দিতে লাগলেন। অবসরের পর এটাই হয়ে গেল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। বিভিন্ন জাতীয় উদ্যান আর বন্যপ্রাণিদের অভয়ারণ্যে নিজের উদ্যোগের কোথায় কী অবস্থা স্বচক্ষে দেখে বেড়াতে লাগলেন। সোসাইটির জার্নাল, 'ওরিক্স' (প্রাণিবর্গ আর উদ্ভিদবর্গ সংরক্ষণ সমিতির বিখ্যাত মুখপত্র) এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পত্রপত্রিকায় বিস্তর প্রামাণিক প্রবন্ধ লিখে যেতে লাগলেন। স্বদেশের ব্যাপক প্রচারের জন্যে ভারতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোতে সমানে যেমন তিনি লিখে চললেন, তেমনি তাঁর তোলা চমৎকার সব ফিল্ম দেখিয়ে, সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিয়ে আর রেডিওতে প্রচার ক'রে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের সেই বার্তা সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার কাজে উঠে প'ড়ে লাগলেন। গী ছিলেন সূক্ষ্মদর্শী একজন স্বতঃপ্রণোদিত প্রকৃতিবিজ্ঞানী এবং ভারতীয় বন্যপ্রাণীর বোর্ডের উদ্যমী সদস্য। সরকারি মহলে তাঁর মতামত আর বক্তব্য বিশেষ গুরুত্ব পেত। ১৯৬৪ সালে তাঁর বই 'দি ওয়াইল্ডলাইফ অব ইণ্ডিয়া' কলিন্স প্রকাশ করে। এর ভূমিকা লেখেন প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। বৃহত্তর বন্য প্রাণিদের হালফিল অবস্থা নিয়ে লেখা এই তথ্যবহুল বইটি সর্বাধিক জনপ্রিয় হয়। সাধারণ পাঠকদের জন্যে কথা বলার ঢঙে লেখা এ বইটি খুবই চিত্তাকর্ষক। সেইসঙ্গে পাতায় পাতায় আছে লেখকের নিজের তোলা সুদৃশ্য ছবি।

গী ছিলেন আমার এক পরম বন্ধু। ওঁর সঙ্গে আমার খুব বনিবনা ছিল। উনি ছিলেন সোসাইটির এক বড়ো সম্পদ। সোসাইটির যখনই যে কাজে ওঁকে দরকার হয়েছে, সব সময় গী একপায়ে খাড়া। তার জন্যে যেমন ওঁকে অসুবিধেয় পড়তে হয়েছে, তেমনি ওঁর গাঁটগচ্চাও কম হয়নি। ওঁর মতো দায়বদ্ধ সদস্য, হায়, সোসাইটির যদি আরও থাকত। ভারতের প্রাকৃতিক সম্বল আর বন্যপ্রাণিদের সংরক্ষণের দিক দিয়ে ওঁর মৃত্যুতে আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতি ওঁরও হয়েছে। নিঃস্বার্থভাবে এতদিনের অক্লান্ত প্রয়াস আর আন্দোলন যখন সবে ফল দিতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই সব কিছু ছেড়ে ওঁকে চলে যেতে হল।

হুমায়ুন আবদুল আলি

বর্মা ছেড়ে বরাবরের মতন চলে আসার পর কুড়ির দশকের গোড়ার দিকে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় যে চেলা পেয়েছিলাম, তার একজন ছিল স্কুলপড়ুয়া হুমায়ুন। ও ছিল সম্পর্কে আমার ভাই। আমার শ্যালক হাসানের বড়োভাই নাজিমুদ্দিন আবদলআলির ছেলে। জাপানে ওর ছিল রমরমা ব্যবসা। পরে সে তার ব্যবসার সদরদপ্তর বোম্বাইতে সরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয়। এসে আন্ধেরিতে ডেরা বাঁধে। আন্ধেরি তখন ছিল বেশ নিরিবিলি জায়গা। গাছপালায় ঢাকা শহরের উপকণ্ঠ। সাধারণ নানা পাখপাখালি সেইসব গাছে এসে বসত। কিছু পাখি ঠাঁই নিত বাড়ির হাতার মধ্যে গাছগাছালির জঙ্গলে। এই পরিবেশে থেকে তার বালক মন প্রকৃতিবিদ্যার দিকে ঝুঁকে পড়ে। সংগ্রহ করতে শুরু করে দেয় যত রাজ্যের পাখির ডিম, সাপখোপ, গিরগিটি, ব্যাং আর অন্যান্য ক্ষুদে প্রাণী। নতুন কী পাখি দেখা গেল, কোথায় পাখির বাসা মিলবে— এসব খোঁজতল্লাস করার ব্যাপারে যে ওকে সাহায্য করত, সে ওদেরই বাড়ির এক কাজের মেয়ে। একেবারে নিরক্ষর, কারো কাছে তালিমও পায়নি। কিন্তু পাখি বলতে পাগল। এমন অসাধারণ প্রকৃতির মানুষ বড়ো একটা দেখা যায় না। নিজে থেকেই সে ঘরে ঘরে পাখির খোঁজ করে বেড়াত।

ইস্কুলের পাট চুকিয়ে হুমায়ুন তারপর তো আনুষ্ঠানিক প্রাণিতত্ত্ব নিয়ে কলেজে (সেন্টজেভিয়ার্স) ভর্তি হল। ততদিনে সে বেশ একজন উৎসাহী জ্ঞানগম্যিযুক্ত চৌকস প্রকৃতিবিজ্ঞানী হয়ে উঠেছে। পাখিতেই ওর বিশেষ আগ্রহ। বোম্বাইয়ের আশপাশের জায়গাগুলো থেকে কলেজ মিউজিয়ামের জন্যে অনুশীলনের খুবই ভালো উপাদান সে সংগ্রহ করেছিল। ওর সেইসব মালমশলা আর প্রধানত ১৯২৪ থেকে ১৯২৯ সালের অন্তর্বর্তী সময়ে আমার সংগৃহীত তথ্য—এই দুইয়ের ভিত্তি ক'রে আমরা দুজনে যুগ্মভাবে 'দি বার্ডস্ অব বম্বে অ্যাণ্ড স্যালসেট' শিরোনামে একটি নিবন্ধ লিখি। ১৯৩৬-৭-এর সোসাইটির জার্নালে তা ছাপা হয়। তিরিশের বছরগুলোর গোড়ার দিকে কলেজের লম্বা ছুটিতে হুমায়ুন তিনবার হায়দ্রাবাদ আর ত্রিবাঙ্কুরে পক্ষিসমীক্ষা পর্বে আমার সঙ্গে থাকে। সেই সময়েই বিধিবদ্ধভাবে নমুনা সংগ্রহ আর ক্ষেত্র সমীক্ষার কাজে ওর হাতেকলমে দীক্ষা হয়। পরে এই বিদ্যায় ও ভালোভাবেই হাত পাকায়। ওর ধারালো পর্যবেক্ষণশক্তি আর নিজস্ব জিজ্ঞাসু মন, সেইসঙ্গে উৎসাহ আর সংবেদনশীলতা থাকায় নবীন প্রকৃতিবিজ্ঞানী ক্ষেত্র স্থলে খুবই যোগ্য সহকারী হতে পেরেছিল। ক্যাম্পজীবনে আর শিকারে ওর সঙ্গ ছিল যেমন আনন্দদায়ক আর প্রেরণাময়, তেমনি মজাদার। কাজে ওর কোনো ক্লান্তি ছিল না। পাখি আর প্রকৃতিবিজ্ঞানের নমুনা সংগ্রহের মধ্যে ওর বিচারবোধ থাকত। ওর ছিল ১২-বোরের বন্দুক। লক্ষ্যভেদেও সিদ্ধহস্ত ছিল। ওর কল্যাণে খেতে বসে ক্যাম্পে আমাদের

মাংসের বড়ো একটা অভাব হত না। তার ওপর, ওর শরীরে কোনো ভয়ডর ছিল না। পাখির খোঁজে গিয়ে বিপদের ভয়ে ও কখনও পিছিয়ে আসত না। খাড়াইয়ের ওপর ঢালু জায়গায় রয়েছে বাজপাখির বাসা। হুমায়ুন দাঁতে পাথর কামড়ে উঠে যাবে। কোন্ এক গুহার ফোকরে আছে তালচোচের বাসা, একশো ফুট ওপরে পলকা ধরনের একটা দড়ি ধরে ঝুলতে ঝুলতে ও উঁকি দিয়ে তা পরখ করবে।

সোসাইটির সাম্মানিক সচিব (১৯৫০-৬২) এবং তার প্রতিনিধিস্বরূপ বোম্বাই রাজ্য বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উপদেষ্টা বোর্ডে সদস্য থাকার সময় হুমায়ুন বনদপ্তরের সহযোগিতায় ১৯৫১ সালে বম্বে ওয়াইল্ড বার্ড অ্যাণ্ড ওয়াইল্ডলাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্টের মুসাবিদা তৈরিতে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল। বিভিন্ন অগ্রসর পাশ্চাত্য দেশে এ ধরনের যত আইন হয়েছে, সেসব ঘাঁটাঘাঁটি করে এবং ছেঁকে নিয়ে আর সামান্য হেরফের করে অনেক খেটেখুটে এই আইনের খসড়া তৈরি করা হয়। পরে এরই ছকে খাড়া করা হয় ১৯৭২-এর সেন্ট্রাল ওয়াইল্ডলাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট। ভারতবর্ষে বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত যত আইন হয়েছে, তার মধ্যে বলা হয় এটাই সবচেয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর। সোসাইটির সচিব থাকার সময় হুমায়ুন নিজে উদ্যোগ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এই নিয়ে আলাপ আলোচনা শুরু করে দেয় যে, সোসাইটি যাতে আলাদা একটা বাড়ি পায়। যেখানে অফিস, লাইব্রেরি আর প্রাণীতাত্ত্বিক অমূল্য সব সংগ্রহ নিয়ে সোসাইটির পাকাপাকিভাবে মাথা গোঁজার ঠাঁই হবে। তা যে সফল হয়েছে, আজকের হর্নবিল হাউস তার অকাট্য প্রমাণ। এটা খুবই দুঃখের যে, পরবর্তী সময়ে ও এমনভাবে বদ্‌লে গেল যে, অনেক সময়ই ওর সঙ্গে কাজ করা দুষ্কর হয়ে দাঁড়াল। যারা ছিল ওর সহকারী, অন্তরঙ্গ বন্ধু আর গুণগ্রাহী, ওর সম্পর্কে তাদের ধারণা বদ্‌লে গেল। এতে ওর নিজেরও ক্ষতি হল, আর সেইসঙ্গে যে আদর্শে ও ব্রতী হয়েছিল, তারও মস্ত ক্ষতি হল। তা না হলে, নিঃসন্দেহে বলা যায়, ওর যা ক্ষমতা ছিল, তাতে ও সত্যিই কাজের মতন কাজ করে একজন কৃতীপুরুষ হতে পারত।

□

বৈজ্ঞানিক পক্ষিবিদ্যা আর জীবহত্যা

শেষদিকে লোকে কীভাবে যেন এটা ধরেই নিয়েছিল যে, যেহেতু আমি পক্ষিপ্রেমিক, সেইজন্যে নিজে পাখি মারা তো দূরের কথা, অন্য কেউ মারলেও আমি নিশ্চয় অতিশয় বিরাগ বোধ করব। আমার সম্পর্কে এরকম ধারণা করে নিলে ভুল হবে। এর ফলে অনেক সময় আমাকে ভারি অস্বস্তিতে পড়তে হয়। এটা ঠিক যে, অকারণে জীবহত্যা আমার দুচক্ষের বিষ। এটি নিছক বর্বরতা বলে আমি মনে করি; যারা তা করে, তারা যারপরনাই নিন্দার যোগ্য। কিন্তু পাখির প্রতি আমার ভালোবাসা মোটেই কোনো ভাববিলাস থেকে নয়। সৌন্দর্যপ্রিয়তা আর বিজ্ঞানবোধ এর মূলে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা এমনকী উপযোগভিত্তিকও বটে। পক্ষিকুল বিষয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানানুশীলনের স্বার্থে অনেক সময় কিছু পাখির প্রাণবলি যায়। মারতে আমার একটুও ভালো লাগে না। কখনও কখনও এমনকী বিবেকের দংশন বোধ করি। কিন্তু এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই যে, প্রথম জীবনে বিধিবদ্ধভাবে আমাকে নমুনা সংগ্রহ করতে হয়েছে—হায়, বেশ কয়েক হাজার। তা যদি না করতাম, ভারতীয় পাখিদের সম্পর্কে চর্মসংরক্ষণমূলক জ্ঞানের ক্ষেত্র কিছুতেই প্রশস্ত হতে পারত না। বিভিন্ন আঞ্চলিক সমীক্ষায় সেটাই হয়েছে। নাহলে তাদের ভৌগোলিক বিস্তৃতি, বসতিতত্ত্ব এবং জীবপরিবেশ—এসব বিষয়েও কিছু জানা যেত না। অবশ্য আজ এমন একটা অবস্থায় আমরা পৌঁছেছি, যখন কয়েকটি সবিশেষ ক্ষেত্রে ছাড়া—যেমন : পক্ষমোচন, দেশের কয়েকটি অনির্ধারিত প্রত্যন্ত অঞ্চলে সমীক্ষা অথবা মিউজিয়ামে অমিল কয়েকটি অজানা প্রজাতির নমুনা সংগ্রহ—এছাড়া ভারতীয় পাখি সংগ্রহের বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। অধিকাংশ চর্মসংরক্ষণ ঘটিত সমস্যা নিরসনে এখন যথেষ্ট মালমশলা মিলবে বোম্বাই প্রকৃতিবিজ্ঞান সোসাইটি, জুওলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া এবং বিদেশের বড়ো বড়ো প্রকৃতিবিদ্যাবিষয়ক মিউজিয়ামে। ব্যক্তিগত আর সাংগঠনিক ভাবে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া আর সহযোগিতা যেমন বেড়েছে, তেমনি দ্রুত বিমান পরিবহণের সুবিধে হয়েছে। ফলে, তুলনামূলক জ্ঞানানুশীলনে অতিরিক্ত উপাদান সহজেই ধার করে আনা যায়। একটা সময় ছিল, খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, যখন

পক্ষিনিরীক্ষণকে শখের জিনিস বলে মনে করা হত। ওটা যেন বেকার বড়লোকদের সময় কাটানোর উপায় মাত্র। একমাত্র অঙ্গসংস্থান আর চর্মসংরক্ষণকেই তখন 'বৈজ্ঞানিক' পক্ষিবিদ্যার পদবাচ্য বলে মনে করা হত। সেই তখন থেকে আমার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ছিল স্বাভাবিক পরিবেশে থাকা জীবন্ত পক্ষিকুল।

চর্মসংরক্ষণবিদ্যা নিয়ে আমার তেমন মাথাব্যথা ছিল না। ওটাকে শুধু পঠনপাঠনের বিষয় হিসেবেই নিয়েছি। চর্মসংরক্ষণবিদ বাঘা বাঘা দিগ্‌গজ পণ্ডিত আর পণ্ডিতমন্যদের মধ্যে যখন বাগ্‌যুদ্ধ হয়েছে, যা কখনও কখনও চুলোচুলির পর্যায়ে গেছে—আমি পাশে দাঁড়িয়ে স্রেফ মজা দেখেছি। যে পাখি নিয়ে ওদের এত গলাবাজি, সেই পাখির সঙ্গে ওদের পরিচয় ছাতাপড়া জাদুঘরের নমুনা ঘেঁটে। যে রকম সহজ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তারা চর্মসংরক্ষণবিদ্যা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, তা দেখে ওমর খৈয়মের সেই রুবাইয়ের কথা আমার মনে পড়ে : 'হেথা হোথা যায়, জোট বেঁধে, বধ করে—ফেরে একে একে যে যার নিভৃত ঘরে।' শেষ পর্যন্ত প্রায়শ এটাই দাঁড়ায়। পুরো এক পাক ঘুরে এসে যেখানে আরম্ভ করেছিলাম, ফের সেইখানেই ফিরে এসেছি। এই চরকি পাকে আমার কোনো আনন্দ নেই। আগেও যা হয়েছে, আমার ভয়, ভবিষ্যতেও সেটাই হবে। সুখের বিষয় এই যে, সর্বাত্মক জোর দেওয়ার জায়গাটা এখন বদলাচ্ছে। বিশেষ করে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে। চর্মসংরক্ষণবিদ্যার নয়, এখন জোর দেওয়া হচ্ছে জীবন্ত পাখির বিষয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষার ওপর। জোর পড়ছে বসতিবিদ্যা আর আচার-আচরণের ওপর। সম্প্রতিকালে পক্ষিনিরীক্ষণ যে বৈজ্ঞানিক আর সামাজিক মর্যাদা পেয়েছে, তার অতিরিক্ত কারণ হল ১৯৭৩ সালে জীববিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তদের (তিন জনের মধ্যে) দুজন—নিকোলাস টিনবার্গেন আর কনরাড লোরেঞ্জ—এঁরা দুজনেই তাঁদের কর্মজীবন শুরু করেছিলেন শখের পক্ষিনিরীক্ষণ দিয়ে।

যে আমলে আমরা বড়ো হয়েছি, তখন ব্রিটিশের দেখাদেখি ভারতীয় উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজে শিকারের শখ জিনিসটা মানইজ্জতের ব্যাপার বলে গণ্য করা হত। বনেদি ঘরের ছেলেপুলেরা এতে সিদ্ধহস্ত হবে অথবা অন্তত এ নিয়ে বাক-ফাট্টাই করতে পারবে, এটাই প্রার্থিত ছিল। এই আবহাওয়াতে আমার আব্বামামু আমিরুদ্দিনের প্রেরণা আর তত্ত্বাবধানে বন্দুক চালানোয় উঠে পড়ে লেগে হাত মকশো করেছি। সমাজের উচ্চ মহলে আমিরুদ্দিনের খুব কদর ছিল। তাঁর সময়কার শিকারপ্রিয় রাজা-রাজড়াদের সঙ্গে তাঁর ছিল বেজায় দহরম মহরম। তাঁর অমায়িক স্বভাব আর শিকারী হিসেবে গুণপনা কারো জানতে বাকি ছিল না। কাজেই তাদের শিকার অভিযানে হামেহাল তাঁর ডাক পড়ত। রাজকীয় শিকার অভিযান থেকে ফিরে এসে তিনি বাঘ মারার রোমাঞ্চকর সব অভিজ্ঞতার কথা বলতেন। সেসব শুনে আমি চেয়েছি একদিন বড়দরের শিকারি হতে। যখন আমি ইস্কুলের ছাত্র, শীতের ছুটির জন্যে মুখিয়ে থাকতাম। খোঁজ করতাম কোথায় মফস্বলে কোন আত্মীয়-স্বজন আছে, যার কাছে

গিয়ে উঠতে পারি। জেলার কোনো অফিসার হলেই ভালো হয়, তাহলে তাঁর শীতকালীন সফরে আমি তাঁর সঙ্গ নিতে পারি। এমন কেউ, যিনি ঐ সময় তাঁর নিজের আর আমার শিকারের ব্যবস্থাটাও করে ফেলতে পারবেন। স্কুলের ছুটিতে আমি করেছি সব ছোটখাটো শিকার—পাতিহাঁস, কাদাখোঁচা, বটের, তিতির আর খরগোশ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে এসব আকছার পাওয়া যেত। তুলনায় কমলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবধি এসব মিলত। জায়গা বিশেষে মিলে যেত ক্বচিৎ কখনও চিনকারা কৃষ্ণসার, কাকার, পারা হরিণ বা শুয়োর। বড়দিনে বেড়াতে আসা অতিথির দল আর আমার কমবেশি সমবয়সীরা সবাই সেই শিকারে ভিড়ে যেত। কত গুলি ছুঁড়ে কে ক'টা মারতে পেরেছে এই নিয়ে ছোটদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা হত। আমাদের কার্তুজ দেওয়া হত গুনে গুনে। কাজেই প্রত্যেকের চেষ্টা ছিল শিকার কে কত ভালো করতে পারে।

আমার মেজো দাদা হামিদ ছিলেন তখন সিন্ধু প্রদেশে। সিন্ধু সেসময়ে ছিল বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত। ইস্কুলের ছেলেরা সবাই গিয়ে হামিদের ঘাড়ে চাপত। তাতে হামিদ কখনও বেজার হতেন না। হামিদ গোড়ায় ছিলেন ল্যাণ্ড রেকর্ডস-এর অধীক্ষক। পরে সিন্ধু প্রদেশের দায়ভাব এস্টেটসমূহের ম্যানেজার হন। যে সময়টা ওঁর কাছে গিয়ে ছুটি কাটাতাম, সেটা ছিল শিকারের অভিজ্ঞতা অর্জন আর প্রকৃতিবিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকে পড়ার দিক থেকে সবচেয়ে ফলপ্রসূ সময়। একা আমার নয়, হামিদের নিজেরও। আর সেইসঙ্গে আমার অন্যান্য বালখিল্য জ্ঞাতিভাইদেরও। হামিদের তখন সরকারি কাজের চাপ কম ছিল। শখ মেটাবার যথেষ্ট সময় পেতেন। শীতের সময় ওঁর সফরতালিকা তৈরি হত সারা প্রদেশ জুড়ে। বাড়ির অতিথিদের কথা মাথায় রেখে এমনভাবে জায়গা বাছতেন, যাতে ওঁর কাছে তিন-চার সপ্তাহ থাকার সময়টাতে আমরা যতদূর সম্ভব সেরা শিকারের জায়গাগুলোতে ঢুঁ মারতে পারি। হামিদভাই ১৯০৪ সালে আই.সি.এস. হন। তারপর যখন ওঁকে সিন্ধু প্রদেশে পাঠানো হয়, সেখানেই শিকারপাগল ওর ব্রিটিশ সহকর্মীদের সংস্পর্শে এসে ঢের পরে ওঁর শিকারের নেশা ধরে। তখনকার দিনে ছোটখাটো জীবজন্তু শিকার করার পক্ষে সিন্ধু প্রদেশ ছিল শিকারিদের স্বর্গস্থান। দেশভাগ হওয়া অবধি তার এই সুনাম বজায় ছিল। বন্দুক আর রাইফেল—দুটোতেই হামিদ ছিলেন সমান সিদ্ধহস্ত। লক্ষ্যভেদের দিক দিয়ে ছোটরা ওঁর সঙ্গে বিশেষ এঁটে উঠতে পারত না। দিনের শেষে ওঁর ঝোলাই বেশি ভারী হয়ে উঠত। হাঁস হোক, তিতির হোক বা অন্য যা কিছুই হেক—পাল্লা দিয়ে শিকারের বোঝা ভারী করতে দেখলে বারণ করতেন। হামিদভাই ছিলেন খুবই প্রকৃতিমনস্ক। আর পাখির বিষয়ে বিদ্যোৎসাহী। তাঁর মুখের বুলি ছিল, যখনই শিকার করে ফিরবে—রসুইতে পাঠাবার আগে খুঁটিয়ে দেখে নেবে তোমার থলিতে কোনটা কোন প্রজাতির পাখি। গোড়াকার এই অভ্যেস পরের জীবনে আমার খুব কাজে লেগেছিল। আমরা অবশ্য

প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিকার করতাম না। তবু এমন খুব কম দিনই হয়েছে, যেদিন খাবার পাতে আমরা মাংস পাইনি। কখনও কখনও বরং দিনে তিন বেলাই মাংস জুটেছে। যারা কখনও উটের পিঠে চড়ার উপযোগী সুশিক্ষিত, আবার বলছি সুশিক্ষিত, সওয়ার হয়নি, তারা এটা জানে না যে, মরুভূমিপ্রায় বালুকাময় অঞ্চলে উটের মতন এমন দ্রুতগামী আর আরামপ্রদ বাহন আর হয় না। হামিদভাইয়ের বাসস্থানে চড়বার পক্ষে দুটি বিশেষ রকমের ভালো উট ছিল। একটিতে তিনি নিজে চড়তেন, অন্যটিতে সওয়ার হতেন ওঁর স্ত্রী সরিফা। শীতকালে বেশির ভাগ উটে চড়ে সফর করাই ছিল ওঁদের দস্তুর। বাড়িতে বাড়িতে লোক এসে গেলে এর ওর কাছ থেকে উট ধার করে আনা হত। জমিদারের দল তো ওঁকে খুশি করার জন্যে সব সময় হাত বাড়িয়েই রাখত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেরাই উট পালন করত আর উটদের ঠিকুজি-কুলজি ছিল তাদের নখাগ্রে। আমাদের ঘুম ভাঙার ঢের আগে উঠে হামিদ হয় তাঁর সুন্দর পাটকিলে রঙের আখতা ঘোড়ায় চড়ে নয়ত তাঁর পেয়ারের উটের পিঠে সওয়ার হয়ে সাতসকালে সরকারি কাজে কিংবা রোজকার রোঁদে বেরিয়ে পড়তেন। ওঁর সঙ্গে নানা আকার প্রকারের টাট্টু ঘোড়ায় চেপে ধীরেসুস্থে তাঁকে অনুসরণ করত জমিদারমণ্ডলী, স্থানীয় ভদ্রশ্রেণী আর রাজস্ব বিভাগের আমলা-ফয়লার দল। হামিদের উটের সঙ্গে তাল রেখে চলা তাদের পক্ষে দুষ্কর হত। দাড়িঅলা জান মহম্মদ ছিল হামিদের বিশ্বস্ত উটচালক। অন্যদের তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে উটকে সে জোর কদমে ছোটাত। তার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে অনুচরবৃন্দের হত নাজেহাল অবস্থা।

তিন-চারদিন অন্তর পাততাড়ি গোটানো কম ঝকমারির কাজ নয়। কোনো চিৎকার নেই, চেঁচামেচি নেই—অথচ সব কাজ নিখুঁতভাবে হয়ে যাচ্ছে। দেখে অবাক হতাম। আজও ভেবে তাজ্জব হয়ে যাই। লটবহর তো কম নয়—বেশ কয়েকটা ঢাউস বেঢপ সুইস তাঁবু, আসবাবপত্র আর ঝোলাঝুলি—তার মধ্যে শতরঞ্চি, চারপাই, ফোল্ডিং চেয়ার আর টেবিল, থালাবাসন ছুরি-কাটারি দপ্তর-দস্তাবেজ ঘটি-বালতি এবং আর যা যা—বাজ-বাক্স, গ্যালভানাইজ-করা লোহার বাথটব, জলপাত্র আর হাঁড়িকুড়ি। যাবতীয় জিনিস ঠাঁইনাড়া করতে হত। চিনেমাটির পাত্র, কাঁচের জিনিস এবং অন্যান্য পলকা জিনিসপত্র বিশেষভাবে তৈরি পেটচ্যাপ্টা কাঠের সিন্দুকে ভরে মালবাহী উটের পিঠে সুষমভাবে দুপাশে স্বচ্ছন্দে ঝুলিয়ে বয়ে নিয়ে যাওয়া হত। গোটা পনেরো ভারবাহী উট, এর ল্যাজের সঙ্গে ওর নাম বেঁধে সারবন্দিভাবে সাজিয়ে তাদের রওনা করানো হত। আর তারা রাতভর হটরং হটরং করে রাস্তা পাড়ি দিত। উটের তদারকিতে একজন লোক থাকত। পরদিন ভোর নাগাদ তারা গন্তব্যে পৌঁছুত। সমানে লাফানো আর ঝাঁকুনি খেলেও সেজবাতি কিংবা বাসনকোশন মোটের ওপর অক্ষত থাকত। বিশেষত, কিছু ছিল অবাধ্য ত্যাঁদড় উট, রাস্তায় নেচেকুঁদে চলত। পরদিন দুপুরের আগে সাহেব আর তাঁর দলবল যথাস্থানে এসে দেখতেন সব কাজ সারা। অফিস,

মেস আর অতিথিদের বাসস্থান—সব পরিপাটি করে সাজানো। যে যার জায়গায় ঢুকে পড়লেই হল। আগের ক্যাম্পে যে যে জিনিস যেখানে ছিল, এখানেও ঠিক তেমনিভাবে রাখা আছে। আসবাবপত্র, ড্রেসিং টেবিলের আর বাথরুমের জন্যে যা যা দরকার সব যথাস্থানে আছে। সামান্য একটা সেফটিপিন, সেটাও যেখানে ছিল ঠিক সেইখানে আছে। রাঁধুনিরা হাতে হাত বেঁধে রান্নাবান্না ঠিক টাইমমতো করে রেখেছে। দেখে কেউ বলবে না যে সে এক ক্যাম্প থেকে আরেক ক্যাম্পে চলে এসেছে। যে কয়েকজন খালাসি বা তাঁবুবরদারের ওপর এ কাজের দায়িত্ব, তারা ঘুণপোকার গতিতে গুছিয়ে কী নিপুণভাবে ঐসব গাবদাগোবদা তাঁবু আর তার আসবাবপত্র আনা-নেওয়া করে, তা দেখে অবাক লাগে। অবশ্য, মূল সরঞ্জামের অনেকটাই, যেমন তাঁবু আর আসবাব, দু প্রস্থ করে থাকে। ভালো করে সেসব দেখভাল করতে হয়। একটি সেট যখন ব্যবহার করা হচ্ছে, তখনই অন্য একটি সেট পরের আস্তানায় তোলাউপুড় করতে হয়। আজ আর সে অবস্থা নেই। এখন আর জেলাকর্তাদের আমিরি চালে গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘোরার দিন নেই। হায়, এখন যেন পেছনে ষাঁড়ে তাড়া করে চলেছে। পাকা রাস্তা বরাবর জিপে আর মোটর-ট্রাকে তীরগতিতে ছোটা, সুসজ্জিত ডাকবাংলোয় সুইচ টিপলেই আলো, ফোন তুললেই পেয়ে যাবে দপ্তরের সচিব আর মন্ত্রীদের আর সেইসঙ্গে হেডঅফিসে জমতে থাকবে কাগজের পাহাড়। লাগু হবে পারকিনসনের বিধি। শিকারের কথা না তোলাই ভালো। শিকার জিনিসটাকে এখন আর লোকে সুনজরে দেখে না। তার ওপর খিদমতগারদের মেহনত আর জিনিসপত্র, গোলাগুলির আকাশছোঁয়া দাম। সারা দেশ ঢুঁড়লেও ছোটবড়ো কোনো শিকার মিলবে না বললেই হয়। আজকের কোনো স্কুলের ছাত্র ছুটিতে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আর সেই মজা করার সুযোগ পাবে না—যা একদিন আমরা পেয়েছি।

১৯১০ সাল নাগাদ যখন আমি স্কুলের ছুটিতে সিন্ধু প্রদেশে যাই, সেই সময়েই আমি প্রথম তালুর বা হুবার জাতের তোকদার পাখির (ক্লামিডোটিস আনডুলাতা ম্যাকুইনি) দর্শন পাই। জীবজানোয়াররা কীভাবে বর্ণচোরা হয়ে আত্মরক্ষা করে, শত্রুদের চোখে ধুলো দেয়—সে সম্বন্ধে শুধু বইতেই বিস্তর পড়েছি। কিন্তু তোকদারের কেরামতি নিজের চোখে দেখার আগে কখনও বিশ্বাস করতে পারিনি যে এ জিনিস এত নিখুঁত হতে পারে। খাদ্যরসিকদের কাছে এর মাংসের খুব কদর। খাওয়ার পাতে পড়তে তবেই তার উপাদেয় স্বাদ মালুম হয়। কিন্তু উটের পিঠে চড়ে ওদেশের প্রথায় আমাদের জন্যে শিকারের ব্যবস্থা ছিল, তাতে শিকারি নিমিত্ত মাত্র। যে উট চালায় একাধারে সে শিকারিও বটে। মাথা খেলিয়ে এদিক ওদিক করে উটটাকে সে নিশানার কাছাকাছি নিয়ে যায়। এইসব মরুবাসীদের চোখের জ্যোতি বস্তুতই অসাধারণ। চারদিকে ধূ ধূ করছে বালি। তার ভেতর মিশে থাকা ঐ পাখিকে ৫০০ গজ দূর থেকে এমনকী চোখে দুরবিন লাগিয়েও দেখতে পাওয়া যার তার কর্ম নয়। সেটা করতে গেলেও

অনেক দিনের অভ্যেস থাকা দরকার। এ কাজটাই ওরা অনায়াসে করে খালি চোখে। দূর থেকে পাখিটা যখন ওদের নজরে পড়ে, তখন ওরা তাকে জানতে না দিয়ে চুপিসাড়ে তাকে বেড় দিয়ে চক্কর দিতে দিতে তাকে শিকারির বন্দুকের নাগালের মধ্যে এনে দেয়। এই রকমভাবে চক্কর দিতে দিতে একটা সময় মনে হবে যে পাখিটা শিকারির বদমতলব আঁচ করতে পেরে পেছনে সরে সরে যাচ্ছে, সে হঠাৎ ফুসমন্তরে হাওয়া হয়ে গেছে। চোখের পলকে একটা নীচু ঝোপের আড়ালে ঘাড় নুইয়ে সটান মাটিতে শুয়ে পড়েছে। উটের চালক এদিকে হন্তদন্ত হয়ে আমাকে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে ঠেলছে, যাতে অবিলম্বে আমি বন্দুক ছুঁড়ি। কিন্তু আমি দেখছি কোথাও কিছু নেই, কাকে গুলি করব! লোকটা তখন মরীয়া হয়ে সামনের ঝোপের তলায় একটা গোবরের শুকনো চাপড়া দেখিয়ে সেটাকেই তাক করতে বলে। নেহাত ওকে ঠাণ্ডা করতে শেষমেশ আমি গুলি না করে পারলাম না। সঙ্গে সঙ্গে যেই না ঘুঁটের চাপড়াটা ছিটকে পড়েছে, অমনি দেখি তার তলা থেকে মাটিতে চিৎপটাং হয়ে রয়েছে দুটো পাখা। বুঝলাম আমার গুলি যেখানে লাগবার সেখানেই লেগেছে। এ জাতের পাখি সেবারই আমি প্রথম শিকার করি। জীবজানোয়ারেরা গায়ের রং বদল করে কীভাবে আত্মরক্ষা করে, সেটা আমি চাক্ষুষ দেখতে পাই। অন্যান্য জায়গায়—যেমন, কচ্ছে—এ ধরনের পাখি শিকার করা হয় মাটিতে দাঁড়িয়ে। পাখিদের তাড়িয়ে বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আনা হয়ে থাকে। তার মধ্যে শিকারের মজা মেলে। শীতের দিনে যখন কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বয়, পাখিরা যখন কেবলি নড়েচড়ে বেড়ায়—তখন লক্ষ্যভেদ করা সে এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। আর সেখানেই হয় শিকারির আনন্দ।

যারা বাজপাখি লেলিয়ে দিয়ে শিকার করে, এ জাতের পাখি তাদের হাতেই বেশি মরে। উপসাগরীয় আমিরশাহির শেখেরা এ কাজে খুবই দড়ো। বাজপাখি দিয়ে শিকার করার নেশায় ওরা মত্ত। এইসব পাখির সাবেক আস্তানাগুলো থেকে মেরে মেরে তাদের ভিটেমাটি প্রায় উচ্ছেদ করে ছেড়েছে। তার একটা দৃষ্টান্ত হল, ১৯৬৭-৬৮ সালের শীতের মরশুমে একা একজন শেখ চার সপ্তাহের মধ্যে ৯১৫টি পাখি নিকেশ করেছে। আর এই নিধনযজ্ঞ বছরের পর বছর বেড়েই চলেছে।

□

২১

যেসব বই আমি লিখেছি

কোথায় কত পাখি আছে, তাদের হাবভাব, আচরণ, অনুষঙ্গ এবং তথ্য আর সেইসঙ্গে তাদের বসবাস আর জীবনবৃত্তান্ত—দীর্ঘকাল ধরে ঘটনাস্থলে বসে শুধু টুকটাক লিখে যাওয়াই যথেষ্ট নয়—যা আমি করেছিলাম। হয়তো শেষে দেখা যাবে গোটাটাই মাঠে মারা গেছে। কিছুই কাজে লাগানো যায়নি। তাই লিখে রাখার কাজটা করতে হয় সমানে বিধিবদ্ধভাবে। যথাযথ সূচি রেখে এবং ধরে ধরে তা হালনগদ করতে হয়। তখনও ক্ষুদে টেপরেকর্ডারের বা ঐ ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতির চলন হয়নি। কাজেই, পাখির খোঁজে বেরোবার দিনগুলোতে প্রায়শ মাঠেঘাটে বসে আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নোট লিখতে হয়েছে। তাতে যেমন সময় লাগে অনেক, তেমনি লিখতে লিখতে ঘাম ছুটে যায়। এসব দেখে, ক্রমে আমি যুৎসই উপায় বার করে নিয়েছিলাম। শার্টের পকেটে আমি একটা নোটবই আর পেনসিল রাখতাম। ঘটনাস্থলে বসেই তাতে তড়িঘড়ি টুকে নিতাম। কোন কোন পাখি দেখলাম তার উল্লেখ ছাড়াও, একটা ধারাভাষ্যে লেখা হত—পাখিদের আচার-আচরণে কোনো মনোগ্রাহী বৈশিষ্ট্য বা কোনো বিচিত্র লক্ষণ। কীভাবে ডাকে, গায়, কী খায়, তাদের বাসা বাঁধার ধরন, তাদের সামাজিক আর আন্তঃপ্রজাতিক সম্পর্কভিত্তিক কার্যকলাপ—স্বহস্তে সাঁটে লেখা থাকত। তারপর ক্যাম্পে ফিরে নিহিত অর্থ মনে থাকতে থাকতে সংক্ষিপ্ত নোটের গিঁটগুলো খুলে যথাশীঘ্র যেখানে যতটা দরকার খোলসা করে লিখে রাখতাম। একটা আবাঁধা খতিয়ান খাতায় আলাদা আলাদা প্রজাতির খাতে এইসব তথ্য লিখে রাখা হত—বৈষয়িক হিসেবের খাতায় যে ধারায় লেখা হয়। কোনো প্রজাতির মাত্র একটি নিদর্শন হলেও, যে পৃষ্ঠায় তার উল্লেখ থাকবে সেখানে বলা হবে কবে, কোথায়, কতটা উচ্চতায় তাকে দেখা গেছে ইত্যাদির বিবরণ। এর ফলে, পরে যেকোনো সময়ে খাতার ঐ পাতাটি খুললেই ঐ বিশেষ প্রজাতি সম্পর্কিত তথ্য যেখানে যা পেয়েছি, সবটাই আমার হাতে এসে যাবে। এতে যেকোনো প্রতিবেদন বা গ্রন্থ রচনার কাজ সহজে চটপট সেরে ফেলা যায়।

সোসাইটি ১৯৩৫ সালে আমাকে ভারতের গ্রামদেশের দীর্ঘ আলোচিত সাধারণ

পাখিদের বিষয়ে একটি বই লেখার ভার দেয়। বইটি হবে সাধারণ পাঠকদের জন্যে। লিখতে হবে সাদামাঠা ভাষায়। তাতে থাকবে ১৮০টির মতো বাছাই করা প্রজাতির কথা। ভারতের ইংরিজি মাধ্যমের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্যে সোসাইটির তৈরি করা যে দেয়ালচিত্র আছে, তার রঙিন ছবিগুলো এ বইতে সন্নিবিষ্ট হবে। একেকটি প্লেটে থাকবে কেবল একটি প্রজাতির ছবি। শনাক্তকরণ, আবাসস্থল, স্বভাব, খাদ্য, ডাক আর বাসা বাঁধা—এইসব বিষয়ে মোটামুটি ৩৫০ শব্দের একটি করে বিবরণ আর সেইসঙ্গে প্রব্রজন, উড়ান, পক্ষি নিরীক্ষণ, পাখিরা মানুষের কী উপকারে আসে—এই নিয়ে একটি করে সাপ্টাভাবে লেখা নিবন্ধ। তাছাড়া ভূমিকা আর মুখবন্ধ তো থাকছেই। এখন অবশ্য বইতে একই প্লেটে একাধিক ছবি দেওয়া হয়। দেয়ালচিত্রের চার রঙের পুরনো ব্লকগুলো ক্ষয়ে যাওয়ায় এবং বইতে আরও বাড়তি প্রজাতির ছবি যোগ করতে হওয়ায় ব্যয়সংকুলানের জন্যে এক প্লেটে একাধিক ছবি দেওয়ার রীতি পঞ্চম সংস্করণ (১৯৫৫) থেকে গ্রহণ করা হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে জানানোর আগেই আমার বন্ধু সহকর্মী এস. এইচ. প্রেটারের (সোসাইটির তদানীন্তন কিউরেটার) কাছ থেকে বই লেখার এসব খবর সবিস্তারে জেনে যাই। ফলে, ১৯৩০ সালে কিহিমে বেকার অবস্থায় পরাশ্রিত হয়ে থাকার সময় বেশ অনেকটা লেখারই আমি খসড়া করে ফেলি।

কিহিমের প্রসঙ্গে সেখানকার একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে গেল। সেটা একটু বলে নিই। আমাদের বাড়িটা ছিল সমুদ্রের ধারে। একতলায় ছিল একটা ছোট সর্বার্থসাধক ঘর। তার তিনদিক জুড়ে বেশ প্রশস্ত বারান্দা। দিনের বেশির ভাগ সময় আমরা সেখানেই কাটাতাম। সেখানেই ছিল আমার লেখার টেবিল। তার ওপর রাখা থাকত আমার যাবতীয় নোট-করা কাগজপত্রের ফাইল আর সেইসঙ্গে প্রস্তাবিত বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ের খসড়া পাণ্ডুলিপি। আমি আর তহমিনা শুতাম ওপরতলার একচিলতে চিলেকোঠায়। একদিন সকালে নীচে নেমে এসে দেখি,—কী সর্বনাশ, আমার সমস্ত কাগজপত্র আঁচড়ানো কামড়ানো অবস্থায় কে যেন লণ্ডভণ্ড করে রেখেছে। আলগা পাতাগুলো টেবিলের চতুর্দিকে মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কিছু কাগজ এমনকী বারান্দার বাইরে বাগানে গিয়ে ছিটকে পড়েছে। ভেবে কূলকিনারা পাওয়া গেল না কী করে এমন ব্যাপার ঘটল। পরের দুতিন দিন সব চুপচাপ। কিন্তু তারপর আবার যে-কে সেই। আরও কাগজের দফারফা। দেখে আমি হতভম্ব। পরের রাতেও আবার সেই নষ্টামি। বুঝলাম, মানুষ হোক, জন্তু হোক বা যা কিছুই হোক, ব্যাপারটা তাকে পেয়ে বসেছে—এবার এর একটা বিহিত করা দরকার। এই ভেবে টেবিলের চারদিকে মেঝের ওপর আমি কাঠের গুঁড়ো ছড়িয়ে রাখলাম। তাতে পায়ের ছাপ পড়লেই বাছাধন যে কে, সেটা আমি টের পেয়ে যাব। এ থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়ে গেল যে, একটা কুকুরই হল আসল অপরাধী। কিন্তু এটা বুঝে উঠতে পারলাম না আমার নোটগুলোতে দন্তস্ফুট করে আর আলগা কাগজগুলো দিনের পর

দিন টেনে নিয়ে যাওয়ার পণ্ডশ্রমে ওর কী ফায়দা! আমার নোটগুলোতে কিসেরইবা অত আগ্রহ ওর! রাতবিরেতে আবার কখন ওর উদয় হবে কে জানে—এই ভেবে একটা যুঁৎসই বুদ্ধি বার করলাম। আমাদের বাগানের বুড়ো মালি ধর্ম রাত্রে থাকত বাড়ির লাগোয়া একটা খুপরি ঘরে। ও ছিল বদ্ধ কালা। আমি ওর এক পায়ের বুড়ো আঙুলে একটা দড়ি বেঁধে অন্য প্রান্তটা একটা ঘণ্টিতে লাগিয়ে আমার মাথার শিয়রে রেখে দিলাম। তার ঠিক পাশেই খাড়া করে রাখা থাকল ২০-বোরের শটগান। ডাকতে গিয়ে যাতে শব্দ না হয়, তার জন্যেই এই ধরনের ব্যবস্থাটা নেওয়া হয়েছিল। পাজির পা-ঝাড়াটাকে একেবারে হাতেনাতে ধরা। দুতিন দিন পর, রাত তখন তিনটে। টুং-টাং টুং-টাং করে ঘণ্টি বেজে উঠতেই তড়াক করে উঠে পড়ে বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম। ব্যাটা দোঁআশলা সেটা টের পেয়ে টেবিল থেকে একলাফে নেমে পড়ে গুটি গুটি পিছোচ্ছে। আর ধরা পড়ে যাওয়ার ভাব করে পেছনে চেয়ে আড় চোখে আমাকে দেখছে। আমার পাকা ধানে হারামজাদা জন্মেও আর যাতে মই দিতে না পারে, তার জন্যে তৎক্ষণাৎ ওকে গুলি করে মারতে আমার একটুও দ্বিধা হয়নি। পেটে সহ্য হবে না জেনেও কেন যে ঐ কুত্তার বাচ্চা আমার টেবিলে হানা দিয়ে কাগজপত্র সব তছনছ করেছে—এ রহস্য আজও আমি ভেদ করে উঠতে পারিনি। একবার হলেও কথা ছিল। বার বার কেন?

বিভিন্ন অধ্যায় খসড়া আকারে লেখার পর তহমিনাকে দিয়ে আমি পড়িয়ে নিতাম। ভাষা সাফসুতরো করে নেওয়ার ব্যাপারে ও ছিল আমার বড়ো সহায়। মৌখিক ইংরেজি গদ্যরীতি সম্বন্ধে ওর ছিল অসাধারণ নাড়িজ্ঞান। আড়ষ্ট রচনাংশকে পাট করে মেলে দিয়ে সেটাকে সুখপাঠ্য করে তোলার ক্ষমতা ছিল ওর। 'দি বুক অব ইণ্ডিয়ান বার্ডস' এবং তার পরবর্তী বইয়ের সমালোচক আর পাঠকের প্রয়াশ প্রসঙ্গের বাইরে গিয়েও পাঠযোগ্যতাকে এসব বইয়ের বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন। তাতে আমি বিশেষ আনন্দ বোধ করেছি।

ডব্লু. এইচ. হাডসন আর ঈ. এইচ. আইকেন (যিনি ঈ. এইচ. এ. নামে পরিচিত)—এঁরা হলেন আমার সবচেয়ে প্রিয় প্রকৃতিবিদ লেখক। নিছক তথ্যের বিবরণ দিতে গিয়েও কাঠখোট্টা গদ্যকেও নজর দিয়ে মেজেঘষে কীরকম সরস করে তোলা যায়, অন্তত আইকেনের লেখায় তার নজির মেলে। সেদিক দিয়ে এঁরা হলেন আদর্শ লেখক। ছাপাতে দেওয়ার আগে এতটা যত্ন নেন বলেই আইকেনের প্রবধাবলী এত প্রাঞ্জল। পড়ে মনেই হয় না যে তা লিখতে অনেক মেহনত করতে হয়েছে। পাঠযোগ্যতাকে লেখার বড়ো গুণ বলে আমি মনে করি। তার পেছনে যে খাটুনি থাকে, আখেরে তা লাভের হয়।

এখন ফিল্ড-গাইডবুকের খুব চল হয়েছে। আমাদের সেই রঙিন সচিত্র বইটাই এক্ষত্রে প্রথম পথপ্রদর্শক। আজ পাখপাখালিতে আর পক্ষিনিরীক্ষণে লোকের যে

ক্রমবর্ধমান আগ্রহ দেখা যাচ্ছে, তার পেছনে এ-বইটির যথেষ্ট হাত আছে। এই বই প্রকাশ সংক্রান্ত সংখ্যাতত্ত্বের একটা হিসেব দিলে পাঠকদের পক্ষে বোধহয় বিষয়টা ধরবার সুবিধে হবে। ১৯৪১ সালে আগস্ট মাসে প্রথম সংস্করণে এই বই ৩,০০০ কপি ছাপা হয়। বোম্বাইয়ের টাইমস অব ইণ্ডিয়া প্রেসে বইটি ছাপা হয় বিদেশি আর্ট পেপারে। বইয়ের বিক্রয়মূল্য ধার্য করা হয় ১৪ টাকা। গ্রাম-গঞ্জের ১৮১টি প্রজাতির সাধারণ এবং চেনাজানা পাখির কথা এই বইতে বলা হয়েছে। প্রত্যেক সংস্করণে পর্যায়ক্রমে আরও আরও পাখি এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দুঃখের বিষয়, তার ফলে বইয়ের দামও বেড়ে গেছে। ১৯৮০-র জুলাইতে যে একাদশ সংস্করণ বেরিয়েছে, তাতে আছে ২৮০টি প্রজাতির বিবরণ। তার দাম বেড়ে হয়েছে ৬০ টাকা। ছাপা হয়েছে ১০,০০০ কপি। আগের দশটি সংস্করণে মুদ্রণের মোট সংখ্যা হল ৪৬,০০০—সংস্করণপিছু গড়ে প্রায় ৪,৫০০ কপি।

বইটির বরাত ভালো ছিল। বোরোবার সঙ্গে সঙ্গে বাজার পেয়ে যায়। সে সময়ে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ লেগে গেছে। ব্রিটিশ আর মিত্রশক্তির তখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাতায়াতের পথে দলে দলে হরদম বোম্বাইতে এসে সাময়িক ভাবে সময় কাটিয়ে যায়। তাদের আবার পাখি দেখার খুব ঝোঁক। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অচেনা পাখিদের বিষয়ে জানা যাবে, এমন বইয়ের খুব চাহিদা তাদের কাছে। গোড়ার প্রথম বিশিষ্ট খদ্দেরদের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। তিনি নিজেও ছিলেন একজন প্রকৃতিপ্রেমিক। নেহরু তখন দেরাদুন জেলে (১৯৪.....) বন্দী হয়ে আছেন। তাঁর মেয়ে ইন্দিরা গান্ধী নৈনি জেলে। জন্মদিনে মেয়েকে পাঠাবার জন্যে একটি বই আমাকে দিয়ে সই করিয়ে নেন। শ্রী রাজেশ্বর প্রসাদ সিংহের (১৯৫৯ সালে প্রকাশিত) শিশুপাঠ্য 'আওয়ার বার্ডস'-এর ভূমিকায় ইন্দিরা গান্ধী পুরনো দিনের কথা স্মরণ করে লিখেছেন : 'বেশির ভাগ ভারতবাসীর মতোই পাখি নিয়ে বাছবিচার করার কথা আমারও কখনও মনে হয়নি। দেরাদুন জেল থেকে বাবার পাঠানো সেলিম আলির মন-কাড়া বইটি হাতে পেয়ে আমার সামনে একটা সম্পূর্ণ নতুন জগৎ খুলে গেল। তখনই বুঝলাম এতদিন আমি কী হারিয়েছি।" এর পরে যখন শ্রীমতী গান্ধী ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের সোসাইটির পৃষ্ঠপোষক, তখন সোসাইটির শতবার্ষিকীর উদ্বোধনী বক্তৃতায় পুনর্বার সেই ঘটনার উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'আমি বরাবরই জীবজন্তু ভালবাসতাম। কিন্তু পাখির বিষয়ে কিছুই জানতাম না। তারপর তো নৈনি জেলের অতিকায় পাঁচিলগুলো সে-জগৎটাকে চোখের আড়ালে ঠেলে দিল। সেই সময়েই প্রথম কানে প্রবেশ করে পাখির গান। আমি সেসব খাতায় টুকে রাখি। পরে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ডঃ সেলিম আলির বইয়ের সাহায্যে আমি ওদের চিনে নিতে সমর্থ হই।'

আমি এও জানতে পারি যে, ১৯৪২ সালে ভারত-ছাড়ো প্রস্তাব পাশ আর

গান্ধীজীর করেঙ্গে-ইয়ে-মরেঙ্গে ডাক দেবার পর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে আহমদনগর কারাগারে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ যখন বন্দী ছিলেন, তখন সেই জেলে সহবন্দী জওহরলালের কাছ থেকে আমার বইটি তিনি চেয়ে নিয়ে পড়েন। তাঁর বিছানার মাথার ওপর একটি ফোকরে দুটি দুর্দমনীয় চড়াই বাসা বেঁধেছিল। তাদের নিয়ে লেখা তাঁর এক অসামান্য গল্প আছে। লেখার সময় চড়াই সম্পর্কে খুঁটিয়ে জানবার জন্যেই তাঁকে ঐ বইটি পড়ে নিতে হয়েছিল। সাধারণ পাখিদের নিয়ে লেখা আমার ঐ বইয়ের হিন্দি আর পাঞ্জাবি তর্জমা বেরিয়ে গেছে এবং উর্দুতে তার তর্জমার কাজ চলছে।

তাভোইয়ের জে. এ. আলি ব্রাদার্স অ্যাণ্ড কোম্পানি শেষমেশ গুটিয়ে ফেলার পর তার দেনার দায় ভাগ হয়ে দুই অংশীদারের ঘাড়ে এসে চাপে। কারবার চালাবার জন্যে বিভিন্ন সূত্র থেকে সুদে টাকা ধার করে আর লগ্নি নেওয়া হয়েছিল। আমার ভাগে দেনার যে দায় বর্তেছে, তার পরিমাণ দেখে আমার তো মূর্ছা যাওয়ার দশা। বোম্বাইতে ফিরে এসে বছর কয়েক বলতে গেলে পয়সাও আমি রোজগার করিনি। ব্যবসা থেকে যে বিষয়সম্পত্তির ভাগীদার হয়েছিলাম, তা দিয়ে এত সামান্য হাতে দায় শোধ হচ্ছিল যে, সুদের বোঝা ভয়ানকভাবে বেড়ে যায়। একটা সময়ে মনে হচ্ছিল, যে হারে আমি ঋণ শোধ করতে পারছি, তাতে কোনোদিনই আমার ঋণ শোধ করার ক্ষমতা হবে না। ঋণদাতার কেউ কেউ আমার দশা দেখে সুদ রেহাই করতে রাজি হয়েছিলেন, কেউ কেউ এমনকী ঋণের পরিমাণ কমিয়ে দিতেও রাজি ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেনার দায় আমার গলায় এমন ফাঁস হয়ে চেপে ধরেছিল যে, ভেবে ভেবে রাত্রে দু চোখের পাতা এক করতে পারতাম না। এমন সময়ে 'দি বুক অব ইণ্ডিয়ান বার্ডস' বেরোতেই হঠাৎ যেন আমার কপাল খুলে গেল। প্রথম চার পাঁচটি সংস্করণ থেকে যে রয়াল্টি পেলাম, তাই দিয়ে সমস্ত পাওনাদারের ঋণ শোধ করে দিতে পারলাম। তা করতে পেরে চিরদিনের মতো আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

দি বুক অব ইণ্ডিয়ান বার্ডস'-এর পর ১৯৪৫ সালে বার হয় 'দি বার্ডস অব কচ্ছ'। দুটি বইই ভালোভাবে লোকে নিয়েছে দেখে গরমের ছুটির বন্ধুরা ধরে বসল যে, হিমালয়, নীলগিরি আর অন্যান্য উপদ্বীপীয় অঞ্চলের জনপ্রিয় শৈলবাসের আশপাশে যে পাখিদের দেখা যায়, তাদের নিয়ে যেন রঙিন ছবি দিয়ে ঐ রকমের একটা গাইডবই আমি লিখি। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের দেখলাম তাতে বেজায় উৎসাহ। তার ভারতীয় শাখার জেনারেল ম্যানেজার তখন আর. ঈ. হবিন্স। আমার 'বার্ডস অব কচ্ছ' বইটি উনিই ছাপিয়েছিলেন। জি. এম. হেনরী (শ্রীলঙ্কার বিখ্যাত পক্ষিচিত্রকর) রয়াল্টির অংশীদার হয়ে ছবি এঁকে দিতে এক কথাতেই রাজি হয়ে গেলেন। 'ইণ্ডিয়ান হিল বার্ডস' নামে এই বই যুক্তরাজ্যে ফোটো-অফসেট প্রক্রিয়ায় একসঙ্গে ১০,০০০ কপি ছাপা হয়। হেনরীর আঁকা ছবিগুলো হয়েছিল অপূর্ব। ভারতে আর বিদেশে বৈজ্ঞানিক

পত্রপত্রিকায় সর্বাঙ্গীনভাবে বইটি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করে। স্বদেশে এ বইয়ের ব্যবহারকারীরা একবাক্যে বইটির তারিফ করেন। এ সত্ত্বেও বই বিক্রির দিক থেকে প্রকাশকেরা খুবই হতাশ হন। প্রথম সংস্করণ শেষ হতে দীর্ঘ পঁচিশ বছর লেগে যায়। পরের পাঁচ বছর ছাপা না হওয়ায় বইটি পাওয়া যচ্ছিল না। এই পাঁচ বছরে দেখা গেল, দেশের লোকের পাখি দেখার ঝোঁক বেড়ে গেছে। সেইসঙ্গে বাইরে থেকে দলে দলে ভ্রমণকারীরা আসছে এদেশের পাখি আর বন্যপ্রাণীর টানে। ফলে, দেশিবিদেশি সবাই চাইছে পাখির বিষয়ে লেখা বই। বাধ্য হয়ে তখন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস বইটি সংশোধনের কাজ পরবর্তী সংস্করণের জন্যে মুলতুবি রেখে ১৯৭৯ সালে 'ইণ্ডিয়ান হিল বার্ডস' বইটির অবিকল প্রতিলিপি ছেপে বার করে দেয়। কিছুদিন যেতে না যেতেই তার তৃতীয় আর চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত হয়। সে সময়ে বিশ্ব জুড়ে কী আকারে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছিল, বইয়ের দাম বাড়া থেকেই স্বচ্ছন্দে তা আঁচ করা যায়। ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত যে বইয়ের ধার্য মূল্য ছিল ২০ টাকা, ১৯৮৪ সালে তারই পুণর্মুদ্রণের দাম বেড়ে গিয়ে হল ১৪০ টাকা। অথচ তখন আগেকার সেই একই ফিল্ম সেপারেশন ব্যবহার করে ন'-রঙের প্লেট ছাপা হয়েছিল।

সার সি. পি. রামস্বামী আয়ার একাধারে ছিলেন প্রাক্তন একজন নামকরা সংস্কৃতজ্ঞ এবং মাদ্রাজের অগ্রগণ্য ব্যবহারজীবী। ১৯৫০-এর বছরগুলোতে তিনি ছিলেন ত্রিবাঙ্কুর দেশীয় রাজ্যের দেওয়ান। সেইসঙ্গে পদাধিকারবলে ত্রিবান্দ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েরও আচার্য। ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে ত্রিবাঙ্কুর আর কোচিনের পক্ষিতত্ত্ব বিষয়ে সোসাইটি জার্নালে আমার লেখা বৈজ্ঞানিক প্রতিবেদন পড়ে তাঁর ভালো লাগায় তিনি ঐ লেখাগুলোর সঙ্গে রঙিন ছবি দিয়ে এমন একটি সর্বজনপাঠ্য বই প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন, যা প্রাণিতত্ত্বের ছাত্র, বনবিভাগের কর্মী, ভ্রমণার্থী এবং অন্যাদের কাজে লাগবে। এর জন্যে তিনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসকে অনুদান দেবার ব্যবস্থা করেন। ডি. ভি. কাওয়েন (মিসেস ভি. গার্ডিনার ল্যুইস) ছিলেন একজন উৎসাহী পক্ষি-নিরীক্ষক। 'দি বুক অব ইণ্ডিয়ান বার্ডস'-এ পাখির ছবি এঁকে তাঁর তখন খুব নামডাক। আমার বইতে ছবি আঁকার ভার তাঁকে দেওয়া হল। ১,০০০ কপির একটি সংস্করণ ছাপিয়ে তার পাঁচ শো কপি বিলিবণ্টনের জন্যে নেবে ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়। বইটির দাম ধার্য হয় ৩৫ টাকা। বাকি বই অল্পদিনের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। বাজারে বইটির চাহিদা থেকে গেলেও, তার পরিমাণ এমন ছিল না যাতে তখনই ছাপিয়ে ব্যবসায়িক দিকে থেকে পোষানো যায়। ১৯৬৯ সাল অবধি বইটি আর ছাপা হয়নি। ইতিমধ্যে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে, দেশীয় রাজ্য ত্রিবাঙ্কুর আর কোচিনের সঙ্গে সংলগ্ন মালাবারের মালয়লম জেলা একত্র হয়ে মানচিত্রে কেরল তার নিজস্ব স্থান করে নিয়েছে। এদিকে তখন বইটির চাহিদা বাড়তে থাকায় দ্বিতীয় সংস্করণ বার করার প্রয়োজন দেখা দেয়। অতএব আবার সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সহায়তায় মালাবার

সমেত ঐ পাখির বইয়ের একটি সংশোধিত পরিবর্ধিত সংস্করণ ছাপা হল। বইটির নতুন নাম হল—'বার্ডস অব কেরালা'। আগের দামই বজায় থাকল। দাম কমের মধ্যে হওয়ায় ক্রেতারা যথেষ্ট লাভবান হয়। আগের মতোই এ সংস্করণটিও ফুরিয়ে যেতে দেরি হয়নি। কয়েক বছর এইভাবে পড়ে থাকার পর সম্প্রতি কেরল বনবিভাগ ১৯৮৫-র মার্চ মাসে পেরিয়ার অভয়ারণ্যের সুবর্ণ-জয়ন্তী উপলক্ষে এই বইয়ের তৃতীয় মুদ্রণের জন্যে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসকে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করেছে।

তাভোইতে থাকতে বারোমাস বৃষ্টি-হওয়া আমি তেনাসেরিমে ওপরসা দেখেছিলাম। সেই থেকে আমার খুব ইচ্ছে ছিল আরও কাছ থেকে ভালো করে দেখবার। এই ধরনের চিরহরিৎ অরণ্যে পাখিদের একমনে খুঁটিয়ে দেখার সুযোগের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থেকেছি। ত্রিবাঙ্কুরে পাখি জরিপ করতে গিয়ে সেই সাধ কতকাংশে মিটেছিল। আমার যাবতীয় আঞ্চলিক পক্ষি সমীক্ষার মধ্যে ত্রিবাঙ্কুরে কাজ করে যেমন আনন্দ পেয়েছি, তেমনি ভালো ফলও পেয়েছি। আমার সেই কাজের বৈজ্ঞানিক প্রতিবেদন লিখতে গিয়ে রীতিপদ্ধতির তোয়াক্কা না করে আগাগোড়া প্রথাবহির্ভূতভাবে আমি জোর দিয়েছি পরিবেশ-বিজ্ঞানের ওপর। বাঁধা রাস্তায় চলিনি বলে আমার লেখা সব পক্ষেরই সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। পরে আমি তা পক্ষিবিদ্যার ছাত্র আর সাধারণ পাঠকদের বৃহত্তর মহলে সুলভ বই আকারে তুলে ধরতে পেরে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি। প্রকৃতপক্ষে যে বই লিখে আমি নিজে সবচেয়ে তৃপ্তি পেয়েছি, সেটা হল—'বার্ডস অব কেরালা'। 'দি বুক অব ইণ্ডিয়ান বার্ডস'-এর চেয়ে কোনো অংশে তা কম নয়।

১৯৫০-এর বছরগুলোতে পাখি সংগ্রহ আর ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজে বেশ কয়েকবার আমি সিকিমে গিয়েছি। আমার সে কাজের খরচা যুগিয়েছে লোক-ওয়ান-থো (ইতিপূর্বে তা বলেছি)। আমার সেই কাজের ফলস্বরূপ 'দি বার্ডস অব সিকিম' চোগিয়াল সরকারের অর্থ সাহায্যে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে ১৯৬২ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের জন্যে যে বিখ্যাত শিল্পীরা রঙিন ছবি এঁকে দেন, তাঁরা হলেন—পল ব্যারুয়েল (ফ্রান্স), ডেভিড রিড হেনরী (যুক্তরাজ্য) এবং রবার্ট শোল্‌ৎস্‌ (জার্মানি)। ২,০০০ কপি ছাপা হয়। রাজঅতিথিদের দেবার জন্যে তার অর্ধেক নিয়ে নেয় সিকিম সরকার। বাকি বই এক বছরের মধ্যে বিক্রি হয়ে যায়। তারপর সে বই আর বাজারে পাওয়া যেত না। দ্বিতীয় মুদ্রণের কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু এরই মধ্যে চোগিয়ালের রাজ্য ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ফলে, ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ে। বইটির আগাম প্রচার সত্ত্বেও বার করা যাচ্ছে না দেখে, অক্সফোর্ড তখন ১৭টি রঙিন ছবির সঙ্গে পাখিদের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ জুড়ে 'পিকচার বুক অব সিকিম বার্ডস' নাম দিয়ে চটি আকারের একটি বই প্রকাশ করে। বইয়ের দাম ৫ টাকা হওয়ায় সিকিমের স্কুলগুলোতে এবং পক্ষিনিরীক্ষক বহিরাগতদের কাছে বইটির খুব কদর হয়।

আমার আর রিপ্‌লে-র 'হ্যাণ্ডবুক অব ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড পাকিস্তান' লেখার ইতিবৃত্তের কথা আগে বলেছি। যখন আমি ঐ বইয়ের জন্যে প্রকাশক খুঁজে বেড়াচ্ছি, এখানে কথাপ্রসঙ্গে তখনকার একটা মজার ঘটনার কথা বলি। এ থেকে প্রকাশকদের ব্যাপার-স্যাপার কিছুটা জানা যাবে। আমার আগের সব বই যারা প্রকাশ করেছে, সেই অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসকে আমাদের ঐ বইটি প্রকাশ করার প্রস্তাব দিই। ওরা যে তাতে আগ্রহী, সেটা স্পষ্ট বোঝা গেল। কিন্তু দশ খণ্ডের বই, শতাধিক রঙিন প্লেট, বড়ো রকমের লম্বা মেয়াদের কাজ, সম্পাদনা আর অর্থলগ্নির বিরাট দায়, ব্যবসার দিক থেকে বহু টাকার ঝুঁকি। এইসব সাতপাঁচ ভেবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে তারা গড়িমসি করছিল। ভারতের বই পাকিস্তানে রপ্তানি করা যাবে না। সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র নিয়ে এই নামের বইয়ের বিদেশের বাজারে খুব একটা কাটতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তার ওপর অন্দৌ ভরসা করা যাবে না। কাজেই মোটমাট যা বিক্রি তা এদেশেই করতে হবে। এদিকে পাখি নিয়ে মাথা ঘামানোর ব্যাপার এদেশে এখনও এমন ব্যাপক নয় যে, বই বিক্রির পুরো দায় প্রকাশক ঘাড়ে নিতে পারে। বই বার করার ব্যাপরটা এইভাবে ঝুলে আছে। সেই সময় একদিন বিকেলে হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। টেলিফোন করছেন নামকরা এক ব্রিটিশ প্রকাশন সংস্থার কর্তা মি: উইলিয়াম কলিন্স। উনি সেদিনই সকালে যুক্তরাজ্য থেকে এসে পৌঁছেছেন। জানতে চাইলেন আমি একবার তাজমহল হোটেলে গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি কিনা। গোপন সূত্রে উনি জেনেছেন আমি এই রকমের একটা বইয়ের ওপর কাজ করছি। ঐ খবর সত্যি সত্যি কিনা। যদি সত্যি হয়, তাহলে আমি তেমন কোনো প্রকাশক পেয়েছি কিনা। আমি তাঁকে বললাম, আমার বই সাধারণত প্রকাশ করে থাকে অক্সফোর্ড। কিন্তু এ-বইতে তাদের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও প্রচুর খরচ আর বিরাট আর্থিক ঝুঁকির কথা ভেবে টালবাহানা করছে। শুনে কলিন্স বললেন, 'আপনি এটা জেনে রাখুন, অক্সফোর্ড যদি অরাজি হয়, তাহলে আমাদের ষোলআনা ইচ্ছে রইল এ-বই বার করবার।' অক্সফোর্ডকে খবরটা দিতেই সঙ্গে সঙ্গে ফুসমন্তরে কাজ হয়ে গেল। তারপর প্রায় রাতারাতি চুক্তিপত্রে সই। হকিন্সের দিক থেকে এটা ছিল খুবই এক দুঃসাহসীক পদক্ষেপ। কিন্তু তার জন্যে প্রকাশকদের যে তাদের ঐ সিদ্ধান্তের জন্যে পরে পস্তাতে হয়নি, সেটা দেখে আমি খুশি হয়েছিলাম। ঘটনাক্রমে প্রমাণ হল যে, তাদের সিদ্ধান্ত খুবই যথোচিত হয়েছিল। কেননা, এ বই বার করে ওরা একাধারে বৈষয়িক লাভ আর প্রকাশক হিসেবে বাজারে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে। প্রত্যেকটি খণ্ডের ক্রমান্বয়ে যেমন দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোচ্ছে, তেমনি দশটি খণ্ড একত্র করে ১৮৮৩ সালে বার হয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ অখণ্ড সংস্করণ। এখনও এটা ভুলতে পারি না যে, কলিন্সের সেদিনকার সেই টেলিফোনটাই ন-যযৌ ন-তস্থৌ অবস্থাটার অবসান ঘটিয়েছিল।

'হ্যাণ্ডবুক' লিখে শেষ করার বছর দুই আগে ১৯৭৬ সালের সেপ্টেম্বরে বোম্বাইয়ের

নবনীত হিন্দি ডাইজেস্ট-এর সম্পাদক জনৈক শ্রী নারায়ণ দত্তের কাছ থেকে আমি একটি প্রশ্নাবলী পাই। উনি আমার সম্বন্ধে একটি জীবনবৃত্তান্ত তৈরি করেছিলেন তারই সূত্রে। তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল: (হ্যাণ্ডবুক) বইটি লেখার জন্যে দিনে কত ঘণ্টা সময় আপনাকে দিতে হয়েছে এবং আপনি কি নিজে হাতে লিখেছেন, না আপনি বলে গেছেন আর কেউ তা লিখে নিয়েছে?' এ প্রশ্ন সময় সময় আরও কেউ কেউ আমাকে করেছেন। শ্রী দত্তকে দেওয়া উত্তর থেকে তাঁরা সবাই সেই প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবেন। তাঁকে আমি এই মর্মে উত্তর দিই :

> আমি সাধারণত দিনে ১০ থেকে ১২ (কখনও কখনও ১৪ বা ১৫) ঘণ্টা কাজ করেছি। কিছু সময় গেছে খাওয়াদাওয়া ইত্যাদিতে। ১৯৫৩-র আগেই শুরু হয় লাইব্রেরি আর মিউজিয়ামের গবেষণার কাজ। কার্যত, সব বই লিখে ফেলতে দশ বছর সময় লেগেছে।...সব বইয়েরই প্রথম খসড়া আমার নিজের হাতে লেখা (মুখে বলা নয়)। কাটাকুটি করেছি আর বদলেছি। কোনো কোনো অনুচ্ছেদ ফিরে লিখেছি। শব্দের অদলবদল করেছি। কাটছাঁট করে বাক্যগুলোকে সংহত করেছি। দেখতে হয়েছে যাতে কোনো অবান্তর কথা এসে না যায়। আমি এটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যে, পাঠককে যেমন যথাযথ বৈজ্ঞানিক তথ্য দিতে হবে, তেমনি সেইসঙ্গে সেটা পাঠকের পড়তে ভলো লাগছে কিনা সেদিকে নজর দেওয়াও সমান জরুরি।...তারপর সেই ক্ষতবিক্ষত হাতে-লেখা খসড়া থেকে ট্রিপ্লস্পেস ছেড়ে টাইপ করেছি। এরপর আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি। ঝেড়ে পুছে লেখাটাকে পালিশ করেছি। পরিচ্ছন্ন কপি ছাপাখানায় পাঠাবার আগে অনেক সময় নতুন করে আবার টাইপ করতে হয়েছে। কাজটা যে কতটা প্রলম্বিত আর সময়সাপেক্ষ, এ থেকে তা কিছুটা বোঝা যাবে।

১৯৩৩ আর ১৯৩৪ সালে ফ্র্যাঙ্ক লুডলো আর জর্জ শেরিফ যখন ভূটানে পাখি জরিপ করেন, প্রতিকূল অবস্থার জন্যে তাঁরা বেশি ভেতরে ঢুকতে পারেননি। সিকিমে কাজ করার পর থেকে ভূটানে আরও গভীরে গিয়ে এ নিয়ে আমার কাজ করার ইচ্ছেটা চাগিয়ে ওঠে। ওঁদের সময়ে না ছিল যানবাহন চলার রাস্তা, খরস্রোতা নদীনালার ওপর না ছিল কোনো সাঁকো। আশপাশে ভয়ঙ্কর সব গিরিখাত। বনজঙ্গলের এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় একমাত্র ভরসা ভারবাহী খচ্চর আর মোটবাহক কুলি। ভূটানে যাওয়াটাই ছিল এক দুঃসাহসিক ব্যাপার। লোকেও ভূটান অভিযানকে সেইভাবেই দেখত। 'দি ইবিস' পড়লে জানা যায় ১৯৩৭ সালে সেখানকার অবস্থাটা সে সময়ে কেমন ছিল। মহামান্য দ্রুক জিয়ালপো জিগমে দোর্জি ওয়াংচুক ছিলেন বিবেচক শিকারী এবং প্রকৃতিপ্রেমীক; বন্যপ্রাণি সংরক্ষণে তাঁর ছিল একান্ত উৎসাহ। ১৯৬০-এর বছরগুলোতে ভূটানের পাখির বিষয়ে একটি সমীক্ষা চালানোর জন্যে আমাকে আমন্ত্রণ জানান। আমিও তাঁকে কথা দিলাম, এর বিনিময়ে পরে তাঁকে আমি পাখির ওপর একটি সচিত্র বই করে দেব—সিকিমের ক্ষেত্রে যেমন করেছি। একান্তভাবে সেটাই তিনি চাইছিলেন। যানবাহন, ক্যাম্পে থাকার ব্যাবস্থা, জিনিসপত্র সরবরাহ—

কোনো কিছুর জন্যেই আমাদের ভাবতে হবে না। সে সময়ে উত্তর দিকের আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর রাস্তাঘাট তৈরি করে দিয়ে ভূটানকে ভারত সাহায্য করছিল। তার জন্যে খাড়া করা হয় একটি আধা-সামরিক সীমান্ত পথ সংস্থা। এদেরই মারফত আমাদের জন্যে যাবতীয় বন্দোবস্ত পাকা করা হয়। অসাধ্যসাধন করে এমন সব রাস্তা তারা বানিয়েছে, যেখান দিয়ে যেতে অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। খাড়াইতে উঠে অতলস্পর্শ খাদের গা ঘেঁষে অসম রাস্তা, অসম্ভব-আকৃতির উঁচু নীচু পর্বতমেখলা, হঠাৎ আচমকা মোড় নেওয়া, চুলের কাঁটার মতো সব বাঁক। সেইসঙ্গে শত শত মিটার নীচে ধপ করে নেমে যাওয়া। রাস্তা তৈরির সময় কত গাড়ি যে পড়ে গিয়ে পিণ্ডি পাকিয়েছে তার ঠিক নেই। এসব দেখে আমার মনে না পড়ে পারেনি—একবার এক পাহাড়ের গায়ে লটকানো একটা নোটিস দেখেছিলাম। তাতে লেখা ছিল : 'প্রবেশ নিষেধ। রাস্তার অবস্থা বিপজ্জনক। জীবিতদের আসামী করা হবে।' যাতে ভূটানেও আমাদের আদালতে সোপর্দ হতে না হয়, সেইজন্যে এসব নির্দেশ আমরা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছিলাম!

কারিগরি কুশলতার দিক দিয়ে অসামান্য এসব রাস্তা। আর তেমনি তার সমভাব। এখানে এমন সুকৌশল ক্রমোচ্চতা রক্ষা করা হয়েছে যে, ভারী মোটরবাহী মোটরট্রাক আর সাঁজোয়া গাড়ির পক্ষে কোথাওই রাস্তা অতিরিক্ত খাড়া নয়। তিব্বত সীমান্ত অভিমুখী রণকৌশল-উপযোগী কোনা রাস্তা না থাকায়, বমডিলা হয়ে আমদের সীমান্তবর্তী একমাত্র রাস্তা বরাবর ১৯৬২ সালে চীন যখন নেফায় (এখন অরুণাচল প্রদেশ) স্বচ্ছন্দে ঢুকে পড়েছিল, তখনই বিকল্প রাস্তার অভাব হাড়ে হাড়ে আমরা টের পাই। অথচ বন্ধুবৎ 'বিদেশি' রাজ্য ভূটানের ভেতর দিয়ে সেই বিকল্প রাস্তা ঐ সময় থাকলে আমরা ওদের ভারতীয় সীমানায় হুড়মুড় করে ঢুকে আসা রোধ করতে পারতাম।

১৯৬৬ থেকে ১৯৭৩—এই সময়ের মধ্যে ভূটানে আলাদা আলাদাভাবে ছ'টি সংগ্রহ-অভিযান চালানো হয়েছিল। প্রতিটির মেয়াদ ছিল চার থেকে আট সপ্তাহ। রাজ্যের পূর্ব, মধ্য আর পশ্চিম অংশে আগাগোড়া ভালোভাবেই সব পরিচালনা করা হয়। কয়েকটি অভিযান ড: এবং মিসেস রিপ্‌লে আর জুওলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার প্রখ্যাত পক্ষিবিদ ড: বিশ্বময় বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তভাবে চালানো হয়েছিল। ভূটানের পক্ষিজগৎ যে সিকিম আর অরুণাচলের থেকে তেমন কিছু আলাদা হবে না, সেটা আগেই আমরা আঁচ করেছিলাম। সংলগ্ন রাজ্য সিকিমের পাখির ওপর সামুহিকভাবে লেখা একটি বই যখন রয়েইছে, তখন আলাদাভাবে ভূটানের ওপর আবার বাড়তি বই করা অনর্থক। রাজা ছিলেন বুঝদার মানুষ। আমি তাঁকে একটা প্রস্তাব দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার সঙ্গে তিনি একমত হলেন। আমার প্রস্তাব ছিল এই : সবচেয়ে কাজের হয়, যদি আগেকার পরিকল্পনা বদলে হিমালয়-সংলগ্ন সমগ্র পূর্বাঞ্চল

বিষয়ে একত্রে একটি প্রথানুগ ফিল্ড-গাইড বার করা যায়। পূর্বাঞ্চল বলতে একদিকে পূর্ব-মধ্য নেপাল থেকে একেবারে পূর্বান্তে অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত গোটা ভূভাগ—যাদের প্রাকৃতিক ভূগোল অভিন্ন। ঠিক হয়, দ্রুক জিগ্মে দোর্জি এই বইয়ের রঙিন ছবির প্লেট বাবদ মোটা অংশের খরচ দেবেন এবং 'ফিল্ড গাইড টু দি বার্ডস অব দি ঈস্টার্ন হিমালয়জ' বইয়ের ৫০০ কপি তাঁর সরকার কিনে নেবে। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসকে এইভাবে তিনি বৈষয়িক দিক থেকে সাহায্য করবেন। (রাজা মারা যাওয়ার পর বইয়ের শিরোনামে বিশেষভাবে 'ভূটান' নাম না থাকার অজুহাত দেখিয়ে নতুন রাজ্যসরকার রাজার দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করতে অস্বীকার করে)। চোগিয়াল সরকারও আরম্ভে ৩০০ কপি বই কিনবে বলে কথা দেয়। কিন্তু বই যখন বার হল, তখন চোগিয়ালের সরকার হাওয়ায় উবে গিয়েছে। এত রকমের ভাগ্য বিপর্যয় সত্ত্বেও ১৯৭৭ সালে ফিল্ড-গাইড পাঠক আর সমালোচক উভয় মহলেই সুখ্যাতি অর্জন করেছে। ১৯৮৩ নাগাদ বইয়ের ধার্য মূল্য বেড়ে ১৩০ টাকা হল, তখনও পুনর্মুদ্রণ হয়েছে তিন দফা। সে বই এখনও সমানে কাটছে।

দেশের লোককে বই পড়ার দিকে আরও বেশি করে টানার মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর উদ্যোগে স্বশাসিত সংস্থা হিসেবে ১৯৫৭ সালে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট গড়ে তোলা হয়। আন্দোলনকে জোরদার করার জন্যে ঠিক হয় যে, ট্রাস্ট হিন্দি, ইংরিজি এবং প্রধান প্রধান সমস্ত ভারতীয় ভাষায় ভালো ভালো বই ছাপিয়ে সুলভ মূল্যে লোকের কাছে পৌঁছে দেবে। বুক ট্রাস্ট 'ইণ্ডিয়া—দি ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড পিপল' নাম দিয়ে একটি সিরিজ বার করার পরিকল্পনা নেয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রের মান্যগণ্য বিশেষজ্ঞদের দিয়ে যার যার নিজের নিজের বিষয়ে পরিভাষার কচকচি বাদ দিয়ে সহজ সরল করে 'সাধারণ মানুষে'র জন্যে এইসব বই লেখাতে হবে। প্রত্যেকটি বই হবে ভালো ছাপা আর দেখতে সুন্দর। দাম হবে এমন যাতে সাধারণ লোকের সাধ্যে কুলোয়। ১৯৬৫ সাল নাগাদ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ড: বি. ভি. কেশকর সাধারণ পাখিদের নিয়ে আমাকে একটা বই লিখে দিতে বলেন। আমার যে বই পাখি সম্পর্কে এবং পাখি দেখায় লোকের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করেছে, এ বই হবে অনেকটা সেই 'বুক অব ইণ্ডিয়ান বার্ডস'-এর ধরনের। ও-বইয়ের যা দাম, স্বল্প-আয়ের গড়পড়তা মানুষের নাগালের বাইরে। ট্রাস্টের এই বই সমস্ত প্রধান ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করা হবে, যাতে এর ব্যাপকতম প্রচার হয়। আমি তখন হ্যাণ্ডবুক লেখার কাজে সারাক্ষণ ব্যস্ত। কিন্তু এন.বি.টি. কী চাইছে সেটা ধরতে পেরেছিলাম। সেইসঙ্গে তার প্রয়োজন আর সুযোগ মেলার ব্যাপরটাও আমার খেয়ালে ছিল। কাজেই সেই অনুরোধ আমি ঠেলতে পারিনি। আমি ওঁদের জানালাম যে, একজন যোগ্য সহযোগীর সঙ্গে যুগ্মভাবে আমি বইটি লিখতে চাই। আমার ভাতুষ্পুত্রী লাঈক (মিসেস জাফর ফতেহ্আলি) তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রকৃতি-প্রেমিক। ইংরিজিতে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ও যা লিখত, তাতে ওর মননশক্তির

পরিচয় পাওয়া যেত। ওর লেখায় চমৎকার প্রসাদগুণ থাকত। কম বয়সে পাখি-দেখা চর্চায় ও ছিল আমার বালখিল্য চেলাদের একজন। পরে ও-ব্যাপারে লাঈক রীতিমতো কাবিল হয়ে উঠেছিল। এবার আমি ওকে রাজি করালাম ও যাতে এই কাজটা হাতে নেয়। আমার কাছ থেকে ন্যূনতাম টেকিনিকাল সাহায্য আর বৈজ্ঞানিক পরামর্শ—শুধু এই নিয়ে অচিরে সে তার লেখা শেষ করে ফেলে। লেখাটি হয় ট্রাস্ট যেরকমটি চেয়েছিল, ঠিক সেইরকম। লেখাও খুব ঝরঝরে। কার্যত দেখা গেল, 'ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড পিপ্‌ল্' সিরিজে জনপ্রিয়তায় 'কমন বার্ডস' হয়েছে সেরা বই—অন্যতম শ্রেষ্ঠ তো বটে। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৮-এর মধ্যে এর ইংরিজি সংস্করণ চার বার মুদ্রণ করা হয়। এ থেকেই বোঝা যায় যে বইটি কী পরিমাণ জনপ্রিয় হয়। কিছুদিন পর বইয়ের আকার কিছুটা বদলে একটি সম্পূর্ণ নতুন ইংরিজি সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। তাতে আলাদা আলাদা প্লেটে কিছু নতুন প্রজাতির ছবি জুড়ে দেওয়া হয়। এ বইয়ের জন্যে বিশেষভাবে ছবি এঁকে দেন রাজকোটের উদীয়মান তরুণ পাখি-আঁকিয়ে কে. পি. যাদব। এই বই হিন্দি এবং প্রধান প্রধান প্রায় সমস্ত আঞ্চলিক—মারাঠি, গুজরাতি, পাঞ্জাবি, ওড়িয়া, মালয়লম, তামিল, তেলেগু, বাংলা আর অসমিয়া—ভাষায় অনূদিত হয়। এর মধ্যে বেশির ভাগ ভাষাতেই দুই বা তারও বেশিবার বইটি পুনর্মুদ্রিত হয়। 'কমন বার্ডস'-এর ইংরিজি সংস্করণের মতোই অন্যান্য ভাষাতেও বইটি তার জনপ্রিয়তা মোটের ওপর অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

□

ইনাম

আমার বাল্যকালে, এবং এই কিছুদিন আগেও—ভারতে প্রাণিবিজ্ঞান বলতে বোঝাত, প্রধানত শারীরস্থান, শারীরবৃত্ত আর চর্মসংরক্ষণবিদ্যা। ক্লাসে আর রসায়ণাগারে কেবল এইসবই পড়ানো হত। ঘরের বাইরে গিয়ে স্বাভাবিক পরিবেশে প্রাণিকুলের জীবন-ইতিহাস—কেউ তখন এসব তেমন আমল দিত না। সেসব কেতাদুরস্ত কথার আজকাল খুব চল হয়েছে—যেমন : বসতিবিদ্যা, জীব-আচরণবিদ্যা—তখন কচিৎ কদাচিৎ তা শোনা যেত। বিদ্যাস্থানের চার দেয়ালের বাইরে কাজের মধ্যে ছিল প্রধানত প্রাণিতত্ত্বের নিদর্শন সংগ্রহ আর তা সংরক্ষণ করে বর্গীকরণ, ব্যবচ্ছেদ আর বিবরণ তৈরি—ক্ষেত্রগত এই ছিল প্রধান কাজ। এর মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রমদের মধ্যে একজন ছিলেন প্রখ্যাত মৎস্যতত্ত্ববিদ সুন্দরলাল হোরা। শেষদিকে যিনি জুওলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টর হয়েছিলেন। ভারতীয় মিষ্টিজলের মাছদের জীবতত্ত্ব আর বসতি, বিশেষ রকমের জীবনাবস্থার সঙ্গে তাদের মানিয়ে নেওয়া এবং ইন্দো-মালয় গোষ্ঠীভুক্ত প্রজাতিদের বিচিত্র রকমের ব্যাহত ভৌগোলিক বণ্টন—এসব নিয়ে তাঁর প্রথাবহির্ভূত গবেষণায় অভিনবত্ব ছিল। তার ফলে, তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন।

পক্ষিচর্চায় বরাবর আমার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ছিল জীবন্ত পাখি, তার বাস্তুসংস্থান আর জীবভূগোল। বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ লেখায় বা গ্রন্থ রচনায় আমি বসতিবিদ্যার ওপর বেশি জোর দিয়েছি। জার্মানিতে এরভিন স্ট্রেসেমান আর অস্কার হাইনরথের মতন পথপ্রদর্শক পক্ষিতত্ত্বিকদের সংস্পর্শে এসে আমার সেই 'সংক্রমণ' আরও জোরালো হয়ে ওঠে এবং একটি দিশা খুঁজে পায়। 'বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্র সমীক্ষার প্রতিবেদনে এই বসতিবিদ্যামূলক 'নতুন' ধারা সামান্য যে কয়েকজন জীবতাত্ত্বিকের স্বীকৃতি আর প্রশংসা পায় তার একজন অবশ্যই ছিলেন স্বয়ং ড. হোরা। আমার কর্মশৈলীর মূল্যায়ন করে তদানীন্তন সভাপতি হিসেবে তাঁরই সুপারিশে বাংলার এশিয়াটিক সোসাইটি বহুপ্রার্থিত 'জয়গোবিন্দ লাগা স্বর্ণ পদক' দিয়ে আমাকে সম্মানিত করে। কারণ উল্লেখ করে বলা হয়—'এশীয় প্রাণিতত্ত্বে গবেষণাকর্মের জন্যে'। পরে আমার কপালে অনেক স্বীকৃতি জুটেছে। কিন্তু এই পদকটিই আমার জীবনের প্রথম পুরস্কার। আন্তর্জাতিক

এবং বৈজ্ঞানিক প্রাসঙ্গিকতায় আমি এর চেয়েও উঁচু মানের কিছু কিছু পুরস্কার পেয়েছি—আমিই প্রথম অ-ব্রিটিশি যাকে ১৯৬৭ সালে ব্রিটিশ অর্নিথোলজিস্টস্‌ ইউনিয়নের সোনার মেডেল দেওয়া হয়। কিন্তু সেই প্রথম একজন ভারতীয়কে পক্ষিবিদের জন্যে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল ব'লে এশিয়াটিক সোসাইটির মেডেলের মূল্য আমার কাছে এক কাঠি বেশি বলে মনে হয়। এর আরও একটা কারণ আছে। প্রথম পুরস্কারটি সবসময়েই দেওয়া হয় নিরপেক্ষভাবে এবং কড়াভাবে যোগ্যতা বিচার করে। তাতে অন্যদের নতুন পথে এগিয়ে যেতে সুবিধে হয়। এই একই অভিজ্ঞান অনুযায়ী আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া বিজ্ঞানের ডক্টরেট (অনারিস কজা) ভাবাবেগের দিক থেকে আমি সহার্ঘ জ্ঞান করি। কেননা তার মূলে ছিল সেই প্রথম আমার কাজের মূল্যায়ন। ১৯৭৩ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় আর ১৯৭৮ সালে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও আমাকে ডক্টরেট দেওয়া হয়—তার মূল্যও আমার কাছে কম নয়। তার মানে এ নয় যে, সেক্ষেত্রেও সেই একই মাপকাঠি প্রয়োগ করা হয়েছিল।

বোম্বাইয়ের প্রকৃতিবিজ্ঞান সমিতির সঙ্গে বাঁধা পড়ে গিয়েছিল আমার ভবিতব্য। এই ঘনিষ্ঠতা আরও বেশি করে ঘটে বর্মা থেকে ১৯২৩ সালে 'পশ্চাদপসরণে'র পর। এদেশে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল সমিতি। তার শতবর্ষের স্থিতিতে শিকারবিধি আর বন্য পশু-পাখি সংরক্ষণ আইন প্রণয়নের কাজ সমিতির প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ প্রভাবের ফলেই সম্পন্ন হয়েছিল। ছেলেবেলা থেকেই আমার ছিল শিকারের ঝোঁক। কিন্তু যেভাবে চিন্তায় ফেলে দিয়ে দ্রুত আমাদের বনজঙ্গল আর বন্যপ্রাণিকুল উজাড় হয়ে যাচ্ছিল, বিশেষ ক'রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর—তাতে ক্রমশ আমি শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম। বনবিভাগের সংরক্ষণ-সচেতন ব্রিটিশ কর্মচারীরা দেশে ফিরে গেল। শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় দেখা দিল বৈশিষ্ট্য; বন্যপ্রাণী বিষয়ে যাদের সক্রিয় উৎসাহ ছিল, সেইসব দেশীয় রাজ্যেরও আর অস্তিত্ব নেই—ফলে সেই উদ্বেগ আরও বেড়ে গেল। তখন আমি সোসাইটির সম্মানিক সচিব এবং জার্নালের সম্পাদক। অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই দুই দায় আমার ঘাড়ে এসে পড়েছিল। সেই অবস্থায় সোসাইটির প্রকৃতি রক্ষার চিরাগত ঐতিহ্য অনুযায়ী যথাযোগ্য কাজে আর আদর্শপ্রচারে আমাকে সর্বতোভাবে যথাশক্তি নিয়োগ করতে হয়েছিল।

যুক্তরাজ্য, ইউরোপ আর যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকজন নামকরা প্রকৃতি-সংরক্ষণবাদী ১৯৬১ সালে বিশ্ব বন্যপ্রাণী তহবিল (ডব্লু.ডব্লু.এফ) গড়বার উদ্যোগ নেন। আই.ইউ.সি.এন.এন.আর (ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজার্ভেশন অব নেচার অ্যাণ্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস)-এর উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃতি সংরক্ষণমূলক প্রকল্পগুলি রূপায়িত করা। তার জন্যে তাঁরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থসাহায্যের আবেদন জানান। মার্কিন দেশের তেলশিল্পের মালিক এক বিরাট ধনকুবের মি: জে. পল গেটি তাতে সাড়া

দেন। এইভাবে পত্তন হয় ৫০,০০০ ডলার অর্থমূল্যের 'পল গেটি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ পুরস্কার'। অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়, এও তারই সমমর্যাদার পুরস্কার। বিশ্বপ্রকৃতির জগতের তেরোজন বিশিষ্ট সংরক্ষণবাদীকে নিয়ে তৈরি একটি আন্তর্জাতিক বিচারকমণ্ডলী প্রথমবার পুরস্কার দেবার জন্যে ১৯৭৪ সালে কোনো ব্যক্তির নাম মনোনয়ন করে পাঠাতে বলেন। বম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি ভারতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আর প্রকৃতি সম্পর্কে লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে এতদিন ধরে এত কিছু করেছে, অথচ দুনিয়ার মানুষের কাছে সেসব অজ্ঞাত থেকে গেছে। সেই ত্রুটি দূর করার জন্যে আমি সোসাইটির নাম মনোনয়ন করে পাঠাই। সেবার তাতে ফল না হলেও অন্তত বিচারকমণ্ডলীর চোখের সামনে সোসাইটির কর্মকাণ্ড তুলে ধরতে পেরেছিলাম, এটাই আমার সান্ত্বনা। এ পর্বের সেখানেই ইতি। ১৯৭৪ সালের পুরস্কার পান পেরুর মি: ফেলিপ বেনাভিডেস। দক্ষিণ আমেরিকার বিলুপ্তপ্রায় ভিকুনা (বন্য উট) প্রজাতির সংরক্ষণের জন্যে। এরপর ১৯৭৬ সালের জানুয়ারিতে একদিন নাস্তা করব বলে বসেছি, এমন সময়ে সাতসকালে টেলিফোন বেজে উঠল। বান্দ্রা সাব-পোস্টাপিসের পোস্টমাস্টার আমাকে ফোন করছেন, কী ব্যাপার! ওয়াশিংটন থেকে এইমাত্র একটা টেলিগ্রাম এসেছে, আমাকে গিয়ে সেটা নিয়ে আসতে হবে। বললাম, টেলিগ্রাম এসে থাকলে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়াই তো নিয়ম। কেন তা করছেন না! তার উত্তরে উনি বললেন, ওটা আমি নিজে আপনার হাতে তুলে দিতে চাই। সেইসঙ্গে আপনাকে অভিনন্দন জানাব। টেলিগ্রামে আপনার একটা প্রাইজ পাবার খবর আছে। কিসের প্রাইজ! কোনো প্রাইজ পাবার তো কথা নেই। ভদ্রলোক নিশ্চয় ভুল করছেন। যাইহোক যখন গেলাম, একমুখ হাসি নিয়ে আমার হাতে উনি টেলিগ্রামটা তুলে দিলেন। দেখলাম ঠিকানাটা আমারই বটে। তাতে লেখা : 'অনুগ্রহ করে খবরটা গোপন রাখবেন। আপনি পাচ্ছেন ১৯৭৬-এর জে. পল গেটি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ পুরস্কার। কয়েক দিনের মধ্যেই সবিস্তারে সব জানানো হবে। টমাস লাভজয় (আওয়ার্ড জুরির কোঅর্ডিনেটর) ডব্লু.ডব্লু.এফ.ইউ.এস.।' বি.এন.এইচ.এস.-এর জায়গায় ভুল করে আমার নাম বসিয়েছে—তখনও এটাই ভাবছি। আমাকে ব্যক্তি হিসেবে মনোনয়ন করলে আমি নিশ্চয়ই জানতে পারতাম। কিছুদিন পর সব জানতে পারলাম। আমাকে মনোনয়ন করেছেন মার্কিন সিনেটের এক সদস্য। মেরিল্যাণ্ডের মি: চার্লস ম্যাকম্যাথিয়াস জুনিয়ার। আঁচ করলাম, এর পেছনে আছেন এমন একজন সতত শুভার্থী এবং সমর্থক, যিনি আমাদের উভয়েরই বন্ধু। বম্বে ন্যাচরাল হিস্ট্রি সোসাইটির কাজকর্ম এবং তার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক—এবিষয়ে তিনি ভালোমতন ওয়াকিবহাল। প্রাইজের সঙ্গে প্রাপকের গুণের যে ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে, আমার ধারণা, তার পেছনেও রয়েছে সেই একই লোকের হাত।

'ধর্মপিতা'টি কে, সেটা আবিষ্কার করার পর সিনেটার ম্যাথিয়াসকে তাঁর অনানুষ্ঠিক

সৌজন্যের ধন্যবাদ জানিয়ে এবং পুরস্কার পেয়ে আমার সন্তোষ আর অপ্রত্যাশিত চমকের কথা জানিয়ে একটি চিঠি লিখি। ১৯৭৬ সালের ৮ মার্চ তাঁর কাছ থেকে খুব সুন্দর একটা উত্তর পাই। তাতে তিনি লেখেন : 'দ্বিতীয়বারের জে. পল গেটি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ পুরস্কারের জন্যে আপনাকে মনোনয়ন করতে পেরে নিজেকে আমি সম্মানিত বোধ করছি। আপনি এই পুরস্কার জয় করে আমাকে কৃতার্থ করেছেন। ফলত, আন্তর্জাতিক বিশিষ্ট বিচারকমণ্ডলীর কাছে আমার বিবেচনা মান্যতা পেয়েছে। এই সম্মান যোগ্য পাত্রে বর্তেছে। আপনি পেয়েছেন বলে আমি সাতিশয় আনন্দিত।... অভিনন্দন!' পরে এটা জেনে আমি দ্বিগুণ খুশি হয়েছি যে, বিচারকমণ্ডলী আমাকে নির্বাচন করার ব্যাপারে প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৭৬ সালের ২৫ মার্চ সিনেটার ম্যাথিয়াস প্রেসিডেন্টকে সম্বোধন করে সিনেটে একটি বক্তৃতা দেন। মার্কিন কংগ্রেসের নথিতে তা উদ্ধৃত করা হয়। বক্তৃতাটি ছিল এই মর্মে :

> মিঃ প্রেসিডেন্ট, কয়েক বছর আগে আমি যখন ভারত সফরে যাই, তখন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী জানতে চান বিখ্যাত ভারতীয় পক্ষিবিদ সেলিম আলির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে কিনা। দেখা হয়নি বলায় তিনি তখনই ব্যবস্থা করে দেন যাতে তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করতে পারি। এইভাবে আমার এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা অর্জনের পথ খুলে যায়। তারই ফলে, বোম্বাইয়ের কাছাকাছি অভয়ারণ্যে সেলিম আলির সঙ্গে একটা গোটা দিন আমি কাটিয়ে দিই। এতে আমার অশেষ উপকার হয়। বন্য প্রকৃতির সৌন্দর্য, কীভাবে উপভোগ করতে হয়, সে বিষয়ে তিনি আমার চোখ খুলে দেন। ইতিহাসের এক জমাটি অধ্যায়ে ভারতীয় জীবনের যাবতীয় দিক সম্পর্কে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা আর স্বচক্ষে দেখা নানা ঘটনার কথা বলেন। সেদিন তাঁর কাছ থেকে ভারতীয় পাখি সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি। তার চেয়েও বেশি করে জানতে পারি মানবপ্রকৃতির সেইসব গুণবত্তার কথা যা সর্বদেশে সমান। যখন জে. পল গেটি সংরক্ষণের পুরস্কারের জন্যে নাম মনোনয়নের অনুরোধ জানানো হয়, আমি সানন্দে সেলিম আলির নাম প্রস্তাব করি। ভাইস প্রেসিডেন্ট রকফেলার যখন ৫০,০০০ ডলার পুরস্কারের নির্বাচিত প্রাপক হিসেবে ডঃ আলির নাম ঘোষণা করেন, তখন আমি উৎফুল্ল হই। সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট কর্মকৃতির জন্যে আজকের দিনে সর্ববৃহৎ পুরস্কার।...'ভারতে সংরক্ষণের পরিবেশের স্রষ্টা'—এই বলে ডঃ আলির কৃতিত্ব স্বীকার করা হয়েছে।

বোম্বাইয়ের প্রাতঃকালীন কাগজগুলোতে পুরস্কারের খবর বেরনোর কিছুক্ষণের মধ্যেই যত রাজ্যের ব্যাঙ্কওয়ালা, বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানের দালাল এবং এই জাতীয় বিবিধ ভদ্রমহোদয়দের কাছ থেকে ক্ষণে ক্ষণে ফোন আসতে শুরু করে দিল। প্রত্যেকেরই গায়ে-পড়া উপদেশ—টাকাটা কীভাবে গচ্ছিত রাখলে সবচেয়ে বেশি লাভ উশুল করা যাবে। যাঁরা উপদেশ দিচ্ছেন, নিঃসন্দেহে তাঁরাই হলেন উপযুক্ত ঠাঁই! তাঁদের সবাইকেই সংক্ষেপে মিষ্টি করে আমি বলেছি যে, আমি মনে করেছিলাম কাউকে জানতে না দিয়ে পুরোটাই আমি নিজের পেটে চালান করে দেব, কিন্তু এখন দেখছি

বড়ো বেশি লোক তাতে নজর দিচ্ছে! শেষ পর্যন্ত পুরস্কারের টাকার অধিকাংশটাই চলে যায় সোসাইটির হেপাজতে। এতদিনে সফল হতে চলল আমার বহুবাঞ্ছিত স্বপ্ন। সোসাইটির প্রস্তাবিত সেলিম আলি প্রকৃতি সংরক্ষণ তহবিলের গোড়াপত্তন হবে ঐ টাকা দিয়ে। এরপর লোক-ওয়ান-থোর স্মৃতিতে আর সোসাইটির প্রতি অনুরাগবশত সিঙ্গাপুরস্থ লোক-এর পরিবারের লোকজনেরা মুক্তহস্তে মোটা টাকা দান করায় ঐ তহবিল যথেষ্ট ফুলফেঁপে ওঠে।

দেরিতে চিঠি আসায় ফেব্রুয়ারিতে (১৯৭৬) নিউ ইয়র্কে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে নিজে গিয়ে পুরস্কার গ্রহণ করতে পারিনি। আমার হয়ে ঐ পুরস্কার গ্রহণ করেন রাষ্ট্রদূত মিঃ টি. এন. কল। অনুষ্ঠানে তাঁর সুপ্রযুক্ত বক্তৃতার সবাই তারিফ করেন। স্যান ফ্রান্সিসকোয় বিশ্ব বন্যপ্রাণী তহবিলের অন্য একটি অনুষ্ঠানে ঐ বছরের শেষে আমি গিয়েছিলাম। সেখানে আমার পূর্ববর্তী গেটি পুরস্কার প্রাপক ফেলিপ বেনাভিডে-এর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের কথা মনে পড়ে। ফেলিপ মজা করে সেই ঘটনা বর্ণনা করে বলেছিলেন—যেন 'একত্রে ১০০,০০০ ডলারের করমর্দন'।

আমার প্রয়াত কিছু গুরুজনদের মতে, যাঁরা বাঁধা রাস্তার বাইরে গেলে ভয় পান, তাঁদের চোখ ফোটানোর জন্যে এই ক'টি কথা আমি লিখে রেখে যেতে চাই। কথাগুলো এই : এমন কী পাখি নিরীক্ষণ করার মতন আপাত নিরর্থক বৃত্তিতেও কেউ যদি কায়মনোবাক্যে লেগে থেকে নিজেকে উজাড় করে দেয়, তাহলে তার প্রাপ্তির ঘর কিছুতেই ফাঁকা যাবে না। বছরের পর বছর সমানে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমার প্রাপ্ত পুরস্কার আর সম্মাননা লাভের একটি তালিকা বর্তমান অধ্যায়ের সঙ্গে জুড়ে দিলাম।

১৯৫৩	'এশীয় প্রাণিবিদ্যা'র ওপর গবেষণার জন্যে এশিয়াটিক সোসাইটির 'জয়গোবিন্দ লাহা মেডেল'।
১৯৫৮	'ভারতীয় পক্ষিতত্ত্বে বিশিষ্ট সেবার জন্যে ভারতের রাষ্ট্রপতির প্রদত্ত 'পদ্মভূষণ'।
১৯৫৮	আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রি (অনারিস কজা)।
১৯৬৭	ব্রিটিশ অর্নিথোলজিস্টস ইউনিয়ন-এর ইউনিয়ন স্বর্ণ পদক।
১৯৬৯	'আন্তর্জাতিক সংরক্ষণে বিশিষ্ট সেবার জন্যে' ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজার্ভেশন অব নেচার অ্যাণ্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস প্রদত্ত জন সি. ফিলিপস মেমোরিয়াল মেডেল।
১৯৭০	'ভারতীয় পক্ষিবিদ্যার ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্যে ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান একাডেমি প্রদত্ত সুন্দরলাল হোরা স্মৃতি পদক।
১৯৭৩	দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রি (অনারিস কজা)।

১৯৭৩	সোভিয়েট একাডেমি অব মেডিকেল কর্তৃক পাভলভস্কি সেন্টিনারি মেমোরিয়াল মেডেল।
১৯৭৩	নেদারল্যাণ্ডের হিজ রয়াল হাইনেস প্রিন্স বার্নহাড প্রদত্ত ইনসিগরিয়া অব অফিসার ইন দি অর্ডার অব দি গোল্ডেন আর্ক।
১৯৭৬	বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্যে জে. পল গেটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার।
১৯৭৬	পক্ষিবিদ্যায় নিরবচ্ছিন্ন কাজের জন্যে রাষ্ট্রপতির দেওয়া পদ্মবিভূষণ।
১৯৭৮	অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রি (অনারিস কজা)।
১৯৭৯	ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান পর্ষদ প্রদত্ত সি ভি. রমণ মেডেল।
১৯৮১	'ভারতীয় উপমহাদেশে পক্ষিবিদ্যায় বিশিষ্ট অবদানের জন্যে' বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি প্রদত্ত স্বর্ণ পদক।
১৯৮১	কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ফলক।
১৯৮২	ভারত সরকার প্রদত্ত পক্ষিতত্ত্বে জাতীয় রিসার্চ প্রোফেসরশিপ।
১৯৮৩	যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বন্যপ্রাণী ফেডারেশন প্রদত্ত আন্তর্জাতিক সংরক্ষণ পুরস্কার।
১৯৮৩	বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্যে ভারত সরকার প্রদত্ত জাতীয় পুরস্কার (স্বর্ণ পদক)।

□

২৩

পাখি দেখার রোমাঞ্চ

সারা জীবন পাখির পেছনে ছুটে আমার কী রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হয়েছে—এই বাঁধাধরা প্রশ্ন কত বার যে আমাকে শুনতে হয়েছে, তা বলার নয়। যাদের ছিল বীরত্বব্যঞ্জক গল্প শোনার আশা, তারা আমার উত্তর শুনে হতাশ হয়েছে। পক্ষিবিদ্যাকে শখ বা বৃত্তি বা অন্তঃপ্রেরণা, যে নামই দেওয়া হোক—স্বভাবতই ঘরের বাইরে এর চেয়ে অবিসংবাদী পেছনে ছোটার ব্যাপার আর নেই। এতে বিপদের ঝুঁকি, সিদ্ধিলাভ আর আশাভঙ্গ—সব কিছুই আছে। এতে উত্তেজনা আছে, রোমাঞ্চ আছে। সেটা অন্য জাতের। সাধারণ প্রশ্নকারীরা যেরকমটা শুনতে চায়, সেরকমটা নয়। গোড়ায় সমস্যার জট ছাড়ানোর উত্তেজনা। তারপর তার সূত্র ধরে ধাপে ধাপে এগিয়ে এমন কিছু আবিষ্কার অথবা সপ্রমাণ করা, যা আগে শুধু আঁচ করে নেওয়া হয়েছিল। ১৯৩০ সালে আমার একবার এই রকমের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তখন আমি বেকার অবস্থায় কিহিমে লতিফদের সঙ্গে সমুদ্রের ধারে ওদের কটেজে থাকি। এই সময় আমিই সর্বপ্রথম আকস্মিকভাবে তাল-বাবুইদের বিচিত্র ধরনের প্রজনন সংক্রান্ত জীবতত্ত্বের সঠিক ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছিলাম।

পাখিদের নীড় বাঁধার যে বৃত্তান্ত এতদিন বই থেকে বইতে প্রচারিত হয়ে এসেছে, সেই পর্যন্তই ছিল আমার জানার দৌড়। তখন আমি খুব পাখির ফটো তুলে বেড়াচ্ছি। বইপড়া বিদ্যে মগজে নিয়ে তোফা ফটো তোলা চলে। কিন্তু আমি একটা মই বেয়ে উঠে দশ ফিট ওপরের ধাপে ক্যানভাসের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছি। সামনে ফুট কয়েক দূরে পাখির বাসা। ওদের সেই বাসস্থলে যা আমার নজরে পড়ছে, তা একেবারেই শাস্ত্রবহির্ভূত। তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ঐসব পাখি ছাপানো পাঠ্যপুস্তকগুলো একেবারেই ছোঁয়নি। রোজ কয়েক ঘণ্টা ধরে লুকিয়ে থেকে পাখির বাসায় ওদের কাণ্ডকারখানা দেখে সবিস্তারে নোট বই আর নকশা আঁকি। তা থেকে অনুমান করবার চেষ্টা করি সম্ভাব্য কী ঘটতে পারে। এইভাবে কয়েক সপ্তাহ কেটে যাওয়ার পর কিছুটা ভরসা পেয়ে সব তথ্য জোড়া দিয়ে দেখি—তালবাবুইদের প্রজননঘটিত জীবতত্ত্বের একটা নির্বিশেষ ছক পাওয়া যাচ্ছে। এরপর এই ব্যাখ্যা আমি ছাড়াও অন্যান্য

গবেষকেরাও বার বার পরখ করে দেখে শেষ পর্যন্ত এর সপক্ষে সকলে রায় দেন। তারপর সেটাকে আরও ঘষামাজা করার পরে 'প্রমাণ্য রূপে' এই ব্যাখ্যা অনুমোদন করা হয়।

সংক্ষেপে, এ থেকে যে সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়, তা এই : প্রজননের পর্বে চড়াই আকারের ছোট্ট পুরুষ-বাবুইদের সুন্দর দেখতে হয়। গায়ের রং অনেকটাই কাঁচা সোনার মতো। এরা পটানোর কাজে সিদ্ধহস্ত বহুবল্লভ। একজন পুরুষ বাবুই একাধিক স্ত্রী জোটাতে পারে। কিন্তু তা হারেম ধরনের হয় না। একর পর আরেক স্ত্রী—এইভাবে পর্যায়ক্রমে। তাদের প্রত্যেককে থাকবার বাসা যোগাতে পারার ওপর তা নির্ভর করে। বাসা তৈরির দায়িত্ব একা পুরুষদের। এ ক্ষেত্রে মেয়েদের কোনো হাত থাকে না। বাসা টাঙাবার জন্যে তারা বাবলা কিংবা তাল গাছ বেছে নেয়। বকযন্ত্র আকারের এইসব বাসা বেশ আঁটসাঁট করে বোনা হয়। বাস্তুভূমিতে একসঙ্গে বহুসংখ্যক পুরুষ বাবুই এইসব বাসা তৈরি করে। কখনও কখনও বাসার সংখ্যা একশো বা তারও বেশি হয়। বাসা তৈরির একটা স্তরে এসে দেখা যায়, অর্ধেক তৈরি হতে না হতেই হঠাৎ এক ভোরে এক ঝাঁক স্ত্রী-বাবুই মনের মতন বাসার সন্ধানে এসে হাজির হয়েছে। ওরা এসে পড়তেই স্বাগত জানাতে পুরুষের দলটাতে হৈ-হল্লা শুরু হয়ে গেছে। ইত্যবসরে মেয়েরা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন্ বাসা কেমন হয়েছে, সেটা ঘুরে ঘুরে যাচাই করে দেখে। কিছু কিছু বাসা তাদের মনঃপূত হয়। বাকিগুলো তারা খারিজ করে দেয়। একের পর এক বাসা যাচাই করে যখন দেখা হচ্ছে, সেই সময় ঘরামি পুরুষটি পাখা ঝাপ্‌টে ঘরণীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তার রায় জানার জন্যে বাইরে অপেক্ষা করছে। বাসার কাঠামো স্ত্রী-পাখির যদি পছন্দ হয়, তাহলে তখনই সে ঘরের দখল নেবে। চুলবুলে মরদটিকে এবার সে কোল দেবে। হেলমেটের ধরনের অর্ধসমাপ্ত সেই বাসার 'চিবুক-বন্ধনী'র জায়গাটাতে চট করে মৈথুন সেরে নিয়ে তারা জোট বাঁধার কাজ পাকা করে ফেলবে। এরপর পুরুষটি আবার উঠে-পড়ে লেগে যাবে লম্বা নলাকার প্রবেশপথ সমতে বাসা তৈরির কাজ সম্পূর্ণ করতে। স্ত্রী-বাবুই তার মধ্যে ডিম পেড়ে, তাতে তা দিয়ে একসময়ে বাচ্চা ফোটাবে। ডিম পাড়া থেকে পরিবার প্রতিপালন—ঘরণীর ওপর এর পুরো দায়িত্ব। এমনটা প্রায় দেখাই যায় না যে, ছানাগোছানোর জন্যে মরদটি কখনও খাবার যোগাড় করে আনছে। অন্তত বাসা বোনার ভার ঘাড় থেকে নেমে না যাওয়া পর্যন্ত সংসার সামলানোর কাজ কখনই তাকে করতে দেখা যায় না। একটি বাসা তৈরির কাজ সেরে ফেলার প্রায় পরে পরেই কয়েক ফুট দূরে আরও একটা বাসা বোনার কাজ সে শুরু করে দেয়। যখন সেটা আধাআধি তৈরি হল, তখন আবার এক নীড়-সন্ধানী স্ত্রী-বাবুই এসে উদয় হবে। সে দখল করবে ঐ দ্বিতীয় বাসা। এইভাবে পুরো প্রক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তি হবে। পুরুষটির তোফা মজা। বলতে গেলে, একই সময়ে তার বেশ কয়েকটি জেনানা এবং বহু পরিবারের সে গর্বিত পিতাঠাকুর।

এমনও হতে দেখা গেছে যে, কোনো নিজস্ব বদখেয়ালের জন্যে একের পর এক স্ত্রী-বাবুই কোনো একটি বাসা অপছন্দ করে কেটে পড়ছে। কিন্তু পুরুষ বাবুইটি তাতে আদৌ ঘাবড়ায় না। অর্ধসমাপ্ত বাসাটা ফেলে রেখে পত্রপাঠ সে কপাল ঠুকে নতুন বাসা তৈরির কাজে লেগে পড়ে। বাবুইদের বসতিতে গেলে দেখা যায় এই রকমের অজস্র অর্ধনির্মিত বাসা ফাঁকা পড়ে রয়েছে। গোদা কথায়, সত্যিকার ঘটনা এটাই। লোকমুখে অবশ্য এ নিয়ে মন-গড়া এক রসের গল্প আকছার শুনতে পাওয়া যায়। আধাখেঁচড়া এই সব বাসায় দোল খেতে খেতে মরদেরা নাকি কাছাকাছি বাসায় তা দিতে বসা ঘরণীদের গজল গেয়ে শোনায়।

মাঠেঘাটে ঘুরে পক্ষিনিরীক্ষণ—আটপৌরে ভাষায় যাকে বলা হয় 'পাখি দেখা'—এটা যথেষ্ট নিরুপদ্রব কাজ। তবে মাঝে মধ্যে এ কাজেও গায়ে কাঁটা দেওয়ার এবং বিপদে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। আমি নিজেও তা কতবার এমন প্যাঁচে পড়েছি যে, ভয়ে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেছে। যেমন, দক্ষিণ ভারতে হস্তিসঙ্কুল জঙ্গলে আমার যা দশা হয়েছিল। সেখানে এমন সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে পড়েছি তা বলার নয়। বনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ এক বুনো হাতি ধাঁ করে সামনে এসে হাজির। কর্নাটক আর কেরলে এ জিনিস হরবখত ঘটে থাকে। তখন প্রায়ই এক বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা হয়। হাতি তখন দাঁড়িয়ে থেকে দেখে—পক্ষিবিদ উল্টোমুখো হয়ে ত্রাহি মধুসূদন বলে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে। আসলে কিন্তু হাতি যদি পাগলা হাতি না হয়, কিংবা ছোট বাচ্চা সঙ্গে থাকা মা-হাতি হয়, তাহলে ভয়ের তেমন কোনো কারণ থাকে না। সে যাই হোক, সামনাসামনি এসে পড়ল অত সব বোঝাবুঝি না করতে যাওয়াই ভালো। বিশেষ করে, হাওয়া যখন বেগতিকে বয়। বরং, এটাই তখন বীজমন্ত্র হওয়া ভালো—যঃ পলায়তি স জীবতি। যেখানে লম্বা লম্বা ঘাসের রাজত্ব, সেখানে ভীতসন্ত্রস্ত হাতির পাল যদি ছোটাছুটি শুরু করে তাহলে হয়তো অতর্কিতভাবে পক্ষিবিদের হাতির পায়ের তলায় গিয়ে যাওয়ার ভয়টা থেকেই যায়। ঐসব অবস্থায় সাহসিকতার চেয়ে বিবেচনাশক্তিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

ক্ষুদ্রকায় কোচিন ফরেস্ট ট্রামওয়ে সম্পর্কে সগর্বে বলা হত যে, এটাই এদেশের সবচেয়ে সস্তায় চালানো রেলপথ। নাকি সারা বিশ্বে? আমার বিশ্বাস, দুটোই ঠিক। এর গার্ডসাহেবের গায়ের যে উর্দি, একদা সেটা সাদাই ছিল। মাথায় বিধিসম্মত সাদা (একদা) সোলার টুপি। চাকরি পাকা হওয়ার দশ বছর পরেও তার মাসমাইনে ছিল ২৫ টাকা। জার্মানদের তৈরি ইঞ্জিন (২ ফুট গেজ) কাঠের জ্বালানিতে চলত। আশপাশের বনের ভেতর দিয়ে কু-ঝিকঝিক করে যেতে যেতেই অনেক সময় গাছ কেটে এর জ্বালানি যোগানো হত। চলাকুড়ি থেকে পরম্বিকুলম—এই সব কিছুর যোগাযোগ কাঠ পরিবহনের কাজ হাসিল করা হত। ইঞ্জিন লাগিয়ে সমতলের ওপর দিয়ে গাড়ি টেনে এনে গড়ানের মুখে নিয়ে আসা হত। বাকি কাজটা ছেড়ে দেওয়া হত মাধ্যাকর্ষণের

হাতে। কোথাও কোথাও ঢালু জায়গাটা ছিল সাংঘাতিক খাড়া ধরনের। মালভর্তি ট্রেন যখন সাঁ সাঁ করে নীচে নামত, তখন তারই টানে খালি ওয়াগানগুলো ওপরে উঠে যেত। এটা নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যে প্রত্যেক ঢালের মুখে ব্রেকড্রাম রাখা থাকত। যত দূর মনে পড়ে, ঐ রকম ব্রেকড্রাম ছিল সাত থেকে ন'টা। সচরাচর ট্রেনে কোনো যাত্রী থাকত না। কিন্তু রেলের কোনো অফিসার কর্মব্যপদেশে সেখানে গেলে, কিংবা কোনো ভিআইপির সফর থাকলে ঐ গাড়িতে ঘোড়ায়-টানা গাড়ির ধাঁচে করোগেটের লোহার একটা ওয়াগন জুতে দেওয়া হত। গাড়ির ভেতরে বসানো থাকত কয়েকটা চেয়ার।

কুরিয়াকুট্টিতে রেল লাইনের ধারেই ছিল সরকারি শিবিরের ছাউনি। ১৯৩৩ সালে আমাদের সার্ভে পার্টি এতে করেই সেবার যাতায়াত করেছিল। ক্যাম্পের হাতায় ঢোকার ঠিক মুখে ট্রেনটাকে দাঁড় করিয়ে যাবতীয় মালপত্র লটবহর নামিয়ে একে একে বাংলোর ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মোটা মোটা লোহার তারের সাহায্যে ওপরে টেনে তোলার সময় খুব মজা লাগছিল। বিশ কি তারও বেশি বছর আগে রেল রাস্তার গোড়াপত্তনের সময় সেই যে লোহার তার খাটানো হয়েছিল, তারপর আর তা বদলানো হয়নি। সুতরাং নানান দৈর্ঘ্যের খাড়াই বেয়ে ওঠার সময় কী-হয় কী-হয় ভেবে জায়গা বিশেষে গা ছম ছম করছিল তো বটেই। এও মনে আছে, মাঝে মাঝে গল গল করে একরাশ ঝুলকালি আর ধোঁয়ার সঙ্গে জ্বলন্ত কয়লার ফুলকি কামরার ভেতরে উড়ে এসে আমাদের মালপত্রের ওপর বা কখনও গায়ে এসে পড়ছিল। ফলে, ট্রেনে বসে থাকতে থাকতেই তহমিনার শাড়ি আর আমার শার্ট বেশ ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। আট ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল—গাড়ির স্পীড ভালোই বলতে হবে। কুরিয়াকুট্টির পরের স্টেশন পরম্বিকুলম। মধ্যে আট কিলোমিটারের মতো দূরত্ব। সেখানেই রেলপথের শেষ। এ জায়গায় আছে একটা ফরেস্ট ডিপো। সেইসঙ্গে কাঠের আড়ত। বনের যাবতীয় কাঠের গুঁড়ি সেখানে এনে জাড়ো করা হয়। তারপর মালগাড়িতে চাপিয়ে চলাকুড়িতে চালান করা হয়।

কোচিন আরণ্যক রেলপথে এর পরে আমার স্বপ্নময় রেলভ্রমণ ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারিতে। তার কিছুদিনের মধ্যেই, হায়, এই রেলপথ সমূলে উচ্ছেদ করে সে জায়গায় দৈত্যকায় পরম্বিকুলম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প পত্তন করা হয়। তার ফলে, সলিল সমাধি হয় চারদিকের সুরম্য অরণ্যপ্রকৃতি সমেত গোটা পরম্বিকুলমের। যখন গড়ানে জায়গা থেকে আমাদের ওপরে টেনে তোলা হচ্ছে, তখন জিজ্ঞেস করে জানতে পারি তখনও সমানে ব্যবহার হচ্ছে তেরো বছর আগের মতোই সেই মান্ধাতাআমলের লোহার তার। এটা জানতে পেরে তাতে স্পষ্টতই অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ পেয়েছিলাম। যখন আমরা পরম্বিকুলমে পৌঁছোই, তখন সবে অন্ধকার হয়ে আসছে। বনবাংলোর বারান্দা যেখানে, তার ঠিক পাশ দিয়ে গেছে রেলের লাইন। নজরে এল বারান্দায় উবু

হয়ে বসে আছে একদল আদিবাসী (কাদার)। আর সেই ভিড়ের মাঝখানে ডাকবাংলোর ছাঁচে-ঢালা আরামকেদারায় হাতলে ঠ্যাং ছড়িয়ে খালি পায়ে খালি গায়ে কোঁকড়ানো-মোকড়ানো হাফ প্যান্ট পরে বসে আছে জনৈক ইউরোপীয় পুরুষ।

কিছু পরেই আমরা পরস্পরের পরিচয় দিলাম। জানলাম উনি অস্ট্রিয়ার এক নৃতত্ত্ববিদ। নাম ব্যারন ওমর রল্‌ফ এহ্‌রেনফেল্‌স। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি ধর্মান্তর করে (সুবিধের জন্যে?) মুসলমান হয়েছেন। হিটলারের ইহুধি নিধন যজ্ঞের সূচনার প্রাকপর্বেই পালিয়ে ভারতে এসে এই অঞ্চলের আদিবাসীদের নিয়ে গবেষণার কাজ শুরু করেন। বললেন তাঁর দ্বিতীয় ভালবাসার বস্তু পক্ষিবিদ্যা। পরদিন সকালে আমি যখন পাখি সংগ্রহ করতে যাব, ওঁর বিশেষ ইচ্ছে আমার সঙ্গী হওয়ার। পথ চেনানোর জন্যে সামনে এক বনরক্ষী। অস্ত্র বলতে একটি কালেক্টিং গান আর ডাস্ট-শট গুলিগোলা। পেছনে ওমরকে নিয়ে আগুপিছু হয়ে জন্তুজানোয়ারদের যাতায়াতের সরু পথ ধরে আমরা যাচ্ছিলাম। চারদিকে প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু ঘাসের গভীর জঙ্গল। চওড়া ল্যাজওয়ালা ঘেসো ফুটকি পাখিরা (শোয়েনিকোলা প্লাতিউরা) এই ধরনের জায়গাতেই থাকে। আমার মাথায় সেটাই ঘুরছে। যেতে যেতে একটা মোড় ঘুরেই দেখি বনরক্ষী সট করে মাথাটা হেঁট করে উত্তেজিতভাবে সামনের দিকে আঙুল দিয়ে কী যেন দেখাচ্ছে। আমি শুধু এক ঝলক দেখলাম এক দাঁতাল হাতির মাথা আমাদেরই রাস্তা বরাবর উল্টোদিক থেকে ধেয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে আমি দে-ছুট। ওমর ছিল আমার চেয়ে তিরিশ হাত পেছনে। হাতের ইশারায় ওকেও বললাম ছুটে পালাতে। ও কতটা বুঝেছিল জানি না। কিন্তু ও আর এক মুহূর্ত দেরি করেনি। বেড়ালের মতো সাঁ করে ঘুরে ডাইনে বাঁয়ে না তাকিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে পাঁই পাঁই করে ছুটেছিল। এমনই জোরে ছুটল যে, শেষে দেখি ও রয়েছে আমার একশো গজ আগে। ওর থামবার কোনো লক্ষণই নেই। শেষ পর্যন্ত আরও একশো গজ ছোটার পর ওমর থেমেছিল। আমার তখন দম নিক্‌লে গেছে। কোনো রকমে হাঁপাতে হাঁপাতে যখন আমি ওকে ধরে ফেললাম, তখন ও দম নিতে নিতে বিড়বিড় করে জিজ্ঞেস করল, 'হয়েছিলটা কী?' শুনে খুব মজা লেগেছিল। এখনও কোনো দাঁতাল হাতি দেখলেই আমার চোখে ভেসে ওঠে ওমরের সেই ঊর্ধ্বশ্বাসে তীরবেগে ছুটে যাওয়ার দৃশ্য। এ ক্ষেত্রে ঐ হাতি বেচারা হয়তো আমাদের চোখেও দেখেনি। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সে তার দলবলের কাছে ফিরে গিয়েছিল। আর কখনও আমাদের ত্রিসীমানায় সে ঘেঁসেনি।

পক্ষিতাত্ত্বিকের যাত্রাপথে কখনও কখনও অন্য ধরনের বিপদও ঘটতে পারে। একটা ঘটনার কথা মনে পড়লে আজও আমি শিউরে উঠি। তিব্বত দেশটা ড্রাগনের পেটে যাওয়ার বছর কয়েক আগের কথা। ১৯৪৫ সালে মানস সরোবর আর কৈলাসে যাব। আলমোড়া থেকে হিমালয়ের পথ ধরে লিপুলেখ গিরিখাতের দিকে চলেছি। একটা সাংঘাতিক সরু পায়ে-চলা রাস্তায় এসে পড়েছি। একপাশে হাজার ফুট খাদ

খাড়া নীচে নেমে গেছে। আরেক দিকে ৩০০ ফুট নীচে গর্জাচ্ছে কালী নদী। কুলিরা তখন তাঁবু গাড়ার কাজে ব্যস্ত। আগ বেড়ে আমি একাই হাঁটতে শুরু করে দিয়েছি। ঠিক সেই সময়, হবি তো হ, ঘাড় হল্‌দে এক ইউহিনা—আজও তাকে আমার স্পষ্ট মনে আছে—আমার হাত কয়েক দূরে সামনে পাহাড়ের গা-ঘেঁষে একটা ঝোপের মাথায় এসে বসেছে। ফিল্ডগ্লাস দিয়ে ওকে যখন দেখছি, তারই মধ্যে আরেকটু উঁচুতে গিয়ে বসেছে। কাজেই আরও ভালোভাবে দেখার জন্যে আমি এক পা পিছিয়ে গিয়েছি। ফিল্ডগ্লাসে তখনও আমার চোখ সেঁটে রয়েছে। রসাতলের দিকে পিঠ রেখে আমি দাঁড়িয়ে আছি কিনা এসব আমার মাথাতেই নেই। পেছনে পা রাখতে গিয়ে মনে হল একটা পাথরের নুড়ি যেন আমার গোড়ালির তলা থেকে সরে গেল। কোনো অঘটন যে ঘটতে পারে সে বিষয়ে তখনও আমার বিন্দুমাত্র হুঁশ ছিল না। অস্পষ্টভাবে কানে এল একটা কিছু গড়াতে গড়াতে সমানে নীচে নেমে যাচ্ছে। পেছনে কী ঘটছে দেখার জন্যে স্বভাবত ঘাড়টা কেবল ঘুরিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে যা দেখলাম তাতে আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার দশা। এক লহমায় বুঝে গেলাম খাদের একেবারে কিনারায় এসে আমি দাঁড়িয়েছি। আর দু ইঞ্চি পিছোলেই আমারও ঐ নুড়ি পাথরেরই দশা হবে। সেই মুহূর্তে আমি এমন একখানা লাফ দিলাম যা মাও-সে-তুঙের সংস্কার স্পৃহার লাফকেও হার মানায়। আজও আমি ভেবে অবাক হই যে, কুলির দল যখন দিনের কাজ শেষ হলে খবর জানতে পারত যে, আমাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—তখন তাদের কাছে আমার রহস্যজনক অন্তর্ধানের কী অর্থ দাঁড়াত! কেননা ঐ পাহাড়ি খাদে উদ্দাম নদীগর্ভে এক অদৃশ্য হয়ে যাওয়া পক্ষিতাত্ত্বিকের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া খুবই দুর্ঘট হত।

ছেলেবেলায় ক্লাসে বসে ক্ষেত্রমিতির অখাদ্য সব অঙ্ক কষার চেয়ে আমি ঢের বেশি ভালবাসতাম মনোরম পরিবেশে মনের সুখে পাখির পেছনে ছুটতে। তারপর এই অর্ধশত বছরেরও বেশিদিন ধরে আমি সমানে পাখি দেখে বেড়িয়েছি। তাতে আমার মনপ্রাণ ভরে গেছে। যেখানে আনন্দে ভরে ওঠে প্রত্যেকটি দৃষ্টিকোণ—পাহাড়ের উচ্চতায় কিংবা অরণ্যের গহনে হোক—অস্থিতপঞ্চক সভ্যতার দ্রুতবেগের এই যান্ত্রিক যুগের কোলাহলময় ডামাডোল থেকে আমার মুক্তির রাস্তা হল পাখি দেখা। হতে পারে পলায়নবৃত্তি—কিন্তু তার জন্যে কাউকে কৈফিয়ত দেবার কিছু নেই।

□

ভরত বাক্য

'নিজের প্রশংসা নিজে করার একটা সুবিধে এই যে, তাতে যথোচিত রং চড়ানো যায় এবং ঠিক যে যে জায়গায় দরকার'—বলেছিলেন স্যামুয়েল বাটলার। আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে এই জ্ঞানগর্ভ রচনাটি সবসময় মনে রাখার চেষ্টা করেছি। যাতে এমনকী উপযুক্ত জায়গাতেও বাড়াবাড়ি রকমের রং চড়িয়ে না ফেলি। কতটা পেরেছি জানি না। আমার যা পত্রালাপ, তার বেশির ভাগই মাঠেঘাটে বসে হাতে লেখা। খুব কম ক্ষেত্রেই তার নকল রাখা হয়েছিল। সুতরাং চিঠির কথা বলতে গিয়ে আমাকে বাধ্য হয়ে অনেকটা স্মৃতির ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। অনেক দিনের পুরনো কিছু চিঠি থেকে গিয়েছিল; জীর্ণপ্রায় ফিল্ড নোটবুকে আর স্পেসিমেন রেজিস্টারে কিছু ছিল আধাখেঁচড়াভাবে সাঁটে লেখা। তার অংশবিশেষ এ বইতে প্রক্ষিপ্তভাবে ব্যবহার করে পুরনো স্মৃতি খুঁচিয়ে তুলেছি। আমি নিজে নিয়মিতভাবে কোনো ডায়রি রাখতে পারিনি। বিভিন্ন অভিযানে যাঁরা আমার সঙ্গী হন, তাঁরা ছিলেন আমার চেয়ে বেশি পরিশ্রমী। যেখানেই পেরেছি, তাঁদের ডায়রি থেকে বেছে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছি। এইসবই হয়েছে এ বইয়ের মূলাধার। তবে বহু চিত্তাকর্ষক এবং উল্লেখযোগ্য ঘটনা, অভিজ্ঞতা আর ব্যক্তিপুরুষের কথা নিঃসন্দেহে আমি বলে উঠতে পারিনি। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে বোদ্ধা প্রশ্নকারীরা আমার 'বৃত্তি[illegible]নের অন্যান্য দিক সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করেছেন। যা আমার প্রকৃতিবিজ্ঞানের সীমানার বাইরের বস্তু। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আমার কী দৃষ্টিভঙ্গী, কিসে আমার আগ্রহ আর শখ, নানা জাগতিক ব্যাপারে আমার কী মতামত এবং কী আমার আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনা আর বিশ্বাসপ্রত্যয়। আধিভৌতিকের প্রায় বাইরে গিয়ে যেসব প্রশ্ন করা হয়েছে, তার কতকাংশের উত্তর দিতে গিয়ে আমি যা বলেছি, সেটাকেই আমার ধর্মবিধি বলে ধরে নিতে হবে।

প্রশ্ন ঃ আপনি যদি ইংরিজিভাষী না হতেন, তাহলে বিজ্ঞান আজ যে সেলিম আলিকে জানে তা আপনি হতে পারতেন না। এটা বলা হয়ে থাকে যে, ইংরিজি না থাকলে ভারতবর্ষ হত 'একটি অনাব্য সমুদ্রে পরস্পরবিচ্ছিন্ন জাতির দ্বীপপুঞ্জের মতো।' ভারতের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে, যদি ইংরিজিকে যোগাযোগের ভাষা হিসেবে পোষণ করা যায়—এই মত আপনি কি সমর্থন করেন? যদি সময় দিয়ে পরিকল্পিতভাবে

এগোনো যায়, তাহলে কি ইংরিজি সারা ভারতকে একসূত্রে বেঁধে একাধারে আঞ্চলিক অসন্তোষ কাটানো এবং আধুনিক চিন্তা আর প্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার সুরাহা করতে পারবে?

উত্তর ঃ জাতীয় আর আন্তর্জাতিক ভাবে আমরা আজ যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই যে, আধুনিক ধ্যানধারণা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ইত্যাদির সঙ্গে তাল রেখে চলার জন্যে যোগাযোগের ভাষা হিসেবে ইংরিজি শুধু কাম্য নয়—ইংরিজি হল অপরিহার্য। তার মানে এ নয় যে, স্থানীয় বিভিন্ন ভাষাকে একই সঙ্গে যথাসম্ভব উৎসাহ দেওয়া হবে না। হিন্দিকেও তুলে ধরতে হবে। গান্ধীজী চেয়েছিলেন হিন্দিকে সাধারণের যোগাযোগের ভাষা করতে। সেটা বরাবরই ছিল। তার জন্যে আলাদা করে চেষ্টা করতে হয়নি। তবে সেই হিন্দি হল সরল কথ্য হিন্দুস্তানি। বাস্তবিকপক্ষে আমি মনে করি, ব্রিটিশ চলে গিয়ে তার যে উত্তরাধিকার রেখে গেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে দামী আর লাভের জিনিস হল ইংরিজি। প্রধানত তারই জোরে দেশকে আমরা একসূত্রে বাঁধতে পেরেছি, জাতীয় সংহতিকে যুগ দিতে পেরেছি এবং জগৎসভায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছি। আমার কাছে অবাক লাগে, যখন দেখি আপাত চক্ষে যে নেতাদের আমরা মান্যগণ্য করি, যাঁদের বুদ্ধিমান বিচক্ষণ বলে মনে করি, এমনকী তাঁরাও চোখে ঠুলি পরে বসে আছেন, নাকের নীচেও তাঁদের নজর যায় না। আমরা অধম মানুষেরা' যেটা বিলক্ষণ স্পষ্ট দেখতে পাই, বড়ো দরের মানুষ হয়েও তাঁরা তা দেখতে পান না—তাজ্জব ব্যাপার।

প্রঃ ধর্মের আওতার মধ্যে কি আপনি মানুষ হয়েছেন? আজকের জীবনে এখনও তার টান অনুভব করেন? আপনার ওপর সুফী মতবাদের কি কোনো প্রভাব পড়েছে?

উঃ ছোটবেলায় মুসলিম পরিবারভুক্ত সে সময়কার সব ছেলেমেয়েদের মতোই খুব কম বয়সেই পাখি পড়ানোর মতো করে কোরান পাঠ আর আবৃত্তি করতে শেখানো হয়েছিল। যে আরবি ভাষায় কোরান লেখা হয়েছিল, তার একবর্ণও আমরা জানতাম না। হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা (নজাম পড়া) করার ব্যাপারেও আমাদের তালিম দেওয়া হয়েছিল। সখেদে স্বীকার করছি, এসব কিছুই আমার মধ্যে আধাত্যভাব জাগিয়ে তুলতে পারেনি। বরং ফল হয়েছিল উল্টো। পরে নমো নমো করে নমাজ পড়ার আর ধারেকাছে যাইনি। গোটা ব্যাপারটাই অর্থহীন, এমনকী বুজরুকি বলে মনে হয়েছে।

প্রঃ আপনি অ-মানবিক জীবকূলের একটি প্রজাতি পাখি—সেই বিষয়ে কাজ করেছেন। এটা করতে গিয়ে বাকি প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে প্রভেদ—তাকে কি আপনি অস্বীকার করেছেন? নাকি আপনি মনে করেন বাকি প্রকৃতি থেকে মানুষ ভিন্ন জীব। সে তার ক্ষুধা, বংশবৃদ্ধি আর আত্মসংরক্ষণের বাইরে সহজাত প্রবৃত্তির পরিপূরণ করে?

উঃ আমি এটা না বলে পারছি না যে, আমি একেবারেই এক আকাট লোক। অতীন্দ্রিয়ে বা গূঢ়বিদ্যায় আমার আদৌ বিশ্বাস নেই। সুতরাং, আমি দৃঢ়ভাবে এটা বিশ্বাস করি যে অন্যান্য জীবও যা, মানুষও তাই। অন্যান্য প্রাণীদের মতোই মানুষেরও আছে মৌল সহজাত প্রবৃত্তি, আবেগ আর আচার-আচরণের ছাঁচ। শুধু এক ক্রমোন্নত বিবর্তনের ধারায় মানুষ হয়েছে মস্তিষ্কের অধিকারী। তার জোরে সে চিন্তা করতে এবং যৌক্তিকতার সঙ্গে কর্ম নির্বাহ করতে পারে। তাই সে, যেন ঐশী অধিকার খাটিয়ে, হীনতর প্রাণীদের চেয়ে নিজেকে সমুন্নত জীব বলে অনুচিত দাবি করে বসতে পারে। সে দাবি মোটেই সংশয়াতীত নয়। 'এপ্ সুপার এপ্' নামের একটি অসাধারণ উচ্চাঙ্গের চলচ্চিত্রে চোখের সামনে এই সত্য তুলে ধরা হয়েছে যে, মানুষের আবেগ, প্রবৃত্তি আর আচরণ অন্যান্য নিম্নস্তরের প্রাণীদের চেয়ে মূলগতভাবে আলাদা নয়। খতিয়ে দেখলে ধরা পড়বে—মানুষের ক্ষেত্রে এই স্বভাবধর্ম একটু শুধু মার্জিত, এই যা। যেখানে দার্শনিক প্রশ্ন জড়িত, সেখানে বুক ঠুকে কিছু বলার আমার এলেম নেই। তবে আমি মনে করি, পর্বতের চূড়ায় বসে নাভিকণ্ডুয়ন বা পরলোক-চর্চার মতন অকাজ আর হয় না। এসব বিশ্বাস অবিশ্বাস করার পেছনে যুক্তির কোনো ভিত্তি নেই। তাই ও নিয়ে মুখব্যাথা করার কোনোই মানে হয় না। এ বিষয়ে খাঁটি কথা বলেছেন দার্শনিকপ্রবর স্যান্টায়ানা : 'মাঝের অবকাশটুকু উপভোগ করা ছাড়া জন্ম বা মৃত্যুর কোনো চারা নেই। জীবনধারণের সুযোগ আমরা মাত্র একবারই পাই। তখন চালকের আসনে বসে আমরা সচেতন হয়ে নিজেদের সমূহ কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। আমাদের (অন্তত আমার) মতে, সেই শক্তির ঘোরতর অপব্যবহার করে, যার কোনো সন্তোষজনক ভিত্তি নেই, তেমন জিনিস নিয়ে যদি কেবল আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ি আর শূন্যে সৌধ নির্মাণ করি, তাহলে সেটা হবে জীবনের সম্ভাবনাকে জলাঞ্জলি দেওয়া। আমাকে হয়তো কেউ কেউ কতকটা কাঠগোড়ার বস্তুবাদী বলতে পারে, তাই বলে আমি যে দুষ্টপ্রকৃতির মানুষ, সেটা ধরে নিলে ভুল হবে। আমার চারপাশে ধরাছোঁয়া যায় এমন যেসব সাক্ষ্যপ্রমাণ রয়েছে, তা থেকে স্বচ্ছন্দে ধরে নিতে পারি যে, প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নীচু স্তর থেকে পরিবর্তিত হয়ে মানুষের ক্রমবিকাশ ঘটেছে। পরেকার বহু আবিষ্কারের ভেতর দিয়ে সেই তত্ত্ব আরও পরিমার্জিত রূপ পেয়েছে। মানুষ আদতে সুপার এপ্ ছাড়া কিছু নয়।

প্রঃ আপনি কি এটা মানবেন না যে, মানুষের মধ্যে একটা বস্তুবহির্ভূত এমন কোনো উপাদান আছে, যা তাকে অন্য প্রাণীদের থেকে আলাদা করে দেয়। মানুষের সৌন্দর্যবোধ আর নৈতিক গুণাবলীকে কোথায় ঠাঁই দেবেন? আপনি কি বলবেন যে, ক্রমবিকশিত হয়ে মানুষের উন্নত মস্তিষ্ক দেখা দিয়েছে, এসব নিছক সেই মস্তিষ্কপ্রসূত?

উঃ দর্শন জিনিসটা আমার ঠিক ধাতে নেই। মানুষের নান্দনিক বা নৈতিক ধরনের উন্নততর গুণগরিমা মানুষের মস্তিষ্কে ঠাঁই নেয় কিনা—সত্যি বলতে কী, এ

নিয়ে কখনই আমি ভেবে দেখিনি। সমস্ত উপলব্ধির আর ইন্দ্রিয়ানুভূতির মূলকেন্দ্র যে মস্তিষ্ক; আমাদের যা কিছু গুণগরিমা শেষাবধি মস্তিষ্কেই ঠাঁই পায়, তারই ছাঁচে গড়ে ওঠে। মনেপ্রাণে তা বিশ্বাস করেও আমি বলতে চাই—এটাই একমাত্র চালিকাশক্তি নয়। আমার মনে হয়, বিবেক (বা গান্ধীজী যাকে বলতেন 'অন্তর্বাণী') সেই গোছের কোনো কিছু নিশ্চয় আছে—তার উৎস যে কোথায়, তার সন্ধান করা বা যুক্তি দিয়ে তার ব্যাখ্যা করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হবে। জানি না একথা বললে খুব ভুল বলা হবে কিনা যে, জীবজানোয়ারদের মধ্যেও এমনতর নান্দনিক আর নৈতিকবোধ আছে। যতক্ষণ না সেটা মানুষের চোখের সামনে প্রকট হয়, ততক্ষণ বাইরে থেকে দেখে সেটা মালুম হয় না। যেমন নয়নাভিরাম বাসা-বোনা অস্ট্রেলিয়া অঞ্চলের বাওয়ার পাখি। এই প্রজাতির পুরুষ পাখিরা আগে জায়গাটাকে ঝেঁটিয়ে সাফ করে নেয়। সেখানে ডালপালার টুকরো-টাকরা দিয়ে বাসা বোনে; বাসা তৈরি হয়ে গেলে তার ভেতরটা বেছে বেছে উজ্জ্বলবর্ণের জিনিসপত্র এনে সাজায়। রীতিমতো মাথা খেলিয়ে এটা তারা করে। যেখানে ঘর বাঁধে, অনেক সমস্ত মাল-মশলা আনতে সেখান থেকে তাদের রীতিমতো দূরের জায়গায় পাড়ি দিতে হয়। এসব তারা করে মেয়েদের মন পাওয়ার জন্যে। কিংবা, যেমন আমাদের কণ্ঠমালা বাবুই। (পুরুষদের) বাসা বোনার কাজ যখন আধাআধি এগিয়েছে, সেই সময় মেয়ে-বাবুইরা ভিড় করে দেখতে আসে কোন বাসাটা ভালো। যখন এই প্রতিযোগিতার ধুম পড়ে, একদলা কাদামাটি এনে পুরুষ-বাবুইরা উজ্জ্বল রঙের পাঁপড়ি এনে তাতে গুঁজে দেয়। এটা তারা করে ভাবী বধূদের সৌন্দর্যবোধের খাতিরে। যাতে তাকে বাসা দেখিয়ে পটানো যায়।

প্রঃ ভেবে দেখুন, নেহরুর এই কথাগুলো : 'স্বাধীন ইচ্ছা আর নিয়তিবাদ—এই দুইয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত কোনো বিরোধ নেই। জীবনের এটাই দ্বৈত রূপ। তার খেলার মতনই জীবন। তোমাকে যখন তাস দেওয়া হচ্ছে, তাতে তোমার কোনো হাত থাকছে না। এই হাত পাওয়াটাই হল নিয়তিবাদ। পাওয়া তাস যেভাবে তুমি খেলবে, সেটাই হল স্বাধীন ইচ্ছা। 'তাস হাতে পাওয়া'র ধারণাটা কিন্তু আপনি বাতিল করে দিতে চান?

উঃ অবশ্য এই 'তাস দেওয়া'র ব্যাপার কিছুটা আমার বোধের বাইরে থেকে যাচ্ছে। তবে আমি বিশ্বাস করি, জনে জনে আমরা যে হাতটা পাচ্ছি, সেটা আমরা পাচ্ছি পূর্বপুরুষদের জিন্-এর সুবাদে। যত দূর মনে হয়, তার ওপর আমাদের কোনো হাত নেই। বুঝতে সুবিধে হয় বলে আমরা তার নাম দিয়েছি নিয়তি বা কিস্মত। স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী হওয়ায়, সেইসঙ্গে আমি এও বিশ্বাস করি যে, মানুষ কতকাংশে এই নিয়তিকে বাগে আনতে পারে। কতকাংশ বলতে বেশ অনেকটাই। (তাস খেলায় হাত পাওয়ার ঐ উপমা অনুসরণ করেই) অন্য কথায় এও বলা যায় যে, খেলতে হবে এমনভাবে যাতে ফলাফলে ইতরবিশেষ হয়।

এক সময়ে এই ধরনেরই প্রশ্ন করেছিলাম আমার সমমনোভাবাপন্ন বন্ধু সাহেবজাদা মাহ্‌মুদ-উজ্‌-জাফর খান-কে। তার উত্তরে মাহ্‌মুদ চুম্বকাকারে যা বলেছিল, সেটা আমারও মনের কথা। ও বলেছিল :

> ইন্দ্রিয়পরায়ণতা বা বৈরাগ্যসাধন—দুইয়ের কোনোটাই জীবন নয়। জীবন জিনিসটা বহুবর্ণময় আর সতত বিলীয়মান। জীবনের রস পেতে গেলে আস্বাদনের উপযুক্ত ক্ষমতা থাকা চাই। সাধারণ বুদ্ধি দিয়েই এটা বোঝা যায়। সুতরাং ধর্ম বা দর্শন—এর একটাও কোনো কাজ আসে না এবং তার প্রয়োজনও হয় না। এই বৈপরীত্য সত্ত্বেও এরা দিব্যি টিঁকে থাকে। জীবনেরও স্ববিরোধ এই কারণে।

আমাকে প্রায়শ আরও একটি প্রশ্নের মোকাবিলা করতে হয়েছে। একদিকে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ নিয়ে আমি গলা ফাটাই, আবার সেই একই সুরে শখ হিসেবে পশুপাখি শিকারের পক্ষে বলি। এভাবে একমুখে দুকথা বলি কী করে। যারা জীবনে কখনও শখ করে শিকারে যায়নি, তাদের কাছে স্ববিরোধ বসে মনে হওয়া স্বাভাবিক। আমার সময়কালে আমার ছিল শিকারের তীব্র নেশা। আগেই এক জায়গায় আমি তা কবুল করেছি। শিকার আমি ছেড়েছি কোনো খেদবশত নয়। তার কারণটা ছিল একেবারেই ব্যবহারিক। সে সময়ে সারা দেশেই বন্যপ্রাণীর সংখ্যা ভয়াবহভাবে কমে আসছিল। অনেক প্রজাতিকেই তখন প্রায় বিলুপ্তির পথে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। একদিকে শখ করে শিকার আর অন্যদিকে কয়েক কেজি মাংসের জন্যে যেকোন প্রকারে জীবহত্যা—এ দুইয়ের মধ্যে তফাত করা দরকার। শখের শিকারে খুব নিষ্ঠার সঙ্গে কয়েকটি প্রথাগত নিয়ম পালন করা হয়। মরশুমের বাইরে গিয়ে ইচ্ছেমতো শিকার করা যাবে না (কেননা তখন হল পশুপাখিদের বংশবৃদ্ধি করার সময়)। নির্দিষ্ট শিকারের থলি ভারী করা যাবে না। স্ত্রী পশুপাখি আর তাদের বাচ্চাদের ছাড় দিতে হবে। রাত্রে চোখ-ধাঁধানো আলো ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। খানাখন্দে জল খেতে আসা প্রাণীদের মারা যাবে না। এই রকমের আরও সব নিয়ম আছে। পেশাদার চোরাশিকারির দল এসব কোনো নিয়মেরই ধার ধারে না। এদেরই কার্যকলাপের দরুন আজ বন্যপ্রাণীর এই মরণদশা। অভয়ারণ্য বা জাতীয় উদ্যান (এসব জায়গার জন্যে বিশেষ রক্ষীদল আছে বা থাকা উচিত) বাদে অন্যান্য জঙ্গলে একজন আইনসঙ্গত শিকারী হাজির থাকলে সেটাই হবে চোরাশিকারীদের কাছে বড়ো প্রতিবন্ধক। এ বিষয়ে আজ দুনিয়ার সবাই একমত। শিকার বিলকুল নিষিদ্ধ করে দেওয়াটা এ রোগের ওষুধ নয়। চোরাশিকারী যখন জেনে যায় যে, দুষ্কর্ম করতে গিয়ে কোন বৈধ শিকারীর ছায়া মাড়াতে হবে না, তখন তার সামনে খোলা মাঠ। যত খুশি পশু মারতে পারে। গত দশ বছরে ব্যাঘ্র-প্রকল্পগুলোতে দেখা গেছে যে, যদি বনের পরিবেশ-ব্যবস্থা সর্বসাকুল্যে রক্ষা করা যায়, তাতে লাভ শুধু বাঘেরই নয়—গোটা বসতিরই তাতে মঙ্গল হয়। হরিণ আর শুয়োর মেরে বাঘ তার খাদ্য জুটিয়ে নিতে পারে এবং সেই অনুপাতে

নিজেদের সংখ্যাবৃদ্ধি করে প্রকৃতিতে ভারসাম্য আনতে পারবে। যেসব অঞ্চলে বাঘসিংহ জাতীয় হিংস্র বড়ো মাপের নিয়ন্ত্রক জানোয়ার নেই, সেখানে ক্ষুরঅলা প্রাণীর সংখ্যা এত বেড়ে যেতে পারে যে, দেখা যাবে সে এলাকার পক্ষে অত বেশি খাদ্য যোগানো সম্ভব হচ্ছে না। ধরেবেঁধে যদি না তাদের সংখ্যা কমানো যায়, (সেক্ষেত্রে শিকার করাতেই বা দোষ কী?)—তাহলে বাড়তি প্রাণীরা স্বাভাবিকভাবেই হয় অপুষ্টিতে নয় রোগব্যাধিতে মরবে। উড়নচণ্ডে হয়ে এইভাবে আমরা প্রোটিনসমৃদ্ধ এমন একটা সুখাদ্য খুইয়ে ফেলব, যা একটা গেলে আরেকটা হয়। সংরক্ষণ জিনিসটা আমার কাছে সম্পূর্ণ দুনিয়াদারির ব্যাপার। তার অর্থ, এর পেছনে রয়েছে একান্তভাবে বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক, নান্দনিক, বিনোদনমূলক এবং অর্থনৈতিক কারণ। তার সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির ছিটেছাঁটাও সম্পর্ক নেই। আজকাল সংরক্ষণ বিষয়ে অহিংসার দোহাই দিয়ে ছোটদের যেভাবে তালিম দেওয়া হয়, সেটাকে আমি একেবারেই দুর্ভাগ্যজনক আর অযথা বলে মনে করি। এটা অনেকটা গোমাংস নিষিদ্ধ করতে মা-ভগবতীকে টেনে আনা। লগ্নী পুঁজির সুদ থেকেই সব উশুল হয়ে যাবে—আসলে হাত দিতে হবে না। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ব্যাপারটাকে এই দৃষ্টিতেই দেখে থাকি। আমার বিশ্বাস, যারা আমাদের পরে আসবে তারাও এ থেকে আমার মতোই বিলক্ষণ মজা পাবে।

□

পরিশিষ্ট : এক

কীভাবে পক্ষিসমীক্ষা চালাতে হবে

হিউ হুইসলার ১৯৩১ সালে যা বাতলেছিলেন

ইদানিং এমন কিছু সমীক্ষা চালানো হয়েছে, বিশেষ করে মার্কিন আর জার্মানরা, যে পদ্ধতিতে করেছে, তার নমুনা দেখে—সমীক্ষা কীভাবে করতে নেই—সেটা আমাদের বিলক্ষণ মালুম হয়েছে। ওরা কোনো অঞ্চলে একজন সংগ্রাহক পাঠিয়ে দেয়। ওদের উদ্দেশ্য থাকে দুটো—একদিকে যত পারে নতুন পাখি তাড়ানো, অন্যদিকে বিনিময় করার মতলবে একই পাখির গুচ্ছের অনুরূপ নমুনা জুটিয়ে আনা। যারা সোজাসাপ্টাভাবে জানতে চায় অথবা জীবতত্ত্বে যারা আগ্রহী, তাদের সেইমতো তথ্য যোগানোর ব্যাপারে ওদের কোনোই গা নেই। বলতে গেলে কিছুই ওরা আমাদের শেখায় না। ওদের প্রতিবেদনে চর্মবিষয়ক টিকাভাষ্য ছাড়া বিশেষ আর কিছুই থাকে না। ফলে, ওরা প্রধানত নিজেদেরই নষ্ট করে। আমার ইচ্ছে, তোমার কাজটা যেন ব্যাপক এবং ব্যবহারিক হয়। তোমার বিশেষ ঝোঁকও যে তাই, সেটা আমি জানি। তুমি হলে জীবতত্ত্বের লোক—নেহাত পায়রার খোপের কাঠখোট্টা বান্দা তো নও। কাজেই আমার ধারণা, এ বিষয়ে আমার সঙ্গে তোমার মতে মিলবে।

প্রথম কথা, আমরা চাই সত্যিকার নিদর্শন (১) রাজ্যের অন্তর্গত রকম রকম পাখি যাতে সনাক্ত করা যায় (২) তোমার ফিল্ড-নোটে যেন তার সায় থাকে (৩) যাতে অন্যান্য অঞ্চলের নির্দশনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে লিপিবদ্ধ করা যায় (৪) যাতে পালক আর উকুনেপোকা সংক্রান্ত জ্ঞানচর্চায় সহায়ক হয়। তোমার সঙ্গে চর্মতত্ত্ববিদ হেনরিক্স্ থাকায় কায়িক দাস্যবৃত্তি থেকে বাঁচবে। চামড়া তৈরির পেছনে মিছিমিছি তোমাকে সময় নষ্ট করতে হবে না। আমি নিজে যখন সফরে বেরোই, চর্মসংরক্ষণের কাজ করতে গিয়ে ফালতু সময় চলে যায়। তার চেয়ে ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবার সময় পাই না। সেদিক থেকে তুমি ঝাড়াহাতপা হতে পারবে।

সকালে ক্যাম্পের আশপাশে আধ ঘণ্টা ঘুরলেই সাধারণ পাখির সিরিজের জন্যে হেনরিক্স্‌কে যথেষ্ট কাজ যুগিয়ে দিতে পারবে। বন্দুক চালাতে পারে, এমন যে কেউ আধ ডজন পাখি মেরে তাকে কাজে বসিয়ে দিতে পারবে। যতক্ষণ না আরও দামী

কাজ হতে থাকে। তখন হাতে অনেক সময় পেয়ে চারপাশে ঘুরে দেখে নিতে পারবে কোনো প্রজাতি তোমার নজর এড়িয়ে গেছে কিনা। লাদাখে সাতসকালে বেরিয়ে পড়ে দুপুর নাগাদ ঘরে ফিরতাম। সন্ধ্যের ঝোঁকেও কিছুটা ঘুরে আসতাম। অধস্তন কেউ যদি ক্যাম্পের খিদমতগারদের তদারক করে, তাহলে আর বাজে কাজে আমাকে সময় দিতে হয় না। জরুরি কাজগুলোতে আমি তখন মন দিতে পারি। তুমি যখন পাঁচ-মাইল চরকি দিয়ে বেড়াচ্ছ সেই সময়টাতে অনায়াসে ক্যাম্পের আশপাশে উড়ে বেড়ানো ছাতারে আর বুলবুল পাখিদের গেঁথে ফেলার সুযোগ পেতে।

ক্যাম্পে পৌঁছে একটা বড়ো ম্যাপ চেয়ে নিয়ে ভালো করে দেখে নেবে কাছাকাছি ভূখণ্ডের ধরনটা কেমন। বেশির ভাগ পাখিই অনুকূল ভূপ্রকৃতি বেছে যার যার বসতি গড়ে। বিশেষ করে, সেইসব পাখি, যাদের সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ বেশি। কাজেই তুমি যদি একই পুরনো জায়গায় বার বার চক্কর দাও, তাহলে তোমার আগ্রহের অর্ধেকটাই মাঠে মারা যাবে। ম্যাপে হয়তো দেখবে সেই জায়গার একদিকে শিলাময় একসারি অনুচ্চ পাহাড়। অন্য উন্মুক্ত প্রান্তরে বিশাল এক নদী, দু-মাইল তফাতে প্রকাণ্ড এক ঝিল। অন্যান্য জায়গা জুড়ে কোথাও সংরক্ষিত অরণ্য, কোথাও ফসলের ক্ষেত। প্রতি ভূখণ্ডেই বিশেষ বিশেষ প্রজাতির আস্তানা। সেই সঙ্গে থাকে তেমন সব পাখি, যারা সব ধরনের ভূপ্রকৃতিতেই নিজেদের স্বচ্ছন্দে খাপ খাওয়াতে পারে। কাজেই এটা প্রতিটি ক্যাম্প মোতাবেক সাবুদ করে নিতে হবে (১) ঐ গোটা এলাকাটিতে কোন্ কোন্ প্রজাতির বাড়বাড়ন্ত দেখা যায় (২) কোন্ কোন্ প্রজাতি ঐ এলাকার কেবল কয়েকটি অংশে বাস করে। প্রজাতি বিশেষে আলাদা আলাদা হয়ে থাকার জীবতাত্ত্বিক কারণগুলো প্রতিপন্ন করার কাজে তুমি হাত দিতে পারবে। যেমন, কাদাখোঁচাদের যে কেন ঝিলের ধারে পাওয়া যায় তা সবাই জানে। তেমনি খাদ্য, আবাস, বিশেষ অভিযোজন, প্রজননের সুবিধা—ইত্যাকার হরেক কারণে একেক প্রজাতি একেকটি ঠাঁই বেছে নেয়। সেখানকার বাসিন্দাদের নাড়িনক্ষত্র যতক্ষণ না তোমার আয়ত্তে আসছে, ততক্ষণ তোমাকে ঐ ভূখণ্ড নিয়ে সমানে চর্চা করে যেতে হবে। প্রাণহরণের মতোই এক্ষেত্রে সমান জরুরি হল পক্ষিনিরীক্ষণ আর সে বিষয়ে মাথা ঘামানো। এর পরের চিঠিতে আমার ইচ্ছে, একেকটি প্রজাতি ধরে ধরে দেখাব কার কোন্ কোন্ দিকে খেয়ালে রাখতে হবে। এ চিঠিতে আমি সবই স্পষ্টভাবে বললাম। ভূখণ্ড চর্চার বিষয়ে আমি কথা আর না বাড়িয়ে বাঘেরা পাখির একটা দৃষ্টান্ত দেখাব। তোমার ক্যাম্পের পাঁচ মাইল পরিধির মধ্যে হয়তো তুমি এলোমেলোভাবে ছড়ানো ৪ প্রকারের বাঘেরা দেখতে পাবে। এই এলোমেলো হয়ে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকার নিশ্চয়ই একটা কোনো ব্যাখ্যা থাকবে। এর চূড়ান্ত কারণ হয়তো খাদ্য। কিন্তু খাদ্যের আত্মপ্রকাশ ঘটবে তার বাইরেকার রূপে—একটি বাঘেরা হয়তো তুলো-ফলানো কৃষ্ণমৃত্তিকার গণ্ডিতে নিজেকে বেঁধে রাখে; অন্য একটি বাঘেরার

হয়তো প্রয়োজন শালগাছের তলার ফাঁকা মাঠ; তৃতীয়টি হয়তো জোড়াতাড়া দিয়ে থাকে; কোনো বাস্তুগত কারণে সংখ্যায় তারা একেবারেই নগণ্য এবং যথেষ্ট স্ত্রী-পুরুষ না থাকায় তারা সংখ্যায় কখনই বাড়ে না—সে অঞ্চল তারা আপন প্রজাতি দিয়ে ভরাতে পারে না। সুতরাং এইরকমের মার্কিনী মডেলের রিপোর্ট আমাদের কাম্য নয় :

মিরাফ্রা ক্যান্টিলান্‌স্‌	প্রভূত	৭৫টি নিদর্শন	ক্যাম্প এ বি সি ডি
মিরাফ্রা আসামিকা	অতি বিরল	১টি নিদর্শন	ক্যাম্প বি
আলাউদা আর্ভেন্সিস	অতি বিরল	২১টি নিদর্শন	ক্যাম্প এ আর বি

তাদের অপেক্ষাকৃত সংখ্যাধিক্য এবং কমবেশি হয়ে ছড়িয়ে থাকার কারণের কিছু হদিশ থাকবে, সেটাই আমরা চাই। পক্ষিতত্ত্বের গোড়ার কথা তো তাই। নিদর্শন আর সঠিক নামকরণ—এসব তো লক্ষ্যে পৌঁছুবার উপায় মাত্র।

আমি এটা অবশ্যই বুঝি যে, তোমার হাতে একই সঙ্গে এত কিছু করে ওঠার মতন সময় থাকবে না। আমরা চাই এসব নিয়ে তোমার কী চিন্তাভাবনা তা জানতে। তাতে যেমন সমস্যার জট ছাড়াতে সুবিধে হবে, তেমনি অন্যান্য এলাকার কর্মীদেরও চাগিয়ে তুলবে। তারা তখন তোমার মতামত সপ্রমাণ কিংবা অপ্রমাণ করতে এগোবে।

হরবখত নিজেকে প্রশ্ন করবে—'কেন?' কেন ওরা এভাবে জোড়াতালি দিয়ে বাস করে? ঐ পাখিটা পাশের সমতল চাষের জমিতে না থেকে কেন মজা নদীর শুকনো বালির চরে বাস করে? এরা জঙ্গলে না থেকে কেন রাস্তার ধার ঘেঁষে তরুবীথিতে আশ্রয় নেয়? ওদের বিশেষ রকম প্রকারভেদ হওয়ার কারণ কী? পোমাটোরহিনাস প্রজাতির পাবডোবা, দিসেমুরুস প্রজাতির ভিমরাজ, পিরহুলান্দা প্রজাতির মাঠচড়াই—একই পরিবারভুক্ত হয়েও কেন এরা আলাদারকমের দেখতে হয়? জরিপের কাজ এগোলে স্বভাবতই এইসব প্রশ্ন তোমার মাথায় ঘুরবে।

তোমার নোটবুক যেন তোমার বন্দুকের মতোই মূল্যবান হয়, সেদিকে খেয়াল রেখো। আমার মতে একাধিক নোটবুক রাখা ভালো। সিন্ধু সফরে হিউম ('স্ট্রে ফেদার্‌স্‌' ১ম খণ্ড) এবং পূর্ব তুর্কিস্তান সফরে গিয়ে ('স্ট্রে ফেদার্‌স্‌' ৪র্থ খণ্ড) বড়ো আকারের জাবদা খাতায় যে ধারায় রোজনামচা লিখতেন, সেই ধারায় তুমি ডায়রি লিখবে। তাতে কোন্‌ জায়গা, ভূপ্রকৃতি, প্রধানত কোন্‌ কোন্‌ প্রকারের পাখি দেখা গেছে, কী কী বৈশিষ্ট্য চোখে পড়েছে—নোটবইতে তার বর্ণনা থাকবে। সমীক্ষার কাজ চুকে গেলে সার্ভে-রিপোর্টের মুখবন্ধ হিসেবে ঐ লেখাগুলোই ঘষে-মেজে ব্যবহার করা যাবে।

এছাড়া আমি আরও একটা নোটবুক রাখি। আলাদাভাবে তাতে প্রজাতি বিষয়ক প্রসঙ্গ টোকা থাকে। কোন্‌ প্রজাতিকে কবে কোথায় দেখলাম, তাদের কী কী বিশেষত্ব—দৈনন্দিন লেখা হয়। নতুন কোনো প্রজাতি দেখলে একটা হেডিং দিয়ে আলাদা জায়গায় লিপিবদ্ধ করি। প্রতিদিন আনুপূর্বিক পড়ে নিই যা লেখা হয়েছে। এর ফলে,

সমস্তটাই মনে থাকে। কোথায় কোন্ পাখি থাকে, সেই ছবিটা স্পষ্টভাবে এতে ধরা পড়ে। পূর্বঘাট সফরে যখন একটি ক্যাম্পে গিয়ে লক্ষ্য করলাম সেখানে সাধারণ পাখি দেখা গেছে কি যায়নি, সে সম্বন্ধে কিছুই লিখে রাখা হয়নি, আমি খুব খাপ্পা হয়েছিলাম। কোনো ক্যাম্পে অনেক সময় পক্ষিচর্মের সংগ্রহ না থাকার অর্থ সম্ভবত এই যে, অন্য ক্যাম্পে তা আসলে যথেষ্ট পরিমাণে মজুত আছে। কিন্তু ঐ ক্যাম্পে দেখলাম খাতাপত্রে কোথাও তার উল্লেখ নাই। বিভিন্ন প্রজাতির হেডিঙের তলায় যে হিসেব দেওয়া থাকে, অবশ্যই তার হেরফের হয়। হয়তো সাতভেয়ের সারণিতে মে ২-৩১ হাইলা কান্দি ক্যাম্প, সর্বত্রই মামুলি এবং সাধারণ বাস, এইটুকু লিখেই খালাস। সে ক্ষেত্রে পরিযায়ী বা ইতস্তত অসমভাবে ছড়িয়ে থাকা পাখি হলে তাদের নিয়ে প্রতিদিনের সাতকাহন। পাঞ্জাবে বছরের পর বছর ধরে পরিযায়ী পাখিদের যাতায়াত পর্বে আমি তাদের হ্রাসবৃদ্ধির হিসেব রাখতাম।

ছোট একটা নোটবুক রাখতে হয় সংগৃহীত নিদর্শনের নরম অংশগুলো বর্ণনা করার জন্যে। লেবেলের ওপর যেন নরম অংশটির রঙের উল্লেখ না থাকে। যেমন যেমন নতুন প্রজাতি দেখবে সেইমতো নোটবইয়ের আলাদা আলাদা পৃষ্ঠায় সে বিষয়ে লিখে রাখবে। পয়লা নিদর্শনের নরম অংশের বিষয়ে লেখার সময় তার পাশে চামড়ার ক্রমিক নম্বর লিখতে যেন ভুল না হয়। প্রত্যেকটি নতুন নিদর্শন আর তালিকাভুক্ত সেই প্রজাতির সাদৃশ্য বা বিশাদৃশ্যগুলো মিলিয়ে দেখা হবে। এতে বর্ণনাপত্রে সামঞ্জস্য বজায় রাখার সুবিধে হয়। এরপর পক্ষিচর্মের ওপর কাজ করার পর্বে তুলনা করে দেখে নিতে পারব যে, লিঙ্গ বয়স আর ঋতুর তারতম্যের দরুন এই বৈষম্য ঘটছে কিনা। লেবেল ধরে ধরে প্রথানুযায়ী গতানুগতিক লেখার পেছনে বেশি সময় চলে যায়। অথচ তাতে লাভ হয় কম। একে নমুনাগুলো ভাগ হয়ে যায়; কোনোদিনই আর ফলাফলগুলো মিলিয়ে দেখে নেওয়া হয় না। ধরা যাক, দুটো লেবেলে রঙের ঘরে লেখার পার্থক্য দেখা যাচ্ছে—এর কারণ এমন হতে পারে যে, একই রং আলাদা দিনে দেখার জন্যেই এই পার্থক্য ঘটছে। এর অর্থ এটাই দাঁড়ায় যে, কবে কোন্ দিন কী নিদর্শন যোগাড় হল—চামড়া ছাড়ানোর আগেই সেটা পক্ষিচর্মের রেজিস্টারে ক্রমিক নম্বর দিয়ে লিখে রাখাই হবে তোমার প্রথম কাজ। প্রত্যেকটি পাখির ক্ষেত্রেই একটা করে ক্রমিক নম্বর বসাতে হবে। নরম অংশের বিবরণ যথাশীঘ্র লিখে ফেলতে হবে। যখন ক্ষেত্রসমীক্ষায় যাবে, তখন এই ছোট্ট রেজিস্টার তোমার ঝোলার মধ্যেই থাকবে। পাখির মুখের ভেতরকার রং খাতায় লিখে রাখা খুবই জরুরি। অনেক সময় এ কাজটাকে অবহেলা করা হয়। অথচ এ থেকে বিস্তর তথ্য নিরূপণ করা যায়।

আস্ত পাখি ওজন করবার ঝামেলায় যেয়ো না। অবশ্য আকারে বড়ো হলে, ওজন নেওয়ার আলাদা একটা মূল্য আছে।

তোমার লেবেল যেন নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করা থাকে : (১) অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কী অবস্থায় আছে। (২) মাথার খুলির কী অবস্থা। (৩) চর্বি। (৪) উকুনেপোকা।

নিদর্শন তৈরির দিক থেকে সঠিক লিঙ্গ নিরূপণ করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রতিটি নিদর্শনের লিঙ্গ নির্ধারণ করা একা হেনরিক্স্-এর পক্ষে সম্ভব হবে না। গুলি লাগার দাগ, তাপউত্তাপ, কচি বয়স, অনুপযুক্ত সময়—এরকম বহুবিধ কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে লিঙ্গনির্ণয় একেবারেই অসম্ভব হতে পারে। আমি যেটা চাই তা হল, যখন তুমি একটি পাখিকে পুরুষ বলে সাব্যস্ত করছ, তখন আমি ধরে নেব যে, শবচ্ছেদ করে সে ব্যাপারে তুমি পুরোপুরি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছ। পাখির পালক দেখে তার লিঙ্গ অনুমান করে নিও না। সেটা আমি করতে পারি। এও মনে রেখো যে, পালক দেখে লিঙ্গ নির্ণয় করতে গেলে কী পরিমাণ ভুল হতে পারে তুমি জানো না। শতবর্ষ যাবৎ লোকে লিঙ্গের প্রশ্নে অনুমানে আর বিচারে সমানে ভুল করে এসেছে। কেননা পালকের অনুক্রমণিকা তখনও আমাদের অজানা ছিল। অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো কী অবস্থায় পাওয়া গেছে, লেবেলে যেন তা বলে দেওয়া হয়। সম্ভবপর হলে অণ্ডকোষ বা জরায়ুর মাপ এঁকে দেখিয়ে দিও। যদি সংশয় থাকে, সেইমতো লিখবে—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বোঝা কঠিন, তবে আপাতদৃষ্টিতে। এই বিষয়টাতে তুমি যত বেশি গুরুত্ব দেবে, পরে যথাকালে পক্ষিচর্ম থেকে তত বেশি ফায়দা ওঠাতে পারবে। ডিমে তা দেবার ছাপছোপগুলো দাগিয়ে দেখিয়ে দিও। কোনো পাখিকে তার বাসার বাইরে গুলি করে মারা হলে, তার উল্লেখ করো—আমরা জানি না স্ত্রী না পুরুষ পাখি ডিমে তা দিচ্ছে।

এবার আসি মাথার খুলি প্রসঙ্গে। একজন পাকা মাথার চর্মসংরক্ষণবিদ মাথার খুলি দেখে বলে দিতে পারে যে, সেটা কচি-কাঁচার, না প্রাপ্তবয়স্কের। (তারও একটা নির্দিষ্ট মাত্রা আছে।) হাড়ের শক্ত-নরম ভাব বিচার করে তারা এটা বলে থাকে। কমবয়সীদের মাথার খুলি বেজায় নরম থাকে। তখনও সেটা তরুণাস্থির স্তর ছাড়ায়নি। হাড় পুরোপুরি পাকা হতে ৩/৪ মাস সময় লাগে। শিরদাঁড়া যেখানে মাথার খুলিতে সংযুক্ত হচ্ছে, সেখানকার হাড় আর চোখের পেছনকার হাড় সর্বাগ্রে শক্ত হতে শুরু করে। এই দুটি হাড় মাথার কল্লার ভেতর পরস্পরের অভিমুখী হয়। কৈশোরোত্তর পক্ষমোচনের পরেও মস্তিষ্কের একটা জায়গা তখনও অপরিণত থেকে যায়। দেখে মনে হবে, কেন্দ্রস্থলে যেন একটা জানলা ফোটানো হয়েছে। ক্রমশ সেই সেই জানলা ছোট হতে হতে শেষে মিলিয়ে যায়। চামড়ার ব্যাপারে যে এলেমদার, সে ঠিক হাড়ের শক্ত-নরম ভাব বুঝে ফেলে। প্রজননকাল আর নভেম্বরের (নভেম্বরের পরে হলে বেশি দেরি হয়ে যাবে) অন্তবর্তী সময়ে সংগৃহীত মাথার খুলিতে হাড়ের পরিপক্বতা বিষয়ে যদি বলা থাকে, তাহলে পালক নিয়ে চর্চা করার ভারি সুবিধে হয়। পালকের লক্ষণ যাই হোক, যদি হাড়ে এতটুকু কচি ভাব থাকে, তাহলে তখুনি বুঝে নিতে হবে যে, সে পাখি অপ্রাপ্তবয়স্ক।

খুব বেশি পরিমাণে চর্বি পেলে বুঝতে হবে, সেই পাখি প্রজননরত ছিল না। হয়তো দেশান্তরে চলে যাচ্ছিল। পক্ষমোচনের আভাস কিংবা অভাব দেখতে পেলে নোটে যেন তার উল্লেখ থাকে। বিশদ বর্ণনার প্রয়োজন নেই।

আমি চাই যে, পাখির খাদ্যের ওপর যেন তোমার বিশেষ নজর থাকে। দায়সারাভাবে চিরকেলে 'পোকামাকড়' বা 'বীজ' লেখা চলবে না। সেই বিশেষ প্রজাতিটি কোনো বিশেষ খাদ্যে আসক্ত কিনা—এটা জানলে কেন কোথায় থাকে সেটা মালুম করা যায়। বেশ কিছু টেস্টটিউব রেখে দিও, যাতে পাখির পাকস্থলী আর পেটের খাদ্যবস্তু হালকা স্পিরিটে ডুবিয়ে রেখে পরে শনাক্তকরণ করা যায়।

পাখির ছানাদের সংরক্ষণ করার দিক থেকেও এইসব ছোট টেস্টটিউব খুবই কাজের হবে। পাখির বাসা পেলে, সেখান থেকে প্রতি প্রজাতির একটি দুটি ছানা সংরক্ষণ করো, যাতে তাদের মিহি পালকের বিষয়ে চর্চা করা যায়। কিছু ছানা ডিম ফুটে বেরনোর সঙ্গে সঙ্গে বাসা ছেড়ে চলে যায়। এদের পালক খুব মিহি। কিছু ছানা আবার ডিম ফোটার পরেও কিছুকাল বাসায় থাকে। (যেমন, শিকারীপ্রকৃতির পাখি আর ডিম)। এদের গায়ের চামড়া অপেক্ষাকৃত ভালো হয়। পাখির বাচ্চাদের শনাক্ত করতে যেন ভুলে যেয়ো না।

এত সব হজরং বজরং দেখে তুমি হয়তো মনে মনে বলবে—এর মধ্যে আর নতুন কথা কী আছে। এসব নিয়মকানুনের খবর সকলেই রাখে। ১০টির মধ্যে আমি দেখেছি ৯টি সংগ্রহ অভিযানেই এই খুঁটিনাটি জিনিসগুলোকে একেবারেই আমল দেওয়া হয় না। ফলে, এসব অভিযান থেকে যতটা ফায়দা ওঠানো যেত, তা আর হয় না। আমার উপদেশগুলো যেন খেয়ালে রেখো। তাহলে আমরা হায়দ্রাবাদ রাজ্যের পক্ষিকুল সম্পর্কে এমন একটা প্রথম শ্রেণীর রিপোর্ট খাড়া করতে পারব, যার তাৎপর্য আঞ্চলিকতা ছাড়িয়ে সুদূরপ্রসারী হবে।

□

পরিশিষ্ট : দুই

টুকরো চিঠির থলি থেকে

কীটদষ্ট খণ্ডহার থেকে কিছু নষ্টোদ্ধার

(গ্রন্থকার ছাড়া চিঠির উদ্দিষ্ট যেখানে আর কেউ, শুধু সেখানেই প্রাপকের নামোল্লেখ করা হয়েছে। বন্ধনীযুক্ত মন্তব্যগুলি গ্রন্থকারের।)

১। **হিউ হুইসলার** : 'ব্যাট্‌ল্‌, ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮। শুনে ভালো লাগল, তুমি নাকি একজন পুরাতত্ত্ববিদ—আমিও তাই—সাসেক্স পুরাতত্ত্ব সমিতির আমি একজন কমিটি মেম্বর। আমার ঠাকুরদা ছিলেন এর সহ-সভাপতি। যাতে পাখিদের না ভুগতে হয়, তাই ওদিকটাতে আমাকে রাশ টানতে হচ্ছে।'

২। **রিচার্ড মেইনের্ৎস্‌হাগেন** : 'লণ্ডন, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮...তুমি আশা করছ যে, হিটলার আর মুসোলিনির মনস্কামনা পূর্ণ হবে—তার মানে কি যুদ্ধ? যদি তাই হয়, তবে তা পূরণ হতে খুব বেশি দেরি নেই। এমন পাগলামো আমি কম দেখেছি। এসব মনোবিকারের রুগিদের একমাত্র ওষুধ হল যুদ্ধ। জোরজুলুম ছাড়া এদের মাথায় কিছু ঢোকে না। এরপর ওদের সম্পূর্ণ অঙ্গচ্ছেদ করা ছাড়া উপায় থাকবে না। যাতে আর না ওরা মাথা তুলতে পারে। ক'বছর অন্তর অন্তর মারমার কাটকাট, কাঁহাতক আর সহ্য করা যায়? একশো বছরে একবার হয়, তো ঠিক আছে। দশ বছর পরে পরে হলে সে এক যাচ্ছেতাই ব্যাপার হয়। পক্ষিবিদ্যা আর আমার কাজকর্ম—সব লাটে ওঠে। এবার শরৎকালে স্ট্রেসেমান এসেছিল। মানুষটা ভালো, কিন্তু বেশি ব্যাজর ব্যাজর করে (হিটলার আর মুসোলিনির রাজনীতি নিয়ে।) ওর কপালে দুঃখ আছে। হিটলারকে ও পছন্দ করে না। কিন্তু তার বিকল্পও কিছু দেখাতে পারে না। বেচারা ইহুদিদের হয়েছে মরণদশা। সবাই তো যতটা পারে ওদের জন্যে করছে। কিন্তু জার্মান ইহুদিরা সত্যিই অতি অখাদ্য। দূর থেকে ভালবাসা যায়, দরদ দেখানো যায়, কিন্তু কাছাকাছি হয়েছ কি মরেছ। ওরা নিজেদের করে তুলেছে ইউরোপের অস্পৃশ্য। 'ওদের জন্যে লড়তে গেলে এখন আমাদের দরকার একজন বিলিতি গান্ধীর।' (১৯৫৪ সালে বাজ্‌ল্‌-এ আন্তর্জাতিক পক্ষিতাত্ত্বিক কংগ্রেসে গিয়ে আমার বন্ধু

খ্যাতনামা পক্ষিবিদ হার্বার্ট ফ্রিয়েডমানের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের হস্টেলে এক ঘরে ছিলাম। উনি নিজে ইহুদি। যুদ্ধের সময় জার্মান ইহুদিদের দুর্দশা নিয়ে একদিন কথা হচ্ছিল। সেই সময়ে উনি একটা মোক্ষম মন্তব্য করেছিলেন মনে আছে—'জার্মানির ইহুদিরা যদি সবাই আমেরিকার ইহুদিদেরই সমগোত্রের হয়ে থাকে, তাহলে বলব—আহা, বেচারা হিটলার'—ওঁর ঐ একটি কথা দিয়েই উনি অনেক কিছু বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।'

৩। **এরভিন স্ট্রেসেমান** : (মিউনিক তোষণনীতি আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগে যাওয়া—এর মাঝের পর্বে লণ্ডনে আমাদের দুজনেরই বন্ধুভাজন কর্নেল মেইনের্ৎস্‌হাগেনের কাছে থেকে আসার পর ফিরে এসে লেখেন) : 'বার্লিন, ১ জানুয়ারি ১৯৩৯। আজ একটি নতুন এবং খুব সম্ভব একটি দুর্বৎসরের প্রথম দিন। আজ রবিবার। পাঁচতলার ওপর আমাদের ছোট্ট ফ্ল্যাট। সামনের দিকে বরফঢাকা বাড়িগুলোর ওপর ঝিকমিক করছে রোদ। কবে সেই ১৯৩৮-এর বড়দিনে তহমিনা আর তোমার সুন্দর চিঠিতে বিশদ খবরাখবর পেয়েছিলাম। যে উত্তর সব সময় আজ-দেব কাল-দেব করে এতদিন কাটিয়ে দিয়েছি, সেটা আজেই শেষ করব বলে এই নির্ঝঞ্ঝাট দিনটাকে বেছে নিয়েছি। এ চিঠিটা হবে এক রকমের পেছনে দেখা। দুর্দান্ত কর্মময় দিন। কত সাধ, কত প্রাপ্তি আর কত যে আশাভঙ্গ। হায়, সব তো সবিস্তারে লেখা যাবে না। জানলে হয়তো শেখবার কিছু পেতে। তবে তুমি নিজেই যে ছবিটা আগেই তুলে ধরেছ (হিটলার, নাৎসি আর ইহুদিদের দ্যাখ্‌মার করার, তাতে মনে হয় না নতুন করে তোমার কিছু শেখার আছে।...রুয়েন-এর আন্তর্জাতিক সম্মেলন শেষ করে কর্নেল মেইনের্ৎস্‌হাগেনের আমন্ত্রণে আমার বোনকে (হেলমুট বায়ের-এর মা) নিয়ে কর্নেলের লণ্ডনের বাড়িতে ওঁর অতিথি হয়ে মহানন্দে এক পক্ষকাল কাটিয়ে এলাম। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে কিছু কাজ করলেও চমৎকার পরিবেশে তোফা আরামে কাটিয়েছি।...তুমি যদি ভারতের মরুভূমিগুলোতে যাও, ভূতলবাসী পাখিদের সঙ্গে সেখানকার মাটিও অবশ্যই সংগ্রহ করবে। মেইনের্ৎস্‌হাগেনের অনুসরণে তাহলে প্রমাণ করে দেখানো যাবে যে, ওরা (বিশেষত, ভরত পাখিরা) কীভাবে চারপাশের রঙের সঙ্গে নিজেদের রং মিলিয়ে নেয়। ড: নিয়েটহামারকে আমি এটা বলায় তাতে দ: প: আফ্রিকায় ভালো ফল হয়েছিল। সব সময় মাটিতে লাল, কালো ইত্যাদি রকমারি রং খুঁজবে। নীলনদ উপত্যকার ঝুঁটিভরতদের কথা ভাবো।...হুইসলারের মধ্যস্থতায় ত্রিবাঙ্কুর থেকে সাদরে গ্রহণযোগ্য যে একগুচ্ছ পাখি পাঠিয়েছ, যার মধ্যে আছে কিছু বিরল প্রজাতি—সে বাবদ এতদিন তোমাকে ধন্যবাদ জানানো হয়নি। এতে আমাদের ভারতীয় সংগ্রহ আরও সমৃদ্ধ হল। পাখিগুলো পেয়ে আমার কী আনন্দ হয়েছে বলার নয়। লেবেলগুলো সত্যিই দেখবার মতো!'

৪। **হিউ হুইসলার** : 'ব্যাট্‌ল্‌, ৬ এপ্রিল, ১৯৩৯। নিপাত যাক হিটলার। এ মাসের শেষে পূর্ব পোল্যাণ্ডে ফের যাবার ব্যবস্থা করেছিলাম। যুদ্ধ বেধে যাওয়ার ভয়ে ইংলণ্ড ছেড়ে যেতে এখন আর সাহস হচ্ছে না। কতইবা জীবনের মেয়াদ। ঐ হতচ্ছাড়া উন্মাদ সারা পৃথিবীকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছে নিজের বিশ্ববিজয়ী হওয়ার সাধ মেটাতে—ও চায় আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ন এবং আর যারা, তাদের সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে। এ কথা মনে না হয়ে পারে না যে, এই একটা ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হত্যায় সায় দেওয়া যেত! তাহলে একটা প্রাণের বিনিময়ে বাঁচত লক্ষ লক্ষ জীবন। ভাবছি, যদি এপ্রিলটা ভালোয় ভালোয় কাটে, তাহলে আপাতত ফসল কাটা পর্যন্ত ফাঁড়া হয়তো কাটল—এরপর মনে হয়, আমার আলজেরিয়া যাওয়াটায় ব্যাটা ঠিক বাদ সাধবে। কী হাল দুনিয়ার!'

৫। **হিউ হুইসলার** (১৯৩৯-এর ৯ জুলাই তহমিনা মারা গেছে এই খবর পেয়ে) : 'ব্যাট্‌ল্‌, ৩ আগস্ট ১৯৩৯। অনেক দিন চিঠি আসছে না দেখে মনে কেমন যেন কু গাইছিল। আর আজ তোমার ২৬ জুলাইয়ের মনখারাপকরা চিঠিতে পেলাম সেই মর্মান্তিক দুঃসংবাদ। আমি কী দুঃখ পেয়েছি বলার নয়। তোমার কথা ভেবে আরও মন খারাপ হচ্ছে। তোমার স্ত্রীকে অবশ্য কখনও দেখার আমার সৌভাগ্য হয়নি, কিন্তু তোমার দীর্ঘদিনের নিরবচ্ছিন্ন পত্রালাপে এটা বুঝতে ভুল হয়নি যে, তোমরা স্বামী-স্ত্রীতে পরস্পর কতটা অনুরক্ত। বুঝেছিলাম অনেক ভাগ্য করে তুমি অমন যোগ্য সহধর্মিনী পেয়েছিলে। তাই তুমি কতটা নিঃসঙ্গ ভগ্নহৃদয় বোধ করছ এবং এটা তোমার কাছে কত বড়ো বিধিবিড়ম্বনা, কিছুটা তা উপলব্ধি করতে পারি। হাজার বলেও আমি তোমার ব্যথার উপশম ঘটাতে পারব না। এ দুঃখ নিজেকেই সইয়ে নিয়ে মাথা তুলে উঠে দাঁড়াতে হবে। তহমিনাও সেটাই চাইত। নিজের লড়াই নিজে লড়তে গিয়ে একথা ভেবে কিছুটা সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করো যে, তোমার বন্ধুরাও তোমার ব্যথার বাথী। আমার গভীর শোক জেনো। আন্তরিক প্রীতিসহ—'

৬। **হিউ হুইসলার** : 'ব্যাট্‌ল্‌, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯। আমার নিজের মনে হচ্ছে যে, এ যুদ্ধ বেশিদিন নেবে না। আমি যদি এখানেই আটকা পড়ি আর তার মধ্যে কাজ করবার পার্সেলগুলো (সমীক্ষাসংক্রান্ত পক্ষিচর্ম) বরাতজোর এসে যায় তো বাঁচি। টেবিলের ওপর রাখা হয়েছে ভারতীয় পাখির পার্সেল—তাতে অপেক্ষা করে রয়েছে অজানা এক রোমাঞ্চ—সে যে কী দৃষ্টিসুখের শিহরণ তা তোমাকে কী বলব!

৭। **হিউ হুইসলার** : (মহীশূর সমীক্ষার প্রস্তুতিপর্বে) 'বাট্‌ল্‌, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯। মহীশূর রাজ্যে কী কী পাখি পাওয়া যায় তার তালিকা পাঠালাম। বিধিবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমার কী ইচ্ছে জানালাম। ফিল্ডনোট রাখার দিকে যেন বিশেষ

নজর থাকে—বেশির ভাগ প্রজাতির, এমনকী অতি আটপৌরে পাখিরও যৎকিঞ্চিৎ তথ্য আমাদের তৈরি নতুন হ্যাণ্ডবুকে দেখানো আছে। সাধারণভাবে আমি বেশি করে চাই যে, পূর্ব আর পশ্চিম ঘাটের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কোথায় কোন্ প্রজাতির বাস তার হদিশ পেতে। এ ছাড়াও, রাজ্যের আর্দ্র আর শুখা অঞ্চল চিহ্নিত করতে হবে। বেট্‌স্-এর নোটে এটা কত বেশি আঞ্চলিক তা দেখানো আছে।'

৮। **এস. এইচ. প্রেটারকে হিউ হুইসলার** : (মহীশূর সার্ভের বিষয়ে সোসাইটির কিউরেটার) 'ব্যাট্‌ল্, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০। এতদিনে আমরা যথাযথ স্থিতি বিন্যাস সম্পন্ন করার কাজে হাত দিতে পারলাম—এই যাবতীয় সমীক্ষার অনেকটাই হতে পেরেছে আপনার উৎসাহে আর 'তাড়না'য়! আপনার কাছে পক্ষিতাত্ত্বিকদের এর জন্যে কৃতজ্ঞ থাকা দরকার।

৯। **হিউ হুইসলার** : (মহীশূর সমীক্ষার সময়কার তৈরি পক্ষিচর্মের পাঠানো গুচ্ছ থেকে কিছুটা স্ট্রেসেমানের কাছে উপহারস্বরূপ পাঠাতে অনুরোধ করেছিলাম, সেই প্রসঙ্গে) 'ব্যাট্‌ল্, ২৬ এপ্রিল ১৯৪০। স্ট্রেসেমানের জন্যে ডজন খানেক আলাদা করে রাখা হয়েছিল, কিন্তু তাঁর কাছে পৌঁছে দেওয়া আদৌ সম্ভব নয়। কাগজে বেরিয়েছে ওয়ারস-র সংগ্রহালয় দফারফা করার খবর—এখন উনি সেই ধাক্কা সামলে উঠুন!'

১০। **হিউ হুইসলার** : (একপ্রস্থ রাজনৈতিক গলাবাজির জবাবে) 'ব্যাট্‌ল্, ২৯ অগাস্ট ১৯৪১। ঠিক বলতে এইটুকু। ভারতীয় আর ইংরেজ—দুইয়েরই দেখার ভঙ্গিতে ঠিক আর ভুল আছে। বিপরীত পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি একটু হৃদয়ঙ্গম করলে তাতে উভয়পক্ষেরই লাভ। আমি আর কথা বাড়াব না। ইংরেজের প্রতি তোমার যতই ঘৃণা আর বিদ্বেষ থাক, আশা করব ঘৃণিত জাতির একজন হলেও পক্ষিতাত্ত্বিক হি-হুর প্রতি তোমার বন্ধুভাব বজায় থাকবে। আমার দিক থেকে এটাই আমি অনুভব করি যে, আমার যে সেলিম আলি, সে একজন মস্ত পক্ষিতাত্ত্বিক—তার প্রতি আমার প্রীতিময় শ্রদ্ধা।'

১১। **হিউ হুইসলার** : (টিসেহার্স্টের মৃত্যুর পর) 'ব্যাট্‌ল্, ৫ অক্টোবর ১৯৪১। এটা দুঃখের যে, ওর আর তোমার সম্পর্কটা তেমন মধুর ছিল না। এখন আর তা নিয়ে আক্ষেপ করা বৃথা।...আমি মাটির সমস্ত নমুনা বার করে ভরতপাখিদের সঙ্গে যথাক্রমে মেলাতে গিয়ে দেখছি সবই ঠিক ঠিক খেটে যাচ্ছে। কোনো কোনো প্রজাতি—যেমন লুল্লুলা (কালো ভরত)—এদের গায়ের রং আর মাটির রঙের মিল অত স্পষ্ট নয়। অন্যদের ক্ষেত্রে—যেমন ক্যালাণ্ড্রেলা, অ্যামোমানেস, গ্যালেরিডা —এই দুইয়ের যোগ খুব স্পষ্ট। যেমন ধরো, গ্যালেরিডা ঠেক্‌লে (নীলনদ উপত্যকা ইত্যাদির)। আমি এখন সংগ্রহ করেছি মাটি সমেত ছ'

জাতের পাখি। পর্তুগালের কালোকোলো দেখতে পাখি থেকে সাহারার টুকটুকে লাল রঙের পাখি—প্রত্যেকটি জাতের গায়ের রঙের সঙ্গে মাটির রং নিখুঁতভাবে মিলে গেছে।'

১২। **ঈ. এইচ. এন. লোথার** : 'এলাহাবাদ, ২ অগাস্ট ১৯৪২ (ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গ্রহণ করার এক সপ্তাহ আগে) তোমার ৭ এপ্রিলের চিঠিতে মতামতের দিক থেকে তুমি প্রায় পুরোদস্তুর রাজনৈতিক! স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌-এর মিশন ব্যর্থ হওয়ায় আমি দুঃখ পেয়েছি। ভারতবর্ষকে আমি ভালবাসি, সেদেশে আমার প্রিয় বন্ধু অনেক। তবু আমি মনে করি, ইউরোপীয়দের সম্পর্কে গান্ধীর যা মনোভাব, তাতে এত বড়ো এক জটিল সমস্যার কখনই সমাধান হবে না। প্রথমত, হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করতেই হবে, ঘটাতে হবে শ্রেণীনির্বিশেষে সবার সঙ্গে ইউরোপীয়দের মিতালি। এটা হওয়াতে গেলে ভারতীয় আর ইউরোপীয়দের পারস্পরিক বিবাহ। অপেক্ষাকৃত সুস্থিত শ্রেণীগুলোর মধ্যে অবাধ অন্তর্বিবাহ। দুপক্ষেরই মনের মিল হওয়া দরকার। তার মানে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিতে এ প্রশ্নের মোকাবিলা করতে হবে। কিন্তু এটা জেনে রেখো, বর্ণবৈষম্যের দিন এবার শেষ—শান্তি ফিরে এলে ও-পাপ বিদায় নেবে। আর কেনই বা তা হবে না? একদল ইউরোপীয় এ-কথা ভাবার কে অধিকার দিল যে, মানুষ হিসেবে একজন ভারতীয়র চেয়ে তারা উৎকৃষ্ট? তা যে নয়, ভালো করেই সে জানে। এটা ভাবা তাকে ছাড়তে হবে যে, মিশ্র বিবাহের সন্তানেরা হল যত রাজ্যের 'অপোগণ্ড কালা জারজ'—যা সে এখন ভেবে থাকে।'

১৩। **মাননীয়া (মিসেস) জোন হুইসলার** : '৯ অগাস্ট ১৯৪৩ (৭ জুলাই ১৯৪৩-এ ক্যান্সারে হিউ হুইসলারের মৃত্যুতে আমার শোকবার্তা পেয়ে লেখা)। আপনাকে জানাই যে, হিউ আপনার সম্পর্কে এবং আপনার জ্ঞানের বিষয়ে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করত। আপনার বন্ধুত্বকে হিউও খুব মূল্য দিত। আপনার চিঠি পেয়ে ও কী খুশি হত বলার নয়। আপনার বই (দি বুক অব ইণ্ডিয়ান বার্ডস) পেয়ে এবং ভূমিকায় যেভাবে ওর কথা লিখেছিলেন তা পড়ে ওর খুব আনন্দ হয়েছিল। আমি জানি, আপনাদের দুজনের কারো মধ্যে কোনো প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব ছিল না—এমন কিছু ছিল না যাতে বন্ধুত্ব নষ্ট হয়। জানি বলেই আমি আপনার পরামর্শ চাইছি (১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হিউ-এর 'পপুলার হ্যাণ্ডবুক অব ইণ্ডিয়ান বার্ডস' বইটির পরিমার্জনের ব্যাপারে। এইচ. ডব্লু. ওয়েইটের সংগ্রহ সমেত হিউ-এর সংগ্রহের মোট প্রায় ২৬,০০০ পক্ষিচর্ম, সেইসঙ্গে পক্ষিবিষয়ক পুঙ্খানুপুঙ্খ নোট ব্রিটিশ মিউজিয়ামে প্রকৃতি বিজ্ঞান বিভাগে রক্ষিত আছে।)'

১৪। ১৯৬৮ সালে আমি যখন ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজে সাময়িকভাবে বোম্বাইয়ের বাইরে ছিলাম, সেইসময় লেনিনগ্রাডের জুওলজিকাল বন্ধুভাজন পক্ষিবিদ ইনস্টিটিউটের ড: এ. আই. ইভানভের কাছ থেকে আমাদের সোসাইটি 'আমার প্রিয় বন্ধু সেলিম আলির শোচনীয় মৃত্যুতে'—এই মর্মে একটি শোকবার্তা পায়। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক সিং (?) সেইসময় লেনিনগ্রাড গিয়েছিলেন, তাঁর মুখ থেকেই ইভানভ এই খবরটি পান। একজন যে কী অঢেল গুণের অধিকারী ছিল, তার অতিরঞ্জিত রূপ সে মারা গেলে তবেই তা ধরা পড়ে। আহা, কী ভালো মানুষ, কী অপূরণীয় ক্ষতি—বর্তমান থেকে অবর্তমানের এমন সব সদুক্তি শোনার সৌভাগ্য ক'জনের হয়? আমি হলাম সেই পয়মন্তদের একজন। মরে গিয়ে বাঁচার অভিজ্ঞতা আলাদা আলাদাভাবে হয়েছে দু' দুবার। বোম্বাইতে ফিরে এলে ড: ইভানভের চিঠিটা আমাকে দেখানো হয়। ভদ্রলোকের ভুল ভেঙে দিতে আমি এক মুহূর্ত দেরি করিনি।

(ক) **ড: ইভানভ** : 'লেনিনগ্রাড, ৯ জুলাই ১৯৬৮। আমার খবর একদম ভুল, এই মর্মে আপনার চিঠি পেয়ে আমার কী আনন্দ হল বলার নয়। রুশদেশে লোকের বিশ্বাস, কারো এমন হলে যতদূর সম্ভব সে দীর্ঘায়ু হয়। আমার বন্ধুরা এই সুখবর পেয়ে সবাই খুব খুশি।'

রুশ সুলক্ষণে ভর করে নিজেকে যখন আমি বাঁচিয়ে চলেছি, সেই প্রক্রিয়ায় ১৯৭৪ সালে আন্তর্জাতিক পক্ষিতাত্ত্বিক কংগ্রেস তার পক্ষিকুল সংরক্ষণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কাউন্সিলের বৈঠক—দুইয়েরই অনুষ্ঠানস্থল হয় ক্যানবেরা (অস্ট্রেলিয়া)। আমার যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু দুটোর কোনোটাতেই আমি গিয়ে উঠতে পারিনি।

(খ) ব্রিটিশ আর্নিথোলজিস্টস ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট চিঠি পাঠান 'মিসেস সেলিম আলি'কে (১৯৩৯ সালেই যিনি প্রয়াত) : 'ব্ল্যাক-বয়েজ, সাসেক্স, ২১ অগাস্ট ১৯৭৪। আপনার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ (রটল কেমন করে!) ঘোষণা করা হলে গত সপ্তাহে ক্যানবেরায় আন্তর্জাতিক পক্ষিতাত্ত্বিক সম্মেলনে খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তিনি ছিলেন সবচেয়ে খ্যাতনামা এবং বিশিষ্ট পক্ষিবিদদের অন্যতম। তাঁর প্রয়াণে সভ্য জগৎ জুড়ে তাঁর বিরাট বন্ধুমণ্ডলী মর্মাহত হবেন। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে তাঁকে আমার জানবার সৌভাগ্য হয়েছিল। ব্রিটিশ আর্নিথোলজিস্টস্ ইউনিয়নের কাউন্সিল আর সদস্যবর্গের পক্ষ থেকে আপনাকে আমাদের গভীর শোক জ্ঞাপন করছি। আমার স্ত্রীও আমার সঙ্গে একত্র হয়ে আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাতে চায়।'

(গ) **গাই মাউন্টফোর্ট** : 'ব্ল্যাকবয়েজ, সাসেক্স, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪।

ক্যানবেরা সম্মেলনে ঘোষিত আপনার মৃত্যুসংবাদ আপনার ভাষায়, 'কিছুটা ভ্রমাত্মক' বলে জানানো হাসিমুখের চিঠি পেয়ে কী যে আনন্দ হয়েছে তা বলতে পারি না। শুনে সকলেই আহ্লাদে আটখানা হবে। অবশ্য বিখ্যাত লোককে নিজের মৃত্যু নিয়ে রটনা অপ্রমাণ করতে হয়েছে, আপনি তার প্রথম নজির নন। আশা করি, আপনার আত্মজীবনীতে এটাকে আপনি যুৎসইভাবে কাজে লাগাবেন। যুদ্ধের সময় এমনকী আমার বেলাতেও এটা ঘটেছিল। একবার দেখি নিহতের তালিকায় আমার নাম রয়েছে।'

আরেক বন্ধু জাপানের ড: য়োশিমারো ইয়ামাশিনা, আই সি বি পি-র এশীয় বিভাগের সভাপতি—আমার মৃত্যুর গুজব তাঁরও কানে যায়।

(ঘ) **ড: ইয়ামাশিনা লেখেন 'মিসেস সেলিম আলি'কে** : 'টোকিও, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪...আপনার প্রিয় স্বামীর প্রয়াণের দুঃখের লগ্নে আমার গভীরতম শোক জ্ঞাপন করছি।...আপনার স্বামীর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় ১৯৫৮ সালে হেলসিঙ্কিতে। তদবধি আমাকে তিনি সাহায্য করে এসেছেন। আমি সর্বদাই তাঁকে গুরু হিসেবে পিতৃজ্ঞানে পরম শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছি। ১৯ অগাস্ট হঠাৎ তাঁর পরলোক গমনের খবরে খুবই বিচলিত বোধ করি। আমাদের কার্যকরী সমিতির সভার প্রারম্ভে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে আমরা এক মিনিটের নীরবতা পালন করি। তিনি কবে কী ভাবে মারা গেলেন, ক্যানবেরায় থাকতে সে বিষয়ে আমরা কিছুই জানতে পারি নি। এ বিষয়ে আমরা জানতে খুব আগ্রহী।...'

(ঙ) **ড: ইয়ামাশিনা লেখেন সেলিম আলিকে** : 'টোকিও, ১ অক্টোবর ১৯৭৪। ১৬ সেপ্টেম্বর লেখা চিঠিতে দেওয়া সুসংবাদের জন্যে অজস্র ধন্যবাদ। কী করে যে খবরটা এভাবে রটল জানি না। তবে আপনি সুস্থ শরীরে আছেন, এর চেয়ে বড়ো আনন্দের খবর আর কিছু হতে পারে না। জাপানে একটা প্রাচীন প্রবাদ আছে : (মনে হয়, সারা দুনিয়াতেই) 'ভুল করে কেউ মরে গেছে বললে তার আয়ু বেড়ে যায়।' কাজেই এখন আর আমার এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, এবার আপনি দীর্ঘকাল সুস্থ সমর্থ হয়ে আমাদের মধ্যে থেকে কাজ করে যাবেন।'

১৫। **এরভিন স্ট্রেসেমান** : 'বার্লিন, ২৬ মে ১৯৭২। তোমার মহাগ্রন্থের ৫ম খণ্ড আজই সকালে পেলাম। প্রথম পৃষ্ঠায় অলঙ্কৃত উৎসর্গপত্র আমরা কাছে পরম মূল্যবান হয়ে থাকবে। আগেকারগুলি যেমন, তেমনি এই খণ্ডটিও আমার এর পরের অনুশীলনে কাজে লাগবে। তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। (সাউথ কেন্সিংটন থেকে স্থানান্তরিত) বি.এম.-এর পক্ষিসংগ্রহের উদ্বোধনে আমরা দুজনেই ট্রিঙে উপস্থিত থাকব। বালি আর মোলাক্কায় জলপথে পাড়ি দেবার আগে

১৯১০ সালে এই মফস্বল শহরটিতে সানুগ্রহে আমাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন আর্নস্ট্ হার্টার্ট (এরভিনের গুরু)। সে আজ অনেক অনেক দিন আগে।'

* * *

পরদেশিদের চোখে আমরা কেমন

খুঁত কাড়া দিয়ে শুরু করে অভিযাত্রী দলের যে নেতা পরে হয়ে গিয়েছিলেন সমাদৃত সমঝদার একান্ত সুহৃদ। কর্নেল রিচার্ড মেইনর্ৎসহাগেন, ডি. এস. ও.-র ডায়েরি থেকে উদ্ধৃত কিছু মণিমুক্তো।

১৪ এপ্রিল ১৯৩৭ ঘোড়বন্দ উপত্যকা, ৬৫০০ ফুট, আফগানিস্তান। তাঁবু গাড়তে ওদের আঠারো মাসে বছর। শেষ আর হয় না। সেলিমটা অকর্মার ঢেঁকি। ওকে দিয়ে কিছুই হওয়ার নয়। চাকরবাকরগুলোও তেমনি। তাঁবু-টাবুর ব্যাপারে একেবারেই অগা। সেলিমের চাই একগাদা ল্যাংবোট, যারা ওর হুকুম তালিম করবে। নিজে কুটোটি ভেঙে দুখানা করতে পারে না। আবার তড়পায়—ওর জাতের লোকেরা নাকি ভারত শাসনের এলেমদার। আগে ওরা নিজেদের চরকায় তেল দিতে শিখুক।'

১৫ এপ্রিল ১৯৩৭। 'এসব আমার একেবারেই বরদাস্ত হচ্ছে না। সেলিম চেষ্টা করছে দেখছি। ও কোনো কর্মের নয়। বললে কথা কানে নেবে না। গোঁসা হবে। সব কিছু সব সময় নিজের মর্জিমতো করতে যাবে। আর তারপর ধেড়াবে। ক্যাম্পজীবন সম্পর্কে ওর অজ্ঞতা আর ক্যাম্পে থাকার দরুন ওর বিড়ম্বনা দেখে দুঃখ হয়। ও বলে যে, এর আগে ক্যাম্পে নিজের জন্যে কখনই কিছু করতে হয়নি। সব সময় একগাদা কাজের লোক থাকত। তারাই ওকে সব কিছু মুখের সামনে ধরে দিত। ক্যাম্পজীবনের যা কিছু মজা তা সঙ্গীসাথীদের ওপরই নির্ভর করে।'

৩০ এপ্রিল ১৯৩৭। 'সেলিমের ওপর আর আমার ভরসা নেই। কাজের মধ্যে একটাই পারে। শুধু পাখি জুটিয়ে আনতে। পাখির চর্মসংরক্ষণ, রান্নাবান্না, ক্যাম্পের জীবনের সঙ্গে জড়িত কোনো কাজ, মালপত্র বাঁধাছাঁদা বা কাঠ চেলা করা—এর একটি কাজেও সেলিমকে পাওয়া যাবে না। হড়বড় করে কেবলি নোট লিখে চলেছে—কী নিয়ে কে জানে, হয়তো বা আমারই সম্পর্কে কিছু!...এমন কি সংগ্রহের ব্যাপারেও যা করে তা নিজে গরজ করে নয়। সব ভারতীয়দের মতোই, ও যাতেই হাত দেয়, তাতেই ওর অবিশ্বাস্য রকমের আনাড়িপনা ধরা পড়ে। যেভাবে করলে ভুল হয়, ও ঠিক সেইভাবেই সে কাজটা করবে। কোনো জিনিস আগে থেকে ভেবেচিন্তে করা ওর কুষ্ঠিতে লেখেনি।'

২০ মে ১৯৩৭। 'সেলিম হল একজন শিক্ষিত ভারতবাসীর প্রতিমূর্তি। ওকে

দেখে আমি মজা পাই। তত্ত্বগত সব বিষয়েই ও খুব পটু। কিন্তু হাতেকলমে কাজের বেলায় টুঁ টুঁ। কোনো ছুটকো-ছাটকা সমস্যায় পড়লেই ও আর হালে পানি পাবে না। এ সত্ত্বেও সব ক্ষেত্রেই ও দাবি করবে ও সঠিক। ওর মতামত শুনলে ভিরমি খেতে হয়। কাল পারলে কালকেই ও ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশদের খেদিয়ে দেবে আর সে জায়গায় নিজেই দেশের রাশ ধরবে। আমি ওকে পই পই করে বলেছি যে, ব্রিটিশ সরকারের বয়ে গেছে কোটি কোটি অশিক্ষিত ভারতবাসীর ভাগ্য সেলিমের মতন লোকদের হাতে সঁপে দিতে ; বলেছি যে, কজন ছুঁচোয় মিলে মানুষের ওপর ছড়ি ঘোরাবে. ইংরেজরা কখনই তা মেনে নেবে না।'

৯ জানুয়ারী ১৯৫২, সিকিম (স্বাধীনতা-উত্তরকালে)। 'ভারতবর্ষ আর ভারতবাসী সম্পর্কে দেখছি সেলিমকে একটু কিছু বলার উপায় নেই। অমনি ফোঁস করে উঠবে। কোনো রকম সমালোচনাই ওর সহ্য হবে না। ভারতীয় প্রশ্নে দক্ষিণ আফ্রিকার আচরণ ওর দুচক্ষের বিষ। কেনিয়া আর দ: আফ্রিকার ভারতীয়দের সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা হল, ওরা ওসব দেশে আমদানি করেছে রোগবালাই, দুর্নীতি আর রাজদ্রোহ।' (এরপর একাদিক্রমে মারমুখো সব উক্তি করেছেন গান্ধীর মতামত প্রসঙ্গে, বলেছেন 'ছুঁচো গান্ধীটা', সেইসঙ্গে ব্রিটিশ রাজের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন বর্তমান ভারতের অকর্মণ্যতা, ভ্রষ্টাচার আর নোংরা দশার কথা।')

□□

Lasertypeset at Ess Ess Enterprise, New Delhi-110 055
and printed at Beauty Print, New Delhi-110 055